শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম এ সপ্তদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

"……আমার জীবনের যাহা কিছু সব নিত্যগোপালের পায়ে বিকানো। আমার যাহা কিছু বলা কওয়া সব ঠাকুরের দান। আমার কিছু ছিল না, আজও নাই। আমি শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, ধনজনহীন। কিন্তু কেন যে এমন সর্ব্বস্বহীনকে ঠাকুর পাইয়া বসিয়াছেন, তাহা জানি না। ……বুঝিতেছি কিংবা দেখিতেছি একটা বিরাট সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিতে আমার নিত্যগোপাল জগতের বুকে দাঁড়াইয়া। কিন্তু উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি 'অবাকী অনাদর'। মুখে তাঁহার বাক্যটী নাই, তাঁহার আদর আর কোথায়? প্রাণকে কি এ জগতে কেউ আদর করে? প্রাণহীন জগতে কি প্রাণের কথা কেউ শোনে? নিত্যগোপাল কথা না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, আদর না পাইয়াই তিনি অপ্রকট। ……আমার ঠাকুর আজ অনোরণীয়ান বটে, কিন্তু মহতো মহীয়ান হইবার সামর্থ্য আছে তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। তোমরা তাঁহার কাজ কর। ……তোমাদের জন্য, মেয়েদের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত এ দেশের কোনও সাধু, কোন সন্ন্যাসী, কোনও শাস্ত্র কি মেয়েদের পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? সন্ন্যাসীর মধ্যে মেয়েদের স্থান কি দিয়াছেন? তোমরা ছিলে দার্শনিক ক্ষেত্রে নিত্য বর্জ্জিত, তোমাদের স্পর্শে নাকি সন্ন্যাস কলঙ্কিত, সংসারীরা বদ্ধ। এমন 'বন্ধন'কে তিনি 'মুক্তি' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তোমরা মেয়েরা কি তাঁহাকে আদর করিবে না? তবে তাঁহাকে চিনিতে হইবে। ……গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন, যে আমার দিব্য জন্ম কর্ম্মকে 'তত্ত্বতঃ' জানেন—। নিত্যগোপালকে তত্ত্বতঃ না জানিলে তাঁহার স্বরূপ ঘুচিবে না, তাঁহার মোহন বেশ দেখিতে পারিবে না: ইহা স্থির। ……"

শ্রীযুৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

(উজ্জ্বলভারত)

(সপ্তদশ বর্ষ)

১৩৭৭০ মাঘ—১৩৭১ পৌষ | ১৯৬৪, ১৮৮৫-৮৬

অন্বেষা (কবিতা)
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ১৭৪

অপরের সঙ্গে কিভাবে মেশা যায়
শ্রীদেবাশীষ পাল ২১৪

অমৃত পেতেই হবে (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ ৮৩

আগমনী
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ১৯০

আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মদমর্পণ
শ্রীরেণু মিত্র ২৪৫

আমরা কোথায় ?
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ৩৯

আমাদের কথা
সম্পাদকীয় ১

আরত্রিক প্রার্থনা
শ্রীশরৎ চৌধুরী ১১

আশা (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ পাল ৫৫

ঈশ্বর দর্শন (কবিতা)
শ্রীবিমল চক্রবর্তী ১৫৫

উজ্জ্বলভারত (কবিতা)
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২০৬

উদারতা ও সারল্য
শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৩

একটি ঝরা পাতা (কবিতা)
শ্রীবিভা সরকার ১৫৬

কঠিন দান (কবিতা)
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ৫৫

কবি হুইট্‌ম্যানের কাব্য সংকেত
শ্রীঊষিকা মিত্র ১৮

কর্মযোগ
শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮২

কস্তুরী (একাঙ্কিকা)
শ্রীমন্মথ রায় ২০৩

কি ছিলাম—কি হয়েছি—কি হবো—কি হতে চলেছি
শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭৫

জিজ্ঞাসা (কবিতা)
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ৫

তবু সেই সিদ্ধান্ত নিলাম (কবিতা)
শ্রীবিহঙ্গম মিত্র ১৯৩

নওজোয়ানের প্রতি (কবিতা)
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৪৬

নমঃ নমঃ নমঃ বৈপায়ন
শ্রীহরিরঞ্জন কাব্যতীর্থ ২৬৫

নিত্যগোপাল প্রশস্তি (কবিতা) ৮৫

পুস্তক পরিচয়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১৩৪
অবিস্মরণীয় কাহিনী ২৩১

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৬, ৩১, ৯৯, ১১৭, ১৪১, ১৬৫, ২১১, ২৬৬, ২৮১

বর্তমান সমস্যায় নারীর কর্তব্য
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ২৩

ব্রাউনিং
জনাব মোহাম্মদ করীম ২০৭

বিনাশায় দুষ্কৃতাং
শ্রীদুর্গামোহন সেন ১৮০

বিশ্বনাগরিক ও শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীসনাতন মণ্ডল ১১৪
মানবিক না পাশবিক
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ২৮৪
যুগযোগনিষৎ (অধ্যুত ভাষ্য সমেত)
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ১১০, ১২২, ১৫১, ১৮১, ২২৪, ২৬৯,
মহাকবির যুগ—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ১৯৪
মধ্য যুগীয় বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ২২০
লাঞ্ছন লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৩
শিক্ষা চিন্তা : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী
অধ্যাপক তারাপদ ভৌমিক ৩৪
শিক্ষায় সৃজনাত্মক শিল্প
শ্রীপ্রভাতরঞ্জন গোস্বামী ২১৭
শিবমঙ্গল কাব্য ও অন্নদামঙ্গল কাব্য
শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪
শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ৮৬
শ্রীনিত্যগোপাল স্মরণে (কবিতা)
শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ৮৯
শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীরেণু মিত্র ৯০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২-৫৩)— ৯, ৪৭, ৬৮, ১০২, ১২৬, ১৫৬, ১৮৫, ২৩২, ২৭৩, ২৮৬,
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীচুনীলাল মিত্র ২৪১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ২৪৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীরাধেশ্যাম মজুমদার ২৫৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীপ্রতিভা রায় ২৬০
শ্রীশ্রীদুর্গা (কবিতা)
শ্রীনিত্যগোপাল ১৮৯
সত্যকে জানতে দাও (কবিতা)
শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত ৩৮
সদাচারী সমাজ
শ্রীনলিনীবিশোর গুহ ২৩৯
সব নিয়ে এ জীবন (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ ২১০
সমন্বয়ের আদর্শ ও আদর্শ সমন্বয়
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ২২৮
সমন্বয় (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ২১০
সর্বধর্ম সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ ৮০
সংস্কৃতির ত্রিধারা
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ১৭২
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ২৫৯
সাহিত্য
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ৬২
সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান
শ্রীদুর্গামোহন সেন ১২০
সাময়িকী : সুহৃৎ বিয়োগ ২৪
সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা
সরস্বতী পূজা ৫৬
বর্ষশেষ ৮৪
নিত্যগোপাল তিথি উৎসব ১১৫
পণ্ডিত নেহরু ১৩৭
একখানি পত্র
নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষ ১৬৪
হে রাজরাজেশ্বর (কবিতা)
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ১০৬
হৃষিকেশে (কবিতা)
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ২৩১

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, যোজনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

নগদ টাকা বাড়িতে রাখবেন না
আজই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিন

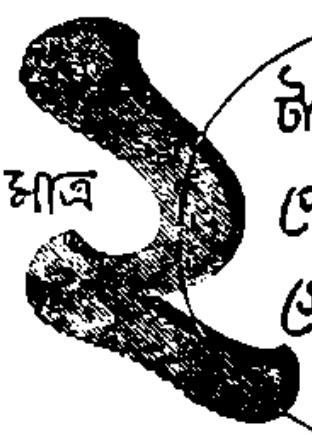

মাত্র ৫ টাকা কিংবা বেশী দিয়ে পোস্ট অফিসে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা যায়

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সহজে এবং নিরাপদে সঞ্চয় জমা করার সুবিধা আছে। নিজ নামে, কি বা যুগ্ম নামে বা অপ্রাপ্তবয়স্কের নামে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। পাসবই বা চেকে টাকা তোলার সুবিধা আছে।

বার্ষিক সুদের হার ৩%

আপনি আপনার সঞ্চয় অন্যান্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতেও লগ্নী করতে পারেন

- ১২ বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৬½ %.
- ১০ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪½ %.
- ১০ বছর মেয়াদী আনুইটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪·২৫ %. (চক্রবৃদ্ধি হারে)
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী ডিপোজিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩ %. থেকে ৪·৩ %.

এই সব লগ্নীর সুদ আয়কর মুক্ত
নির্দিষ্ট সময়ের উপর সম্পত্তিকর লাগে না
সহজে কেনা যায়, সহজে ভাঙা যায় ও সহজে ভাঙানো যায়

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন।

আপনার প্রিয় সব কিছু রক্ষার জন্য আরও বেশী সঞ্চয় করুন

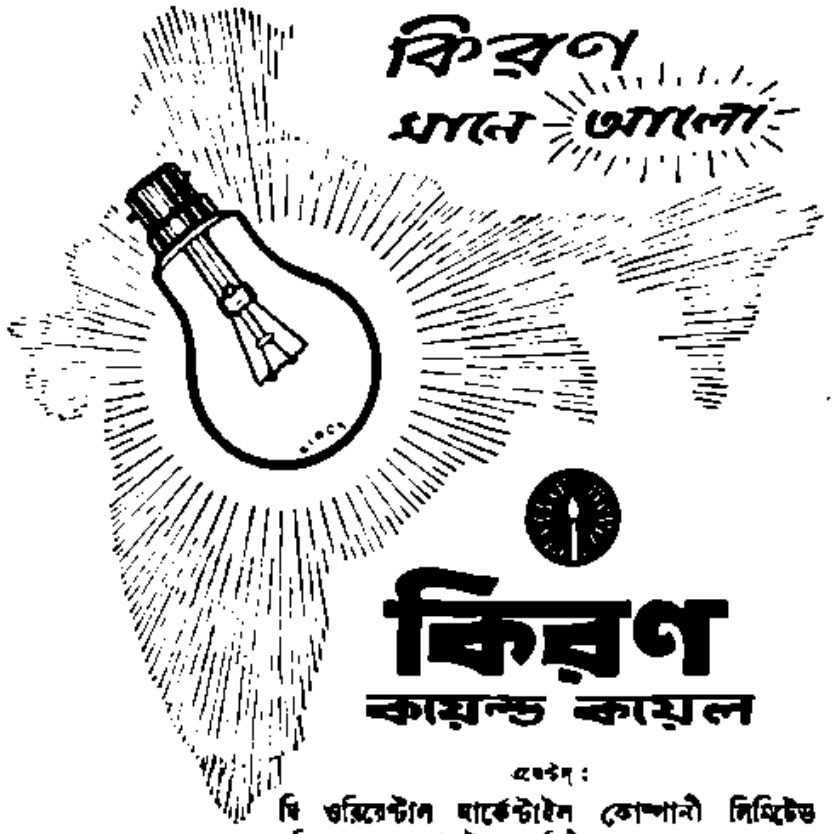

কিরণ
কায়েন্ড কয়েল

প্রস্তুতকারক :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

[illegible] • ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। • গড়িয়াহাট মার্কেট •

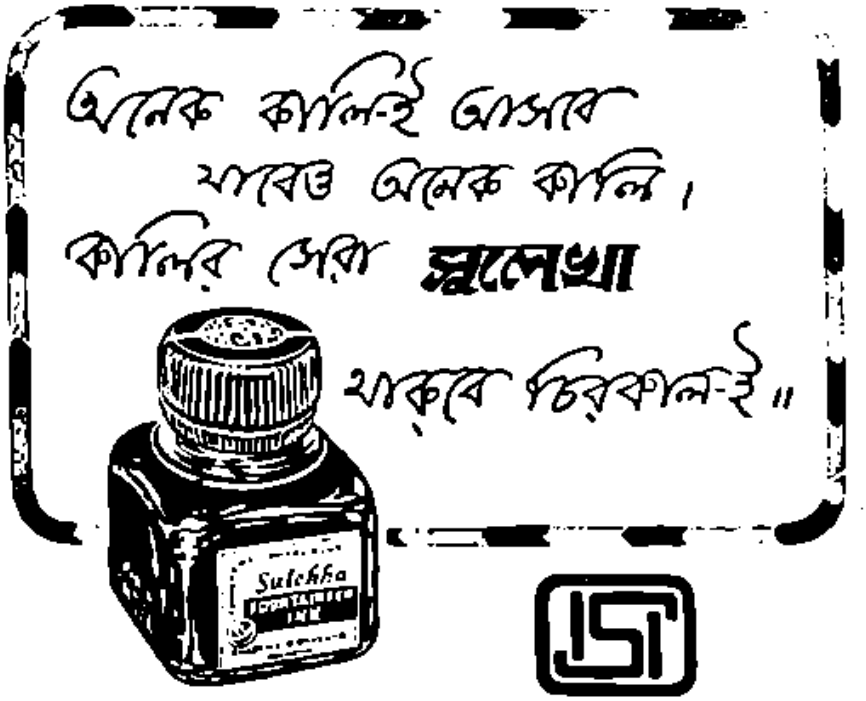

সূচীপত্র, মাঘ, ১৩৭০

১।	আমাদের কথা ...	১	৭।	আরত্রিক প্রার্থনা ...	
২।	লাঞ্ছিত নৈতিক পতাকা ...	৩		শ্রীশরৎ চৌধুরী	
৩।	মাং নমস্কুরু ...	৪	৮।	কবি সুইটম্যানের কাব্য সংকেত ...	
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ			শ্রীঘুথিকা মিত্র	
৪।	জিজ্ঞাসা ...	৫	৯।	মেয়েদের কথা ...	
	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়			শ্রীরেণু মিত্র	
৫।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ ...	৬	১০।	বর্ত্তমান সমস্যায় নারীর কর্ত্তব্য ...	
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৩)		১।	সাময়িকী : সুহৃৎ বিয়োগ ...	
৬।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২)	৯		সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা	

বিদেশে বাণিজ্য...(৪)

ইতালী
১৯৬৩সালে
ভারতীয়
বাটা প্রতিষ্ঠান
থেকে
মোট ৭৫000 জোড়া
জুতো কিনেছেন
Bata

উজ্জলভারত

মাঘ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ — ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

'উজ্জলভারত' পত্রিকার ষোল বৎসর পূর্ণ হইল—১৩৭০ বঙ্গাব্দের এই মাঘ মাস হইতে ইহার সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হইল। আজ এই দিনে মনে পড়ে ষোল বৎসর আগে উজ্জলভারতের প্রথম প্রকাশের দিনে ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের আবেগ ও সংকল্পকে। একটা পত্রিকা বাহির করিতে বাহিরের দিক হইতে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার কিছুই সেদিন পুরুষোত্তমানন্দের ছিল না—না অর্থবল, না লোকবল। ছিল কেবল অন্তরের মধ্যে উজ্জল ভারতের একটা উজ্জল চিত্র এবং তাহাকেই রূপ দিতে একটা তীব্র প্রেরণা। ভারতের এই যে বাস্তব একটা উজ্জল চিত্রের প্রেরণায় ১৯১৯-এ পুরুষোত্তমানন্দ শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্র কন্যা লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে চিত্র রাজনৈতিক ভারতের চিত্র নয়, উহা কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চিত্রও নয়, কিংবা অন্য কোন বিশেষ সৌন্দর্যে উজ্জল ভারতের চিত্রও নয়—সে চিত্র কর্মজ্ঞানপ্রেমময়, সৎ চিৎ আনন্দময়, সাত্ত্বিক রাজস তামস চিত্তবৃত্তির সুসমঞ্জস সমীকরণে সমুদ্ভাসিত, যেখানে কাহারো দ্বারাই কেহ অভিভূত প্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যেকে প্রত্যেককে পোষণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। এমনই একটি সামগ্রিক জীবন-সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও তাহাকেই বাস্তবে রূপ দিবার তীব্র প্রেরণা ছাড়া সেদিন—উজ্জলভারতের প্রথম প্রকাশ-দিনে—পুরুষোত্তমানন্দের আর কোন সম্বল ছিল না। সেটা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস। পুরুষোত্তমানন্দের নিজস্ব স্থান ছিল না, নিজস্ব অর্থ ছিল না, লোকবলের মধ্যে ছিল বলিয়া যদি ধরা যায় তাহলে প্রত্যক্ষতঃ বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায়, আজন্ম অসুস্থ বর্তমান সম্পাদিকা আর পরোক্ষ ভাবে অনেকের আত্মিক সংযোগ। তাঁহার নিজের দেহকেও তখন আর কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী চালাইবার অবস্থা ছিল না, দেহের সমর্থতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেহকে চালাইবার অবস্থা তখন আসিয়া গিয়াছে। এ হেন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দুইজন বন্ধুর নিকট হইতে পাঁচশত মত অর্থ সাহায্য পাইয়া পুরুষোত্তমানন্দ 'উজ্জলভারত' পত্রিকা প্রকাশ করিবার পথে রওনা হইলেন। সাড়ে দশ বৎসর পরে ইহারই মধ্যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ—তাহারও পরে প্রায় ছয় বৎসর হইতে চলিল। সব শুদ্ধ ষোলটি বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। উজ্জলভারত প্রতি বছরের প্রতি মাসে নিয়মিতই প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। কত অসুবিধা কত দুর্যোগের মধ্য দিয়া এ চলা সে বিবরণের স্থান ইহা নয়। যাই হোক, আজও 'উজ্জলভারত' শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের আদর্শকে ধারণ করিয়া চলিতেছে, বহু মানুষের বহু সহযোগিতা পাইয়া আজ পুরুষোত্তমানন্দের পবিত্র দেহকে ধারণ করিয়া রাখিবার অবস্থাও সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, গ্রামের মধ্যে কয়েকটি সমাজ সেবার কাজও সুষ্ঠুভাবে চালাইবার পরোক্ষ সহায়ক হইয়াছে—তথাপি আজও সে অর্থসম্বলহীন, লোকবলহীন। আজও তাহার প্রধান সম্বল সেই উজ্জল ভারতের চিত্র—সেই সমগ্রতার সামঞ্জস্যের সুষমাদ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে মণ্ডিত করার প্রেরণা। তাই এত দীনতা সত্ত্বেও বিশ্বাস রাখি উজ্জলভারত চলবে। সেই বিশ্বাস লইয়া এই নূতন বৎসরের যাত্রারম্ভ ক্ষণে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সেই প্রেরণার সঙ্গে একাত্ম হই, তাঁহার সংকল্পের সঙ্গে

একাত্ম হই। একাত্ম হইয়া প্রণাম জানাই তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালকে যাঁহারই স্পর্শে পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে শ্রীকৃষ্ণের এই সামগ্রিকতার জীবনতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সহজ মানুষের সহজ জীবন কত পবিত্র, উষ্ণ, কত কল্যাণধর্মী হইতে পারে শ্রীনিত্যগোপাল তাহারই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মানুষ অতীত বর্তমান নানারকম সংস্কারে আবদ্ধ—বুদ্ধি আর বোধিকে সমমূল্যে প্রস্ফুটিত করিয়া বন্ধ-সংঘাতকে অনেকখানি সমতায় রাখার যে সহজ জীবন সেই জীবনের সংবাদ আজও তাই মানুষের কাছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায় নাই—নিত্যগোপালকে তাই আমরা চিনি না, জানি না। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে যে-নিত্যগোপাল প্রতিফলিত হইয়াছেন, তিনি ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বোধগম্য হইতেছেন। উজ্জলভারত পত্রিকা ও নরনারায়ণ আশ্রমের অস্তিত্ব তাহাই প্রমাণ করে।

আগতিক জীবনে—রাজনীতি ক্ষেত্রেও—হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থপরতা বা কূটনীতি দ্বারা অপরকে অভিভবের পথ পরিত্যাগ করিয়া সত্য প্রেম পবিত্রতার পথে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শত্রু ভয়ের যে নির্ভিকতার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সে পথ পুরুষোত্তমানন্দের প্রিয় পথ। রাজনীতি ক্ষেত্রে পরপদানত থাকিয়া আত্মার মুক্তিও তিনি স্বীকার করিতেন না—তাই আত্মশক্তি উদ্বোধন করিয়া ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তিনি অগণিত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাই উজ্জলভারতের এই নব যাত্রাপথে সেই মহাত্মা গান্ধীকেও প্রণাম জানাই। তাঁহার গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির যে ব্যাখ্যা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পাইয়াছিলেন, তাহাতে জ্ঞানপ্রধান কর্মকুণ্ঠ ভারতবাসী তাহার বাস্তব জীবনের স্থিতি খুঁজিয়া পাইবে—গান্ধীজীর সত্য প্রেম পবিত্রতা অহিংসাও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের আলোকে তাঁহার হাতে গতিধর্মী হইয়া উঠিয়া বহুতর সমস্যার সমাধান দিবে।

ভারতের সাদর অভিনন্দন জানাই সেই সব গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছাপূর্ণ বন্ধুগণকে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতাতে উজ্জলভারত এতটা পথ আসিতে পারিয়াছে। তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের আনন্দ-কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আরও বেশী করিয়া তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। একদিন ছিল যখন উজ্জলভারত পত্রিকার কাজই আমাদের প্রধান কাজ ছিল—কিন্তু আজ তাহা নয়। আজ নরনারায়ণ আশ্রমের বিবিধ কাজ—অথচ সেই অনুপাতে তাহার লোকবল অর্থবল বৃদ্ধি পায় নাই—উজ্জলভারতের জন্য কাজ করিবার লোকবল বলা যাইতে পারে কমা ছাড়া বাড়ে নাই। এই জন্য সকলের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে উজ্জলভারতের দায়িত্ব সকলেই আরও খানিকটা গ্রহণ করুন যাহাতে শ্রীমৎ স্বামিজী ও শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও কথাকে আমরা সুদূর ভবিষ্যৎ কালেও বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি। একটা নূতন জীবন-চেতনা সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়াই—পুরাতন যুগ ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সমস্ত বৈচিত্র্যের যথা মূল্য যথা মান দিয়াও যে প্রত্যেকের পারস্পরিক ভাবনা-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করিয়া একটা বিশ্বেই সকলকে বাস করিতেই হইবে, এ যেমন মানুষের বহির্দেশে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্দেশে,—এ কথাটা আস্বাদন করিবার ও করাইবার প্রচেষ্টায় উজ্জলভারত সকলকে আহ্বান জানায়, নিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দের বিশ্ব-নাগরিক হওয়ার আহ্বান সকলের দুয়ারে বহন করিয়া লইয়া যাইতে চায়। সকলের সম্মিলনে আমাদের জীবনের গতি বাড়িয়া যাউক, আমাদের চলার পথ সহজ হউক—আমাদের জীবনে পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অন্তর্যুক্ত হউন।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জয়ন্তভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অন্নাদ্যম—লাঙ্গল যাহার স্তোতক—সমন্বয়ঘন তত্ত্ব-প্রকাশিকা এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি।]

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কাল-প্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের ধ্বংসঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রামরাজ্যমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়েই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন পীতাশাস্ত্রের জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাবৃত। কৃষিক্ষেত্রে বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা **'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'**।

উজ্জয়ন্তভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

'মাং নমস্কুরু'

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

['শ্রী' নামক পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য উহার সম্পাদকের অনুরোধে এই প্রবন্ধ ২৮. ৮. ১৯৪২-তে পাঠান হইয়াছিল।]

'যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' শ্রীশ্রীচণ্ডী।

—যিনি সর্বভূতেষু 'বিষ্ণুমায়া' বলিয়া শব্দিতা, সেই সর্ব ভূতাত্মিকা বিষ্ণুমায়া দেবীকে নমস্কার নমস্কার, নমস্কার নমস্কার, নমস্কার।

শ্রীশ্রীচণ্ডী এই মন্ত্রটীর মধ্যে মানুষের জীবনের একটী সাধারণ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। বিশ্বের প্রতিটি স্পন্দন যে সর্বাত্মিকা বিষ্ণুমায়া, কোথাও যে জীবকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কোনও দুষ্টু ভগবান কিছু করেন নাই, বিশ্বময় যে মায়ের স্নেহস্পর্শ ই বিরাজিত, সর্বত্রই অভয়ার অভয় ক্রোড় যে জীবের জন্য প্রসারিত, যাহাকিছুকে এতদিন সাধনার প্রতিকূল বলিয়া শুনানো হইয়াছিল, সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-ভ্রান্তিও যে সর্বাত্মিকা বিষ্ণুমায়ারই অভয় রূপ, তাহা আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে। আমরা তাঁহার চরণে শরণ নেই নাই বলিয়াই সর্বমঙ্গলার সব মঙ্গলরূপ আমাদের কাছে অমঙ্গল রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বিচ্ছিন্ন আমি, বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া দেখিলে ভয়মোহ ছুটিয়া উঠিবেই, মঙ্গল-অমঙ্গলের ভেদ-দর্শন, বিষ্ণু-মায়ার দ্বন্দ্ব দর্শন আমাদিগকে বিপন্ন করিবেই। ভেদবুদ্ধির এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সঙ্কটহারিণী সর্বমঙ্গলার তখন রুদ্রাণী রূপের প্রয়োজন হয়। আমাদের সমগ্র সৃষ্টির অভাবই তাঁহাকে আমাদের কাছে 'রিপু' রূপে সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা রিপু বলিয়া বিকৃত, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিব যে, উহাও মায়েরই দিব্যরূপের ঝলক।

মন্ত্রটীর মধ্যে সর্বভূতেষু পদটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। জীবের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রয়োজন হয় সর্বভূতের সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া লওয়া। যিনি ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির কাছে মায়া, নিছকই জটিলতা, তিনিই সর্বভূতাত্মিকা সৃষ্টিতে বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া, আত্মমায়া। বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিতে যে জগৎ মায়া মরীচিকা, সেই জগৎই সর্বাত্মিকা দেবী-সৃষ্টিতে বিষ্ণুমায়া। বিষ্ণুমায়াই যোগমায়া। এই যোগমায়ার উপাশ্রয়েই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই মায়াময় ব্যক্তিক জগৎকে দিব্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন আজিও পূর্ণ হয় নাই। এই বার হইবে, তাহারই সূচনা দিকে দিকে।

যাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-ভ্রান্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়াই বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে জগৎ মিথ্যা নিশ্চয়ই। কিন্তু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'ক্ষুধা'ও সর্বাত্মিকা; সেখানে একার ক্ষুধাই একমাত্র ক্ষুধা নয়, সর্বভূতের ক্ষুধা সেখানে দেবী রূপের সন্ধানই দিয়াছে, অন্ন-ব্রহ্মকে বিশ্বজনীন রূপে গড়িয়া তুলিবার পথে আকর্ষণ করিয়াছে। সেখানের 'তৃষ্ণায়' মানুষ বাদ দেওয়ার ভুল (error of omission) করে না, সেখানের তৃষ্ণা সর্বাত্মিকা বলিয়া উপলব্ধ হয় যে, 'Reality lies ahead,' সেখানের তৃষ্ণা ভবিষ্যৎ অনন্তের দিকেই উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সেখানের 'ভ্রান্তি' মানুষের জীবনকে রস রূপে জমাইয়া তোলে, সেখানে ভুল করিতে করিতেই মানুষ আগাইয়া চলে, ভুল মানুষকে গতিধর্মেই দীক্ষিত করে। ভুল যে মানুষের করিতেই হইবে বিশ্বের 'রস' আস্বাদন জন্য, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিশ্বের বিদ্যা-অবিদ্যা দুইই মহাবিদ্যার দুই দিক্। একান্ত বিদ্যা বা একান্ত অবিদ্যা কেহই সমগ্রকে ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। বিদ্যার জীবনও একদেশদর্শী, অবিদ্যার জীবনও এক-

সেশদর্শী। সমগ্র দর্শন সম্ভব শুধু বিদ্যা-অবিদ্যার সমন্বয় ক্ষেত্রে, যোগমায়ার ক্ষেত্রে। এই যোগমায়ার ক্ষেত্রই বৃন্দাবন। সেখানে চৈতন্যের লীলা আমরা দেখিয়াছি, অচৈতন্যের রসলীলাও আস্বাদন করিয়াছি। ভ্রান্তি-অভ্রান্তির যুগল রূপের পরিপূর্ণ রস-আস্বাদন সেখানে ওতপ্রোত হইয়াছিল। নন্দ-যশোদা ভ্রান্তিবশতঃ ভুলিয়া যাইতেন, তাহাদের দুধের ছেলে ব্রহ্মবস্তু। কি মধুর আস্বাদনই না রহিয়াছে এই ভ্রান্তির মধ্যে!

এই রসলীলা আস্বাদন করিবার সাধনা হইতেছে আমাদের গুরুদেব দ্বারা পাঁচটী বার 'নমস্কার'। নমস্কার অর্থ 'নোয়াইয়া' দেওয়া'। আমরা স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, কারণ দেহ, তুরীয় দেহ, তুরীয়াতীত দেহ তাঁহারই সামনে নোয়াইয়া দিব, যাহাতে তিনি তাঁহার পরাশক্তি দ্বারা আমাদিগকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে পারেন। এত দিন তুরীয় ছিল স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের পর এই মাত্র। তাই তুরীয়ের তুলনায় স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ ছিল অজ্ঞানপ্রসূত। কিন্তু পরে 'তুরীয়াতীত' বলিয়া আর একটী স্তরের যখন খোঁজ পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-তুরীয় এই চারিটী স্তরই তুরীয়াতীতের মধ্যে সমন্বিত রহিয়াছে। এই তুরীয়াতীত স্তরই হইতেছে এই মাটির বুকে মাটির মানুষের স্তর। আমরা বুদ্ধির চুলচেরা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে কারণে, কারণ হইতে তুরীয়ে এবং তুরীয় হইতে তুরীয়াতীতেই উপনীত হইতেছি। তুরীয়াতীত স্তর যেমন বিমূর্ত (abstract), তেমনি ইহা মূর্তও (concrete) মূর্ত-অমূর্তের ভেদদর্শন তুরীয়াতীতের মধ্যে বিলুপ্ত। এ ভেদদর্শন বিলোপের সাধনাই শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঁচটী বার নমস্কারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন।

সর্বমঙ্গলা মাটির মানুষী মা আমাদের পারমার্থিক জীবনে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে জয়যুক্ত হউন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম জীবনের সকল বৃত্তিকে তাঁহার স্নেহস্পর্শে সর্বাত্মিকা করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আজ উদ্বুদ্ধ। শ্রীশ্রীচণ্ডী বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মতে কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরুষোত্তম মহিষী শ্রীশ্রীদুর্গা জয়যুক্ত হউন। বন্দে মাতরম

জিজ্ঞাসা

॥ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

আজো আসে বাঁশরীর আকুল আহ্বান
মাটির ধরার বুকে। অমৃতের গান
ভেসে আসে ধরণীর দগ্ধ বক্ষ প'রে।
বহিয়া শান্তির বাণী প্রতি ঘরে ঘরে।
মোরা পাপী, তাপী, মত্ত নৃত্য-গীত, গানে।
মুহূর্তে বিফল হই ঐহিকের টানে।
কামনা-কণ্টকে ক্ষত হয়ে উঠে মন।
অশান্তির দাবদাহে জর্জর জীবন।
মহাকল্যাণের বাণী, মধু ভক্তি রস
আজো করে ধরিত্রীরে স্নিগ্ধ ও সরস।
বাঁশীর যে মধু ধ্বনি আহ্বানিছে সবে
আনন্দে কল্যাণে তারা ক'বে মূর্ত হবে?
অমৃতের পুত্র ক'বে খুঁজে পাবে পথ
থামিবে হৃদয়-ঘাবে অনন্তের রথ?

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩৩)

—এই দুইদিকে টান যাদের তাদের এসে ভগবান হেপ্পার করেন।...কর্ম ও জ্ঞানের পথে আরম্ভ নিজের থেকে—ভক্তিযোগে আরম্ভ ভগবান থেকে—কর্মীর ও জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা যখন মানুষকে কূল দিতে পারছিল না—দুকূল ধারা মোটামুটি হারিয়েছে—কর্মীর আধিতেও চলছে না, আবার জ্ঞানের শুষ্কতাতেও তৃপ্ত না—তখন ভক্তি সম্ভব হয়। ভক্তের আমি শক্ত নয়—কর্মীর আমি খুব শক্ত, জ্ঞানীর আমিও শক্ত—কর্মীর অন্ধকারের আমি, জ্ঞানীর আলোর আমি—ভক্তিযোগীর আমি শক্ত নয়—তারা নিজের আমি প্রায় হারিয়েছে।... সন্ধি কালে—ত্রিসন্ধ্যায়—দিনরাত্রি যেখানে মিশেছে, গোধূলি উষা কালে—আলো অন্ধকারের মেলা মেশায়—এই সময়গুলি প্রাণের সময়—এই সময়ে ভগবান আনাগোনা করেন।...সংসারে যারা আসক্ত, তাদের এখানে না আসাই ভাল ...ভক্তি শব্দ প্রথম শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়। এ সাধনা অনেক পরে এসেছে। জ্ঞানী সংসারে ঢুকতে পারে না, কর্মী সন্ন্যাসে যেতে পারে না—কিন্তু ভক্ত কর্মী জ্ঞানী সব—সত্তাকারের যারা নিরহংবাদী তারাই ভক্ত। ভক্ত কর্ম ছাড়তে পারে না—ভগবানের এত বড় কাজ রয়েছে এই সংসার চালানো আর আমার কাজ থাকবে না? তিনি বিশ্বকর্মা...। কিন্তু ভোগ, বিষয়ীর ভোগ, নরনারায়ণ আশ্রমে চলবে না—কৃষ্ণের ভোগ—যেখানে রয়েছে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়—সেই ভোগ স্বীকৃত। একেবারে ত্যাগও নয়—তাহলে কর্ম থাকে না—সেবা থাকে না—চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ক্ষেত্র থাকে না।...কৃষ্ণ লিপ্ত হয়েও লিপ্ত না থাকা শিখিয়ে গেছেন। ইহাই তাঁর কর্মত্যাগ—সেবাবুদ্ধিতেই সব করেও না-করা হয়। সব কিছুকে ভোগ করা যায়—কিন্তু ভোক্তা হয়ে ভোগ্য বুদ্ধিতে নয়। ভগবদীয় বুদ্ধিতে যজ্ঞ করে ভোগ করতে হবে...অন্যকে ভোগ করতে হলে প্রসাদ করে নাও। সেবক যে হয় নি, তার ভোগে অধিকার হয় নি। নরনারায়ণ আশ্রম তথাকথিত যোগ আর ভোগের মাঝখান দিয়ে এই সেবকের ভোগের সন্ধান দিয়ে যাবে।...কৃষ্ণ রাম এরা সন্ধিতে এসেছিলেন—পিতৃযানেও নয়, দেবযানেও নয়...ত্যাগ করেই ভোগ করতে হয়।...প্রথমি তোমারে চলিব নাথ সংসার-কাজে।...এইভাবে করলে এই সংসারই গোলোক বৈকুণ্ঠ।—আমি সংসারী, আমি অসংসারী—শিব আদি গুরু—তিনি সন্ন্যাসী, তিনি গৌরীপতি।...অবধূত সম্প্রদায়ের আদি শিব।...

৬, ৮, ৪৬।...বৈষ্ণবদের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে - গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবের সবার দয়া হল, নিজের দয়া না হওয়ায় জীব ছারেখারে গেল—খুব অর্থদ্যোতক। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের দয়া সূর্যকিরণের মত সর্বদা প্রস্ফুরিত হচ্ছে। বৈষ্ণব মানে ভক্ত। এদের দয়া স্বপ্রকাশ, স্বপ্রকাশত্বই এদের ধর্ম। সূর্যের প্রকাশের জন্য কাউকে অপেক্ষা করতে হয় না। তুমি চোখ বুজেই থাক আর খুলেই থাক, সূর্যের আলো যথাসময়ে আসবেই। গুরুকৃষ্ণের দয়াও তেমনিই। সংসারে এর দৃষ্টান্ত আছে পিতামাতা—সন্তান মঙ্গল চায় না—তবু পিতামাতা তার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন। শিশু কত লাঞ্ছনা করে, তবু শিশুর মঙ্গল শুধু চান।.. তাঁহার এত দয়া যে কোন্ ছিদ্র পথে দয়া করবেন তাই খোঁজেন—ধাইমার কাছটুকুর অনুকরণের জন্য পুতনাকে ধাত্রী উচিত গতি দিলেন—শিবও কালকেতু ব্যাধকে কৃপা

করবেনই অর্থাৎ কৃপা করবেনই একটা ছুঁতো পেলেই হল। তাই এদের সন্তুষ্ট করতে বেগ পেতে হয় না। তবু মানুষ তো তাঁদের খুশী করে না। যদি বল জোর করে মানুষকে নিয়ে নিলেই হয়—না, তা হয় না—তাহলে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না। বুদ্ধিমান মানুষ, তেবে দেখ আমাকে মানলে তোমার কর্মজ্ঞানভক্তি সব দিক পূর্ণ হয়, না তোমার নিজের বুদ্ধিতে চললে তুমি সার্থক হও—তুমি বুঝেই দেখ তুমি কি চাও।···আমি যদি তোমার চাওয়ার শতগুণ দিতে পারি, কেন তুমি মানবে না? অহংকার রাখতে চাইলেই তো অহংকার রক্ষা হয় না। শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতিগণ নিজেদের অহংকার রক্ষা করবার জন্য কম চেষ্টা করে নি—শেষ রক্ষা করতে পারছে কি?···জোর করে কল্যাণ করা যায় না।···প্রত্যেক মানুষেরই একটা আমি রয়েছে—কিন্তু জোর জবরদস্তি করে কি আমি রক্ষা করা যায়?···এ কথা বলতে শেখ, 'তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়'।···তোমার জীবনের যত দিকের সার্থকতা সব আমাকে দিয়ে সার্থক হয়।···নিজের অহংকারকে যদি সম্মান করতে চাও, বিশ্বের অহংকারের নিকট অবনতমস্তক হও—অবন্ধঃ অর্পণস্ত মুখম্। যেখানে নিজের আমি নিয়ে দূরে সরে আছ—কিছু পাবে না—মাথা না ঘুইয়ে যারা মাথা উঁচু রাখতে চেয়েছে, তাদের অহংকার কর্দমের মত ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে।···উজান স্রোতে পুঁটিমাছও যায়—কেননা সে জলের শরণাগত—কিন্তু উজান স্রোতে হাতী ভেসে যায়।···বিশ্বের আমির কাছে শরণাগত হলে বিশ্বের করুণা পাবে।···করুণা তো পাচ্ছই—দুর্ভেদ্যের কাছ থেকেও জল সরে যায় নি, আলো সরে যায় নি।··· নিজের উপর দয়া কর—নিজে স্বাধীনতা চাইলে, মর্যাদা চাইলে, সম্মান চাইলে অন্যের স্বাধীনতা, মর্যাদা, সম্মান হরণ করো না।··যখনই না মানলে তখনই নিজেকে অপমান করলে—নিজেকে অপমান না করে অন্যের অপমান করা যায় না।···গীতা বলছেন আত্মৈব আত্মনো বন্ধু ··। তুমি তোমার শত্রু যখন তুমি নিজেকে অপমান কর···। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান না, কতটুকু জান?···তোমার গুরু জানেন, তোমার থেকে বেশী জানেন।...দশজনার মতই আজও চলতে চাইছ—এ তো জীবন নয়—জীবন ব্রহ্ম-ধ্য ···তোমাদের অতীত তো এমন কিছু উজ্জ্বল নয়—কি অতীত কাটানো যায়···কত কত মানুষের মরণের ম দিয়ে ভারতের অতীতের কত পাপ কেটেছে···নেতা সঙ্গে চলতে হবে। আমার সঙ্গে ভবিষ্যতে চলতে পারবে পার যদি থাক—নয়তো বিদায় হও।···আমাদের বিসর্জ আমার কাছে সমান - আমি মনের এমন অবস্থাও করে পারি। আস থাক—আমার নিত্যগোপাল অনন্ত জ্ঞা কর্মের সাগর—আমার সঙ্গে, নিত্যগোপালের সঙ্গে জীব টাকে গেঁথে তোল—অতীতের প্রারব্ধ কেটে যাবে···নিত্য গোপাল, নিত্যগোপাল আশ্রম-জীবনকে শুদ্ধ কর··।

৭, ৮, ৫৬।···অর্জুন মিশ্র নামে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কাছে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রোজ গী পড়তেন। একস্থানে এই শ্লোকটি আছে—

অনন্যচিন্তয়ন্ত মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

···যোগক্ষেম আমি বয়ে দেই—ভগবান বলেছেন অর্জুন মিশ্র ভাবলেন বয়ে দেন এ হয় না।···তিনি সে কেটে দদামাহম্ পড়েন। একদিন তিনি ভিক্ষায় অনে দূর চলে গেছেন ··এমন সময় দুই কচি ছেলে—এক কালো একটি ফর্সা—দুই ছেঁদারী খাবার ঘরে এনে অর্জুনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল। অর্জুনের স্ত্রী কচি ছেলে দে বড় বিচলিত হলেন।···অর্জুন বুঝলেন, হাঁ, তিনি বে আনেন। বহামি কাটার জন্যই কালো ছেলেটির বুক দি রক্ত পড়েছিল।·· অর্জুন বললেন, হাঁ, তিনিই এসেছিলে আমি অহংকারী, আমি ধার্ষ্টিক—আমার ঐশ্বর্যমিশ্র ভা আছে, তাই বিশ্বাস করতে পারি নি।···সন্তানের বো পিতা বন, পিতের বোঝা গুরু বন···। পেটের ছে মায়ের সঙ্গে রক্তের মধ্য দিয়ে অনন্ত, শরণাগত শি সাধনার মধ্য দিয়ে গুরুর সঙ্গে অনন্ত—তাই পিতামা গুরু এদের বোঝা বন। বুদ্ধি লোপ না হলে অনন্ত হ যায় না—অনন্ত না হলে আমার বোঝা তিনি বই পারবেন না। বুদ্ধি জগৎটাকে শাণিত ছুরিকা দিয়ে ঘবি করেছে···রস না থাকলে অখণ্ডত্ব থাকে?···বুদ্ধিমান দি

সংসারের কোন কাজ হয় না ··যে অনন্ত মনে করতে পারে তাকে দিয়েই কাজ হয়।···আমাকে অনন্ত মনে করে এখানে থেকো না—তাতে অভিসন্ধি থাকে।···দেওয়া জিনিষও বাইরের—সেখানে দাতা গ্রহীতার মধ্যে মনোরঞ্জনের, তোষামোদের প্রশ্ন আছে। কিন্তু অনন্ত হলে সুরসুর করে বেরিয়ে আসে—দিতে হয় না—বয়ে আসে। ··আমি আর বিশ্বনাথবাবু দেখতে পৃথক মনে হয়। কিন্তু আমরা organically related—মায়ের সঙ্গে ছেলে যেমন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ তাই।...অনন্যের দুই অর্থ—তাঁর সঙ্গে আমি অন্য নয়, তিনি ছাড়া অন্য কেহ নাই। ইতর অর্থ অপর, ইতরামি—আর একজনকে অন্য মনে করেছ কি তোমার ব্যবহারে ইতরামি প্রকাশ পাবে। তখন বুদ্ধি চালাতে অভিসন্ধি ফাঁকি ইত্যাদির আশ্রয় করে—এটা প্রেমের পথ নয়।···প্রেমে কোন অভিসন্ধি নাই... ফাঁক বোঝাতে গেলে অনন্য হতে হবে—পাওয়ার পথ অনন্য হওয়া—জীবন দিয়ে যান। উপাসনা মানে উপ আসতে সমীপে থাকা।···এই অনন্য লোকদের সংসারী লোকেরা নিত্য অভিযোগ করে—তাই অনন্যরা নিত্য অভিযুক্ত। সংসারে সম্বন্ধগুলি—স্বামী স্ত্রী পিতাপুত্র বন্ধুবান্ধব—মনে হয় যেন মিলেছে—কিন্তু কৃষ্ণ অনন্যত্ব আনবার কথা বলে গেছেন।···অভিযুক্ত যীশুখৃষ্ট, অভিযুক্ত গৌর নিতাই, অভিযুক্ত গান্ধী ···আর সংসারী মনে করে সংসারীরাই ভাল, ওরা সব পাগল।···এ বিশ্ব যুক্তের খেলা···। মাথার স্বার্থ আর পায়ের স্বার্থ এক—ব্রাহ্মণ শূদ্র অনন্য···নিত্যগোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ তো পাতান নয়—তিনি একথা বলতেন।···যে সত্যিকার গুরুর সঙ্গে এক হয়েছে, সে অনন্য—নরনারায়ণ আশ্রম এই অনন্যত্বের সাধনা করবে। আমি জীবনে কারোকে অন্য মনে করি নি—যে কাউকে অনন্য মনে করেছি—তাই আমার কোন কিছুতে ইতরামি নাই।···অনন্য হলে সব পাবে। যতটুকু অনন্য নিত্যগোপালের সঙ্গে হয়েছি, ততটুকুই তো তিনি পাইয়ে দিচ্ছেন—নইলে কেমন করে এ আশ্রম চলতো? ১৯১৯ থেকে তিনি রইছেন···। আমি কর্মীর কাছে অভিযুক্ত যেহেতু আমি জ্ঞান ভালবাসি, আমি জ্ঞানীর কাছে অভিযুক্ত যেহেতু আমি কর্ম ভালবাসি, আমি রাজনীতিকের কাছে অভিযুক্ত যেহেতু আমি জয় রাধে বলি, বৈষ্ণবের অভিযুক্ত···।

৮, ৮, ৫৬।···গীতার কর্ম এবং ধ্যান একই জীবনের দুইটি প্রকাশ। কর্মের গতি বাইরের দিকে, ধ্যানের গতি ভিতরে। বৈষ মন দুটোকে একত্র করতে পারে না। একটা করলে আর একটা থাকে না। প্রচলিত সাধনা কর্ম ক্রমে কমিয়ে ধ্যান বাড়িয়ে চলতে হবে—ব্রহ্মকে পেতে হলে। গীতায় তা নেই—সেখানে কর্মই ধ্যান, ধ্যানই কর্ম। কর্ম আর ধ্যানের বিরোধে—এক গল্প—স্বামী-পাগল স্ত্রীর গল্প—ঈশোপনিষদের অবধূত তাতে আছে।··· ধ্যানটা স্বতন্ত্র নয়, চিন্তার একটা আনন্দ মাত্র। কুকুর যখন শুকনো হাড় চিবায় তখন নিজের মুখের রসটাকেই হাড়ের রস মনে করে।···ধ্যানের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গীতায় কৃষ্ণ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সব সামঞ্জস্য করে বলেছেন।···কর্মের সঙ্গে ধ্যানের সামঞ্জস্য করা যায় ভালবাসায়—কর্ম হয় ধ্যানের বিকাশ। ···কর্মকেই ধ্যান করা যায় শরণাগতিতে। দুধ দেওয়া ভালবাসার প্রকাশ। যশোদা গরুর ধ্যান করেন, গরুর সেবা করেন কৃষ্ণের সেবার জন্যই...কর্মকে কর্ম হিসাবেই না দেখলে বিষকর্ম হয় না।···ভগবানকে তো সব সময় মনে রাখা যায় না—মনের এত যোগ্যতা নেই যে মনের মত গতির ভিতরে হাতী-রূপ ভগবানকে ঢোকাবে। ভগবানকে কখনও বুদ্ধিতে রাখতে হবে, কখনও প্রেমে রাখতে হবে।···প্রেম যদি থাকে তবে কর্মটাই ধ্যান হয়—যৎ করোষি···তাই-ই যেন ধ্যান হয়।···ধ্যানটা ন তু পৃথক্ ব্যাপার এবং করণীয়।···কলিযুগে সারাটা দিন পেটের জন্য কর্ম করতে যায়—ধ্যান করবে কখন?—তাই তো নির্দেশ—যা কিছু কর তাই-ই যেন ধ্যান হয়। ···ইংরাজীতে G, O, D তিনটী অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা, তিনটা মিলে যে God হয় তার উচ্চারণ আলাদা—

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৫)

সকালেআফিসে যাই। ৯টার মধ্যেই ফিরি। রেণু বাহির হয় না, 'যোগাযোগ' লেখা শেষ করে। ২টার পর আসে। আমরা ৪টার পর বাহির হই।...৭।৮ শত টাকা বিধা হইতে পারে। ২।৩ বিঘা পাওয়া যাইতে পারে। খোঁজ নিতে বলিলাম। পুকুর কাটিয়া মাটি ভরাট করিয়া লইতে হইবে। ধানের জন্য কিছু জমি থাকা ভাল। উচ্ছল ভারতের উপর সমস্ত খরচের জন্য নির্ভর করা কি সঙ্গত হইবে? আশ্রম করিতে হইলে মাসিক সকল খরচ বাবদ ৩।৪ শত টাকা তো দরকার হইবে। ঠাকুরের জীবনী কিছু পাঠ হয়। ঠাকুরের যেমন সমাধি ছিল এক দিকে, অপর দিকে তেমনি থাকা দিয়া চলিবার প্রচেষ্টাও তো ছিল। তিনি কিসের জন্য সিদ্ধান্তদর্পণ লিখিলেন? কেনই বা জাতিদর্পণ লিখিতে গেলেন? যদি তিনি একান্ত ভাল মানুষটির মত গোপনে গোপনেই থাকিতে চাহিতেন, তবে কেন তাঁহার এই গায়ে পড়িয়া বাস্তার ঝামেলার মধ্যে জড়াইয়া পড়া? বলুন স্বামী সত্যানন্দের অন্নপূর্ণা মূর্তিকে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার কথা? গুপ্তাবতারের কি আসে যায় তাহাতে? তিনি আসিয়াছিলেন সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁচে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিতে। যাহাকেই গোঁড়ামি লইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া চলিয়াছেন। তিনি গোঁড়োচারা সমাধিস্থ পুরুষ নন, তাঁহার ঝোঁক আছে, তিনি যে নবীন স্রষ্টা। ৯টার পর রথের ভিড় ঠেলিয়া আমরা আসি। আজ হইতে Saw palmeto খাইতে আরম্ভ করি। ১২টার পূর্বে একবার ও ৩টার পূর্বে একবার উঠি। প্রস্রাবের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। বালি খাই বৈকাল ৩টায়।

২রা জুলাই

তুমি আছ আমার—ইহাই আমার সান্ত্বনা, ইহাই আমার গর্ব্ব। সকলে ছাড়িয়া গেলেও তুমি আছ। আমার প্রতিষ্ঠা তুমি, আমার আমিই তুমি। তোমার বাহিরে কে আমি, কি আমি? তুমি আমাকে সকল দিক দিয়া আবরণ করিয়া আছ, তাই আমি শত ঝড়ের মাঝে আজিও সোজা হইয়া চলিতেছি। আমি তো হুইয়া পড়ি নাই, তোমার পতাকা বহিয়া চলিয়াছি। তোমার পতাকা বহিবার মানুষ কি তুমি আর দিবে না? তোমার পতাকা বিশ্বের সর্ব্বত্র উড়িবে না? নইলে বিশ্ব বাঁচিবে কেমন করিয়া? আমি তোমার পতাকাবাহী হইব—ইহাই আমার চরম সার্থকতা। সকালে আফিসে যাই।...কমলা আসে। আমি তাহার পড়া দেখাইতেছি, এমন সময় রেণু আসে।...মস্ত বৃষ্টি আসিতেই জানালাগুলি দিয়া দেয়। বাবার কথা কি তাহার মনে আছে? বাবাকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইলে সে-ও বাঁচিত, আমিও বাঁচিতাম। সে-ই কি শান্তিতে আছে? তাহার কি ভাবনা ছিল? আমিই তাহার সব আগলাইতাম. সে ঠাকুরের কাজ করিত। কিন্তু তাহা তো হইল না। কে জানে? ঠাকুর কল্যাণ করুন। বৃষ্টি থামিলে আমি ও রেণু আফিসে যাই। ঠাকুরের জীবনী পাঠের পর প্রতিভা বিরজার স্নানে যায়।...

৩রা জুলাই

ঠাকুর, তুমিই আমার পরম সার্থকতা, চরম সফলতা। তোমার 'আমি'র ভিতরই আমি আমার সত্য ব্যবহারিক পারমার্থিক 'আমি'কে খুঁজিতেছি, তোমার জীবনেই আমি আমাকে পাইতে চাই। তবে না আমি সার্থক? ওগো আমার আমি, আমি তোমাময় হইব, তুমি বনিয়া যাইব।

তোমার সগুণ নির্গুণ রূপে স্বরূপে আমি তুমি হইব। ইহাই আমার কামনা বাসনা ধ্যান ও জ্ঞান। তোমার জীবনে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সকল স্তরের সব দিব্য রূপ উদ্ভাসিত হইতেছে, তাই তুমি সর্ব্ব স্তরের সর্ব্ব অবস্থার, সর্ব্ব বিশ্বের সর্ব্ব মানবের ঘন বিগ্রহ। তোমার জীবনে বহির্গতিও মূর্ত্ত। তুমি মূর্ত্তিমতী প্রভাকৃষ্টি, মূর্ত্তিমতী পরাকৃষ্টি; এক দিকে তোমার মুহুর্মুহুঃ সমাধি, অপর দিকে তোমার তাত্ত্বিক রূপ, ঠেলিয়া-চলা চরিত্র—জাতিদর্শন ও সিদ্ধান্তদর্শন। তুমি ধন্য। সকালে আজ আর আফিসে যাই না। রেণুই আসে।...সব শিশিগুলি ধুইয়া ঠিক করি আমি ও প্রতিভা।...৪৷৷০টার পর বাহির হই। ট্রাম জোরে নামে।...এক ব্যক্তির কাঠের গোলায় আশ্রয় লই।...বসিতে বলে। আমরা বসি। তাহার বাড়ী ভাগলপুর। তাহার সঙ্গে আলাপ করি। পথে যেটুকু আদর পাই, তাহা কুড়াইয়া লই। কিছু পরে অন্য অন্য বৃষ্টির মধ্যেই আফিসে যাই।...ঠাকুরের কাছেই রাখিয়াছি, যাহা হয় করিবেন। মনে হইতেছিল, পুরুষোত্তমের অবতরণে কাল তো সুস্থ হইবেই। কেন অকাল মৃত্যু প্রভৃতি উঠিয়া যাইবে না? তাই আমি প্রাণপণে আরোগ্য কামনা করি, দীর্ঘ জীবন শিশুদের প্রার্থনা করি। যাহারা কালক্রমে আগে আসিয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধদের পরে যাইবে, ইহাই তো সুস্থ কালের লক্ষণ। তাহাই হউক বিশ্বে, ঠাকুর আমার।...

৪ঠা জুলাই

বিশ্বের সকল অঙ্গের কান্না জুড়াইতে পারে একমাত্র তোমার সকল অঙ্গের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াই। তুমি আসিয়াছিলে, ধন্য ধন্য হইয়াছে। কিন্তু আজিও তো তুমি চির অপরিচিতই রহিয়া গেলে। বিশ্ব আজ সমস্যায় জর্জ্জরিত। কে ইহার সমাধান দিবে তুমি ছাড়া? আজ বিশ্ব সকল অঙ্গ দিয়াই চায়। তোমাকে এক অঙ্গে পাইলে তাহার চলিবে না। তাই তোমার জড়াজড় সমন্বয় মূর্ত্তি দিকে দিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তোমার জয় হউক। আজিও সকালে রেণু আসে।...কলিকাতা [illegible] সিগ্নিকেট—২টার পর এখানে আসে। কিছু পরেই সুধাংশু আসে। ৫৲ টাকা দিয়া যায়। তাহাকে নিয়া একদিন হিসাবের কত কাজ করিয়াছি। তাহার অনেক শক্তি ছিল। সে তো তাহা ঠাকুরের সেবায় দিল না। সে যদি গীতা ব্যাখ্যা করিত পুরুষোত্তমদর্শন আশ্রয় করিয়া ধন্য হইত। ঠাকুর আসিয়াছিলেন সকলের সব প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে। একদিকে তাঁহার সমাধি, অপর দিকে ধাক্কা দিয়া চলার শক্তি—এই দুইয়ের সমন্বয় লইয়াই তো তিনি। সুধাংশুর মধ্যে ধাক্কা দিয়া চলার শক্তি ছিল। তাহার সদ্ব্যবহার হইল না।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যখন নরেন্দ্র ঠাকুরকে রামকৃষ্ণের গদীতে বসিবার জন্য অনুরোধ করেন; তবে বিলে, 'আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব'।...ঠাকুরের স্নেহের কথা বলিলাম, কেমন করিয়া তিনি ভক্তদের ছোট ছোট অসুবিধার কথাও প্রাণ দিয়া শুনিতেন ও ব্যবস্থা করিতেন। সন্ন্যাসী হওয়ার কথা প্রস্তাব করেন। অন্তরে সন্ন্যাসী হওয়ার কথাই বলি। বিশ্বের কাজ আসিয়া জুটিলে সেরূপ হওয়া যাইবে। জোর করা সঙ্গত নয়। সাদা-লালের উপাধির মধ্যে না পড়িবার কথাও বলি। মহা সিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক মনে হয়।...সংসারের মানুষ কি স্বার্থপর। উহারা মারিয়াই ফেলিবে; তাহাদের কাছে বউ মরিলে কি হয়? ৯টার একটু আগে আসি।...

৫ই জুলাই

নরনারায়ণ, নরনারায়ণ, নিত্যগোপাল, গুরু আমার, সখা আমার, স্বামী আমার, তোমাকে সকল সত্তা দিয়া নমস্কার। বিশ্ব জীবনে তোমার জয় হউক। রেণু ৬টার পর দক্ষিণেশ্বরে নীলুকে দেখিতে যায়।...নিজের আত্মার মর্য্যাদার জন্য কি মাতৃত্ব-স্ত্রীত্ব পিতৃত্ব-স্বামীত্ব ধর্ম্মও পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়? 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'-বাণীর অর্থ তাহা হইলে কি? রেণু ১১টার পর ফেরে। কমলা আসে ২টায়। তাহাকে রেণুর ওখানে পাঠাইয়া দেই।...আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।.....আমি ও প্রতিভা জয়ার বাসায় যাই।...ঠাকুরের কথা বলি, প্রাণটা কাঁদিয়া ওঠে।

আমার তো কেহ নাই নিতাগোপাল ছাড়া? আমার দেহ আমার শক্তিও আমায় ছাড়িয়া যাইতেছে। একমাত্র নিতাগোপালই ছাড়িতেছেন না।·····—, তুইও আমাকে বুঝলি না? বড় দুঃখ আমার, তোমাদের জন্য যে আমি আমার সর্ব্বস্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তুমি তিল তিল করিয়া আমার অবমাননা সহ্য করিবে ভাবিতেও আমার প্রাণ দগ্ধ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু তুমি তো আসিলে না। অন্তর বাসা হইতে মঠে আসি। ঠাকুরের সামনে শ্যামানন্দ পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীহট্টের—নাগ নামে একটী যুবক প্রশ্ন করে শ্যামানন্দকে, আত্মা যদি নিষ্পাপ, তবে পাপ করে কে? আমাকে উত্তর দেওয়ার জন্য শ্যামানন্দ বলিলে আমি পুরুষোত্তমের মাঝে কেমন করিয়া ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয় হয়, তাহা বলি। প্রথমে শ্যামানন্দের উত্তর কিছুই হইতেছিল না। যুবকটী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। Whitehead-এর উক্তিও বলি।···

৬ই জুলাই

শ্রীগুরুপূর্ণিমা। বিশ্বগুরু, তোমায় নমস্কার। পরমগুরু পরমহংসাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, ভগবান ঋষভদেব, কেবলানন্দ, তোমাদের নমস্কার। পিতা নীলকমল, মাতা মুক্তকেশী, তোমাদের নমস্কার। সংসার ও সন্ন্যাসের সব গুরুসত্তা, গুরুচৈতন্য, গুরুআনন্দ এই বিশ্বকে ঘিরিয়া আছে। তাই ইহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ স্ফুরিত হইতে পারিতেছে। সবিতা দাঁড়াইলে এই মুহূর্ত্তে সব তাসের ঘরের মত ধরায় লুটাইবে। আমি শরণাগত। জলের মাঝে যেমন মীন, শুরু, তোমার মাঝে তেমনি আমি। যাহারা আমার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধের, ভাবের সম্বন্ধের, তুমি তাহাদের আপন করিয়া লও।...অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিহ্বলতা লইয়া 'ঠাকুর যে আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহার শরণ লইলে সবাই কোনও ভয়ের নাই'—ইহাই বলি। বিশেষ করিয়া কমলাকে 'মানুষ' হওয়ার কথা বলি। সত্যই তো 'পথ'ই তাহার দাঁড়াইবার স্থল। কত বড় যোগ্যতা হইলে মানুষ পথে নিরাপদে দাঁড়াইতে পারে? ৯টায় আমি প্রতিভা ছন্না রেণু কমলা ট্রামে মঠে যাই।...গুরু পূজায় আবার শুচি অশুচি কি? যাহার আশীর্ব্বাদে অশুচিও শুচি হয়, তাঁহার পূজা সর্ব্বাবস্থাতেই করা যাইতে পারে। শুচি হইবার জন্যই গঙ্গাস্নান করে, শুচি হইয়া গঙ্গা স্নান কেহ করে না। ১১টায় বাহির হই।...ঠাকুরের লেখা 'দিব্যদর্শন' পাঠ রেণু করে। ঐ বই রেণু কিনিয়া আনে। ভক্তেরা কে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাহাও ঐ বইতে ঠাকুর লিখিয়াছেন। নিজের কথা নিজেরই বলিয়া যাইতে হয়। জীব প্রচারকে ভয় করে, তাই সে সাত্ত্বিক হইতে চায়, কিন্তু ভগবানও কি সাত্ত্বিক? ৯টায় পর ফিরি।

৭ই জুলাই

ওগো আমার সঙ্গী, তুমি আমার সঙ্গে আছ—আমার ইহাই পরম সান্ত্বনা। তুমি হুগলীতে বলিয়াছিলে, 'পরৎ, তুমি যখন যেখানে আছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। আমার সকল ভাবনা তুমি। তোমার প্রচার যেমন করিয়া পার তুমি করিও। আমি যতদূর পারিলাম, ঠেলাঠেলি করিলাম। আমার আর কতটুকু শক্তি! জগৎ বিরাট অথচ আমার শক্তি কত পরিচ্ছিন্ন। আমাকে দিয়া কেমন করিয়া ফুলাইবে যদি না তুমি প্রতি ক্ষণে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার আবেষ্টন গড়িয়া তোল? তোমার দেবার জন্যই বাঁচিয়া আছি, থাকিব। সকালে আফিসে যাই না। রেণু আসে ৮টার পর, যায় ১০।১১টার পর।··· দিব্যদর্শন পাঠ হয়। ঠাকুরের জীবনে সব মতে extreme type—pushed to the extrem প্রকাশিত হইয়াছে। একদিকে অজড়বাদের চরম অবস্থা ঐ সমাধি, অপর দিকে জড়বাদের চরম অবস্থা সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমস্ত মতবাদের জীব আস্বাদন এমনভাবে আর কি আছে? আজ প্রয়োজন সব আস্বাদনগুলি সমন্বয়ে দিবা সামাজিক মানুষের। তিনি ছিলেন type, মূর্ত্তিমান সব সিদ্ধির abstraction-স্বরূপ। এই abstraction আজ concrete হইতে চাহিতেছে তাঁহার জয় হউক। শ্রীনিত্যগোপালের কত রূপ, কত আকার ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে, সবই 'bloodless categories'-এর মূর্ত্ত বিগ্রহ। আজ প্রয়োজন তাঁহার জীবনে আস্বাদন। ধন্য আমরা যে, এমন একটী জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি আর

দিয়াছেন, স্নেহ করিয়াছেন, আদর করিয়াছেন।...

৮ই জুলাই

বিশ্বনাথ, তোমার সকল অঙ্গের নিংড়ান রস আমি। তোমার অস্তিত্ব, তোমার চৈতন্য, তোমার আনন্দ নিংড়াইয়াই তো আমি আমি। তোমারই মাঝে আমি সত্তা। তোমাকে দিয়াই আমি আমি। তোমার বাহিরে কে আমি, কি আমার স্থান? আমার জীবনে তোমার জয় হউক। সকালে আফিসে যাই। ৯টার পর রিক্সায় আসি।...আমাকে কি এমন করিয়া রুড় ঠেলিয়াই চলিতে হইবে?...ধূপধূনা দিবার পর ঠাকুরের জীবনী কিছুটা পড়া হয়।...ঠাকুরের জীবন অদ্ভুত! হৈ, তাঁহাকে তো আপনার করিতে পারিলাম না। বড় লোভ ছিল আপনার করিব, নিতাগোপাল বনিয়া যাইব দেহে প্রাণে মনে। তাঁহার ভিতর অবগাহন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া যাইব। সেবার কিছুই তো করিতে পারিলাম না। ঠাকুর, তুমি বলিয়াছিলে নবদ্বীপে, 'ভয় কি, টেনে তুলব'; হুগলীতে বলিয়াছিলে, 'শরৎ, যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। তবে কেন তোমার সঙ্গ প্রভাবে আমার আবেষ্টন তোমার সেবার অনুকূল হয় না? ৯টার পর আসি।...

৯ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি যোগাচার্য যোগেশ্বর, সংসারের সকল দুর্যোগ ঠেলিয়া আমাকে চলিতে হইতেছে; তুমি তো সুযোগ আনিয়া দিলে না? কেমন করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িব? তুমি সঙ্গে আছ, ইহাই আমি ধ্যান করিব। তোমার আশীর্বাদে আমার সকল দুর্যোগ তো সুযোগে গড়িয়া উঠিল না? সকালে আফিসে যাই। রেণুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। কেন জীবনভরা আমার এত রুড়? যেদিন আমি প্রতি ওষের নির্ভরত্ব ও অমূল্য স্বীকার করিয়াছি, সেদিন সাত্ত্বিকী প্রকৃতির চাপ হইতে মুক্ত রাজসী ও তামসী প্রকৃতি আমার জীবনে আসিবার সহজ পথ পাইয়াছে। তামসী প্রকৃতিই 'black forces of nature'! নিমতলা শ্মশানে ঠাকুর যখন আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন বিরাটাকার ভূতপ্রেত তাঁহাকে ঘিরে তুলিয়াছিল। ঠাকুর আত্মস্থ ছিলেন, তাই তাহারা পরিপাক হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনে কি কম ভূতপ্রেতের অত্যাচার? ঠাকুর সব আগলাইয়াছেন। কোথায় ডুবিয়া যাইতে পারিতাম, কোথায় জড়াইয়া পড়িতে পারিতাম—বরিশাল ত্যাগের পরের ইতিহাস, রাজনীতির জীবন, —র জীবনের ঘটনা, উজ্জয়িনী—সর্বত্রই কি ঠাকুর প্রমাণ দেন নাই যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও টানিয়া তুলিতেছেন? তবে কেন আমি নূতন ঘটনায় ঘাবড়াইব? টানিয়া তোলাই তাঁহার ব্রত। ৯টার পর আফিস হইতে আসি। কমলা আসে ২টার পর, কিছু পরেই রেণু প্রেস হইতে আসে।...

১০ই জুলাই

রাধারাণী আমার, নৈর্গুণী শ্রীরাধা আমার, তোমার জীবনে সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী প্রকৃতির পরিপূর্ণ সার্থকতা সমন্বয়, দেখিতেছি। ব্রজই এই সমন্বয়ের দেশ। মহাচাতুরীর এই দেশ। এই দেশে সাত্ত্বিক রাজস তামস বৃত্তিগুলিকে যথাযথভাবে যথাস্থানে প্রয়োগ করিবার কৌশল মিলিয়া উঠিয়াছে। সত্ত্ব-রজ-তমঃ-র সঙ্ঘর্ষ এখানে নাই, আছে কোলাকুলি। জীবনের কী অপূর্ব আস্বাদন। সকালে আফিসে যাই। কিছুটা প্রুফ দেখার পর রেণু সুধাংশুর ওখানে যায়। সুধাংশুকে নলিনীর পত্রমত বেলেঘাটা পাঠায়। ইতিমধ্যে বীরেনবাবু প্রুফ নিবার জন্য আসেন, বসিয়া থাকেন রেণুর অপেক্ষায়। তাহার কাছে উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।...ঠাকুর আমার জীবনের মূলে থাকিয়া আমায় পরিচালিত করিতেছেন—ইহা সত্য। আমি কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিব না? তিনি আমাকে ডুবিয়া যাইতে তো দেন নাই। এমন কত ঘটনা ঘটিয়াছে, যে-কোনও ঐরূপ ঘটনাতে কত বীর আটকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তো উতরাইয়া আসিয়াছি। কাহার জোরে? শুধু ঠাকুরের জোরে! কোনওদিন আমার আর নাই। যখন নিতাইবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝড় বহাইতেছিলেন, তখন আমি একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার উপর বিশ্বাস না হারাই'। তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, তোমার

অবিশ্বাস আসিবে না'। আমি রক্ষা পাইয়াছি, বাঁচিয়াছি। কি দশা হইত আমার? ঠাকুর, আমায় অনন্ত বিশ্বাস করিতে দাও। তুমি আছ আমার, আমার ভয় কি? আমি সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ। তুমি তো আমায় গায়ে সংসারের আঁচ তেমন করিয়া লাগিতে দেও নাই। রাত্রি ৯টায় ফিরি।···কুহুমের কাছে এক ইনভেলাপ দেওয়া হয়। প্রতিভা লেখে। এখানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হইবার কথাই তাহাতে আছে।

১১ই জুন

মুক্ত মুক্ত জীবনপ্রবাহ ওগো রাধারাণী, কেন অযাচিত করুণায় আমার কাছে ধরা দিলে? তুমি পরাপ্রকৃতি, আমার অপরা প্রকৃতিকে তোমার নির্গুণ বিশ্বময় জীবন-প্রবাহের মাঝে গড়িয়া তোল। ধরার বুকে তোমার পুরুষোত্তমকে গড়িয়া তুলিবার উন্মাদ লালসায় আমি ছুটিয়াছি, তোমার সঙ্গিনী হিসাবে। ওগো জীবন-সঙ্গিনী, জীবন-বল্লভ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার অপার করুণার মাঝে ডুবিয়া রহিব। তুমি নৈর্ঋতী, মহানির্বাণ-মূরতি। সকালে আফিসে যাই।···পরীক্ষিতের আত্ম-কাহিনী মহাভারত হইতে বর্ণনা করেন। সেখানে আছে —পরীক্ষিৎ মৃতাবস্থায় গর্ভ হইতে পড়িয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জীবন দান করেন। ভাগবতে আছে, 'জুগোপকুক্ষিং গতঃ আত্তচক্র'। কি ভাবেই যে ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছে। বলিহারী যাই শ্রীকৃষ্ণ জীবন। জীবনের সব কিছুর জীবন্ত ব্যাখ্যান শ্রীকৃষ্ণ। কেন তুমি আসিয়াছিলে আমার জীবনে? আমিও তো অর্থ বুঝি নাই। কি প্রয়োজন তোমার আমার জীবনে। তোমাকে যেমন করিয়া আমি বুঝিলাম, অন্তেরা এমন করিয়া তোমাকে বোঝে না। কি বিপদেই না আমি তোমাকে লইয়া পড়িয়াছি। তোমাদের আমার জীবনে আসা যেন ব্যর্থ না হয়, দেখিও। আমি কি তোমাদের কৃপা পাইয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইব না? আমি কি তোমাদিকে বিশ্বাস করি না?···

১২ই জুলাই

ঠাকুর তখন হুগলীতে। আমরা পাশের ঘরে শুইয়া। রাত্রি প্রভাত হয়। আমি দেখিতেছি, ঠাকুর আসিয়াছেন বলিলেন, 'আপ, আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি'। তিনি ধ্যা হইলেন, গৌর হইলেন। পরে কৃষ্ণ হইয়া এমন জোরে আমাকে টান দিলেন যে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল এই ঘটনা আমি সেইদিন ঠাকুরকে জানাই। ঠাকু বলিলেন, যখন তখন যার তার কাছে বলো না'। সেই দিনই 'কৃষ্ণ' নাম জপ সুরু হয়। কৃষ্ণ ভাল লাগিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরে কত তত্ত্বই না আমার জীবনে স্ফুরিত করিয়াছেন, যাহা নিত্যন্তই অভিনব। অযাচিত করুণায় যখন পাইয়াছি, তখন কি সকল দেহপ্রাণ দিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া পাইব না? আসিয়াছ যদি, সার্থক কর তোমাকে পাইয়া যেন আমি কাঙ্গালের মত না থাকি।··· ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। ভগবান আমাকে স্প করিয়াছেন, আদর করিয়াছেন, ডাকিয়াছেন—ইহা অশেষ গর্বের, সৌভাগ্যের ও সার্থকতার বিষয় আর কি হইতে পারে? জীবন দিয়াও তাঁহার সেবা করিব। সন্ধ্যার পূ বেশ কাল মেঘ করে। কি চমৎকার। কিছু বৃষ্টি হইয়াছিল গ্রহ দিয়া গিয়াছিল সকালে। ৯টার পর টিপটিপ বৃষ্টি ভিতর থালি পায়ে আসি।

১৩ই জুলা

ঠাকুর আমার বৃন্দাবন যাইবার (প্রথম বার) ক শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তব তিনি হুগলী। হুগলী মঠ হইতে নয় পদে, একটি মা ছোট পুটুলি লইয়া হুগলীঘাট স্টেশন হইতে ব্যাণ্ডে পৌঁছিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছি। গাড়ি আসিল কিন্তু আমি তো উঠিতে পারিতেছি না। ভিতর হই ধাক্কা দিয়া কেহ প্রবেশ করিতে দিতেছে না। গাড়ী তখ ছাড়ে ছাড়ে। রেলের একটি কর্মচারীকে অনুরো করিলাম, তিনি কিছু করিলেন না। বৃন্দাবন যাওয়া হইল না, মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ইতিমধ্যে দেখি যেন সেই লোকটিই আসিয়া একটা কবাট ধাক্ক দিয়া আমাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন। এক পা আমা ফুট বোর্ডে, অপর পা ভিতরে। ভিতর হইতে একজ লোক আসিয়া কবাট ঠেলিয়া ধরিল। আমার মাথা কাটি

গেল, রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ভিতরের অন্য লোকেরা আসিয়া আমাকে ভিতরে টানিয়া লইল। কে ঐ ভদ্রলোকটি যে আমাকে তুলিয়া দিল? সে নিশ্চয়ই পূর্বের রেল কর্মচারী নন। সকালে খুব বৃষ্টি হয়। ঠাকুরের জীবন-চরিত লিখিতে গেলে তাঁহার লিখিত মতবাদসমূহ দ্বারা এমন একটি ছক তৈয়ারী করা দরকার যাহার ভিতর দিয়া তাঁহার সমস্ত বিরুদ্ধ লেখাগুলি ও জীবনের ঘটনাগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। ঠাকুরের জীবন এত বিচিত্র যে তাহা লিখিয়া উঠা খুব কঠিকর। তাঁহার আশীর্বাদ থাকিলে পারিব। ৯টায় ফিরি।

১৩ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি আমার স্বরূপ, নিজরূপ। তোমার রূপে আমি রূপবান হইব, আমার সকল রূপ ছাপাইয়া তোমারই রূপ ফুটিয়া উঠুক। আমাকে এমন করিয়া অঙ্গীকার কর, একান্ত কর যাহাতে আমার নামরূপ তোমার নামরূপের মাঝে গলিয়া যায়। আমি মুক্ত হই, তুমি পূর্ণ হও। তোমার আমার বিচ্ছেদের জ্বালা, বিভেদের জ্বালা ঘুচাও। আমাকে এক কর তোমার জীবনের মাঝে। আমি বলিয়া পৃথক কিছু থাকিবে না, আমি তোমার জীবনে অপৃথক হইয়া থাকিব। আমার সকল আবরণ করিয়া তুমিই প্রকাশিত থাক। রেণু সকালে ৯।০টায় হেমাঙ্গবাবুর বাসায় যায়, সেখান হইতে এখানে আসে প্রায় ১০টায়। ১১টার পূর্বে যায়। প্রতিভার সঙ্গে ঠাকুরের নানারূপে দর্শন দেওয়ার রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঠাকুর আসিয়াছেন মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত স্তরকে নিজ জীবনে পরিপাক করিয়া ভক্তের বুদ্ধির সামনে দাঁড়াইয়া আধ্যাত্ম জীবনে মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্তের সাধনা বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আস্বাদন দিবার জন্য। তাই যখন তখন তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হইতেন। গীতা 'বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' বলেন, অথচ শ্রুতি বলেন, 'বুদ্ধেরস্ত মহান্ পরঃ মহতঃ পরং অব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'। অবতার ঐ স্তর নিজ জীবনে হজম করিয়া জীবের বুদ্ধিগম্য হন। বুদ্ধিমান ভক্ত এই দেহেই মহৎ ও অব্যক্তের স্পর্শ লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সাধনা যে ভগবানের স্তর হইতেই সুরু হইতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য, একটি আবর্ষণ পূর্বে করিবার জন্যই ঠাকুর ভক্তগণকে এত স্বপ্ন দেখাইতেন। স্বপ্ন শুধু ইঙ্গিত দেয় কোন্ পথে স্বপ্নের ঠাকুরকে জাগ্রত স্তরে আস্বাদন করা যায়। পূর্বে একটি আস্বাদন না দিয়া দিলে কোন্ সম্বল লইয়া সাধক রওয়ানা হইবেন? সাধন ভজন তো বুদ্ধির কসরত নয়। স্বামীর বীর্য না পাইলে স্ত্রী কাহাকে সন্তানরূপে ফুটাইয়া তুলিবে? স্বপ্নাদির ভিতর দিয়া ভগবান অনেক সময় এই বীর্যদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তবে যাহাদের জীবনে জাগ্রতের দৃষ্টি বেশী, যাহাদের ভগবানকে জাগ্রত স্তরে পাইবার লালসা তীব্র, তাহাদের কাছে স্বপ্ন বেশী আসে না। স্বপ্ন লইয়া মত্ত থাকাও বিলাসিতা। স্বপ্ন লইয়া তুষ্ট থাকা তৌহিকতা। ইহাতে স্বপ্ন তিরোহিত হয়, অথচ জাগ্রতের জীবনও আর গড়ে না। রেণুর সঙ্গেও এই কথা হয়। সকলের জন্য স্বপ্ন দরকার হয় না। মধ্যযুগে এই স্বপ্ন দেখার খুব প্রাবল্য ছিল। রেণু কলিকাতা যায়। ৯টার সময় ফিরি।...

১৪ই জুলাই

ঠাকুর, তোমার অবতরণের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ পাওয়ার আনন্দের প্রথম পর্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার চিনিয়া লইবার ও আস্বাদন লাভ করিবার পর্য্যায়ের সামনে আমরা দাঁড়াইয়াছি। কত দীনহীন, পতিত পাবন, কত বেশ্যা কত মূর্খ তোমাকে পাইয়াছে, জুড়াইয়াছে। কিন্তু চিনিয়া লওয়া তো হয় নাই। পাওয়ার আনন্দে ছিল তাহারা বিভোর। তুমি-আমি এক হইয়া এই নূতন পর্যায়ের পথে যাত্রা করিব। আমার দেহে তোমার দেহ, প্রাণে তোমার প্রাণ, মনে তোমার মন ফুটিয়া উঠুক। তুমি-আমি অদ্বৈত হইয়া আবার নূতন বিশ্বে চিনিবার আনন্দ ছড়াইয়া দিব। এস প্রিয়তম, আমার জীবনে। ভেদ-বিচ্ছেদ তোমার সঙ্গে আমার আর সহ্য হয় না।...ঠাকুরের কথা আলোচনা হয়। সমাজের দৃষ্টিতে পতিতারা ঠাকুরের স্নেহময় কোলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ইহা কি কম কথা। তাঁহার তো বাছাবাছি ছিল না। একটা পাওয়াইয়া দিবার বড়

তিনি তুলিয়াছিলেন, পাইয়াছে, পাইবার আনন্দে মাতাল হইয়াছে। কিন্তু জীবনের সকল psychology দিয়া তো পাওয়ার সময় তখন ছিল না। সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনে নিজেকে ধরাইয়া দিবার যুগই ছিল সেটা। আজ চিনিবার যুগ আসিয়াছে। তাহারই সামনে আমরা দাঁড়াইয়া আছি। দুরূহ কাজ। অথচ করিতেই হইবে। একটা মানুষের মত মানুষ হইলেই তো হয়। শুধু প্রচার দ্বারা হইবে না, চাই জীবনের স্পর্শদ্বারা জীবন গড়িয়া তোলা। প্রাণের প্রকাশ চিরদিনই গোপন। অথচ তাহাই organic। তাহাই একদিন দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠে। ঠাকুর চান তাই।...

১৬ই জুলাই

ঠাকুর, তুমিই আমাকে ঘর ছাড়া করিলে। আমি তো ছিলাম কুনো। বাহিরের কোনও ধারই কোন দিন ধারি নাই। দুইজন পুরুষ মানুষের সামনে দিয়া হাঁটিয়া যাইতেও আমার পা জড়াইয়া যাইত। সেই আমাকে রাস্তায় বাহির করিয়া একা এই পথের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া তোমার রহিয়াছ? আমি যে বড় একা, আমার সঙ্গে থাক। আমার জন্য কী আমি চাহিয়াছি? চাহিয়াছিলাম তোমার সেবা করিব। যে ধর্মের বীজ তুমি বপন করিয়া গেলে, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিব। পারিতেছি না তো। তুমি কি বিশ্বে অপরিচিতই থাকিবে? তোমাকে না হইলে যে বিশ্বের চলিবে না। তবুও তুমি আবার আসিবে না? এস আমার জীবনে। আমি জীবন দিয়া তোমার ধারণ করিতে চাই। সকালে আফিসে যাই। আজ 'সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' হরতাল ঘোষণা করিয়াছে।... বেণু বিরজার বাবার সঙ্গে জায়গা কেনা সম্বন্ধে কথা বলিয়া আসে। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়, তাহারই মধ্যে বিরজা আসে। ঠাকুরের বিদ্যানগর পরিভ্রমণ ও নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ হয়।...আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে সকল দিয়াই ভালবাসি, একান্ত করিয়াই ভালবাসি—ইহা বলি।...মানুষ দুই মুখো—আত্মামুখী ও সর্বভূতমুখী। দুই দিক খোলা থাকা চাই। নচেৎ ভগবান যখন আত্মার দিক দিয়াই প্রেরণা দেন, তখন যদি সর্বভূতের দিক খোলা না থাকে, প্রেরণা কিছুটা কাজ করিয়া শুষ্ক হয়। ঘরের দুই দিকের দুয়ার খোলা থাকিলেই তবে বাতাস যাতায়াত করিতে পারে, ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ হয়। নিত্যগোপাল আত্মায় প্রকাশিত হইয়াছেন সহস্র সহস্র মানুষের, কিন্তু সর্বভূতের দিক খোলা না থাকায় তাহা আজ শুষ্ক। আজ সেই দিক খুলিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিব। ঠাকুর, তুমি আমায় বল দেও, স্বামিন্ আমায়।

১৭ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি একদিন তোমার সুমহান ও সুমধুর জীবনের স্পর্শে যে প্রাবন ভক্তদের মাঝে আনিয়াছিলে তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়াই গিয়াছেন, তোমাকে চিনিবার ও আস্বাদন করিবার সুযোগই তাঁহারা পান নাই। তুমি সেযে তাহা সংহরণ করিয়াছিলে চিনিবার সুযোগ দিবার জন্য। আজ কি সেই প্রাবন বিশ্বের জীবনের সকল সত্তা মথিত হইয়া ঘন হইয়া উঠিবে না? প্রাবনকে কি আমরা জীবনে পরিপাক করিয়া জীবনের ব্রহ্ম-প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে পারিব না? সেই শক্তি তুমি আমাকে দেও দেখিয়াছি, আমিও যখন ঝড়ের মত ছুটিতাম, তখন একটা প্রাবন আসিত। কিন্তু তাহা দানা বাঁধিত না। আজ তাই বসিবার প্রয়োজন, পারস্পরিক আদান প্রদানে ভিতর দিয়া জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য। তুমি আবার এস সংগঠন মূর্তি লইয়া। আমি যে আর একা পারিতেছি না। বেণু ১০টায় বাহির হয়,...৪।০টার পর আসে ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। কি আনন্দ ভক্তগণ সেদিন পাইয়াছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে! ঠাকুর খাওয়াইয়া দিয়াছেন, ঠাকুরকেও তাঁহারা খাওয়াইয়া দিয়াছেন পারস্পরিক এই মিলন শেষের দিকে ছিল না। তখন পরমাত্মভাব। পরাণের (গোবিন্দানন্দের) সঙ্গে মিলনের কথা আজ পড়া হয়। কত ঐশ্বর্যের কথা। এক কাঁড়ি চিঁড়া দিয়া ৩৪ শত লোককে খাওয়ানো ইত্যাদি। কি সুন্দর তাঁহার ইহার মধ্যের ব্যবহারগুলি, চলন ও বলন প্রভৃতি। তাহাই বিশেষ ভাবে আমার প্রাণ আকর্ষণ করে। এই সব ব্যবহারের ভিতর দিয়া বুঝি তিনি আমার প্রাণের ঠাকুর। ঐশ্বর্যে তিনি ভগবান হয়ে...

আমি কত ছোট।...

১৮ই জুলাই

ঠাকুর, তুমিই 'সহজ', তাই আত্মা ও সর্বভূতের ক্ষেত্রকে স্বয়ম্ভূ স্বীকার করিয়া আস্বাদন করিয়াও উহাদের পারস্পরিক অন্তঃসত্তা-রস তুমি জীবনে জমাইয়া তুলিয়াছ। আত্মজ্ঞানীরা চোরের মত আড়াল করিয়া সর্বভূতকে নিজ প্রয়োজনে, নিজের আত্মতৃপ্তি দিবার জন্য ব্যবহার করিয়াছে, আবার অন্যান্য জ্ঞানীরাও চোরের মত আত্মাকে সর্বভূতের প্রয়োজনে, সর্বভূতসিদ্ধির জন্য লাগাইয়াছে। তুমি এই দুই চুরির উপর কাটপাবি করিয়াছ, তাই তুমিই 'চৌরং ব্রহ্ম'। তোমার কোনও প্রয়োজন নাই, তাই অভিসন্ধি নাই। তুমি আত্মজ্ঞানী, তুমি সর্বভূতজ্ঞানী, তুমি সহজ; পেণ্ডুলামের দুই প্রান্ত ঐ আত্মা ও সর্বভূতে তুমি সহজ-ভাবে বিচরণ করিয়াছ, অথচ কোথাও কোন গ্রন্থি সৃষ্টি হয় নাই। তাই তোমার লীলায় ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, মাধুর্যেরও অন্ত নাই। সকালে আফিসে যাই। ৮৷৷০টায় উদ্বোধন আসে.....। অরবিন্দ মন্দির হইতে প্রকাশিত 'বন্দিকা' হইতে শ্রীমা লিখিত 'চিন্তা' প্রবন্ধ প্রতিভা পাঠ করে: Synthesis-এর কোনও positive (হাঁ-ধর্মী) রূপ সামনে না থাকিলে এবং উহার মধ্যে প্রাণের যোগ না থাকিলে কি বিশ্লেষণ করা সহজ হয় কি ধর্ম কি অধর্ম, কি আমার নিজের বা সমাজের বা পূর্ব-পুরুষদের, আমার অতীত সমাজ-সংস্কারসমূহ? রাধারাণীর ছবি ও জীবন সামনে থাকিলেই না সীতার সতীত্বও একটা সংস্কার বিশেষে পরিণত করা সম্ভব? কোনও বাস্তব পরম 'আমি'র আলোকে দেখিলেই না ক্ষুদ্র আমির উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার রূপ ধরা পড়ে? নহিলে যখন তখন তো পেণ্ডুলামের যে কোনও একটী প্রান্তের সঙ্গে আটকাইয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকে: আমি আমাকে কি করিয়া উদ্ধারিব যদি না a hand from above draw? ইহা একান্ত intellectual হইলে তরাডুবি অনিবার্য। Intellect-এর সঙ্গে রসের যোগ প্রথম হইতে না থাকিলে বিশ্লেষণ হয় অবাস্তব, যাহা বাস্তবের সংস্পর্শে আসিলেই মুসড়াইয়া পড়ে। রাত্রি ৮৷৷০টার পর আসি।...ভুবন বসু সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গান্ধী সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি যুবক বৈকালে আসিয়াছিল।... ১৯শে জুলাই

ওগো রাধারাণী, মুক্ত জীবনপ্রবাহ তুমি ছুটিয়া চলিয়াছ দুকূল ভাসিয়া দুকূল প্লাবিয়া দুকূল গড়িয়া কৃষ্ণসাগরসঙ্গমে। আমি তোমার সঙ্গিনী হব। আমার সকাশ পুত্তলী, জীবনমরণধন, আমার দিবিমণি, বিশ্বের সকল কান্নার ধন বিশ্বের, তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। বিশ্ব-প্রকৃতির চরম সার্থকতা, চরম সফলতা তুমি। কোন্ প্রয়োজনে তুমি আসিয়াছিলে রিক্ত আমার হৃদয় দুয়ারে? অযাচিত করুণায় তুমি আসিয়াছ। আমি তো তোমাকে খুঁজি নাই, ডাকি নাই। সাধিয়া আসিয়াছ। আসিয়াছ যদি আত্মসাৎ কর। পুরুষোত্তম তো আমাকে তোমার জীবনে এক করিয়া একদিন আমাকে তাঁহার ধামে করিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। সে দর্শন আমার জীবনে মূর্ত্ত হউক। বেণু সকালে শশীবাবুর বাসা হইয়া এখানে আসে। এখান হইতে মন্মথেশ সান্যালের বাড়ী, পরে প্রকাশ সরকারের বাড়ী যায়।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। সত্য বিশ্বাস, রামদাস মোদক প্রকৃতিকে কৃপা, নবীনবাবুর ডায়েবেটিস রোগ অঙ্গীকার করা। জীবনের সকল দিক বিস্তার করিয়া একটা নিরবধি আনন্দধারার মাঝে তন্ময়পণকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের স্বপ্নলোককে সার্থক করিয়া চলিয়াছিলেন। আজ সেই স্বপ্নকে বাস্তবে আস্বাদন করিবার দিন আসিয়াছে। স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে যদি না তাহাকে বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপদান করিবার জন্য প্রাণপণ করা যায়। স্বপ্নে পাওয়াকে বাস্তবে পাইতে হইবে—ইহাই হইল ঠাকুরের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের সাধনা। তাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুসারী আমরা সেই পাওয়াকে সকল দেহপ্রাণমনে ফুটাইয়া তুলিব। আগে ঠাকুর যতখানি ভক্তদের সঙ্গে দেহের ক্ষেত্রেও একাত্ম হইয়া চলিতেন, শেষে তো তাহা করেন নাই। আগের চঞ্চলতা শেষে কোথায়? তখন যে 'পাওয়াকে' চিনিয়া লইবার সাধনার যুগ।...

২০শে জুলাই

ক্রমশঃ

আরত্রিক প্রার্থনা

॥ শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী ॥

তোমারে আরতি করে নীহারিকা, চন্দ্র, তপন ;—
তোমারি বন্দনা গান, গাহে বন-বিহঙ্গমগণ।
ছয় ঋতু সঙ্গোপনে, পূজে বহু উপচারে ;
বারো মাস অহোরাত্র করে নিত্য পূজা আয়োজন।
কানন বল্লরী রাজি ফল পুষ্পভারে সাজি'
তোমারে প্রদানে ব্রত—কুসুমিত কুমকুম চন্দন।
কবিতা কুসুম মালা, কবিরা হৃদয় ডালা
দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ঋষি-কবি করে তব চরণ বন্দন।
আজি আমি কী ভাষায়, কি ছন্দে তোমারে, হায়,
বন্দনা করিব, প্রভু, পর-ব্রহ্ম, নিত্য নিরঞ্জন,
ভাষার অতীত তুমি, ছন্দেতে লুটায়ে তুমি
প্রণমি ও পাদপদ্মে—পদ প্রান্তে লইনু শরণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শ্যামা, তুমি বীণাপাণি, রমা,
দ্বৈতাদ্বৈত, রূপারূপ, তুমি অভেদ পরমাত্মন্।
সাকারাকার নিরাকার, তুমি বিশ্ব মূলাধার ;
সগুণ নির্গুণ তুমি, গুণাতীত ব্রহ্ম নারায়ণ।
তুমি অখিলের স্বামী, তুমি দেব অন্তর্যামী,
অন্তরে বিরাজ,-রাজ'—ঘুচায়ে মোহ মেঘাবরণ।
হৃদে যেন হয় তব, প্রেম-স্পর্শ অনুভব,
সত্য-প্রেম-মঙ্গল-মধুর-সৃষ্টি হেরে এ-নয়ন।

কবি হুইটম্যানের কাব্যে সংকেত

॥ শ্রীযুথিকা মিত্র ॥

সাংকেতিকতা সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ। কবি বা লেখকের প্রেরণার মূলে যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, যে বাক্যের অতীত রসোময়তা কবির প্রাণ হয়ে থাকে—তাহার তার প্রকাশ যখন পুরোপুরি সম্ভব হয় না—তখন কবি শরণ নেন সংকেতের। সাংকেতিকতা নঞর্থক এবং তার অসাধারণ অসম্ভব।

উনবিংশ শতকের আমেরিকায় যে কয়েকজন বিখ্যাত কবি ছিলেন—Walt Whitman তাঁদের মধ্যে একজন। হুইটম্যানের কলাকৃতিতে সাংকেতিকতা বা symbolism-এর অবদান অনস্বীকার্য। পার্নে বোদলেয়ার বা ভিকেন মালার্মের প্রদর্শিত পথে চলে হুইটম্যান সাহিত্যের এই নবজাগরণকে স্থায়ী করেছেন তাঁর রচনায়। বর্তমান প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়—স্বল্পমাত্র প্রয়াস পাওয়া যাচ্ছে বলা যায়।

কবি হিসেবে হুইটম্যান কবিতার আঙ্গিকের প্রতি একটু বিশেষ নজর দিয়েছেন। প্রচলিত ছন্দ বা গঠন পদ্ধতিকে বর্জন করে তিনি এক নতুন ধরণে কবিতা রচনা করেছেন—সেখানে ধ্বনি বা শব্দ ছন্দের বন্ধন অস্বীকার করে ব্যঞ্জনায় পাঠককে মোহিত করছে, যেমন—

A word then (for I will conquer it)
The word final, superior to all,
Subtle, sent up—What is it ?
I listen ;
Are you whispering it, and have been
all the time, you see waves ?
Is that it from your liquid rims
and wet sands ?
Wherto answering, the sea,
Delaying not, hurrying not
Whisper'd me through the night,
and very plainly before day break
Lisped to me the low and delicious
word death,
And again, death, death, death, death,
Hissing melodious, neither like the
bird nor like my aroused child heart,
But edging nears as privately for me
rustling at my feet,
Creeping thence steadily up to my ears
and laving me all over,
Death, Death, Death, Death, Death...

—কবিতাটিতে অনিয়মিত ছন্দ লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য এবং আবৃত্তি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

সংকেত সম্বন্ধে হুইটম্যানের ধারণা একটু বিশেষ রকমের ছিল। এবং ভাষা ও আঙ্গিকের ওপরে তিনি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন বলে অনেক সময় তাঁর একই কবিতার অর্থ বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই অস্পষ্টতা দূর করে সংকেত সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন তা আলোচনা করলে : The poetry of future...aimes at the free expression of emotion···the reader will always have his or her part to do, just as I have had mine." কবিতার রস উপভোগে কবির দায়িত্ব যতখানি—পাঠকের দায়িত্ব তার চেয়ে কিছু কম নয়।

হুইটম্যানের চিন্তাধারা গভীর এবং দার্শনিক। তাঁর

ব্যবহৃত সংকেতগুলিতেও তার ছায়া পড়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মন প্রতিনিয়ত প্রকৃতির মধ্যে অনুসরণ করে চলেছে তার বাঞ্ছিত বস্তুর। The mind penetrates nature and this process creates a new world. শিশু প্রথম যে বস্তু বা ব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হয়—তাকেই অনুসরণ করে—কিংবা তার প্রভাব অজান্তেই শিশুর মধ্যে ছায়া ফেলে। এইভাবে ব্যক্তির সত্তার সঙ্গে সব পেয়েছির দেশের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সে যোগ চিরন্তন যাত্রাপথের। The Child Who Went Forth Every day তে হুইটম্যান অপূর্ব কতকগুলি সংকেতের মধ্যে দিয়ে এই ধারণাকে তুলে ধরছেন পাঠকের সামনে।

ফ্রান্সের সাংকেতিক কবিদের সঙ্গে হুইটম্যানের ভাবধারার অনেক মিল রয়েছে। র‍্যাঁবো, লাফর্গ, ছুয়ার্ট মেরিল প্রভৃতিরা হুইটম্যানের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রতীকধর্মিতার প্রধান কথাই হলো:—রূপ রস গন্ধভরা এই পৃথিবীকে উপভোগ করা বা বর্ণনা করা একমাত্র সম্ভব সূক্ষ্ম প্রাণচেতনায়—যা হলো সার্থক কবির মূলধন। সংকেত ত' কবির সবচেয়ে বড় অস্ত্র। একটি স্বর বা একটি ধ্বনিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে ভাষা যথেষ্ট নয়। হুইটম্যান প্রমুখ কবিরা দৃশ্যমান জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছেন—অপরূপকে দেখেছেন দুটি নয়ন মেলে—কিন্তু সেই উপভোগ সেখানেই শেষ হয়নি—কবির স্পর্শকাতর মনকে সমাহিত মগ্নচৈতন্যে পৌঁছে দিয়েছে। তখন সেই গভীর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যে বর্ণনা কবির ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আসছে তা কতকগুলি ছবি, স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট কতকগুলি সংকেত। দৃশ্যমান বহির্জগতের সঙ্গে হুইত তার মিল খুবই কম। হুইটম্যানের কাব্যে—সমুদ্র, নক্ষত্র, পাখী এবং Lilac ফুল বহু ব্যবহৃত সংকেত। ফরাসী সাংকেতিক কবি গোষ্ঠীর সঙ্গে হুইটম্যানের বহু মিল থাকলেও এক অংশে হুইটম্যান স্বতন্ত্র। মালার্মের হতাশা কিংবা বোদলেয়ারের নৈরাশ্য হুইটম্যানের কাব্যে ততটা প্রধান হয়ে ওঠে না। মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় সুষমা দেখলেন হুইটম্যান—বর্তমান জীবনের boredom তাঁকে অবশ করতে পারেনি। ফরাসী সাংকেতিক কবিতা কিন্তু ঠিক তা বলে না।

Out of the Cradle Endlessly Rocking-এর মধ্যে হুইটম্যান মাতৃত্বের জয়গান করেছেন। ১৮৫৮ সালে কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার নাম ছিল A Child's Reminiscence; ১৮৬০ সালে নতুন নাম হ'লো এর A word Out of the Sea আবার ১৮৭১ সালে ঐ একটি কবিতাই বর্তমান নাম নিয়ে দেখা দিল: Out of the Cradle Endlessly Rocking। নামকরণের মধ্যে প্রতীক ব্যবহারের সার্থকতা রয়েছে। Sea অথবা Cradle মাতৃত্ব জন্ম এবং জীবন এই ভাবধারাকে প্রকাশ করছে। Cradle অথবা 'দোলা' শব্দটির মধ্যে জীবনের চিরন্তন গতি সূচিত হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ শিশুর কানে গুঞ্জন করে বলতে চায় 'মৃত্যু' কি—শিশুর অবচেতন মনে অপরিমাণ বিস্ময় এই জগত, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে। সমুদ্রের ঢেউএর দোলায় দোলায় সেই একই কথা, সেই delicious word death, death, death...শিশুর কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। কিন্তু দোলা ত' দুলছে নারেরই হাতে; তবে এই death ত' আর কিছু হতে পারে না—rebirth ছাড়া। হতাশা কোথায়? জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম...এই অবধারিত চিরন্তন বৃত্ত চলে আসছে অনাদিকাল থেকে।

Crossing Brooklyn Ferry কবিতাটিতে কবি সুরু করেছেন তাঁর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা দিয়ে Brooklyn নদীতে খেয়া বাইতে কবির বিশেষ সাধ কিন্তু ক্রমশঃ যখন খেয়া নৌকা তীর ছেড়ে অকূলে পাড়ি দিচ্ছে—কবিও হারিয়ে যাচ্ছেন রূপের অতীত অপরূপের অতলান্ত গভীরে। ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ সময়ের সমস্ত ব্যবধান অন্তর্হিত হয়ে কবির চৈতন্যকে অন্তহীন এক অনুভূতির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। অতীতের সঙ্গে অনাগতের সঙ্গে কবি নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছেন এই Oneness of Spirit-এর ভাবনা খেয়া নৌকা প্রতীকের মধ্যে দিয়ে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেলো। খেয়া নৌকা এখানে Oneness of spirit-এর প্রতীক

যার শেষ নেই—কাল নেই ; অন্তহীন প্রাণ প্রবাহ।

হুইটম্যানের প্রতীক ব্যবহারের সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো When Lilacs last in the Dooryard Bloomed কবিতাটিতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন নিহত হয়েছিলেন ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে। তখন বসন্তকাল। Lilac ফুলের সমারোহ ; পাখীর গানে আর ঘাসের প্রাচুর্যে অপরূপ এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই বসন্ত বারবার ফিরে আসবে ; সেই সঙ্গে একজন মানুষের স্মৃতিও ঘরে আসবে :

When lilacs last in the dooryard bloom'd
And the great star early droop'd in
the western sky in the night
I mourn'd, and yet shall mourn with
ever-returning spring.

—এখানে Evening star নিধনের প্রতীক, এবং ever-returning spring এর মধ্যে দিয়ে কবি একথাই প্রমাণ করতে চান যে লিঙ্কনের চিরবিদায়ের মত মর্মস্পর্শী ঘটনা চিরকাল মানুষের মনে থাকবে। কিন্তু দুঃখ, সে যত কঠিনই হোক না কেন, ব্যক্তির জগত থেকে তার মুক্তি না হ'লে বিশ্বের জগতে তার স্থান হবে কি ? তাই কবি hermit birdকে দিয়ে death's outlet song of life গাওয়ালেন ; মৃত্যু সত্য, মর্মান্তিক সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনের গতি অবিরাম চলেইছে। মৃত্যু সেখানে ছেদ টানতে অক্ষম। বারবার সেই বসন্তই আসে. Lilac ফুলের সমারোহ ঘটে ; সেই সমারোহে বেদনার রেশ থাকেও, তবু অনন্ত—তবু আনন্দ জেগে থাকে। এই ভাবে কবি আলোচ্য কবিতায় একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন। এই বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মৃত্যুরও একটা স্থান রয়েছে—তাকে মেনে নিতেই হয়। এ তো গেল অন্তর্নিহিত অর্থের কথা। আঙ্গিকের দিক দিয়ে বলতে গেলে কবিতাটি সাংকেতিক কবিতা হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। অস্তায়মান সন্ধ্যাতারা আর প্রস্ফুটিত lilac ফুল সংকেত হিসেবে হুইটম্যানের অনবদ্য সৃষ্টি। যা ব্যক্তিগত বেদনা, তার পরিসমাপ্তি ঘটুক দিকচক্রবালে। যা চিরন্তন সত্য—যা অমৃত আনন্দ তা ফুটে উঠুক আলো সোহাগ প্রকৃতির কোলে। এখানে সংকেতগুলি বস্তুমাত্র নয়—নাটকের চরিত্রের মতই প্রাণময় এবং অর্থবহ তাদের ভূমিকা। কবির কলাকৃতি নিঃসংশয়ে শ্রোতৃবর্গের দাবী রাখে।

মেয়েদের কথা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

[২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯-তে বর্তমান প্রবন্ধটী আনন্দ-বাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় অংশে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর আগের 'মেয়েদের কথা' যে আজ বাসি হইয়া গিয়াছে এমন নয়, সেইজন্য উজ্জয়িনী পাঠকদের নিকট রচনাটি উপস্থিত করিলাম। সমস্যাটা আজও সমস্যা হইয়া আছে—তাই আলোচনাটী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ভরসা রাখি। —সম্পাদিকা, উজ্জয়িনী]

উপন্যাসের নায়কটা পড়ে অনেকেই নিশ্চয় বিরক্ত হবেন যে মেয়েদের কথা বলে নিজেদের বিশেষ করে দেখার এ মনোবৃত্তি কেন ? ট্রামে-বাসে লেডিস্ সীট কোন সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন সমাজের থাকতে পারে না। তেমনি মেয়েদের কথা বলে বিশেষ কিছু কথা যতদিন থাকবে, ততদিন বোঝা যাবে মেয়েরা তথা সমগ্র সমাজ সুস্থ জীবনের অধিকারী হয়নি। দীর্ঘদিন থেকে মেয়েদের বিশেষ করে

দেখাই হয়ে আসছে—তাকে দেবী বলে যখন মনে করা হয়, তখনও যেমন বিশেষ করে দেখা হয়, দাসী বলে যখন খাটো করে রাখা হয়, তখনও বিশেষ করেই দেখা হয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে নারীকে বলতে হয়—দেবী করে যে দেখো, সে-ও আমি নই, দাসী করে যে রাখ, সে-ও আমি নই। তোমার পাশে সকল কর্মে, সকল দায়িত্বে আমাকে দাঁড়াতে দাও।

আজকের দিনের মেয়েদের কথাটা কি? খুব মোটা করে যেটা চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে আজকের দিনের আমরা আমাদের ঠাকুমা দিদিমার মত জীবন যাপন করছি না—আমাদের জীবনধারা বদলে গেছে।

এই যে পরিবর্তন—এ আমাদের কোন্‌খানে নিয়ে এল? আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি, এমনি করে চলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? মেয়ে হিসেবে আমাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি আমরা হারিয়েছি বলা চলে, কিন্তু নূতন কতকগুলি গুণ ত আমাদের হল না। আমরা ছিলাম ঘরে, আজ বাইরেও আমাদের স্থান হয়েছে; এবং বলা যায় প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘরটা বুঝি মুছেই গেল—বাইরে এসে হৈচৈ করেই যেন একটা যুগের নারী সমাজ বড় হয়ে চলেছে।

তা'হলে এই যে আমাদের বিচরণ ক্ষেত্রটা বদলে গেল, এই বদলে যাওয়া ক্ষেত্রটাতে আমরা কেমন করে মানুষের মত হয়ে দাঁড়াতে পারব? ক্ষেত্রটাকে ত আর আর একেবারে উল্‌টে দেওয়া যাবে না। এটা ত নিশ্চয় দাবী কথা যে, আজ আর মেয়েদের জন্য এ ব্যবস্থা দেওয়া চলবে না যে, তারা ঘরের বাইরে আসতে পারবে না, বার বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে দিতেই হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব ব্যবস্থা আজ আর কোনমতেই মেয়েদের জন্য সম্ভব নয়। অর্থাৎ সেই যে সূত্র—নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন, নারীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই—সেই সূত্র দিয়ে নারীর জীবনকে আগেকার মত বেঁধে দেওয়া আজ আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাহলে এই যে সব বদলে গেল, এতে সব সুদ্ধ আমরা মেয়েরা কেমন হয়েছি? আর আগেকার ঐ সব ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয়, তাহলে মেয়েদের জন্য এখন পাশ্চাত্য নূতন ব্যবস্থাটা কি হবে?

আজকের আমরা যা হয়েছি তাতে আর কিছু না হোক এ কথা বলা চলে যে, আমরা ব্যক্তিগতভাবেও ঠিক সার্থকতা লাভ করতে পারিনি, সমষ্টিগতভাবেও সমাজকে অধিকতর সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারিনি অথচ এ কথাও খুব সত্য যে, আজকের আমরা একটা কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছি।

কী সে ইঙ্গিত? কী আমাদের হতে হবে? কেনই বা এতদিনকার ব্যবস্থা ভেঙে গেল এবং সে ভাঙনের মধ্যে দিয়ে কোন্ ইঙ্গিত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে?

যে সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে মেয়েরা আজ ঘরের বাইরে এসেছে, সে ব্যবস্থায় মেয়েদের মেরে করে রেখেছি মানুষ করে রাখে নি। শরৎচন্দ্র লিখলেন,' 'মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দেয়নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত চাই-ই'।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,—'কিসের লড়াই দাদা?

যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশী ফাঁকি দিয়েছে, তার সঙ্গে লড়াই।'

এমনি কথা ছড়িয়ে আছে সমস্ত শরৎ ও রবী সাহিত্যের আনাচে-কানাচে। কী তাঁরা বলতে চেয়েছেন এবং তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন তার মধ্য দিয়ে এ ভারতীয় নারী সমাজ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথ এ-ও যেমন বলেছিলেন যে, স্ত্রীকে নিরুপা ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার হয়েছে তেমনি এ-ও তিনি বলেছেন, বিশ্বাস বুঝা পারলে 'মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে বা তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘ অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আ আপনি নিবিড়ে বসে আছে। তারপরে কেবলি মর ভয়ে, কেবলি মরচে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হা কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে করতেই স্ত্রী-জন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা।...'

তাহ'লে মেয়েদের সমস্যাটা আরও কত গভীর হয়ে আছে বুঝতে পারা গেল। একদিকে সামাজিক ব্যবস্থা তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে, আর একদিকে তাদের নিজেদের ভিতরকার কতকগুলি স্বভাব তাদের নিজেদের কেবলই আঘাত করছে। আজ প্রাকৃতিক নিয়মে বাইরে থেকে মেয়েদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। ত্রিশ বৎসর আগে আর আজ—বাইরে থেকে এই দুইয়ে অনেক তফাৎ। কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? নারীর নিজের সঙ্গেই নিজের বিপ্লব ঘোষণা করবার এখনও যে বাকি রইল। মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছে সব চাইতে কম কেন? কেন আপনার আলো আপনি আমরা নিবিয়ে বসে আছি? আর তারপরে কেন কেবলই মরছি ভয়ে, কেবলি মরছি ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেন কেবলই খাচ্ছি মার? এর উত্তর নারী-প্রকৃতির পরিচ্ছিন্নতা। যে পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা একদিক দিয়ে মেয়েদের যোগ্যতা, যারই গুণে ছোট ভালবাসার অল্প কয়েকজনকে নিয়ে এক একটি সংসার গড়ে উঠতে পারে, সেই পরিচ্ছিন্নতাই আবার নারী-চরিত্রকে ব্যাপকতা থেকে, সমগ্র দৃষ্টি ও চরিত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। তাই আজকের নারীকে একদিক দিয়ে ছোট সংসার রক্ষা করবার মত প্রয়োজনীয় পরিচ্ছিন্নতাটুকু যেমন রক্ষা করে চলতে হবে, তেমনই নিজের বাইরে বিশ্বের সঙ্গে, বড় সংসারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, প্রীতি রক্ষা, নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাইরের বিশ্বকে সমান অস্তিত্ব বোধে স্বীকার করার ঔদার্য ও নারীকে আজ তার নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতেই হবে। তাই নারীর সমস্যা আজ বিমুখী হয়ে জটিলতর হয়েছে।

যে কথাটা আরম্ভ করেছিলাম। বাইরের ঘটনাগুলি থেকে আজ মনে হতে পারে যে, মেয়েদের অবস্থা বুঝি সত্যিই বদলে গেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর, আমাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতার দ্বারা তাকে যদি বদলে নেওয়াতে না পারি তাহ'লে এই বাইরের ঘটনাকে কি আমরা রক্ষা করতে পারব? কালের মধ্যে কি আমরা জেগে থাকতে পারব শুধু কতকগুলি ঘটনার দ্বারা? হয় আমাদের ফিরে যেতে হবে আগেকার গতিবদ্ধ সীমাটুকুতে, নয় আমাদের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য তার সবটুকু খোয়াতে হবে।

আসলে ঘটনা ঘটে আগে, তারপরে তা জাতীয় তত্ত্বে পরিণত হয়ে শাস্ত্রীয় সমর্থন লাভ করে। বাইরের এইসব ঘটনাকে শাস্ত্রীয় সমর্থন দেবার সময় ভেবে দেখতে হবে নারীর সত্যিকারের স্বরূপটি কি? সেই স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখে তার বাইরের ঘটনা কতটা কি স্বীকৃতি লাভ করবে, তার বিচার করতে হবে।

সমাজ নারীকে যে বিশেষ কিছু থেকে বঞ্চিত করেছিল, সে হচ্ছে নারীর একটি নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র মূল্য ও স্থান, নারীর মূল্যেও নারীকে বিচার করবার স্বীকৃতি। একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে নারীর স্বীকৃতি সমাজের মধ্যে ছিল না—হয় পিতা, নয় স্বামী, নয় পুত্রের নির্ভরতায় তার বিচার হয়েছে। কারও নির্ভরতা ছাড়া নারীর বিচার হয় নি। এক কথায় বুদ্ধিপ্রধান পুরুষের কাছে প্রাণপ্রধান নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ে এই যে পুরুষের মানদণ্ডে বিচার হয়েছে—এইটেই তার সকল দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের নারীর সব কাজ-অকাজের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের যে চাওয়াটা ফুটে উঠতে চাইছে, তা হচ্ছে তার নিজের মূল্যের স্বীকৃতিটুকু।

এই স্বীকৃতি তাকে দেওয়া হোক, সে-ও তা নিতে শিখুক। বাইরে থেকে দিলেই তা নেওয়া হয় না। নারীকে এ মুক্তি নিতে হবে নিজের অন্তরের যোগ্যতার মূল্যে। মুক্তির প্রথম যাপে আজ প্রতিক্রিয়ায় নারীর জীবনে বিকৃতি, বিরূপতা অনেক দেখা যাচ্ছে। এই বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে আসবার জন্যে নিজের সঙ্গে নিজেকে তার সংগ্রাম করতেই হবে। তার এই বিমুখী সাধনায়—একটা তার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করবার বিরুদ্ধে আর একটা তার নিজের পরিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে—নারী জয়ী হোক, সুস্থ হোক—এই আমাদের আজকের সাধনা। ঘরে তার সান্ত্বনা ছিল, আজ বাইরে এসে নারী ঘরের

লাঞ্ছনাও যোচাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, বাইরেতেও সমান লাঞ্ছনার সৃষ্টি হল। তাই নারী যদি তার আত্মস্বরূপকে বুঝে নিয়ে নিজের মধ্যে স্থিত হয়ে বাইরে বিচরণ করবার যোগ্যতা অর্জন না করে, কিছুতেই নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না নিজের প্রাণের ধর্মে—যা তার স্বরূপ। এ কাজ কঠিন সন্দেহ নেই—কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানুষের সভ্যতার তরফ থেকে নারীর কাছে এই কঠিনতর আহ্বানই এসেছে—তাই ত চারদিকের এমন বিপর্যয়ের মধ্যে সে আজ এসে পড়েছে। আজকের এ দুর্যোগ তার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনুক, সে তার আত্মধর্মে স্থিতিলাভ করুক—এই প্রার্থনাই নারীর অবচেতন সত্তা থেকে আজ উৎসারিত হচ্ছে।

বর্ত্তমান সমস্যায় নারীর কর্ত্তব্য

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্ত্তী ॥

ক্রমান্বয়ে বাংলায় যে ভাবে আসুরিক নৃত্য বেড়ে চলেছে তাতে মানব সভ্যতা কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে ভাবলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ভারতবর্ষ বিদেশী কবলমুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু লাঞ্ছনা-মুক্ত হতে পেরেছে কি? আজ বিখণ্ডিত ভারতের বুকে শুম্ভ নিশুম্ভের দল সাম্প্রদায়িকতার বিষ-দাঁত ফুটিয়ে মানবসমাজ-দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে ধ্বংসের পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এরা কারা? এরাই কি আমাদের বংশধর, আমাদেরই পরিবারের, রাষ্ট্রের, সারা বিশ্বের ভরসা স্থল? কিন্তু হায়! ভেবে শিহরণ লাগে ভবিষ্যৎ ভরসা তবে কি এই দুর্যোধনরূপী সমাজ-ধ্বংসীদের ওপরে? আবার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যখন ভাবি আমরাই ত এদের জননী।

কিন্তু আমরা কী বলতে পারবো না ভারত-নারী গান্ধারীর মতন—"দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষিয়া খলখল হাসিতেছে সভামাঝখানে গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা—ধর্ম জানে সেদিন চুর্ণিয়া গেল অন্ধের মতন জননীর শেষ গর্ব।" আজকের দিনে বলতে ইচ্ছে হয় আমরাও কি পিশাচ-জননী হব?

কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না নারী জাতিই রক্ষণশীল মূর্ত্তিতে সমাজ রক্ষা করেন। সমাজের ধারণ ও পোষণ নারীরই ধর্ম। সমাজের এই ভীষণ দুর্দিনে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ-দাঁত ভাঙবার ভারে প্রতিটি নারীকে আজ এগিয়ে আসতে হবে নতুবা অদূর ভবিষ্যতে দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

আজ সর্ব্বত্র দেখছি পাশবিক অস্ত্রের স্থান বুদ্ধি কারসাজী চলছে। বুদ্ধিমান তার বুদ্ধি দিয়ে মানবতার গলা টিপে ধরেছে, বলবান তার বল দিয়ে মানবতার শ্বাস রোধ করে মারছে। কিন্তু হায় প্রাণ কোথায়! তা' বলি হে প্রাণ-প্রধান নারী-সমাজ, একবার তাকাও—দেখ অধর্মের মধুমাখা বিষ-ফল নিয়ে তোমারই সন্তানদল আনাচে কানাচে বেড়াচ্ছে—শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞ সৃষ্টি করছে।

প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারের যে প্রকার রাষ্ট্রের ওপরে দাবী আছে তেমনি রাষ্ট্রেরও দাবী আছে প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারের ওপরে। রাষ্ট্রের তথা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক মানুষ সমভাবে দায়ী ইহা ভুললে চলবে না। দেহ যন্ত্রের মতোই বিশ্ব-যন্ত্র। এর কোন অংশে পচন ধরলে দেহ-যন্ত্রের মতো সমগ্র বিশ্ব-যন্ত্রই পচে যাবে। তাই আবার বলব, বার বার করে বলব বাংলার নারী, ভারতের নারী, এস, মৃত্যু করে

বলি, শুধু বলিনা কার্যে পরিণত করি, নূতন মন্ত্রে ধ্যান করে দেশে নূতন প্রাণের সঞ্চার করি, যে প্রাণের ধ্বনি হবে—

"জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

তবেই হবে সাম্প্রদায়িক বর্বরতা শুদ্ধ। আমরা প্রতিটি মায়েরা সন্তানদের এই মন্ত্রে দীক্ষিত করব—

"দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো—
নিজেরে হীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।"

এ নারী সমাজ! আমরা একযোগে গর্জন করে বলি আমরা সেই মায়ের জাত যে মায়ের এক হাতে অসি আরেক হাতে বরাভয়। পৈশাচিক বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন আমরাই করব। আমিও ভারত-জননী পিশাচ-জননী নয়।

এই ভারতের মাটিতে গীতায় ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বধর্ম, বিশ্ব প্রেম, বিশ্ব মানবতার কথা। আমরা আজ এই বাণী বহন করব। সন্তান গঠনের উদ্দেশ্য হবে তাঁর এই বাণীর সার্থকতা। সর্বশেষে বলি আজ সমস্ত নারীর পক্ষ থেকে ভারতের জন-নায়কগণের কাছে, বাংলার জন-নায়কগণের কাছে এই একমাত্র চাহিদা হোক বিখণ্ডিত বাংলার বুকে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত প্রাণের নিরাপত্তা ও তাহাদের স্ব মর্যাদায় থাকবার উপযুক্ত ব্যবস্থা। বন্দেমাতরম্

সাময়িকী

সুহৃৎ-বিয়োগ: সুহৃৎবর শ্রদ্ধেয় হরিগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ৩রা অক্টোবর ১৯৬৩-তে পরলোক গমন করেন। হরিগোপালবাবুর সঙ্গে উদ্বোধন তথা নরনারায়ণ আশ্রমের পরিচয় ১৯৫২ সন হইতে। ১৯৫২ সনে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁহার নরনারায়ণ আশ্রম ও উদ্বোধনভারতের অফিস একত্র করিয়া টালীগঞ্জে ৬৯।৮৯ রসা রোড সাউথ-এ ৯ মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় হরিগোপালবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যে পণ্ডিতে মুগ্ধ হইবেন, কিন্তু আমরা তাঁহার অন্তরের যে পরিচয়, হৃদয়ের যে স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আজ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আছি। ৯ মাস মাত্র আমরা সে পাড়াতে ছিলাম, কিন্তু হরিগোপালবাবু উদ্বোধনভারত ও আশ্রমকে সেই হইতে কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার একটা অকৃত্রিম প্রাণখোলা হৃদয়ের স্পর্শ এতদিন পর্যন্ত আমরা পাইয়াছি; কেবল তাহাই নহে সেই টালীগঞ্জ হইতে এই বাগুইআটিতে বৎসরে অন্ততঃ একবার তিনি আসিতেন এবং তাঁহার সাধ্যমত আশ্রম সাহায্যও করিতেন। গত ৩রা অক্টোবর ১৯৬৩ হরিগোপাল-বাবু সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক-গমন করেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট সুহৃৎ হারাইলাম। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে আমাদের হৃদয়-বেদনাকে যুক্ত করিয়া দিলাম। হরি-গোপালবাবু তাঁহার সাধনোচিত গতি লাভ করিয়াছেন—আমরা তাঁহার গতিপথে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

হরিগোপালবাবু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে mechanical Engineering বিভাগের শিক্ষকরূপে প্রবেশ করিয়া শেষে রীডার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘ ৩৩ বৎসর শিক্ষকতার পর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিবার পর আর বেশীদিন থাকিলেন না, ১৯৬৩-র ৩রা অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনেতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ —তাঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জিলার কামারখারা গ্রাম, জন্ম নোয়াখালি জেলাতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে

(১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ)। নোয়াখালী জুবিলী হাই স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়া কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আই এসসিতে ভর্তি হন, কিন্তু পাঠ্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং নিয়মিতভাবে খদ্দর পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ-এ তৎকালীন মানিকতলাস্থিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (জাতীয় শিক্ষাপরিষদ) এর অধীনস্থ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট হইতে A. M. M. E (Associate members, mechanical Engineering) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এক বৎসর কাল টালা ওয়াটার ওয়ার্কস-এ শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করেন, এবং পরে বর্ত্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনস্থ যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ৭৫৲ টাকা মাহিনায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং পরে ইহার রীডার হন। এই সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি কলিকাতা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের applied chemistry বিভাগে সম্মানজনক শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি Institute of Engineers প্রভৃতি আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনে বিলাত যাওয়ার সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মায়ের অনুমতি না পাওয়ায় তাঁহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই মনস্তাপে তিনি আজীবন অধ্যয়নেই কাটান, যাহাতে তাঁহার কোনরূপ বৈদেশিক ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও কেহ যেন তাঁহাকে শিক্ষাগত মানে হেয় প্রতিপন্ন করিতে না পারে এবং তাই তিনি অর্থ উপার্জনের বহু সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন নাই—শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহার তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হরিগোপালবাবু বর্ত্তমানে টালীগঞ্জে বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিলেন।

আমাদের অপর সুহৃৎ বাগুইআটি গ্রামের সন্নিকটস্থ চিত্তরঞ্জন কলোনীর প্রাক্তন ভূপতিমোহন সেন মহাশয় বিগত ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪-তে দেহত্যাগ করেন। এই বাগুইআটি গ্রামে নবনারায়ণ আশ্রম গড়িয়া উঠার পেছনে ভূপতিবাবুর দান অনেকখানি। তাঁহার সে সহযোগিতার মূল্য আশ্রম কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। ১৯৫৫ সালে আশ্রমের জমিতে একখানা ছোটখাট ঘর তুলিবার প্রয়াসের কথা ভূপতিবাবুর নিকট প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিলে তিনি সুহৃৎবর প্রাক্তন শ্রীজিতেন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন এবং একশালীন ৫০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন—ইহা ছাড়াও বাৎসরিক উৎসবকালীন কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ঘর করার সময় বহু দিন কলিকাতা হইতে সকালে আসিয়া সন্ধ্যায় গিয়াছি—সেই সময় দ্বিপ্রহরে ভূপতিবাবুর বাড়ীতে তাঁহার সাগ্রহ আমন্ত্রণে কতদিন যে আহার করা হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। তখন লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার বাড়ীতে মানুষকে খাওয়ান একটা আনন্দজনক ব্যাপার ছিল। যে কোন সৎ ও জনসাধারণের কল্যাণমূলক কর্ম্মেই ভূপতিবাবুর আগ্রহ ছিল—এজন্য আমাদের মত স্বল্প পরিচয়ের মানুষও তাঁহার প্রাণখোলা সহযোগিতা পাইয়াছিল। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন রায় মহাশয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া ভূপতিবাবুর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দ নিবেদন করিতেছি। শ্রীভগবান তাঁহার সদ্‌গতি প্রদান করিয়াছেন। ভূপতিবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে আমরা আমাদের বেদনাকে যুক্ত করি।

বিগত ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪-তে স্থানীয় হিন্দুবিদ্যাপীঠের Founder President ভূপতিমোহন সেন মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে কয়েকমাস রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, বহু পৌত্রপুত্রী আত্মীয়বন্ধু শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বহু লোক তাঁহার শবদেহ অনুসরণ করিয়া নিমতলা শ্মশান পর্যন্ত গিয়াছিলেন। শোকযাত্রা স্থানীয় হিন্দুবিদ্যাপীঠ, হিন্দুবালিকা বিদ্যাপীঠ এবং স্থানীয় প্রত্যেকটি ক্লাব প্রাঙ্গন হইয়া কীর্ত্তন সহ নিমতলা ঘাটে গিয়াছিল। বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য ভূপতিবাবুর লাভ

করিয়াছিলেন তাঁহার জনহিতকর কাজের জন্য।

১৯৩৭ সনে তিনি এখানে চিত্তরঞ্জন কলোনী স্থাপন করিয়া বহু আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতিকে বসতি করান। প্রায় ২৩।২৪ বৎসর পূর্বে তিনি প্রথমে খড় বাঁশের ঘরে একটি প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন, তাহাই বর্তমানে উন্নীত হইয়া হিন্দুবিদ্যাপীঠ (সর্বাধুনিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়), হিন্দু বালিকা বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া প্রায় দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগ দিতেছে। খড় বাঁশের ঘরই এখন দুই তিন তলা পাকা ইমারতে পরিণত হইয়াছে। স্কুলগুলিই ছিল ভূপতিবাবুর প্রাণ। রোগশয্যায় পড়িয়াও স্কুলের কথাই চিন্তা করিতেন। কয়েক মাস আগেও হিন্দু বালিকা বিদ্যাপীঠের গৃহনির্মাণের সাহায্যকল্পে দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা আর করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাই আমাদের দুঃখ। আমরা আশা করি স্থানীয় জনসাধারণ তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

ভূপতিবাবু মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা আসিয়া তাঁহার কর্ম-জীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে আরম্ভ করেন ছোটখাট ব্যবসা, তারপর একটি জুট মিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া কিছুকাল কাটান, তারপর জীবনবীমা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। ১৯১৯-১৯২৪ পর্যন্ত নানা কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ১৯২৫-এ East & West Life Insurance Co-র সঙ্গে যুক্ত হন—কর্মকুশলতার গুণে ১৯৩০ সালে উহার জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। জীবন-বীমা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদিও তিনি প্রকাশ করিতেন। মোটর দুর্ঘটনায় পা জখম হওয়ার পর কার্য হইতে অবসর লইয়া তিনি স্কুলগুলির উন্নতির জন্যই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৯১৪ সনে 'ঢাকা বান্ধব সমিতির' একটি শাখা কলিকাতায় স্থাপন করিয়া ছাত্র ঢাকাবাসীদের সাহায্য করিতেন। কলিকাতার 'বৈদ্য বান্ধব সমিতি'-র তিনি ছিলেন কার্যকরী সম্পাদক। একসময়ে তাঁহার নিজবাড়ীর [illegible] সহযোগিতায় এবং স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাহায্যে একটি Maternity Home ও কয়েক বৎসর পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার হরিদ্বার কুম্ভমেলায় এবং গঙ্গাসাগর তীর্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠান। জনসেবাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র—আজীবন কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জনসেবাই তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় জনসাধারণ এমন একজন কর্মী হারাইল, যাহার স্থান সহজে পূরণ হইবার নয়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা আরও একজন সুহৃৎকে হারাইয়াছি। তিনি স্বনামধন্য চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়। বিগত ১৮ই পৌষ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে সুরেনবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। নরেনবাবুর আশ্রমের খুব সন্নিকটেই তাঁহার বাড়ী ছিল। আশ্রমকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন ও ইহার কল্যাণ কামনা করিতেন। একটা কথা মনে পড়ে—বছর দুই বয় যখন যে বইটি পড়িয়া তিনি আনন্দ পাইতেন, তখন সে বইটি আমাকে পড়িবার জন্য জোর করিয়া বলিতেন—অনেক সময় তাঁহার নিকট হইতে বইটি আনাইয়া পড়িয়া লইতেও বলিতেন। যাহাহউক, সুরেনবাবুর প্রধান ও প্রথম পরিচয় চিকিৎসক হিসাবে। চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার বিষয়। মহাত্মা হ্যানিম্যানের বাণী, রোগীর নিরাময় চিকিৎসকের জীবনের পেশা মাত্র নয়, এ তার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য বা মিশন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ হ্যানিম্যানের এই বাণীর এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শিক্ষা-জীবনে তিনি নানা ধরণের গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বালক সেবার দল গঠন করিয়া স্বগচিত গানে লেখার তাহাদের সমাজ সেবার কাজে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের তাকেও সাড়া দিতে কি এম কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকীর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথকে মেডিক্যালের দুয়ার হইতে বাহির হইয়াছিল সমাজ সেবার বিরাট ক্ষেত্রে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মনে [illegible]

তাঁহার জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। পারিবারিক অবস্থা এই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল ছিল না—কিন্তু দৃঢ়-সংকল্প সুরেন্দ্রনাথ একদিন ৬টি টাকা মাত্র সম্বল লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কাগজের মোড়া তৈয়ার করিয়া, বই বাঁধাই করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক স্কুলে ভর্তি হইয়া নিজের মেধা ও অধ্যবসায় দ্বারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। নিজের সাধনাদ্বারা যে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ বিকাশ করিতে পারে আবেষ্টনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও—সুরেন্দ্রবাবু তাহারই একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুরেনবাবু বলা যাইতে পারে এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। অথচ ইহাকে তিনি পেশা করিয়া রাখেন নাই—ইহা ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সুরেনবাবু বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন, প্রতাপ হেয়ার মেমোরিয়েল কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, হোমিওপ্যাথিক স্টেট কেকালটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশে চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিত্বের পদে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বলা যাইতে পারে শেষ দিন পর্যন্ত সুরেনবাবু তাঁহার সাধনা চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হারাইল।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ঃ পাকিস্তানে হিন্দু-নিগ্রহের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ উত্তেজিত হইয়া উঠিল—ক্রমে সংঘর্ষ লাগিয়া গেল। সংঘর্ষ বন্ধ করিবার নামে বলিতে হইবে পুলিসী অবিমৃষ্যকারিতার একটি নিরপরাধ ছাত্র প্রাণ হারাইল—বলা যাইতে পারে তাহারই ফলে ঘটনা জটিলতর হইল। তাহার পর যাহা হইল তাহাতে সাম্প্রদায়িক গন্ধ যতটা রহিল, তাহা হইতে বেশী দেখা দিল গুণ্ডাবাজী। দেখা যাইতেছে এই যে হাঙ্গামা ইহার পিছনে কোন একটা ঘটনা কাজ করিতেছে না—সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ যদি ইহার মূল বা প্রথম কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মুষ্টিমেয় অর্থলোলুপের অভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপও ইহার [illegible] অংশ গ্রহণ করে নাই—যাহারই ফল পুলিসী নিষ্ক্রিয়তা আর রহিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাবাজী। গুণ্ডাবাজীকে সরকার সৈন্যবাহিনী সহায়ে দৃঢ় হস্তে দমন করিতে অগ্রসর হইবেন—ইহা অবশ্য আকাঙ্ক্ষনীয়, কিন্তু এই পুলিসী নিষ্ক্রিয়তা বা পুলিসী অবিমৃষ্যকারিতার জবাব কি? জনসাধারণ ইহার উত্তর চায়।

পরবর্তী অথচ প্রধান কথা হইল বাঙ্গালীর জীবন হইতে এই সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তার সমাধান কি কোন দিন হইবে না? ইহার সমাধান-প্রয়াসে দেশ বিভক্ত হইল—সেই বিভাগের লাঞ্ছনা সমস্ত দেশকে কম সহিতে হয় নাই—কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হইল না। আজও পশ্চিমবঙ্গেও দুইটী সম্প্রদায় এত ওতপ্রোত হইয়া আছে যে, দুইটির মধ্যে কোন স্থায়ী অশান্তির কল্পনাতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়—কিন্তু এত বৎসরের স্বাধীনতা সত্ত্বেও আজও হিন্দু মনে করিতেছে মুসলমান আমাদের আক্রমণ করিবে, মুসলমান মনে করিতেছে হিন্দু আমাকে আক্রমণ করিবে। এখানেই শেষ নয়—ভারতীয় সংবিধানে সকলের সমান অধিকারের সুযোগ, হিন্দুর স্বভাবগত নম্রতা এবং সর্বোপরি সরকারী নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি যে বিদ্বেষ সেই বিদ্বেষকেই ধূমায়িত করিয়া বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস ও প্রচেষ্টাও বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি কোথায়? সমাধান কি? কোন কথা ভাবিবার পথে সব চাইতে অসুবিধা এই যে কোন ঘটনাই তাহার নিজস্ব স্বরূপে নাই সমস্যাটা যদি শুধু সাম্প্রদায়িক হইত, তাহা হইলে সমাধান যে রকম হইত, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সঙ্গে যখন কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন অভিসন্ধি তাহার ভিতরে ভিতরে কাজ করিতে থাকে এবং তাহারও সঙ্গে যখন যুক্ত হয় গুণ্ডাদলের অরাজকতা লীলা—অথচ সঙ্গে থাকে না সরকারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রখর শাসন—তখনই সমস্যা জটিলতম হইয়া উঠে। আজকের সমস্যা তাই এত বেশী জটিল। যেখানে যাহার যেটুকু করণীয়—কেহই যদি তাহা নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন না করে, তবে কোন দিনই কোন সমস্যার সমাধান হইতে না। জাতির উপর হইতে নীচ পর্যন্ত প্রত্যেকে নিজের কাছে ফাঁকি দেয়—প্রত্যেকেরই সোড়ার কথা থাকে কা

কম কাজ করা যায়, এবং কত কম কাজ করিয়া কত বেশী পয়সা রোজগার করা যায়—জাতীয়তা-বোধ, সমষ্টি-বোধ, বিশ্বমানবতা-বোধ—কোন বোধই কি আমাদের কাজকর্ম চলাফেরার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়? এই যেখানে অবস্থা, যেখানে ছুতানাতায় দেশ গুণ্ডাবাজীর কবলে পড়িয়া যায়, যাহা হওয়া কোন দিক দিয়াই সমীচীন নয়, তেমন ঘটনাও যেখানে হামেসা এবং সহজে ঘটে—সেখানে কোন সমাধানই কি কার্যকরী হইবে? কোনো সমাধান কার্যকরী করিবে কে? জন সাধারণ এবং সরকার দুই-এ মিলিয়াই তো? কিন্তু প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন-প্রবণ, প্রত্যেকেরই গোড়ার দৃষ্টি আত্মস্বার্থের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ—তাহা হইলে সমাধান কোথায়?

কাজেই সাম্প্রদায়িকতার সমাধানের পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রত্যেকের—ছোটর থেকে বড়র, জনসাধারণ থেকে সরকারের—জাতীয় চরিত্রের সমাধান প্রয়োজন; খুব সংক্ষেপে বেটা হইল—জাতীয়তা বোধ, সমষ্টিবোধ বিশ্ববোধ জন্মানো অর্থাৎ আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠা এবং প্রত্যেকের কাজ নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করা। এ ঘটনা না ঘটিলে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির জীবনের কোন ঘটনারই সমাধান কোন দিন হইবে না।

সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইল কি ভাবে?

যে হিন্দু তাহার বর্ণাশ্রমীয় ব্যবস্থায় একদিন নিজের কোল হইতে ছুতানাতা করিয়া মানুষকে কেবল সমাজ-চ্যুতই করিয়া আসিয়াছে এবং সমাজচ্যুত করিয়া গর্ব বোধ করিয়াছে, নিজে পবিত্র থাকিলাম মনে করিয়া আত্মসন্তোষ লাভ করিয়াছে, সে হিন্দু সমাজচ্যুত সেই মানুষদের হাতেই আজ মার খাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?—'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে'—মনস্তত্ত্বের এ সত্যকে আজ হিন্দু কেমন করিয়া বাধা দিবে? রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের এই বর্ণাশ্রমীয় ভেদবাদের সম্বন্ধে তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসে ৪০।৫০ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন যে ঐভাবে চলিলে হিন্দুস্থানকে একদিন আর হিন্দুস্থান বলিয়া চেনা যাইবে না। পাকিস্তান শব্দটা তিনি [illegible] বলিয়া চেনা যাইবে না—যাহা উহার বর্তমান রূপ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে—এ কথা বলিতে পারার দূরদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছিল। সামাজিক ভেদবাদে ভারতের সংবিধান স্বীকার করে নাই—কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংবিধান-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের পরিবার সমাজ জীবনের আনাচে কানাচে যে ঢুকিতে পারে নাই, পারে না—ইহার জন্য যে স্বতন্ত্র আন্দোলন স্বতন্ত্র স্থান হইতে প্রয়োজন—ইহা তো ভারতবর্ষ আজও বুঝিতে পারে নাই। সামাজিক ভেদবাদ বজায় রাখিয়া সাম্প্রদায়িকতার মূল দূর করা যাইবে না—এ কথা কি কুলীন, শিক্ষিত, অর্থশালী সম্প্রদায় আজও বুঝিতে পারিয়াছেন? হিন্দুত্বকে রক্ষার জন্য যাহারা অত্যন্ত সচেতন তাঁহারা মুসলমান মারিতে উদ্যত না হইয়া হিন্দুর কোল হইতে যাহাতে কেহ ধর্মান্তরিত হইয়া চলিয়া যাইতে না পারেন তাহার জন্য সচেষ্ট হউন। যে ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের মধ্যে সামাজিক উচ্চনীচ ভেদবাদ স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল, যাহার ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় হিন্দুত্বের কোল হইতে আজও ধর্মান্তরিত হওয়া বেশই সহজ, সেই ধর্ম ও সামাজিক স্তর হইতে ভেদবাদ দূর করিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা না করিলে হিন্দুর বাঁচিবার অধিকার গোড়াতেই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। হিন্দু কি তাহার কোলে কখনও বাহিরের মানুষকে—ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে স্থান দিয়াছে? কতজন হিন্দু অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, এবং কতজন অন্য ধর্মাবলম্বী হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়—তাহার হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে হিন্দুর তথাকথিত হিন্দু হিসাবে বাঁচিবার অধিকার ও যোগ্যতা কতটুকু।

মুসলমান হিন্দু-বিদ্বেষের উপর নিজের অস্তিত্ব রক্ষা বা পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা করিলেও করিতে পারে, কেননা উহা তাহার স্বধর্ম, কিন্তু হিন্দু যে মুসলমান মারিয়া হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না—এ কথা হিন্দু যদি ভোলে, তাহা হইলে সে অনেক গোড়ার কথাই ভুলিয়া গেল। আত্ম-রক্ষার্থে বা দুর্বলকে রক্ষা করিতে আঘাত বা প্রত্যাঘাত সে অবশ্যই করিবে, কিন্তু অপরকে মারিয়া ফেলিয়া সে

বাঁচিয়া থাকিবে বা বাড়িয়া উঠিবে—এরূপ সত্য নয়। হিন্দুকে আজ তেমন হিন্দু হইতে হইবে যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতে তাহার বাধা না হয়; এমনি বিশ্বের প্রতি সম্প্রদায়কে। আজ এক-বিশ্বে প্রত্যেককে বিশ্বনাগরিক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া বাঁচিতে হইবে। কেহই নিজের চাল চলন আচার ব্যবহার বা মনোবৃত্তিকে এমন করিতে পারিবে না যাহাতে আর সকলের সঙ্গে মিলিতে তাহার বাধার সৃষ্টি হয়। বিশ্বের ঈর্ষাকে অস্তিত্ব রক্ষার ভিত্তি পাকিস্তান করিতে পারে কিন্তু হিন্দু তাহা পারে না—এ কথা হিন্দুর ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না। বিশেষ অধিবাসীর জন্য বিশেষ স্থান—বিশেষ মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—'সে যুগ হয়েছে বাসি' একথাও মনে রাখিতে হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে তাহার সংখ্যালঘুর প্রতি যে দায়িত্ব পালন করিতেছে না—এজন্য যেমন আমাদের তেমনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের উচিত এমন বিশ্ব-জনমত সৃষ্টি করা যাহাতে সে তাহার কর্তব্য পালনে বাধ্য হয়। কিন্তু কে কাহাকে শোধরাইবে? প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রতিটি পা ফেলে—সত্যকে যেমন ব্যক্তিও চায় না; জাতিও চায় না। নহিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সত্য নির্ণয় করিতে এবং তাহা পালন করাইতে বাধ্য করিতে পারিত না কি? যাহাহউক, দেশে বিদেশে পাকিস্তানকে তাহার কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য করিতে যেমন জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে, তেমনি হিন্দুকেও মনে রাখিতে হইবে যে ভালবাসা বা প্রেম; মিলিয়া মিশিয়া বাঁচিবার পথই তাহার পথ—এ ছাড়া আর কিছুতেই তাহাকে মানায় না এবং ইহাই ধর্মধর্মী বিশ্বের সমস্ত জাতি তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে সামঞ্জস্য করিয়া লইবে যাহাতে সকলে মিলিয়া মিশিয়াই বাঁচিতে পারে—গোড়ায় এ বিশ্বাস, এ বুদ্ধি রাখিতেই হইবে। এ মনোবৃত্তি প্রতিমুহূর্তে সজাগ রাখিয়া আমাদিগকে শক্তিমান হইতে হইবে—যেন আত্মরক্ষা করিতে পারি, যেন প্রয়োজন হইলে প্রত্যাঘাত করিতে পারি। প্রত্যাঘাত করার ঘটনাটা খুব জটিল—কাজেই যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া আসক্তি বা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া প্রত্যাঘাত করা চলিবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন অর্জুনকে অস্ত্রগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার আগে অর্জুনকে তিনি আঠার অধ্যায় গীতা শুনাইয়া কোন্ মনোবৃত্তিতে প্রত্যাঘাত করা চলে তাহা শিখাইয়া লইয়াছিলেন। সেই আঠার অধ্যায়ের গোড়ার কথা হইল কর্ম আমার ব্যক্তিগত নহে, আমার-মনে-কর্মের সঙ্গে বিশ্ব-কর্মের, বিশ্ব-কল্যাণের সঙ্গতি হয় না, সে কর্মই আমার হইতে পারে। সে কর্ম কোন ব্যক্তিগত আসক্তি বিদ্বেষদ্বারা প্ররোচিত হইবে না—প্ররোচিত হইবে বিশ্বসেবা-বোধদ্বারা, কৃষ্ণসেবা-বোধদ্বারা। আমার এ হেন মনোবৃত্তিতেই প্রত্যাঘাত সম্ভব। তাই প্রত্যাঘাত করিতে যাওয়ার আগে যেমন দরকার অত্যন্ত নিরাসক্তি ও বিদ্বেষহীনতা, তেমনি তাহার পিছনে থাকিতে হইবে সামগ্রিক একত্ববোধ ও বিশ্বকল্যাণ বোধ। এমনি মনোবৃত্তিতে আমাদিগকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আত্মরক্ষা, দুর্বলের রক্ষা ও প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত—এ সবের জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিলে একটা জাতি নিজেরও কল্যাণ করিতে পারিবে না, বিশ্বেরও না।

জাতীয়তাবোধ, বিশ্ববোধ, আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠা, প্রত্যেকের কর্তব্য নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে পালন, বর্ণাশ্রমীয় উচ্চনীচ ভেদব্যবস্থা ও তাহার গোড়ার চিন্তাধারার ধর্ম ও সামাজিকভাবে পরিবর্তন, হিন্দুদের কোন হইতে যাহাতে কেহ যাইতে না পারে বরং বাহিরের লোক হিন্দুত্বের মধ্যে প্রবেশ করে সেই বিরাট হিন্দুত্বের কল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের প্রচেষ্টা—ইহাই আজ সমাধান। যে ক্ষুদ্র হিন্দুত্বের কিছুই হজম হয় না, কেবলই বাদ দিয়া দিয়া যে কোনরকমে মনে মনে কোণে আত্মরক্ষা করিবার কথা মুখস্ত করিয়াছে, সে হিন্দুত্বের বিশ্বের বুকে গৌরব লইয়া বাঁচিবার নিজস্ব অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণের মত হিন হইতে হইবে—যিনি সর্ববাদবিবাদপ্রতিরূপশীল, যাঁহার অঠরাগ্নিতে সব বিরুদ্ধ, সব বিপরীত হজম হইয়া যায়—যাহার জীবন বিভিন্নধর্মী হইয়া ক্লীবত্বে পরিণত হয় নাই, অথচ তাহার গতিশীলতাও কখনও অবসাদ বা

উচ্চ্ আদর্শের সৃষ্টি করে নাই, যিনি মৃত্যু করিতে পারেন অথচ যাহাতে তাঁহার আত্মস্বার্থ কিছুই থাকে না বিশ্ব-কল্যাণ বোধ ছাড়া, যিনি একটী মহৎ জীবনের অধিকারী —যেখানে কোন কুসংস্কার কোন ক্ষুদ্রতার স্থান নাই— তেমনই একটী বিশ্বজনীন হিন্দুত্ব যদি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারি যাহার আলিঙ্গনের মধ্যে সকলেই ধরা পড়িয়া যাইবে—তবেই কেবল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিয়া আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করিতে পারিব। পক্ষ প্রতিপক্ষ দুই-ই সমান স্তরের—সমাধান সেখানে নাই—আমাদিগকে সকল দিক দিয়া অনেক বড় হইতে হইবে, সামনের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ এই মাঘে আরম্ভ হইল। সভাগণকে সপ্তদশ বর্ষের চাঁদা ফাল্গুন ১৩৭০-এর মধ্যেই পাঠাইয়া দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলের সহযোগিতাতেই 'উদ্বোধন' এই ষোল বৎসর চলিয়া আসিল বটে কিন্তু এখনও অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধার মধ্য দিয়াই চলিতে হইতেছে—কর্মীর অসুবিধা তো আছেই। তাই শ্রীমৎ পূর্ণাত্মানন্দের কাজ ও কথাকে মানুষের কাছে উপস্থিত করার দায়িত্ব সকলেই প্রাণ দিয়া খানিকটা গ্রহণ করুন— সকলের নিকট এই আবেদন জানাই এবং সভাগণকে এইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব চাঁদাটা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। ইতি ১৮ই মাঘ, ১৩৭০।

কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি.ক্রিষ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, বোসপাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

কৃষ্ণকে কৃষ্ণের মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, কৃষ্ণহীন কৃষ্ণার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত :

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১।০
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ৮৲
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬৲

২। ঈশোপনিষৎ ২৲
৩। কেনোপনিষৎ ১৲
৪ কঠোপনিষৎ ৩৲
৫। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে ১।০
৬। স্বরাজের পূর্ণরূপ ।০
৭। গীতাতত্ত্বসার ৵০
৮। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ৫০
৯। ঐতরেয়োপনিষৎ ১৸০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
১০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১৸০

: পাণ্ডুলিপি :

১। মুণ্ডকোপনিষৎ
২। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
৩। তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬। প্রশ্নোপনিষৎ
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮। স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৯। অপ্রকাশিত পত্রাবলী
১০। বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীযুতী প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ঐতিহ্য ১।
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা ।/

শ্রীযুতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৸০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ১
৩ শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ১
৪। রবীন্দ্র-ছন্দ ১
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ১
৬। শরৎ-মাধুরী (যন্ত্রস্থ)

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

SHREE HANUMAN FOUNDRIES LTD.

GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS, ENGINEERS, FOUNDERS, STEEL REROLLERS, BUILDERS, STRUCTURAL FABRICATORS

LIGHT AND HEAVY FERROUS CASTINGS/ROLLED LIGHT-SECTIONS AND RAILWAY PERMANENT-WAY MATERIALS.

Associated Concerns :

SHREE BAIDYANATH IRON & STEEL CO. LTD.
Wagon Builders, Founders, Manufacturers of Pig Iron and Steel Castings, Engineers, Government and Railway Contractors.

AGARWALLA PROPERTIES LTD.
Owners of Real Estate.

THE LAKSHMI PRINTING WORKS LTD.
Printers and Publishers—Artistic Job a speciality.

Head Office
AGARWA[illegible]ANSIONS
370, Upper Chitpore Road,
Calcutta-6.
Phone : 33-6422 (4 lines)

Branch Office :
25-H CONNAUGHT CIRCUS
NEW DELHI
Phone : 40317

প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প. বার্ষিক পাঁচ টাকা

Cover Printed by : Narayan Printing Works. 95, Narkeldanga North Road, Cal-11

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

"আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না যাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মণীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের টানে গোপীগণকে সহজ ও অনায়াসে (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রীয়ায় ও দ্রব্যে অন্বিত হইলেই ভক্ত অতি দ্রুত দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া সংসারকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান যুগ বর্ত্তমান ভজনের যুগ, ইহাও তাঁহারই নির্দ্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

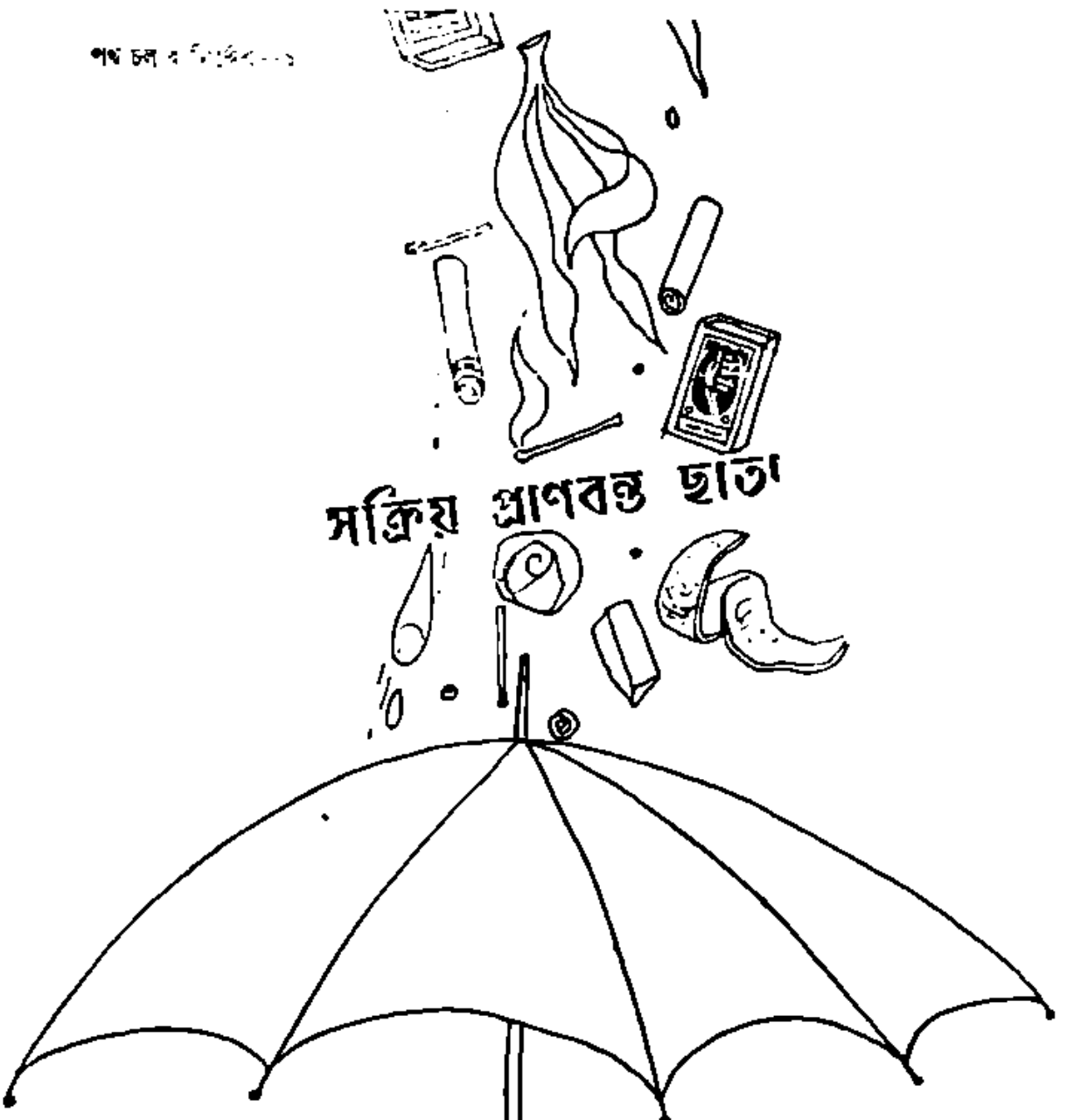

স্টেশন-প্লাটফর্ম-এ বৃষ্টিধারার মতো নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত জঞ্জাল প্রতিরোধের জন্য ছাতা চাই—সাধারণ চলতি ছাতা নয়, সক্রিয় প্রাণবন্ত ছাতা ; একমাত্র আপনিই এই প্রাণবন্ত ছাতার ভূমিকা গ্রহণ করে স্টেশন-প্লাটফর্ম-কে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন।

আপনাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন

LITTER BIN

পূর্ব রেলওয়ে

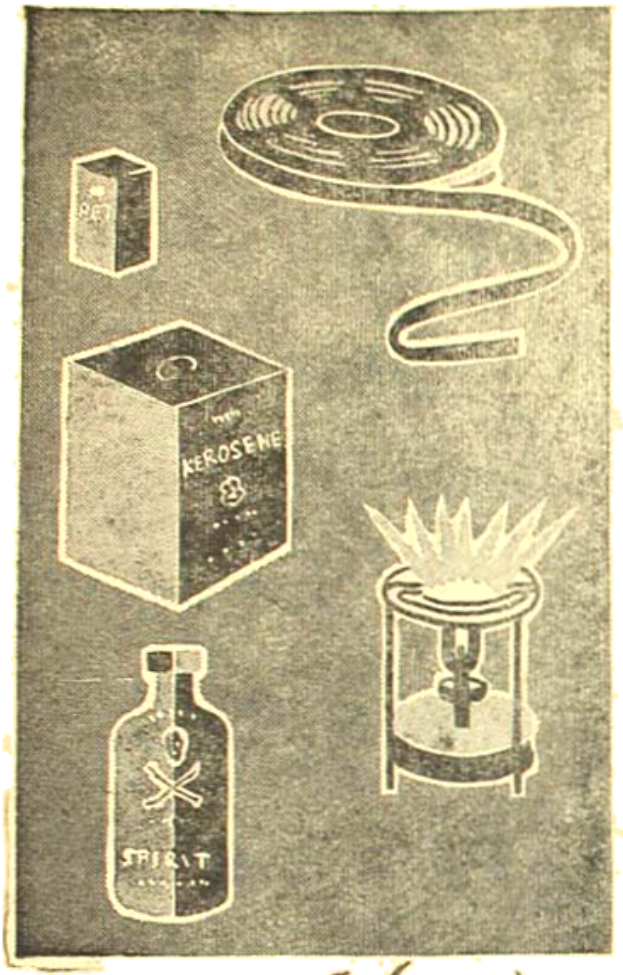

আগুন লাগার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলুন

মনে রাখবেন :-

দেশলাইয়ের কাঠি বা সিগারেটের টুকরোর আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিয়ে তবে ফেলবেন। এগুলো বাইরে অথবা কামরার মধ্যে রাখা ছাইদানেতে ফেলে দেওয়াই ভাল।

কামরার মধ্যে স্টোভ জ্বালাবেন না।

বিস্ফোরক জিনিষ, বাজী, ফিল্ম বা এধরণের বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ মালপত্রের সঙ্গে নিজের কাছে রাখবেন না।

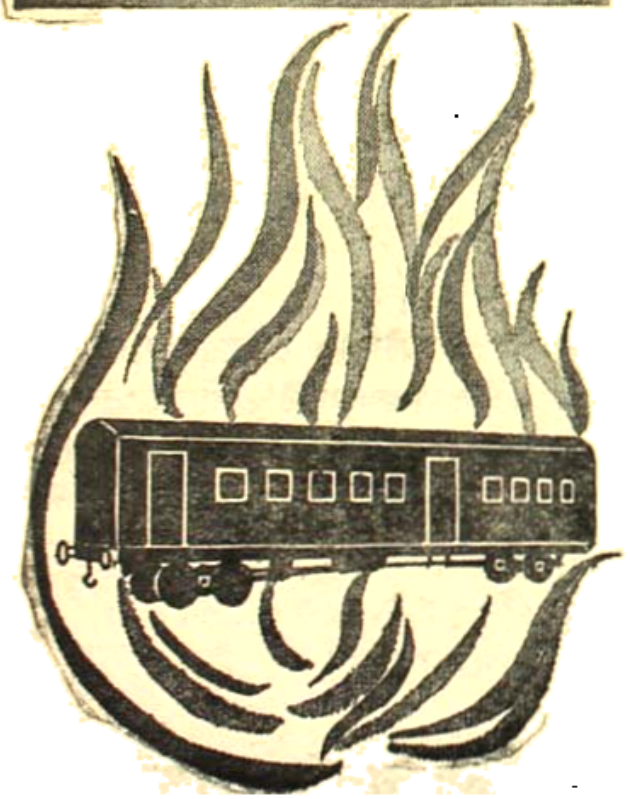

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·২০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

এডিয়েন্স লাইব্রেরী • ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। • গড়িয়াহাট মার্কেট।

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৬শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা সকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনীনগর
জি: ২৪ পরগণা

সূচীপত্র, ফাল্গুন, ১৩৭০

১। প্রার্থনাকালীন ভাবণ ... ৫১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৪)

২। শিক্ষাচিন্তা : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ... ৩৪
অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভৌমিক

৩। সত্যকে জানতে দাও (কবিতা) ... ৩৮
অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত

৪। আমরা কোথায় ? ... ৩৯
শ্রীপার্ব্বতী নাথ বিশ্বাস

৫। উদারতা ও সারল্য ... ৪৩
শ্রীশঙ্কর নাথ চট্টোপাধ্যায়

৬। নওজোয়ানের প্রতি (কবিতা) ... ৪৬
শ্রীকালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত

৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪২) ৪৭

৮। কঠিন দান (কবিতা) ... ৫৫
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য

৯। আশা (কবিতা) .. ৫৫
শ্রীআশুতোষ পাল

১০। সাময়িকী : সরস্বতী পূজা ... ৫৬

উদ্বোধন

ফাল্গুন, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
(৩৪)

কিন্তু সংস্কৃতে তা নয়। অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর সমষ্টির উচ্চারণ এক। গীতার সাধনা এই—দৈনন্দিন ব্যাপারকে এমন ভাবে কর যে সেই কর্মগুলির সমষ্টির নাম হয় ধ্যান।'' কর্মকে ধ্যান করে ফেল—কি করে? মামেকং শরণং ব্রহ্ম—ব্রহ্মধ্যান আর ব্রহ্মকর্ম এক···ভালবাসার বিকাশের নাম, জ্ঞানের বিকাশের নাম কর্ম, প্রেমের আস্বাদনের নাম কর্ম।···বিবেকানন্দ তাই বললেন—Fill thy brain with high thoughts and high ideals, work will come out of itself. Little manifestations of energy which have originated in thought and are escaping through muscles ···are called work.···শক্তির বাইরে পালিয়ে আসার নাম কর্ম···অদ্বৈততা ঘন হলে কর্ম আসে—অর্জুনকে যুদ্ধ করতে করতে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাচ্ছেন।···

৯-৮-৫৬।···ভগবান যে ধর্ম নিজমুখে বলেছেন সেই ধর্মের নাম ভাগবত ধর্ম—গীতা শ্রীভগবানের বাক্য, তাই গীতাও ভাগবতধর্ম—গীতায় যাহা দর্শন—abstract, ভাগবতে তাই জীবন concrete।...গীতাধর্ম রাজবিদ্যা—রাজাদের বিদ্যা—কিংবা বিদ্যানাম্ রাজা। এ যে রাজগণের বিদ্যা, তা বুঝতে কষ্ট হবে না—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজত্ব করতে বলছেন। অর্জুন রাজা হলে পুরুষোত্তম রাজ্য স্থাপিত হবে—শোষণ উঠে যাবে—কৃষ্ণধর্ম শোষণময়।··· গীতাতে আছে আমি প্রথম সূর্যকে, মনুকে, ইক্ষ্বাকুকে বলেছি।···পরীক্ষিতের উপর অভিশাপের ফলে ভাগবত পাওয়া গেছে—সেখানেও রাজাদের প্রশ্ন। নারদ বসুদেবকে শুনিয়ে ছিলেন।···রাজা যদি অচ্যুত থাকেন প্রজা-বিদ্রোহ হয় না—ছোটরা যে ক্ষেপে তা ছোটর দোষে নয়, বড়র দোষে। ভারতীয় শাস্ত্র রাজাদের শাসনের জন্য—বড়দের শাস্তি বেশী।···ভাগবতে তাঁর ধর্মই সূচিত হয়েছে—একে নারায়ণীয় ধর্ম বলে।...পুত্র-পিতার পাওয়া-পাওয়ির মধ্যে পুত্রের তরফ থেকে কিংবা পিতার তরফ থেকে সাধনা চলতে পারে।...বর্ণাশ্রমে কাল অনুকূল হওয়া চাই—ভাগবতে···যে কোন কালেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য অনুকূল।···বর্ণাশ্রমে গরীবের পক্ষে রাজদর্শন যেমন ফ্যাসাদ, গরীবের পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন তেমনি ফ্যাসাদ। প্রকৃতি একান্ত প্রতিকূল হওয়ায় জীবের দিক থেকে সাধনার যখন আর কিছু রইল না, তখন তাঁর দিক থেকে সাধনা সুরু হল।...তিনি যদি না চাইতেন আমি কি তাঁকে পেতাম?...ভাগবত বলেন যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ—যিনি সম্পর্ক রাখতে চান না, তাঁকে পাওয়ার অর্থই বা কি আর পেতে চাইবই বা কেন?··· তেমন নির্গুণকে পাওয়া যেমন বিড়ম্বনা, তেমনি চলেও না...। ছেলে মাকে চায়, না মা ছেলেকে চায়?—মায়ের চাওয়ার চাপে ছেলের চাওয়া জন্মাতে পারে।···অহংকারের লয় নির্বাণ দুই স্থানেই—বর্ণাশ্রমেও, ভাগবতধর্মেও।...ভালবাসার চাপে মানুষের আমি পুড়ে যায়।··ভগবান কত অল্পে খুশী হন—বললেন পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং...বাকিটা তিনি পুরিয়ে নিচ্ছেন স্নেহ দিয়ে। যিনি আমাকে চান

না, তাকে খুশী করতে ষোড়শোপচারে লাগে—যিনি আমায় চান, তাঁকে খুশী করতে অসুবিধা নাই।...বড়দের স্বভাব কি তা দেখলেই ভগবানের স্বভাব বোঝা যাবে—মা তো দুধ নিজে খান না, বিলিয়ে দেন।...ধনী যদি ধন বিলিয়ে দিত, কুলীন যদি কুল বিলিয়ে দিত, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণত্বকে ছড়িয়ে দিত—তবে সেটা ভাগবতধর্ম হত।... ধন নিয়ে ব্যবসা, কুল নিয়ে ব্যবসা, পাণ্ডিত্য নিয়ে ব্যবসা, ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে ব্যবসা কেন? এ সংসারটা কি ব্যবসার স্থান? বড়দের যা কিছু তা ছোটদের—তাই রাজ-রাজেশ্বর আসনেন—সে-ই রাজার রাজা যে প্রজাদের চরণতলে এসে দাঁড়াতে পারে।...যে বড় ছোট হতে পারে না, সে ছাঁচড়া বড়, যে ধনী ধন বিলাতে পারে না, তার ধন সেছে।...ভগবান নিজে পুঁজি করেন না, লক্ষ্মী সন্তানদের জন্য।...সমস্ত রাজাদের দর্প চূর্ণ করতে কৃষ্ণ এসেছেন... Don't sit tight—come to the level of the poor—এর নাম অবতারবাদ...ভক্তি হচ্ছে বিকাশ—decentralisation;—ভক্তিবাদে প্রতাপকত্র এসে রাস্তায় দাঁড়ান।...যে যেখানে একটু রাজত্ব পেয়েছে—ধনের রাজত্ব, পাণ্ডিত্যের রাজত্ব...সে-ই সেটাতে শক্ত হয়ে বসে সেটা ভোগ করতে চায়...। কৃপণের ধন বিলিয়ে দিলে সে ধন ফুরায়, কিন্তু সত্যিকারের কথা এই যে, ধন বিলিয়ে দিলেই ধন অক্ষুণ্ণ হয়।...রুদ্রকে জাগিও না—কেউ যেন না খেয়ে না থাকে, নারী যেন অপমানিত না হয়... তাহলেই রুদ্রের রোষ নেমে আসবে...। আমরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে কুলীন...আমার থেকে ছোটর যেন আমি আদর করতে পারি।...

১০, ৮, ৫৮।...বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আজ আলোচনা করতে করতে তারই মধ্যের একটা রহস্য কথা বলতে ইচ্ছে হল। সেখানে আছে—ব্রহ্মকে যিনি আমি বলে না জেনেছেন, আমি বলে ডাকতে না পেরেছেন...ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ থাকলে সমস্ত দেবতা পর হয়ে যায়—পিতৃসূত্রে ধরলে সকলেই আত্মৈবাভূৎ—যদি বাবাকে ভালবাসি তবে সেটাই ভাইদের ভালবাসার common thread—তুমি আছ তাই আমি আছি—আমার সাংসারিক আমির গোড়ায় পিতা—আর মূল আমির গোড়ায় ব্রহ্ম—এই ব্রহ্মকে যখনই পৃথক বলে ধরলাম তখনই আমি দেবতাদের গোলাম হলাম। যার আমি ব্রহ্মে দেওয়া হয় নাই, পুরুষোত্তমকে যার অনন্ত মনে করা হয় নাই, তার আমি সমস্ত বিশ্বশক্তির কাছে গোলাম হয়ে পড়লে। জল মাটি আগুন মেঘ সব দেবতা—ব্রহ্মের সঙ্গে পৃথক বলেই পশুকে যেমন মানুষ ভোগ করে, তেমনি দেবতারা এই মানুষদের ভোগ করে। আমার একটী গরু ধারালে যেমন আমার দুঃখ হয়, তেমনি দেবতাদের ভোগের বস্তু না হয়ে মানুষ যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তাহলে তো দেবতাদের ভোগে কম পড়ে—তাই দেবতারা চান না যে মানুষ ব্রহ্মকে জানে। সেই ব্রহ্মজ্ঞ মানুষটী তো দেবতাদের কাছে হারিয়ে গেল।...বৃন্দাবনে ইন্দ্র কৃষ্ণের গরু চুরী করলেন।...ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ ভাবাপন্ন হলেই দেবতারা আর তাকে কিছু করতে পারে না—রাজার ভালবাসা পেলে ম্যানেজার থেকে কর্মচারীরা সবাই সেলাম ঠুকে।...প্রকৃতির গোলামী যদি ছাড়তে চাও, ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ হও।...নিত্যগোপাল তাঁর ভক্তিযোগ গ্রন্থে বলেছেন, ভগবানের সঙ্গে অদ্বৈতজ্ঞান আনতেই হবে... অন্য-বুদ্ধি ত্যাগ করতেই হবে...পুরুষোত্তম মহাদেবের চাকুরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—পুরুষোত্তমকে ভালবাসলে সমস্ত বিশ্ব-জমিদারীই আমার হল—বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে বললেন আমিই সূর্য,—প্রকৃতি দুয়ার খুলে দেয় যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অদ্বৈত হতে পার।...রাজাকে ভাল না বাসলে রাজা কিছু কইবে না কিন্তু কর্মচারীর ঠেলা সামলাতে পারবে না।...উনি অন্ধ, আমি অন্ধ ভেদবুদ্ধিই পশুত্ব—পশুত্ব লোপ করতেই ভেকেছি—বিশ্বের একজন মানুষকে আমি বলে ডাকতে শেখ—সমস্ত দুনিয়া পথ ছেড়ে দেবে। এ পথ আমি শিখেছি—নইলে এত বড় পথ চলে আসতে পারতাম না।...যে স্ত্রীকে স্বামী পছন্দ করে না, তাকে বাড়ীর চাকর চাকরাণীও লাঞ্ছিত করে, আর স্বামী সোহাগিনীকে সকলে সম্মান করে।...যেমন করে পার ওঁকে আপন কর—দেখবে সমস্ত পৃথিবী অনুকূল হবে।...যে আমাকে আমি বলে

ভেবেছে, মায়া তার কি করবে ? বাড়ীর কুকুর গেরস্তের অনুগত—নূতন লোক দেখলে ঘেউ ঘেউ করে, গেরস্ত বলল এই চুপ কর—ব্যস চুপ। ভগবানের সঙ্গে এক হলেই ভগবানের সমস্ত শক্তি শুদ্ধ হয়ে আমাকে সম্মান দেবে, পাত্তির করবে।...দেবতার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই—দেবতার সুযোগ যদি চাও, মহাদেবের শরণাগত হও।...আমি যার গোবিন্দে দেওয়া হয়ে গেছে, তার বিশ্বে কোন ভয় নেই···বকলমা দাও, বকলমা দাও।... ভগবান যাকে আপন মনে করেন না, তাকে বিশ্বে কেউ ভালবাসে না। নিতাগোপালই আমার আমি, তুমিই আমার আমি—তোমার শরণাগত হয়েই আমি আমি—যতটুকু তোমায় জেনেছি, তোমায় পেয়েছি, ততটুকুই বিশ্বকে পেয়েছি···।

১০, ৮, ৫৬। বিশ্বনাথবাবু কদিন থেকেই আমাদের আরতিতে যোগ দান করেন।···'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে-জীবনে' নিয়ে গেলেন, উজ্জ্বল ভারতের গ্রাহক হলেন: ঐ বইতে কি আছে তাই বলব। সোনা কথাও অভ্যাস ও আবৃত্তি করতে হয়।···

শ্রীনিতাগোপালকে বুঝতে হলে প্রাণতত্ত্বের দিকে তাকাতে হবে। তিনি সবচেয়ে কম পরিচিত—এই কম পরিচিতিটাই তাঁর যোগ্যতা···চুপ করে বসে আছেন—watching the tide। তাঁর পালা আরম্ভ হব হব হয়েছে। মনের স্তর ছেড়ে বিশ্ব প্রাণের স্তরে এসে পড়েছে—একটা প্রলয় এসে গেছে পৃথিবীতে।...বিভিন্ন মতবাদের অবস্থা—প্রত্যেকে অপরকে খণ্ডন করছে—তোমারটা ভুল, আমারটা শুদ্ধ—কিন্তু জৈমিনীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করতে পারেন নি। জৈমিনীর কর্ম আর উত্তর মীমাংসার জ্ঞান কৃষ্ণে সমাধান প্রাপ্ত। কপিরা সব শ্রুতি-বিপ্রতিপন্ন—বুদ্ধ জৈন বরং অবৈদিক—গৌতম কণাদ তো বৈদিক...গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক আর সাংখ্যের পাতঞ্জল···এদের দলাদলি আজ শেষ করতে হবে। দলাদলি শেষ করে দিয়ে নূতন বেদ নিয়ে, অথচ বেদ নিয়ে এসেছেন নিতাগোপাল।...যজ্ঞে পশু বধ করা হয়···জ্ঞানকে বাদ দিয়ে নয়—তস্মিন্ যজ্ঞে বধঃ অবধঃ—বধ অবধ মেলে কি করে ?—যজ্ঞ নাহংকৃত ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে···এত দিন এক এক দৃষ্টি কোণে দেখা হয়েছিল, আজ প্রদক্ষিণ করে দেখতে হবে।···ইহাই বর্তমান যুগধর্ম।···বুদ্ধি ঐক্যদেশিক, প্রাণ ঐক্যদেশিক হয় না।... কৃষ্ণ পরাপ্রকৃতি—বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে পাবে না—প্রাণ সকলকে বাঁচিয়ে নিয়ে বাঁচে...উপনিষদের প্রাণের কাহিনী ...যাচোরস্তনং বিকারঃ...।

১৩, ৮, ৫৬।...আজ এই নরনারায়ণ আশ্রমে যে দুটি যুবক এসেছেন, ওরাও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, অতীত জীবনের সখী হিসাবে আমিও বিশেষ স্নেহ করি।··· সব অতীতকে আমি বর্তমানের মতই পাচ্ছি। আদানের (ভাল নাম ধীরেন্দ্র সেন) কাকা বাবা সবই আমার বিশেষ পরিচিত···রমেশের বাড়ী আমার বরিশালের বন্ধুরা বাসার কাছেই ছিল। যেদিন রমেশ ম্যাজিষ্ট্রেট খুন করে সেদিন বরিশালে আমি ছিলাম।··· নিতাগোপালের মধ্যে একটী বিপ্রবী ঠাকুরকে পেয়ে আমার সংসার সন্ন্যাস এক হয়ে গেছে।...ভারতবর্ষের তথাকথিত দর্শন পড়লে কোন আত্মীয়তা-বোধ আসে না।··· কবে ছাড়িয়া যাইব এই চিন্তায় আত্মীয়তা হয় না।··· Old physics showed us a universe which looked more like a prison house than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling place for free men and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live lives of endeavour and freedom'—Jeans.

ক্রমশঃ

শিক্ষাচিন্তা ঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভৌমিক ॥

আচার্য বিনোবা তাবে যান্ত্রিকতামূলক অবৈজ্ঞানিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে ইংরাজী 'to teach' শব্দের কোন প্রতিশব্দ ভারতীয় কোন ভাষাতেই লক্ষিত হয় না। 'শিক্ষাদান', 'শিক্ষাগ্রহণ' প্রভৃতি কথা একাধিক সম্বন্ধযুক্ত। 'শিক্ষা দান' করার রীতি ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে অজ্ঞাত। শিক্ষাকার্যে দাতা কিংবা গ্রহীতার স্থান নাই। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষাকার্য চলবে। এটাই ভারতীয় শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই প্রার্থনা করেন 'সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ; তেজস্বিনাবধীতমস্তু'—আমাদের উভয়কে (দেবতা) রক্ষা করুন, আমরা উভয়েই যেন অধীত বিদ্যার ফল ভোগ করি, উভয়েই যেন বীর্যবান্ হই'।

শিক্ষাকার্যে ছাত্রের এই সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা আমরা আজ নানাভাবে শুনছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে পুরোভাগে স্থাপন করে তার স্বীয় প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত, সার্থক এবং ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে যত্নবান্ হতে অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। তার কারণ আমরা 'teaching'-এর উপর যতটা বিশ্বাসবান্, 'learning' এর উপর ততটা বিশ্বাসবান্ নই। ছাত্র তার অপরিণত মন বুদ্ধি চরিত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে এলে পরিণত বয়স্ক শিক্ষক তার জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতাদ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন—আজিকার দিনে এইটিই সহজবোধ্য এবং সর্বস্বীকৃত শিক্ষানীতি। শিক্ষক এখানে দাতা, ছাত্র গ্রহীতা, শিক্ষক শিক্ষাদানের কারক, ছাত্র অভিনেতা মাত্র!

Sir John Adams ছাত্র এবং শিক্ষনীয় বিষয় উভয়কেই সম্যকভাবে জানার জন্য শিক্ষককে উৎসাহিত করেছেন। তিনি ইংরাজী 'teach' শব্দটির বিকর্ষক বৈশিষ্ট্যটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন the 'teacher teaches John Latin' এই বাক্যটিতে teach শব্দটির দুটি কর্ম—একটি John, অপরটি Latin। সুতরাং শিক্ষককে Latinও যেমন জানতে হবে, John-কেও তেমনি জানতে হবে। এখানে কিন্তু শিক্ষাদানকর্মে শিক্ষকের ভূমিকার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, শিক্ষার্থী Johnকে ততটা দেওয়া হয় নাই। যেখানে শিক্ষকের Latin জানাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, John-এর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যকে সমপরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

আধুনিক কালের ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষক-কেন্দ্রিক এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে অনেক শিক্ষা-বিদ্ শিশুকে পুরোভাগে স্থাপন করে তার শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন। পেস্তালৎসী, ফ্রোবেল, মন্তেসরী, ডিউই প্রভৃতি শিশু-দরদীর কথা আজ সর্বজনবিদিত। ইংলণ্ডের শ্রীমতী মার্গারেট ম্যাকমিলান, শ্রীমতী গার্ডনার প্রভৃতির নামও নার্সারী ও শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচিত।

এই সকল শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রত্যেকেই শিশুর স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জৈব প্রেরণায় বলেই শিশু নিজেকে বিকশিত করবে, ফুল যেমন বিকশিত হয় আপনার প্রেরণায়। ফুলের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন আলো, বাতাস এবং ধরিত্রীর অন্তর্নিহিত স্নেহরসধারা, মানবশিশুর পক্ষেও নিজেকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ—প্রয়োজন স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যের, স্বাস্থ্যপ্রদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের। এই বিকাশ-তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আজ গড়ে উঠেছে যে মনোবিদ্যা তাকেই Developmental Psychology বলা হয়। বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বিকাশের গড় (Norm) কি, তার মানসিক বিকাশেরই বা কি ধারা, তার জন্য,

ক্রোধ, আত্মপ্রকাশের কি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল পরিবেশ—এইগুলিকে লক্ষ্য করে এবং প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মানবশিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। শিশুর দন্তোদ্গমের, হাঁটাশেখার, কথা বলার যেরূপ প্রায় সুনির্দিষ্ট সময় আছে, তেমনি তার মানসিক বিকাশের ধারাও সুনির্দিষ্ট গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। শিক্ষকের কর্তব্য এই স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে বাধামুক্ত রাখা এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে শিশুকে সর্বোত্তম সুযোগ দান করা।

একে শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপও বলা চলে। রাষ্ট্র-বিকাশের ধারায় যেমন গণতন্ত্র মানুষের উন্নতির এবং অভিব্যক্তির অধিকারকে স্বীকার করে, শিক্ষাতত্ত্বের বিবর্তনেও প্রত্যেকটি ছাত্রের স্বপ্রকাশের অধিকারকে আজ স্বীকার করে মনোবিদ্যা। Pestalozzi তাই বলেছেন Let us psychologise education—আসুন আমরা শিক্ষাকে মনোবিদ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করি। ছাত্রের মানস-কুসুম প্রস্ফুটিত হবে তার স্বাভাবিকতায়, স্বকীয় সৌন্দর্যে, কোনটি তার সুগন্ধে পথিকজনের আনন্দবর্দ্ধন করবে, কোনটি তার বর্ণসুষমায় দর্শকের মনোহরণ করবে, কতকগুলি বা হবে নিগন্ধা ইব কিংশুকাঃ, কতকগুলি ঝরে যাবে অকালে। নিপুণ মালীর মত স্নেহস্পর্শে শিক্ষক তাদের লালন করবেন, পালন করবেন, বৃদ্ধির সহায়ক হবেন। নয়নসুখকর উদ্যান রচনায় যেমন নানাবর্ণের, নানা গন্ধের পুষ্পের স্থান আছে, মানব-সমাজ রচনাতেও প্রয়োজন রয়েছে বহুমানুষের বহুসাধনার, বহুমানুষের বহুশক্তির সম্মিলিত দান, কোনটি ক্ষুদ্র, কোনটি বৃহৎ, কোনটি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়, কোনটি অপ্রমেয়। কিন্তু এই সমাজ-রচনার স্থপতি নিপুণ দূরদর্শী স্থপতিরও যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অদক্ষ কারিগরের, অনিপুণ শ্রমিকের। কেহই হেয় নয়, কারও শ্রমব্যতিরেকে এই সুমহান শিল্পকীর্তির রূপায়ণ সম্ভব নয়।

শিক্ষাকে এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার বয়স রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষালাভের এই অধিকার যেমন সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত, তেমনি এই অধিকার মনো-বিদ্যাসম্মতও বটে। শুটিকতক ভাগ্যবান্ কিংবা মেধাবী ছাত্রের জন্যই আজ শিক্ষাব্যবস্থা নয়, আজকাল শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের জন্য, তীক্ষ্ণধী, স্বল্পধী, মন্দধী এমনকি লক্ষতন্ত্রের সেই পরম দুর্মেধা ছাত্রদের জন্যও। যারা ধীমান, শিক্ষকের সমগ্র দৃষ্টি তাদের উপর পড়তে বাধ্য এবং তাদের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু যারা অল্পধী, তারাও যাতে সমাজের কণ্টকস্বরূপ না হয়, তার জন্যও তাঁকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে, নতুবা তারাই একদিন সমাজ-দেহে দুষ্ট-ব্রণের মত আত্ম-প্রকাশ করে সমগ্র দেহকে কলুষিত করে তুলতে পারে।

একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছে, অপরদিকে রয়েছে কোন পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেকটি শিশুকে কোন একটি বিশেষ ধরণে গড়ে তোলার কথা। নাৎসী জার্মাণী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে সর্বশক্তিমান হিটলারের ছবি টাঙ্গানো থাকত, প্রত্যেকটি শিশুকে সেই ছবি অভিবাদন করতে হত। শিক্ষা দেওয়া হত জার্মাণজাতি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিডিক জাতি, ইহুদীরা জার্মাণদের শত্রু, প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে সামরিকশিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। এ ধরণের শিক্ষার পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন; তা হয়তো সাময়িক, তা হয়তো চিরন্তন কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয়, কিন্তু সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ হবে বলে শিক্ষকগণকেও ঐ চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিকে সেইভাবে সাজাতে হয়। শিশুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, তার স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ এ সব ক্ষেত্রে কম, শিক্ষকের নির্দেশই সেখানে সর্বময়, আদেশ লঙ্ঘন দোষনীয়, শাস্তিযোগ্য, আদেশপালন পুরস্কার্য না অবশ্যকর্তব্য। তা হলেও শিক্ষাব্যবস্থাকে আজ সর্বদেশে সমাজ-ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষার্থী নিজে একজন শিক্ষ

অধ্যাপক কিংবা শিক্ষাবিদ্ নন্। দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে নানা-শ্রেণীর লোকের মতামত গ্রহণ করে, তিনি সেই সকল সুপারিশকে কার্য্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন মাত্র। শিক্ষক নিজে ব্যবস্থাপক নন্ জন্য পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণের ব্যাপারে, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে, এমন কি পুস্তক-প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। কি কি বিষয় পড়াতে হবে, কতটুকু পড়াতে হবে, কোন্ বিষয় কত ঘণ্টা পড়াতে হবে, কখন পরীক্ষা নিতে হবে, কেন্দ্রীয় পরীক্ষার স্বরূপ কি হবে—আজ প্রায় সমস্তই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট। শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সর্ব্বত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলে পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষকের কিছুটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সে স্বাধীনতাও কার্য্যক্ষেত্রে সময়ের সঙ্কীর্ণতা, বিষয়ের সীমাবদ্ধতা, পাঠ্যক্রমের জটিলতা এবং পরীক্ষাগ্রহণের অতি গুরুত্ব দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, এমন কি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। সোক্রেটিস এথেন্সের পথে পথে, এথেনীয় যুবকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের শিক্ষাদান করতেন। তাঁর স্বকীয় প্রতিভার ও বিষয় বস্তুর নূতনত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রের দল এই অদ্ভুত দর্শন দার্শনিকের কাছে ভিড় করে আসত। সোক্রেটিসকে অবশ্য এই ছাত্র-প্রিয়তার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু সোক্রেটিসের স্বকীয় পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রের অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করে তাকে জ্ঞানালোকিত পথে পরিচালিত করার যে পদ্ধতি, তা আজও সর্ব্বদেশে স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতেও আশ্রমিক শিক্ষার মূলে গুরুই ছিলেন সর্ব্বময়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর গুরুত্বের ছাপ ছাত্রের চরিত্রকে স্বকীয় মর্য্যাদা দিত। বৌদ্ধযুগের তক্ষশীলা, সারনাথ প্রভৃতি বিহারেও শীলভদ্র, দীপঙ্কর প্রভৃতি অধ্যক্ষদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল জ্ঞানসাধনার এক একটি তীর্থক্ষেত্র। মধ্যযুগের ইউরোপেও অনুরূপভাবে এক একজন জ্ঞানব্রতীকে কেন্দ্র করে এক একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। Van Lion তাঁর The Story of Mankind নামক পুস্তকে Universityর উদ্ভবের একটি সরল বর্ণনা দিয়াছেন—

"But in the Middle Ages things were done differently. A wise man said to himself "I have discovered a great truth, I must impart this knowledge to other. And he began to preach his wisdom wherever and whenever he could get a few people to listen to him, like a modern soap-box orator. If he was an interesting speaker, the crowd came and stayed. If he was dull the crowd shrugged their shoulders and continued their way. By and by certain young men began to come regularly to hear the words of wisdom of this great teacher. They brought copy-books with them and a little bottle of ink and a goose quill and wrote down what seemed to be important. One day it rained. The teacher and his pupils retired to an empty basement or the room of the "Professor". The learned man sat in his chair and the boys sat on the floor. That was the beginning of the University, the "Universitas" a corporation of professors and students during the Middle Ages, when the "teacher" counted for everything and the building in which he taught counted very little."

এমি করে অধ্যাপককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের Salerno, Paris, Bologna (Italy), Oxfore, Padua প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার প্রয়োজন তখন ছিল গৌণ, আর

প্রথমেই প্রয়োজন হয় অট্টালিকার, পরে আসেন অধ্যাপকগণ।

শিক্ষার সার্ব্বজনীনতার সাথে সাথে এই 'গুরুদাসী' শিক্ষার ক্রমশ বিলোপ সাধিত হ'ল। অসংখ্য ছাত্র যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিড় করতে লাগল, তেমি প্রয়োজন হল বহুসংখ্যক শিক্ষকের। সকলেই এঁরা প্রাচীনকালের অধ্যাপকগণের ন্যায় জ্ঞানী, ছাত্রগত প্রাণ কিংবা সংস্কারক হতে পারেন না। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান অন্যান্য উপজীবিকার ন্যায় একটি উপজীবিকা মাত্র। তাই আজ দেখা যায় শিক্ষকগণ অন্যান্য চাকুরীজীবিদের মত ইউনিয়ন গঠন করে নিজেদের দাবী-দাওয়া রাষ্ট্রকে এবং দেশবাসীকে জানাতে চান্।

বর্ত্তমান সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষকের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় যান্ত্রিক পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। শিক্ষকের কৃতিত্ব, অকৃতিত্বের একমাত্র মাপকাঠি তাঁর ছাত্রদের পাশের হার। যে বিদ্যালয়ের কিংবা শিক্ষকের ছাত্রেরা যত অধিক সংখ্যায় পাশ করবে, তার কৃতিত্ব তত বেশী।

কিন্তু সর্ব্বদেশেই আজ শিক্ষককে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। এবং এরূপ মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও বিদ্যমান। আজ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর, বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদ্যালয় গৃহে সমবেত হচ্ছে। এদের শক্তি সামর্থ্য, আগ্রহ, অভিরুচি প্রভৃতি বিভিন্ন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে প্রত্যেকেই একই দেশের অধিবাসী, একই সমাজের নাগরিক হবে। দেশের ও সমাজের কল্যাণ এদেরই দ্বারা সাধিত হবে, সুতরাং এদের আচার আচরণ, এদের কর্মশক্তি, এদের জ্ঞান যাতে শুভকর হয়, শিক্ষককে তার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। তাই বিদ্যালয়কে আজ কতকগুলি তথ্য পরিবেশের কেন্দ্র মনে করলে চলবে না, কয়েকটি বিষয়ের আংশিক জ্ঞান আহরণেই শিক্ষকের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হলেও চলবে না, ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই হবে শিক্ষা দানের লক্ষ্য। শিক্ষককেও আজ তাঁর সঙ্কুচিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হতে হবে।

কি ভাবে এই সঙ্কীর্ণ পরিবেশে, সীমিত স্বাধীনতার মধ্যেও শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন, এই প্রশ্ন আজ শুধু আমাদের দেশের নয়, সর্ব্বদেশের। শিক্ষাদান আজ তাই একটি জটিল সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে সকল দেশেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাদ দিলে, প্রাথমিক ও মধ্যস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন্, সেকথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই। আমেরিকার মত ধনী দেশে শিক্ষকের বেতন যথেষ্ট হলেও অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় কম। আমেরিকাতেও আজ শিক্ষক-প্রতি গড় ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং আমেরিকায় শিক্ষকের স্বল্পতা এখনও বর্ত্তমান। রাশিয়ায় সে তুলনায় শিক্ষকের অভাব নাই, তার কারণ শিক্ষক-সংখ্যাও সেখানে অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় পূর্ব্ব পরিকল্পিত। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় স্কুলের সংখ্যা "আরও কম।" Overcrowding is a problem as it is in the United States, most schools are full to bursting and many operate in two shifts. One reason for this is a conscientious effort to keep the size of the classes down. আজ তাই সর্ব্বদেশেই শিক্ষাবিদ্গণ চিন্তা করছেন কি করে এই প্রতিকূল পরিবেশকে যথাসম্ভব অনুকূল করা যায়, বিদ্যালয়ের স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়, প্রতিটি ছাত্রের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করার কি কার্য্যকর পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রতিটি ছাত্র দেশের সম্পদ। দেশের খনিজ সম্পদ, বনসম্পদ কিংবা কৃষি সম্পদ তার তুলনায় নগণ্য, মানুষের প্রয়োজনে তাদের অস্তিত্ব। সুতরাং কোন শিশুই যাতে অবহেলিত না হয়, প্রত্যেকেই যাতে সমাজের কল্যাণে তার জ্ঞান বুদ্ধিশ্রমকে নিয়োজিত করতে পারে, শিক্ষকের সেই কর্ত্তব্যে অনলস থাকতে হবে, তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিশ্রমেরও এই হবে সার্থক প্রয়োগ। শিক্ষাদান সমাজ-সেবা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পীড়িতের চিকিৎসা সমাজ সেবা হবে অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করা, দেহ-মন-বুদ্ধির সুস্থতা অক্ষু

রাখতে সর্বক্ষণ সাহায্য করাও সমাজ-সেবা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কি উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষক তাঁর শ্রমের উপযুক্ত ফল পেতে পারেন, কিভাবে তিনি স্বল্প সময়কে সার্থক করে তুলতে পারেন, কি ভাবে তিনি প্রতিটি শিশুকে 'আবিষ্কার' করে তার স্বকীয় সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন—এটাই তাঁকে চিন্তা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে জ্ঞানরাজ্যে ছাত্রই পথিক শিক্ষক পথ-প্রদর্শক মাত্র। পিচ্ছিল পথ, বন্ধুর পথ, কণ্টকাকীর্ণ, তুহিনাস্তীর্ণ পথ—সব পথই তাকে পার হ'তে হবে স্বীয় প্রচেষ্টায়, শিক্ষক শুধু দিশারী, বন্ধু, সখা, পরামর্শদাতা মাত্র। Whitman-এর কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য—

"Not I, nor any one else can travel
that road for you,
You must travel it for yourself,
You are asking me questions and
I hear you
I answer that I cannot answer,
you must find out for yourself"
(A Song of myself)

সত্যকে জানতে দাও

॥ অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত ॥

তোমাতে বিশ্বাস রেখে বাহির হয়েছি আমি পথে
অনেক চলার মাঝে তোমার কথাই ভেবে যাই ;
অন্তরের প্রত্যয়কে তুমি আছ জেনেই জানাই,
আকাশের আঙ্গিকে তোমার বিস্তৃতি কতো মতে
অনেক বুঝিয়ে দিলে, সে-বিস্তার জীবনের ব্রতে
গভীর আনন্দ নিয়ে জ্বালাক প্রশান্ত দীপশিখা ;
তমস্বিনী রাত্রিকেও সমুজ্জ্বল তারকার টীকা
উপহার দিয়েছ তো,—আঁধার আলোর লীলাস্রোতে—

সত্যকে জানতে দাও প্রাণের পরম অঙ্গীকারে,
জীবনের চিত্রকল্পে ফুটুক সে উজ্জ্বল আকাশ ;
আমার সত্তার শুভ্র উন্মোচিত পরিচয়-দ্বারে
তোমাকে সাজাতে চাই,—সে-সজ্জায় নিভৃত বিকাশ।
অন্তরের যে-জিজ্ঞাসা, রূপ তার সত্য-আকুতিতে
যেদিন উঠবে ফুটে, সেইদিন শান্তি ধরণীতে।

আমরা কোথায় ?

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

আজ বারে বারে একটি প্রশ্নই আমাদের মনে হচ্ছে "আমরা কোথায়"! চারদিক হ'তে যে বিদ্বেষ বিষ, রাজনৈতিক ক্রূরতা, দুর্নীতি, সামাজিক অনাচার, অসংযমের দুর্গতি ও মৃত্যু, যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা গোটা সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করে ফেলছে তার শেষ কোথায়? এ তো কোন নতুন সৃষ্টির বেদনা নয়—এ যে একান্তই রোগ-বিকার। এই রোগের প্রতিকার কি একান্তই অসম্ভব? যদি সম্ভব তবে উপায় কি? যেখানে সমাজ-দেহের প্রতিটি কোষ রোগাক্রান্ত হয় সেখানে চিকিৎসা আরম্ভ করা কোথা থেকে? কোথায় কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদ হতে পয়গম্বরের কেশ চুরি যাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে ছুতা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকর্ণধারদের খল-বুদ্ধি পূর্বপাকিস্তানের খুলনা, যশোহর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতিস্থানে ধর্মের নামে বীভৎস খুন জখম, নারীহরণ, শিশু হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহ-দাহের ঘটনা ঘটাল যার প্রতিক্রিয়ায় পূর্বপাকিস্তানের ঐ বিষ ও অগ্নি পশ্চিম বঙ্গের দেহকেও বিষাক্ত ও উত্তপ্ত করে ফেলল। যারা এই বীভৎস ঘটনা সংঘটিত করল, তারা পাকিস্তানে মুসলমানই হোন আর ভারতবর্ষে হিন্দুই হোন তারা কি সত্যই ধার্মিক, তারা কি সত্যই ধর্মের নামে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এই বীভৎস পথ অবলম্বন করেছেন? যদি সত্যই ধর্মরক্ষার্থে এই জেহাদ হত তবে কিছুতেই তা কুৎসিৎরূপ গ্রহণ করতে পারত না। আসল কথা হচ্ছে যারা এইগুলি করে তাদের আসলে কোন ধর্মই নেই। পাকিস্তানে যারা এই বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে তাদের আমরা মুসলমান বলতে লজ্জাবোধ করি কারণ ইসলাম ধর্মের এরা কলঙ্ক। যে ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে, যে ইসলাম ভালবাসতে শেখায়, যে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে আল্লার নিকট সমর্পণের বাণী শোনায় সেই ইসলাম ধর্মের এরা পরিপন্থী। তেমনি আমাদের দেশেও যারা পরস্ব হরণ, ধ্বংস ও লুণ্ঠনে মাতে তাদের মধ্যেও আমরা কোন ধার্মিক মানুষকে দেখতে পাই না—বরং বিপরীতপক্ষে তারা ধর্মের ধারই ধারে না। আসল ধার্মিক যারা তাঁরা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন দেশের এই অবস্থা দেখে তাঁরা লজ্জায় অবনত শির, দুর্বৃত্তের আধিপত্য দেখে ভীত, বুদ্ধিমানের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি দেখে হতাশায় মুহ্যমান, আর সমাজের সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-বিভ্রান্তি দেখে নির্বাক।

মুনিঋষিগণ যদিও উপনিষদীয় যুগে সকল ধর্ম সকল মত ও বিশ্বাসকে একীভূত দর্শন করেছিলেন, এক ও বহুর unity in diversity দেখেছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্মকে two parts of single whole বলে জেনেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য প্রজ্ঞাবাদী ভারত তার দার্শনিক ব্যাখ্যানাম্বে অন্তরের দিকে অতিমাত্রায় জোর দিতে বাইরের জগৎকে করল উপেক্ষা—স্থির ব্রহ্মকে মূল্য দিতে গিয়ে প্রকৃতিকে, অস্থির জগৎ-গতিধর্মী সংসারকে ক'রল হেয়। যুগপৎজ্ঞানের অভাববশতঃ মনবুদ্ধির স্তরে রাগ-দ্বেষের ওপরে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যাতা শাস্ত্র সৃষ্টি ক'রল কুলিন অকুলিনে, উচ্চ-নীচে ভেদ। ঐ দৃষ্টিভঙ্গির ফলই আ সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত। যে অন্তরের প্রতিষ্ঠার জ বাহিরকে অস্বীকার করা হয়েছে সেই বাহিরই প্রকৃতি বিধানে আজ সমাজদেহে প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমাজ আজ একান্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানসর্ব হ'য়ে পড়েছে। ফলে তার অন্তরের দিক যাচ্ছে শুকিয়ে অন্তর বাইর সম না হওয়ার ফলে রাগদ্বেষরূপ দো আক্রান্ত হয়ে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য, শোষ অত্যাচার। সমাজের এই ধর্মগ্লানিরূপ রোগের পরিণ হ'ল হিন্দুসমাজে উচ্চ নীচ জাতিভেদ, বহু হিন্দুর ইসলা

খৃষ্টান, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ; ফলে গোটা ভারত-সমাজ রাগদ্বেষে ভেদবুদ্ধিবশতঃ খান-খান হ'য়ে গেল। ইংরেজ রাজত্বে এর চরম পরিণতি দেখতে পেলাম। ইংরেজের ধূর্তবুদ্ধি আমাদের এই দুর্বল স্থানে আঘাত করে আমাদের দুর্বলতর করে রেখে তার সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে রাখার উদ্দেশ্যে Divide and Rule policy অবলম্বন করল। ইংরেজের এই কূট চাল বুঝতে পেরে সুস্থ চিন্তাবিৎ নায়কগণ তাদের সমাজদেহের এই দুর্বলতা সারাবার জন্য হিন্দু মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব ও অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের ইহাও একটা দুর্ভাগ্য যে গান্ধীজীর আপ্রাণ চেষ্টা এবং তাঁর সুস্থ শক্তিশালী নেতৃত্বকে পর্যুদস্ত করে ইংরেজের কূট বুদ্ধির নিকট আত্মসমর্পিত জিন্না সাহেব তার দ্বিজাতি-তত্ত্বের মাধ্যমে সাধারণভাবে মুসলমানদের আত্মকল্যাণের পথেই টেনে নিয়ে গেল। এ সম্ভব হওয়ার পিছনেও ঐ বিদ্বেষ। ফলে মহাত্মাজীর মনঃপূত না হলেও ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারত খণ্ডিত হ'য়ে গেল, মুসলিম-রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের জন্ম হল। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হ'য়ে স্বাধীন হল। ভারতবর্ষের বুকে বিদ্বেষ হ'তে সৃষ্ট ও পালিত পালিত একটি দুষ্টক্ষত দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে গণ্য হয়ে গেল।

ভারতবর্ষ বিভাগে স্বীকৃত হওয়ার সময়ে তৎকালীন নেতাগণ এই-ই আশা ক'রেছিলেন যে, যে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতার দাবী নিয়ে এই কলহ সেই দাবী স্বীকৃত হলে কলহ আর নাও থাকতে পারে। আর তাছাড়া ভারতবর্ষ খণ্ডিত হ'য়েও স্বাধীনতা লাভ করবে—তাতে সুবিধা এই যে, যে দুই রাষ্ট্রশক্তি বিভেদকে উস্কিয়ে রাখছে তারা ক্ষেত্রচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের প্রভাবও আর থাকবে না। সমাজদেহ থেকে সকল ভেদ বিভেদ দূর ক'রে ভারতবর্ষ এক-জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী ছিল তার মধ্যে লোক-বিনিময়ের কথাও স্বভাবতঃই ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের নায়কগণ কংগ্রেসের আদর্শানুসারে দেশ-বিভাগে সম্মত হলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাগকে স্বীকার করেন নি। সুতরাং লোক বিনিময়ের প্রস্তাব থাকলেও কার্যকরী হয়নি। জিন্না সাহেবও পরবর্তী সময়ে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নেন। লোক বিনিময় হয়ে গেলে কি অবস্থা দাঁড়াত আমরা বলতে পারি না। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হ'তে জাত স্বতন্ত্রতার দাবী অনুসারে ভারত বিভাগ হ'লেও ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতাকে কখনও মেনে নেয়নি। সে তার শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের সকল বর্ণের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান নাগরিক অধিকার দান ক'রেছে। এখানে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কোন সমস্যাই আজ আর বিদ্যমান নেই। এখানকার মানুষের পরিচয় মর্যাদা সে হিন্দু কি মুসলমান এই বলে নয়—এখানকার মানুষের মর্যাদা ও মূল্য হয় সে কতখানি ভারতবাসী হ'তে পেরেছে তাই দিয়ে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু (হিন্দু) সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ নাগরিক অধিকার দানে বৈষম্য রক্ষা করা হ'য়েছে, মনের স্তরেও সেখানে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি ও মিলন আজও আসতে পারছে না। আর তা ছাড়া যে উপায়ে তারা পাকিস্তান আদায় করেছে সেই উপায়কেই অবলম্বন ক'রে সেখানের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাদের ক্ষমতা করায়ত্ত রাখবার জন্য সাম্প্রদায়িক হানাহানির কৌশল ছাড়া মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেও পারে না। পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর ভণ্ডামি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থ-পরতার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রগতিশীল আন্দোলন আজ আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে, তাকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করার জন্যও পাকিস্তানের দানব প্রকৃতি শাসকশ্রেণী ঐ পুরাণ কৌশল সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও ভারত হিন্দু প্রধান ব'লে ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের পথ অনুসরণ ক'রে চলছে এবং যে কোন ছল ছুতা বা সুযোগে ভারতকে হেয় করা, ভারতকে বিপদে ফেলা, ভারতের অভ্যন্তরে গোলমাল সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে চলছে। যত দিন পর্যন্ত এই জাতীয় শাসকশ্রেণী পাকিস্তানে থাকবে ততদিন পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিবৃত্তি আশা করা নির্বুদ্ধিতা।

যারা কোনরূপ চুক্তির মূল্যই রক্ষা করে না, যাদের কথার কোন মূল্যই নেই তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাও নিষ্ফল। আজ ১৭ বৎসরেও পাকিস্তানের মতিগতিতে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করা তো যায়ই নি, বিপরীত পক্ষে ভারত সরকারের উদারতাকে তারা দুর্বলতা মনে ক'রে ভারতকে উত্যক্ত করার জন্যই দিনদিনই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এদের স্পর্দ্ধা এতদূর পর্যন্ত বেড়েছে যে ভারতের শত্রুতা করার জন্য এরা চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেও লজ্জা বোধ করেনি। এ হেন খল প্রতিবেশী নিয়ে আমাদের বাস।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রথমে পাকিস্তানে আরম্ভ হ'য়েছে আর তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা ও বদলা নেওয়ার জন্য জনসাধারণের এক অংশ ক্ষেপে উঠেছে। অর্থাৎ প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল উৎস স্থান পাকিস্তানে। পাকিস্তানকে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে বাধ্য না করান যায় তবে পুনঃ পুনঃ এই দাঙ্গা হবেই হবে।

এবারকার দাঙ্গায় কতকগুলি বিষয় খুব পরিস্ফুট হ'য়েছে। পূর্ব বঙ্গের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং কাশ্মীর হজরতবাল মসজিদের পবিত্র কেশ অপহরণের ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী মুসলমানদের দিয়ে খুলনাতে প্রথম দাঙ্গা আরম্ভ করা হয়। এই দাঙ্গায় বাঙ্গালী মুসলমানদের কোন সমর্থন তো ছিলই না বরং বহু মুসলমান তাদের জীবন বিপন্ন ক'রেও হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকাতেও ঠিক একই ইতিহাস—সেখানেও অবাঙ্গালী মুসলমানরাই অগ্রণী। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা সম্পূর্ণ সরকারী প্ররোচনায় এবং গোপন ষড়যন্ত্রে সংঘটিত হয়েছে। পরম্পর শোনা যায় ঢাকার দাঙ্গা আরম্ভ করার সাত দিন আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও তার ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে দানাবদ্ধ ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়, দাঙ্গার বিরোধিতা না করতে পারে। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কোন দাঙ্গাতেই বা দেখিনি বাঙ্গালী মুসলমানগণ হিন্দুদের রক্ষা ক'রতে গিয়ে, দাঙ্গার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বহু সংখ্যায় প্রাণ দিয়েছে। তাই এবারকার পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের দাঙ্গা না ব'লে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পশ্চিমা মুসলমানদের দাঙ্গা বললে খুব অধিক বলা হবে না।

পশ্চিম বঙ্গের পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় যা কিছু হ'য়েছে তাতেও একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এখানকার জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের পৈশাচিক ঘটনার সংবাদে বিচলিত হ'য়ে পড়ে। রক্তের টান সামলান সাধারণ যুক্তি বুদ্ধিসম্পন্নদের কাছে আশা করা উচিৎ নয়। তারা বিভ্রান্ত হ'য়ে দায়িত্বহীন কথা বার্ত্তা বলেছে। তাদের এই উত্তেজনার সুযোগ নিয়েছে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা যারা যে কোন গোলমালের সুযোগে লুঠন, ছিনতাই, ছোরা মারামারির কাজে নেমে পড়ে। এ দলে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। এরা সুযোগ মত হিন্দুর বাড়ীও ধ্বংস লুঠন করে, মুসলমানের বাড়ীও ধ্বংস লুঠন করে। এদের আমরা হিন্দু বা মুসলমান বলতে রাজী নই। এদের পরিচয় এরা জাতিতে গুণ্ডা, ছিনতাই ডাকাত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই জাতীয় বিভ্রান্ত আন্দোলনে এই গুণ্ডার দলই নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে থাকে। এরা এত শক্তিশালী যে জনসাধারণের বিভ্রান্তি ও সরকারী নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সমাজের ধন মান জীবন শান্তি যে কোন মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে পারে। সুখের বিষয় সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালী আজও দেশে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পশ্চিম বঙ্গের ছাত্র সমাজ ও তরুণ তরুণীর দল বিভ্রান্ত হ'য়ে বিপথগামী হয়নি। কিন্তু যে সমস্ত রাজনৈতিকগুরুর সে সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সরকার-কর্তৃক সমাধানের চেষ্টা না ক'রে জোড়া তালি দিয়ে আদর্শের কথা বলে সমাধান করতে চেষ্টা চাইলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কেন ? সাধারণ মানুষ যদি বুঝত যে আমাদের রাষ্ট্রশক্তি অসহায় নিরপরাধ মানুষের হত্যালীলার বিরুদ্ধে বজ্রমুষ্টি সিধা করে দাঁড়িয়েছে, তবে আমরা জোর ক'রেই বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছুতেই এই ভ্রাতৃহনন যজ্ঞে নামত না বা তাদের বিভ্রান্তি

আসত না। কারণ মানুষে মানুষে হানাহানি ভারতের কৃষ্টির বিরোধী। আজ ১৭ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ যে একই খেলা চলছে তার বিরুদ্ধে যেখানে মানুষ শুধু দেখতে পেয়েছে মৌখিক দুঃখ প্রকাশ আর প্রতিবাদলিপি, কোন সক্রিয় প্রতিরোধ দেখতে পায়নি সেখানে তারা সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেরাই প্রতিকারের পথ বেছে নিতে চেয়েছে। কিন্তু কূটনৈতিক বিষয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে নয় তাই তার পথ বিপথই হয়ে যায়। এর জন্য সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নির্বিচারে যথেচ্ছ শাস্তি দিয়েও লাভ নেই, পিটুনিকর বসিয়েও কোন সুরাহা হবে না। রোগের মূল ধরে চিকিৎসা করতে হবে। আমরা এ কথা যদি না কোনরূপ রণনৈতিক পন্থা গ্রহণ করা হউক। পাকিস্তানকে কোনরূপ আক্রমণ না করেও তার পুরাণ কৌশলকে, তার সাম্প্রদায়িক ঘৃণার পুরাণ অস্ত্রকে ভোঁতা করে দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে পাকিস্তানের বর্ত্তমান দুষ্ট শাসকগোষ্ঠী নিজের বিষেই নিজে জলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে; হয়নি শুধু আমাদেরই চালের ভুলে, আমাদের অতি উদারতার ফলে তাদের বিষাক্ত দাঁত আরও বিষাক্ত হয়েছে মাত্র। দেশ স্বাধীন হবার পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবার পরে, দেশের আপামর জনসাধারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও কেন বারে বারে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে? দোষ কোথায়? সেই দোষের মূল কারণকে দূরীভূত না করে দাবানলকে সৈন্য পুলিশের জল ঢেলে তো পাকাপাকি ভাবে নেভান যাবে না। কোন প্রকার প্রলেপেরও তো এ কাজ নয়। যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানির উৎস পাকিস্তানের বর্ত্তমান সরকারীতন্ত্রে এবং পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রতিক্রিয়া এখানেও এসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে সেখানে এক তরফা ভাবে শান্তির বাণী কোন কাজেই আসবে না। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় সেখানকার সরকারের সক্রিয়তার ফলে, আর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে। ভারত সরকার যদি সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎসমুখকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতেন তবে অবস্থা ভিন্নরূপ হ'ত এতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে খলের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করতে হয় সেইরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করা। উদার ভাষা, মানুষের ভাষা খলেরা বুঝতে পারে না। তারা তাকে দুর্ব্বলতা মনে করে আরও অধিকতর হিংস্রই হয়ে থাকে। আজ ভারতবর্ষের প্রয়োজন সেই ভাষায় কথা বলা—সেই কর্মপন্থা অনুসরণ করা যাতে করে পাকিস্তানের সকল কুমতলবই শুরুতে অঙ্কুর চালনার মত ব্যর্থ হয়ে যায়। যে হিন্দু সাম্প্রদায়কে পাকিস্তানি কুচক্রীরা হপ্তায় হপ্তায় তাদের অস্ত্রের বাক্স হিসাবে পুড়িয়ে মারছে, যে হিন্দুরা ভারতভূমি মন্থনে উত্থিত হলাহল পানে স্বীকৃত না হলে কি স্বাধীন হিন্দুস্থান কি স্বাধীন পাকিস্থান কারও জন্মই তৎকালে সম্ভব হ'ত না, যে হিন্দুদের এই আত্মত্যাগের কথা মনে করেই ভারতবর্ষের নেতাগণ তাদের আশ্রয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে হিন্দুদের কথা আজ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। প্রথমতঃ হুঠকারিতা বশতঃ যে দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সে দ্বার আজ মুক্ত করে দিতে হবে। যারা পূর্ব্ববঙ্গ থেকে তাদের প্রাণ মান বাঁচাবার জন্যে ভারতবর্ষে আসতে চান তাদের আসার এবং আশ্রয়ের ও বৃত্তি অনুসরণের সকল ব্যবস্থার ভার ভারত সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য ব্যতীত সকল প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদন করতে হবে, অসহযোগের পথ অবলম্বন করতে হবে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল পাকিস্তানী এজেন্ট আছে তাদের খুঁজে বের করে তাদের মূল উচ্ছেদ করতে হবে। তৃতীয়তঃ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলেও সমাজের যত প্রকারের উচ্চ নীচ ভেদবুদ্ধি আছে, বিদ্বেষ আছে, দুর্নীতি আছে, শোষণ আছে তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দর্শন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা গ্রহণ ও সেইভাবে সমাজ-

মনকে শিক্ষিত ক'রে তোলা। মুক্তির উপায় হিসাবে প্রজ্ঞাবাদের বিবেক দর্শনের ন্যায় ছোট-বড়তে ভেদ দর্শনের সনাতনী পথ পরিহার ক'রে কি ক'রে ছোট-বড়তে মিলে সমাজ হ'তে পারে সেইরূপ ব্যাখ্যা-পন্থা আজ গ্রহণ করার দিন এসেছে। মানের ক্ষেত্রে, standard এর ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে আর সমাজে মানুষে মানুষে মিলন হবে এ সম্ভবে না। আমাদের সামনে আজ সমস্যা গভীর ও অত্যন্ত বিস্তৃত। সমাধান যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, পৃথিবীটা যখন অচ্ছিদ্রম্ নয় তখন পথ কেটে বেরিয়ে যাবার পথ নিশ্চয় আছে। সেই পথকেই আজ আমাদের সকল ঐশ্বর্য, সকল কার্পণ্যদোষ হ'তে মুক্ত হয়ে গ্রহণ করতে হবে। একটি কথা আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে—রাগদ্বেষই সকল দোষের মূল দোষ। 'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।" যে পরিমাণে আমরা এই রাগদ্বেষমুক্ত হ'তে নিরপেক্ষ হ'তে পারব সেই পরিমাণে আমাদের জনজীবনে সফলতা, শান্তি সুখ সমৃদ্ধি আসবে। নইলে সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ আমাদের স্বপ্নের বিষয় হয়েই থাকবে।

উদারতা ও সারল্য

॥ শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সর্বত্রই আমরা দুইটি রূপ দেখিতেছি। এক হইতেছে মঙ্গল রূপ, এবং অন্যটি অমঙ্গল রূপ। ব্রহ্মার মানস হইতেই সৃষ্ট হইল পুরুষ-প্রকৃতি, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা। কিন্তু সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষই হইল শ্রেষ্ঠ। সেই মানুষ ইচ্ছা করিলে দেবত্বও লাভ করিতে পারে, আবার বিপরীত ইচ্ছা করিলে পশুত্বও হইতে পারে। এক কথায় তাহার অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আত্মিক উন্নতি বিধানে সে সক্ষম, আবার অসদ্‌বৃত্তির পরিচালনায় দ্বারা আপন আত্মিক অবনতি ঘটানোও খুবই সহজ। সৎগুণগুলি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে এবং অসৎগুণগুলি অশুভ কর্মের প্ররোচনা দান করে।

মানব চরিত্রে যে কয়টি সৎগুণ বর্ত্তমান, উদারতা ও সারল্য তাহাদের অন্যতম, তথা প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। বর্ত্তমান যুগ, যাহা যন্ত্র মানবের যুগ বলিয়া পরিচিত, আজিকের দিনেও এই গুণ দুইটির প্রয়োজনীয়তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যন্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল অংশের ন্যায় মানব অন্তরেরও জটিল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহার মনের বৃত্তিগুলি এখন আর সহজ পথে, সহজভাবে প্রকাশিত হয় না। যন্ত্রের মধ্যে যেমন একটি যান্ত্রিকতা রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ মানব অন্তরে আজ যান্ত্রিকতা নির্মমতার বীভৎস লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে। কুসুমের উপর তারাক্রান্ত লৌহপিণ্ড পতনের ন্যায়, আজ মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপরও এমন এক কঠিন নির্মমতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহা ভেদ করিয়া সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রকাশ ঘটিতেছে না। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সুকোমল মানবচিত্তের আজ মৃত্যু হইয়াছে যন্ত্রমানবের এক রূঢ় আঘাতে। সংস্কৃত কোমলতা, সৌকুমার্য হারাইয়া মানুষ আজ যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রিয়া করিতেছে যন্ত্রবৎ। সে যে অমৃতের পুত্র তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু আজও একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি যত উদার, যত সরল সেই ব্যক্তি তত সুখী ও সন্তুষ্ট। জীবনপথে চলা তাহার তত সহজ। মন যখন থাকে না সন্তুষ্ট, থাকে না সুখী, জীবনে তখনই আসে একটি বিতৃষ্ণা। এই বিতৃষ্ণা নানা রূপ পরিগ্রহ করে কিন্তু আত্মতৃপ্তি যাহাকে বলা হয় তাহা থাকিলে জীবন মধুময়, পৃথিবী অমৃতময় বলিয়া অনুভূতি জন্মে। সেইজন্য

চরিত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উদারতা ও সারল্য। উদারতাকে অনেকের 'দয়া' বলিয়া ভ্রম জন্মে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত মন এই দুই-এর সমন্বয়েই উদারতার প্রকাশ। পরন্তু দয়াকে উদারতার একটি অঙ্গ বলা যাইতে পারে। উদারতা ভিন্ন প্রকৃত দয়া আসিতে পারে না।

এই পৃথিবীতে যে সকল মহামানব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সরল ও উদার। প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়া সেই ঔদার্য, সারল্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই হেতুই তাঁহারা মানবের অন্তরে চিরস্মরণীয় ও পূজিত হইতে পারিয়াছেন। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব যদি না থাকে, তবে স্থূল দেহের অহঙ্কার কেন? মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য, ব্রহ্মচর্যহীন সন্ন্যাসীর সমতুল্য। মানুষকে যদি মানুষের চক্ষে না দেখি তবে দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা কোথায়? অন্তরে যদি না রহিল কারুণ্য ও সারল্য তবে তাহা কি পৌরুষিতং রূপ ধারণ করিল না? এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি লইয়া দৈনন্দিন জীবনে চলিতে হইবে যে, 'উদারতায় ও সারল্যের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাসঙ্কট কালেও আমার এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইব না।' উদারতা ও সারল্য মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, সমস্যার সমাধান করে এবং সৌকুমার্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন পরম উদার ও সরল। প্রতি কর্তব্য কর্মের মধ্য দিয়া তিনি ঔদার্য ও সারল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেইহেতু স্বর্ণরাজ্য, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা, মহামূল্যবান রাজপোষাক পরিত্যাগ করতঃ জটাবল্কল পরিধান পূর্বক পঞ্চবটীর পদ্মাচ্ছাদিত পর্ণকুটিরে তিনি অত্যন্ত সুখে শান্তিতে, সহজ সরলভাবে বাস করিয়াছিলেন। বনবাসের কোনপ্রকার ক্ষুদ্র কষ্টও তিনি উপলব্ধি করেন নাই। কেবলমাত্র রামচন্দ্র বলিলে ভুল হইবে, লক্ষ্মণ ও সীতার মধ্যেও ঔদার্য ও সারল্য অনুরূপ মাত্রায় বর্তমান ছিল। এই তিন মহান্ চরিত্রে এক অপূর্ব উদারতা ও সরলতা ছিল বলিয়া রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা হাসিমুখে গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের চরিত্রে এক অচিন্তানীয় উদারতা ছিল, যাহার ফলে কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দুর্বাক্য বলিলে তিনি "নোত্তরং প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ উত্তরদান করিতেন না। শুধু তাহাই নহে উদার স্বভাব হেতু তিনি "ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া" অর্থাৎ তিনি পরকৃত শত অপরাধের কথাও বিস্মৃত হন। এইপ্রকার উদারতা ও সরলতার নিমিত্তই তিনি প্রজার নিকট ছিলেন শ্রদ্ধাই, পূজাই ও প্রণম্য। এইরূপ যথার্থ উদারতা ও সারল্যই আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া উচিত।

নেতৃত্ব করিতে গেলেও উদারতা ও সরলতার বিশেষ প্রয়োজন। 'আমি নেতা, অতএব আমাকে তোমরা সম্মান কর'—এইরূপ আদেশ দিলেই সম্মান লাভ করা যায় না, পরন্তু ঔদার্য ও সারল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে সকল সভ্য তথা জনসাধারণ মোহমুগ্ধের ন্যায় সেই ব্যক্তির পদতলে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং তাঁহাকে নেতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন। তাহা হইলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, সংগঠনী শক্তির মূলে রহিয়াছে চরম আত্মত্যাগ, ঔদার্য ও সারল্য। জনসাধারণের ব্যথা, বেদনা ও বহুদিনের পুঞ্জীভূত হতাশ্বাসকে নিজের মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন পরম উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত অন্তর। তবেই জনসাধারণের সেই দুঃখ দূর করার প্রবৃত্তি আসিবে এবং তাগিদ আসিবে অন্তর হইতে। যিনি সেই দুঃখ দূর করার জন্য যথার্থ প্রয়াসী, তিনিই যথার্থ নেতা। এই উদারতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আসিয়া পড়ে 'সরলতা' কারণ সরলতা ভিন্ন সকল শ্রেণীর মানুষের সহিত মিলন ও আলাপ সম্ভবপর নহে। সরল না হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত মেলামেশা করিতে একটি স্বাভাবিক দ্বিধা, সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে না। তবে সরলতা বলিতে কেবলমাত্র পোষাক-পরিচ্ছদের বা প্রসাধনের সরলতাই বলিতেছি না,—সর্ববিষয়ে যেমন, চালচলন, আচার

ব্যবহার, কথাবার্তা প্রভৃতিতে একটি স্বাভাবিক সরলতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা না হইলে উদার হওয়া যাইবে না এবং মানব অন্তরও জয় করা যাইবে না। ধন ও গণশক্তি লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে প্রধান মূলধন ঔদার্য ও সারল্য। নেতা যদি স্বার্থপর, পক্ষপাতদুষ্ট এবং আত্মকেন্দ্রিক হন, তবে দলের মধ্যে অসন্তোষের আগুন গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং নেতার প্রতি জনসাধারণ আস্থা হারান। ফলে দল বিভক্ত হয় উপদলে—গণশক্তির ঐক্য থাকে না, সংগঠনীশক্তির অপমৃত্যু ঘটে এবং সমস্যারও সমাধান হয় না। পরম কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগঠক সুভাষচন্দ্রের জীবন দেখিয়া বুঝিতে পারিব সংগঠনী শক্তির মধ্যেও উদারতা ও সারল্য কত আবশ্যক। তাঁহারা ছিলেন ভারতবাসীর প্রকৃত দরদী—ভারতবাসীর দুঃখ, আঘাত ও বঞ্চিত হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, করিয়াছিলেন প্রাণ দিয়া অনুভব। তাঁহারা দুইজনে দুই ভিন্নপথে ভারতবাসীর মঙ্গলের সন্ধানে, মুক্তির সন্ধানে, সুখের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এই দারুণ দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানে। এ হেন উদারতার পরিমাপ নাই—ইহা অপরিমেয়।

দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনেও উদারতা ও সারল্যের আবশ্যকতা রহিয়াছে যথেষ্ট। যেখানে বিভিন্ন রুচির, ভিন্ন পন্থীর, ভিন্ন মতবাদের, ভিন্ন ভাবধারার লোকের সহিত একত্রে বাস করিতে হইবে, সেখানে উদার না হইলে, উদারদৃষ্টিভঙ্গী লইয়া না চলিলে শান্তিভঙ্গের প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমনকি অশান্তির অগ্নিও তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইতে পারে। এই বিষয়টির প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ভূরীভূরী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিতে চাই, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিবার প্রধান কারণ উদারতা ও সরলতার অভাব, আধিক্য কারণ নহে। শান্তি ও শৃঙ্খলা কামনা করিলে পরিবারের প্রত্যেককে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সারল্য লইয়া চলিতে হইবে। নতুবা 'শান্তি' 'শান্তি' করিলে শান্তি আসিয়া ধরা দিবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মানসিক সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্য এবং শাশ্বত সুখলাভ করা যাইবে তখনই, যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃত সরল ও উদার হইবে। কুসুমপূর্ণ বৃক্ষের পত্রসকল যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে তখন তাহাতে কুসুমের বিন্দুমাত্র সৌন্দর্য থাকে না। সকলপ্রকার সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির অপমৃত্যু ঘটে মানবের মধ্যে মানবের অস্তিত্ব থাকে না। উদারতা ও সারল্য দুই প্রধান সুকুমারবৃত্তি—মানব অন্তরে ইহার অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং একান্ত কাম্য।

"কৃপাও জীবনে সৃষ্টি হয়। ওতো ছাদ থেকে টপকে পড়ে না। বর্তমান জীবনের চলার পথ দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে—তখনই কৃপার প্রকাশ সম্ভব। অহংতা দিয়ে বহির্জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রেখে বাঁচা অসম্ভব। গান্ধীজীও আজ বাঁচতে পারছেন বিশ্বরূপের সঙ্গে যোগ রেখেছেন বলে।"

—শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

নওজোয়ানের প্রতি

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

নওজোয়ান ! নওজোয়ান !
বিশ্বের দ্বারে নিঃস্ব ভারত
মাগিছে ভিক্ষা চাহিছে দান
আজিকে তোরাই এ-দেশের আশা
তোরাই রাখিবি দেশের মান।

অন্ন নাই,—বস্ত্র নাই
শৌর্য নাই, বীর্য নাই
একাকী নিভৃতে সাধনা করিতে
ধৈর্য নাই ভক্তি নাই,—
হাতে হাত দিয়া মিতালি করিতে
মিলায়ে মিলিতে শক্তি নাই
ঐ স্বার্থ দেখি দুখিনী জননী
কাঁদিছে তোদের পানেতে চাই।

আজি ধিক্‌কৃত সোনার বাংলা
বিকৃত তাহার কীর্তি কথা
যে যার ইচ্ছা বলে আর করে
স্বেচ্ছাচারের প্রতিকূলতা।

হিন্দী ও চীনী বলি ভাই ভাই
লালচীনে মোরা কাল চিনি নাই
(তাই) পীত বর্বর গর্ব করিছে
ছাগের অঙ্গে বাঘের ত্রাণ
মাটির ভিতরে মুখ গুঁজিয়া কি
উটপাখী পাবে পরিত্রাণ ?

নওজোয়ান ! নওজোয়ান !
আজি কি শোণিত হয়েছে শীতল
শীতল অগ্নি বিষবান ?

বঙ্গবাসী কি সন্ন্যাসী হয়ে
ভস্মাসনের ভুলেছে মান ?

(না না) বাংলা যুঝিছে আজিও ঝলিছে
শঙ্খ তাহার সাংবাদিক
শত শত প্রাণ দিল সন্তান
দেশের সমরে সে নির্ভীক।
কারেও কভু সে করেনি আঘাত
ঘৃণ্য বন্য বর্বরতা—
করে নি বলে কি দেশেরে বাঁচাতে
করিবে না কর্তব্য যথা ?

পুরাণেও তাই, ইতিহাসে তাই,
নরপশুদের হয় নিধন,—
বীর কভু সহে নির্দয় মদে
দুর্বলদের হৃদ্‌দলন ?
মিথ্যা জীবনে কি হবে ভাই
(যদি) বাঁচার মত না বাঁচিতে পাই—
আততায়ীদল আসিলে প্রবল
হত্যা করিতে ভাবিতে নাই।

নওজোয়ান ! নওজোয়ান !
মূর্চ্ছাহতের আশাও প্রাণ
নির্যাতনের যাতনা হইতে
জননীরে কর পরিত্রাণ।
পাঁকে পড়া হাতী ব্যাঙে মারে লাথি
তাহারে বধিয়া কর বিধান
দলিত পীড়িত আর্ত জননী
ডাকিছে কোথায় নওজোয়ান।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৬)

তুমি কায়া, আমি ছায়া, তুমি বিম্ব, আমি প্রতিবিম্ব। তুমি আমি অন্যোন্য এক অদ্বৈত। ব্যবধান আর আমার সহ্য হয় না। আমাকে আত্মসাৎ কর—কর্মে জ্ঞানে প্রেমে স্বরূপে বিশ্বরূপে। প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে আসিতে প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (গুরুভ্রাতা) ঠাকুরের কাছে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য শিখাইয়া দিলেন, যাহার উত্তর পাইলে বুঝা যাইবে ঠাকুর কি বস্তু। 'আমরা কাহার অনুগা হইয়া চিন্তা করিব?' যাহার অনুগা হইয়া ভাবিতে বলিলেন, ঠাকুর তাহাই। ফলটী ফিরিলাম। ঠাকুর তখন সেখানে। প্রশ্ন বলিবার জন্য দেখা করিতে চাহিলাম, ঠাকুর টালবাহানা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'শরৎ, তুমি কি জাননা ভগবান আন্তর্যামীরূপে তোমার যখন যাহা দরকার বুঝাইয়া দিতেছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, তাহা বুঝি'। ঠাকুর বলিলেন, 'তবে আর কি, যাও'। তবুও এক দিন পীড়াপীড়ি করার পর খুব জোরে যেন তন্দ্রার ভিতর দেখিতেছি—'আমি কোথায়ও শুইয়া আছি একটা মশারির মধ্যে। ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণরূপে আসিয়া বলিলেন, 'ওঠ, আমায় ভাখ'। আমি বলিলাম, 'আমি যে শাক্ত'। ঠাকুর বলিলেন, 'শক্তি তো আমারই শক্তি। শক্তি কি আমা হইতে স্বতন্ত্র? ওঠ, ভাখ।' আমি বলিলাম, 'তবে আমাকে যুগলরূপে দেখা দেও'। ঠাকুর আমাকেই রাধা-রূপে বামে দাঁড় করাইয়া আমাকে দেখা দিলেন।' তন্দ্রা কাটিয়া গেল। ইহা ঠাকুরকে সেইদিনই বলি। ঠাকুর বলিলেন, 'যখন তখন যার তার কাছে বলো না'। ঠাকুর এই দর্শনকে অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি যে আমার কে, আমি যে তাঁহার কি—সেই দিনই কি দেখান নাই?

৭টার পর আফিসে যাই।...বেণু পোস্টাফিস হইতে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান-এ বিলটি দস্তখত করিয়া দিয়া আসে। ঢাকেশ্বরী বাসন্তীতে যায়।...ম্লানিম্যান হইয়া ফেরে।...এক বৃদ্ধ অধ্যাপক আসেন। উজ্জ্বলভারত পড়িয়াছেন, ভাল লাগিয়াছে। প্রজ্ঞাবাদ ও প্রাণবাদ কি প্রশ্ন করেন। আলোচনা হয়। Eucken-এর Intellectualism সম্বন্ধে লেখা পড়িয়া শোনায় রেণু। ৯টার পর ফিরি।...

২১শে জুলাই

ওগো নাবিক, পার করাই তোমার ব্রত। অকূল এই সংসার পারাবারে কত জটিল কুটিল ঘটনার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। তুমি তো সেই স্রোতে হারাইয়া যাইতে দেও নাই। আজিও তোমার শ্রীচরণে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। ধন্য তুমি। ১৯১৯-এ যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, কূল তো দিয়াছিলে কোলে করিয়া। পার তুমি তোমার ধামাইকে করিয়াছিলে এই গঙ্গা পার করিয়া। আমাকে পার করিতেছ মনস্তত্ত্বের এই জটিল কুটিল সমস্যার মধ্যে। আমার মনে তোমার জয় হউক, প্রাণে জয় হউক, দেহে জয় হউক। স্বপ্নলোকের মত এই জাগ্রৎ বিশ্বে তোমার 'পার করিবার' ব্রত সফল হউক। ধামাইকে পার করিয়াছ যাদুমায়া, আমাকে অহরহ পার করিতেছ তোমার যোগ-মায়া শক্তিদ্বারা।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। ধর্মদাসকে কেমন করিয়া নৌকায় গঙ্গা পার করেন, পরে রাত্রিশেষে আশ্রমে আসিলে ধর্মদাসের কাছে জানালায় হাত বাড়াইয়া পায়ের কড়ি চান ইত্যাদি বেশ লাগিল। পারই তো তিনি করেন, তাই পারের কাণ্ডারী নিত্যগোপাল, জটিল

দুটিন এই সংসারকে তোমারই হাতে গড়া বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। পার তুমি করিতেছ, করিও। তুমি অচ্যুত, অচ্যুত তোমার এই পার করা ব্রত।…

২২শে জুলাই

ঠাকুর, তুমি কাল ও পুরুষের সমন্বয়মূর্তি পুরুষোত্তম। তোমার অবতরণেও কি অকাল মৃত্যু দূর হইবে না, বিশ্বের বুকে কাল মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত হইবে না? পুরুষ এতদিন কালকে অস্বীকার করিয়াছে কালাতীত হইবার নেশায়, তাই কালকে সে অপমানিত করিয়াছে। কাল তাই আজ বিকৃত। তাই তো শিশুমৃত্যু, পিতার চোখের সামনে পুত্রের মৃত্যু ইত্যাদি অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইতেছে। তোমার আগমনেও কি এই ধারা চলিতে থাকিবে? তুমিই তো বিকৃত কালকে প্রকৃত কালে গড়িয়া তুলিবার জন্য পুরুষোত্তম মূর্ত্তিতে কালে কালে প্রকটিত হও। কালের এই ব্যভিচার তোমার অব্যভিচার ভক্তিযোগে কবে দূর হইবে? প্রকৃতি শান্ত হউক। সকালে আফিসে যাই মাখনের চিঠি লইয়া। কুসুমের ঠিকানায় এক পোস্টকার্ড দেই শুক্রবারই চলিয়া আসিবার জন্য। ঠাকুরের জীবন পাঠ হয়।…হিংসার পথে কোনও দিনই ধীরে ধীরে armed revolution সম্ভব হয় না। এ দেশে জনসাধারণকে মন্থন করিয়া সঙ্ঘ গড়িবার মত নেতা কই? হিংসায় প্রসার যত বেশী হয়, ততই উহা এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের dilution-এর মত ক্ষীণ হইতে থাকে! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ potency বাড়াইলে শক্তি বাড়ে। রাশিয়ার হিংসার সাধনা রাশিয়াতে জমিয়া উঠিয়াছে, চীনে তাহা হইতে ক্ষীণতর, ভারতবর্ষে হইবে ক্ষীণতম। জনসাধারণ ও নেতাগণ যেরূপ দুর্নীতির কবলে কবলিত, এখানে কে তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে? পচা গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করা সহজ নয়। জাতির মাস্তুগুলি যে পচা গোবরের মত হইয়া গিয়াছে। এক মাত্র ভরসার স্থল শ্রীনিতাগোপাল, যিনি পরমহংসদেবের আশার পচা গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতে আসিয়াছিলেন। ১টার সময় আশ্রমে ফিরি। প্রস্রাবের অবস্থা একরূপই।

২৩শে জুলাই

ঠাকুর, তোমার জীবনের পরশ পাইয়া যে স্নেহ মায়া মমতা উথলিয়া উঠিয়াছে, উহা যেন তোমার সেবায় লাগে, উহাদ্বারা যেন আমার বিচ্ছিন্ন-আমি সংসারের জনদের পিছন পিছন না ছুটি, তোমার শ্রীচরণতলে লাগিয়া থাকিয়া বিশ্বের উর্দ্ধে থাকিয়া উহা দ্বারা যেন বিশ্বের নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া তোমার সমীপে আনিবার প্রয়োজনে লাগাইতে পারি। তোমার শ্রীচরণস্পর্শে যাহা আসিয়াছে, তাহা তোমারই সেবার জন্য, তোমার বিশ্বের সেবার জন্য। উহা আমার বিচ্ছিন্ন-আমির সম্পদ নয়। এত দয়া, এত মায়া, এত মমতা কি তোমার স্পর্শের পূর্বে কেহ পায়? অসম্ভব। ভোর ৫-৫০ এ রেণুর ওখানে যাই, তাহাকে বাহির হইতে মনে করিতে। গোলমাল হইতে পারে এই আশঙ্কায়। আজ general strike ঘোষণা করা হইয়াছিল। তখন বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। রেণু ইহার আগেই ধীরেন ডাক্তারের ওখানে চলিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া আসি। ট্রাম বাস চলিতেছিল। ৮টার পর যাই, তখন রেণু আসিয়াছে। ধীরেনের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। ১১টার পর ফিরি। 'আমি'র দুইটি কেন্দ্র থাকে—একটী ভগবান-মুখী, অপরটি সংসারমুখী। দুইটিকে একই কেন্দ্রে গড়িতে হইবে। সংসারমুখী কেন্দ্রকে ভগবানমুখী কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে—ভগবানের আলোকে পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে হইবে। সংসারের 'রস' পর রসের মধ্যেই সার্থক ও সফল হইতে পারে।—র জীবনে এই বিভ্রাট চলিতেছে। তাহার সংসার তাহার 'ব্যবহারিক' পর্যন্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা সে পারিতেছে না। …অথচ—এই অবস্থাতেও বিপ্লব করিতে পারিতেছে না। তাহার তো রাধারাণীর মত পথে বাহির হইবার জন্য সাহস থাকা উচিত ছিল। পথে দাঁড়াইলে ঠাকুর পথ দিতেন। কিন্তু ইহা তো উপদেশ দিবার বিষয় নয়। ২০টাকা চাহিয়াছে। অথচ সে নিজে সুস্থ হইল না এত দিন বসিয়াও। তাহার সময়ের বা দেহের কোন মূল্যই তাহার কাছে নাই। নিজে সুস্থ থাকিলেও তো পথ হইতে পারিত। কাল রেণু গিয়া ২০টাকা দিয়া আসিবে। কমলা আসে ২টার পর এখানে দুই লইয়া। রেণুর ওখানে

পাঠাইয়া দেই।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। বিরজা আসে। ৭টায় যায়। কুসুমের এক চিঠি আসিয়াছে... শনিবার ভোর ৭-৩০টায় পৌঁছিবে...।

২৪শে জুলাই

শ্রীরাধারাণী, আমার পরাণপুতলী, বিশ্বের সারভূতা, আমার সকল অঙ্গের নিংড়ানো রসঘনমূরতি তুমি, তুমিই আমার সত্যকার আমি, তুমি বিশ্বের চরম সফলতা, organic nature। তোমার 'আমি'-র মাঝে আমার 'আমি' গলাইয়া দিয়াই আমি 'পুরুষোত্তমোঽহমস্মি' হইব।...রেণু এখানে আসে ৭।০ টায়।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। আমার প্রবন্ধ (ভাদ্র মাসের) 'সহজ মানুষ'ও পাঠ হয়।...কেমন করিয়া সে জীবনে তাহার static nature ও বর্ত্তমানের বিরাট পরিবর্ত্তনকে সমন্বিত করিবে তাহার কোন জিজ্ঞাসাই তাহার নাই। বেশ গোঁজামিল দিয়া সে চলিয়াছে। রেণু বলে, যে সংসার পুরুষোত্তমমুখী হইবে না, সে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যবহারিক ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। যদি কোন দিন পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া ওঠে, তবেই সেদিন সকল দেহপ্রাণমন দিয়া ইহার সঙ্গে যোগদান করা চলে। সত্যই বর্ত্তমান সংসারের সঙ্গে এই-ই সম্বন্ধ। কি বলিব, কি করিব সংসারের মানুষ লইয়া, ঘটনা লইয়া। ঠাকুর, তোমার জন দাও, যাহাদের সঙ্গে আমার সবল দিয়া একাত্ম হইয়া মিলিতে মিশিতে পারি, সব দিতে পারি, সব নিতে পারি। দিতেও কিছু পারি না, নিতেও কিছু পারি না, সংসার নিয়া কি বিপদেই না পড়িয়াছি। কাল ভোর ৬-৪০-এ সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে গোপা-কুসুমের আসার কথা।...

২৫শে জুলাই

ওগো মহানির্বাণমূরতি নিত্যগোপাল, তোমার দেহে আমার দেহ মিলিয়া যাক, তোমার মহাপ্রাণে আমার প্রাণ নির্বাপিত হোক, তোমার মনে আমার মন গলিয়া যাক। আমি তোমার মাঝে তুমিময় হইয়া যাইব, বিচ্ছিন্ন 'আমি'র খেলা আর সহ্য হয় না। তুমিই রবে, আমি রব না। তুমিই থাক, আমি নিভিয়া যাই। আমার সকল ছাপাইয়া তোমার বিশ্বরূপ ও বিশ্বনাথ আত্মপ্রকাশ করুক।...কুসুম ও মাখন সহ গোপা আসে।.. কুসুম, আর যে আমি তোমাদিগকে দূরে রাখিতে পারি না। আমার ঠাকুর কি তোমরা থাকিতে ডুবিয়া যাইবেন? তিনি যদি ডুবিয়া যান, আমাদের কি কোনও অস্তিত্ব থাকিবে? যতদূর শীঘ্র পার আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াও। এখনও কিছু সময় আছে। সময় তো খুব বেশী নাই। যাহা লইয়া একদিন পথে বাহির হইয়াছিলে, তাহা তো পাও নাই; পাইবার সুযোগ তো সামনে।...

২৬শে জুলাই

তুমি আমার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। সংসারের সকল জটিল সমস্যা আমার জীবনে একে একে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এইবারকার সমস্যার কি সহজ সমাধান লইয়া তুমি প্রকাশিত হইবে না? ৭টার মধ্যেই আশ্রমে যাই।...ভাদ্র ও আশ্বিনের উজ্জ্বলজাগরণ যে কেমন করিয়া বাহির হইবে, ভাবিয়া কূল পাই না ঠাকুর, তুমি জান। 'ভয় কি? টেনে তুলব' বাণীই আমার জীবনের সম্বল।

২৭শে জুলাই

ঠাকুর, আমার জীবনের সকল সমস্যার এক অংশ তুমি, অপর অংশ আমি। সমাধানেও তুমি আমি এক অদ্বৈত। তুমি আমি এক-তনু, একপ্রাণ হইয়া আমার জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছ। তুমি আমার নিত্য সঙ্গী সকল সমস্যার সকল সমাধান। কয়েক দিন হইতে যে ও প্রতিভা চরকার সূতা কাটে।... ঘুরে ঘুরে থাকিয়া রাখিয়া কিছুতেই সার্থকতা মিলিবে না।... আমি যে প্রাণ লইয়া ইহাদিগকে চাই সে প্রাণের খবর কি যে রাখে?...যুগের যত গ্লানি আছে, তাহার সকলই যুগ মানবের জীবনে সংক্রমিত হয় এবং সেখান হইতে উহ সমাধানও হয়। যুগ-মানব একাধারে সেই যুগের সকল সম ও সমাধানের মূর্ত্তি। এই পথেই তো আমরা চলিয়াছি সার্থক আমাদের হইতেই হইবে। ৯টায় আসি।...

২৮শে জুলা

শ্রীরাধা, আমার পঞ্চাশ পুরুষী, জীবনের আধিনায় তুমি বিহারিণী বেশে অযাচিতভাবে। আমি তোমাকে ডাকি নাই, খুঁজি নাই। তুমি আসিয়াছ, আজও জীবনের মধ্যে বাস করিয়া আছ। আমার প্রতি কর্মে, প্রতি স্পন্দনে বুঝিতে পাও, আস্বাদন করিতে পাও যে তুমি আমার জীবনের সার সর্ব্বস্ব ধন, আমারই সত্তা স্বরূপ। আমি তুমি হইয়া যাইব। তুমিই আমার পরিপূর্ণ সফলতা। ৯০টার মধ্যেই আফিসে যাই। ধীরেন চৌধুরী আসে :... আসিয়া দেখি মালদহের সতীশচাঁদ আগরওয়ালা অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছে। সে 'জীবন-পরীক্ষা' নামক বই পড়িতেছিল। আমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। সে 'উদ্বোধনের' গ্রাহক হইল। এখানেই প্রসাদ পায়। ৩টা পর্যন্ত এখানে ঘুমায়। ১২ বৎসর পর দেখা। বেশ ভাল লাগিল। যাহাকে এক দিনও আপনার মনে করিয়াছি, তাহাকে তো কোনও দিন জীবনের বাহিরে সরাইয়া দেই নাই। একথা কাহাকে বুঝাইব? বুঝমকে বলি—কর্ম্মী, জ্ঞানী, অবধূত, প্রেমিক কাহারও জাতি, কুল, শীল, শুচি-অশুচি লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর কোথায়? যাহারা বসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের জীবনের অগ্রগতি থামিয়া গিয়াছে, তাহারাই দ্বন্দ্বমোহে আচ্ছন্ন। প্রথমবার বৃন্দাবনে যখন মাধুকরী করিতাম, একদিন এক খোপা বাড়ীতে মাধুকরী করিতে যাই। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা খোপা,' এখানের কোনও বাবাজী আমাদের বাড়ীতে মাধুকরী করিতে আসেন না। আপনি নিবেন'? আমি বলিলাম, "শ্রীধাম বৃন্দাবনে সকলেই কৃষ্ণের জন। আমি এখানে জাতি কুলের বিচার করিতে আসি নাই। আমায় মাধুকরী দিন"। তাঁহারা দিলেন। আনন্দ পাইলাম। বৈকালে দেখি যে বহু খোপা আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য 'সোনার গৌরাঙ্গ'র সামনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন সেখানে থাকিতাম। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের আদর সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছেন। আমি তাহাদের আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম ও কাঁদিতে লাগিলাম। আমিও তৃপ্ত হইলাম, তাহারাও তৃপ্ত হইল। কিসের জাতি? বিশ্বে সব জাতি এক পুরুষোত্তম জাতি।...

২৯শে জুলাই

... সমগ্র অখণ্ড সত্তার জীবের 'আমি' এক দিক, অপর দিক হইতেছে ঈশ্বরের 'আমি'। এই দুই আমির অন্যোন্যরমণের ফলে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বর যেন 'আমি'র নিষ্কাম অংশ, জীব যেন 'আমি'র সকাম, বাসনাময় অংশ। যখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, তখন জীবের 'আমি'র কোনও স্থানই থাকে না। কিন্তু জীবের 'আমি'ও তো নিত্য। এই জীবের 'আমি'র মর্য্যাদা দিবার জন্যই ব্রহ্ম হন পরমাত্মা ও ভগবান। ঈশ্বর অনশ্নন্ নিষ্কাম, জীব অশ্নন্ সকাম। জীবের কামনা না থাকিলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিবেন? তাই ব্রহ্মজ্ঞানে সৃষ্টি থাকে না, তাই সৃষ্টির কোন সার্থকতা সেখানে নাই। জীবের কামনাকে ব্রহ্মময়ী সার্ব্বজনীন করিবার জন্য ঈশ্বরের নিষ্কাম মুক্তির প্রয়োজন। জীব একান্ত নিষ্কাম হইলে লীলা সম্ভব হয় না। ঈশ্বরও একান্ত নিষ্কাম থাকেন না। জীব ও ঈশ্বর দুই-ই অন্যোন্য রমণের ভিতর দিয়া বিবর্ত্তিত হন। জীব যতখানি শরণাগত ততখানিই তাহার কামনা ও ঈশ্বরের নিষ্কামনা অন্যোন্য মননের ভিতর দিয়া পরস্পরকে গড়িয়া তুলিতেছে—যেমন স্বামীর বীর্য্য ও স্ত্রীর রেতঃ। সকালে আফিসে আমি ও প্রতিভা যাই, ফিরি ১১টার পর। ২।০টায় আবার যাই।...

৩০শে জুলাই

কোন-কিছু একান্ত হইলেই সৃষ্টি থাকে না—একান্ত জ্ঞান, একান্ত ভক্তি বা একান্ত বিশ্বাস-নির্ভরতারও সৃষ্টি থাকে না। সবই যদি তিনি করেন, জীবের যদি করিবার বা কামনা করিবার না থাকে, সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার সূত্র হইবে কি করিয়া, কোথায়? প্রয়োজনই যে জীবগত। নাম-রূপই তো জীবের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের ক্ষেত্র তো অনাম-অরূপ। ঈশ্বরের নাম-রূপ তো জীবের দেওয়া। জীবের কামনার যথার্থতা ও সার্থকতা দিবার জন্যই তাঁহার অনাম-অরূপের স্পর্শ দিয়া নামরূপ আশ্রয়ে সৃষ্টি গড়িয়া তোলেন। জীব-ঈশ্বর পরস্পর নির্ভরশীল সত্তা। দুইয়ের সমীকরণ হয় পুরুষোত্তম-বস্তুতে। জীব নির্ভর করে

ঈশ্বরের উপর শরণাগতের মত, আর ঈশ্বরও নির্ভর করেন জীবের উপর অনাম অরূপকে রূপ দিবার উপযোগী তত্ত্ব থাকার জন্য। ঈশ্বর স্বামী, জীব তাঁহার স্ত্রী। ঠাকুর তোমার আমার মিলন নির্বিকল্প হউক। তুমি হও বাস্তব বস্তু, আমিও হই বাস্তব বস্তু। বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের হউক বাস্তব মিলন। সব অবাস্তব কল্পনা দূরীভূত হউক। স্বরূপে স্বরূপে হউক সত্তা দেখা। তোমার আমার অন্যোন্যরমণে এক নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। ৩।০টার পর আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।...১১টার পর আসি। বেণু ফকিরবাবুর ওখানে, ডালহৌসীতে যায়। হীরেন ঘোষ (সরকারের প্রচার বিভাগের) আসে। তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগ আমাদের দর্শনের উপযোগী—তাহা অনেকটা ও খুব জোরের সঙ্গে বলি। সেও তৃপ্ত হয়।...সে আমার বরিশাল কনফারেন্সের বক্তৃতা শুনিয়াছে।...

৩১শে জুলাই

ঠাকুর, তোমার নাম আমার হউক, তোমার রূপ আমার হউক, তোমার বিশ্ব আমার হউক। আমার নামরূপ-বিশ্ব তোমার নামরূপ-বিশ্বের মাঝে মহানির্বাণ লাভ করুক, চরম ও পরম সার্থকতায় গড়িয়া উঠুক। তোমার দেহ ও আমার দেহ এক অদ্বৈত, তোমার প্রাণ ও আমার প্রাণ এক অদ্বৈত, তোমার মন ও আমার মন এক অদ্বৈত হউক। তুমি আমার, আমি তোমার; তুমিই আমি, আমিই তুমি। ওগো আমার আমি, ওগো আমার আমি! তোমার 'আমি' নামই আমার মধুর হইতেও মধুর। আমিতে আমিতে এক নির্বিকল্প অদ্বৈত আস্বাদন। ৩।০টার পর আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।.....বেণু বাজারে যায়...৯।০টার পর ডালহৌসী যায়।...প্রাণটা আমার উতলা হইয়া পড়ে।...এই প্রাণকে লইয়া আমি আজ বিপন্ন। ওগো প্রাণনাথ, তুমি আমার প্রাণ তোমার প্রাণের সঙ্গে একীভূত করিয়া লও। কংগ্রেসের কাজ করিয়াছি, তখনও প্রাণ ঢালিয়া, এদিক ওদিক না চাহিয়া, পাগলের মত হইয়া কাজ করিয়াছি। এই প্রাণ লইয়া আমি কি উপায় করিব?...বেণু অবিচলিত মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। আনন্দ হয়। বিশ্বের কাজ, বিশ্বেশ্বরের কাজ করুক, ধন্য হউক।

১লা আগ

ঠাকুর,...জাগ্রতের বুকে দেহে প্রাণে মনে বিজনে আনন্দে আমি ধন্য হইব, তোমার সঙ্গে এক অদ্বৈত হইব। এই স্তরে দাঁড়াইয়া আমার জীবনের ও বি জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিব এবং তাঁহার ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া তুলিব। তুমি আমার স্বামী, আ তোমার প্রকৃতি। তোমার জীবন আমি ধারণ করি পোষণ করিব আমারই গর্ভে। আমি বিশ্বধাত্রী হইব ৭টার পর আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।...বে এস্, এন্, রায়ের ওখানে যায়।...মহানির্বাণ মঠের ঠিকান আমার নামে একটি এনভেলাপ (confidential বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেন। চিঠিটা ভাল। উহার ম অরবিন্দের সঙ্গে বারীনবাবুর তফাৎ তোমার, তাহা বু যায়। মনে হইতেছে আমাদের সঙ্গে অরবিন্দের স্থানে পার্থক্য, বারীনবাবুরও সেইখানে। আম Supramental-কে মনের মধ্যেই নিহিত দেখিতেছি পক্ষান্তরে অরবিন্দ চান মনের স্তরের উপরে। ইহা প্রকারান্তরে মায়াবাদই আসিয়া পড়ে। অরবিন্দের দ্ব মায়াবাদের একটু অগ্রগামী সংস্করণ ছাড়া বেশী কিছু না ইহাদ্বারা 'ভাল-মন্দে'র এই জগৎ থাকে না।...

২রা আ

ঠাকুর, নারী প্রকৃতি অদ্বৈতানুভূতির ভিতর দি যেমন নিজগর্ভে স্বামীকে অন্তরে ধারণ করে, পোষণ ক বাহিরে প্রকাশ করে, আমিও তোমার সঙ্গে অদ্বৈতরূ বিভোর থাকিয়া তোমাকে ধারণ করিব, পোষণ করি বাহিরের দুনিয়ায় প্রকট করিব—ইহাই ছিল আমার সা জীবনের কামনা। তাহা কি পূরণ হইবে? দিন যায়। আমি যে আর বিচ্ছেদ বেদনা সহিতে পারি ন আমি যে নিত্যবিষাদযোগে যুক্ত। তোমাকে নি জীবনে পাইয়া কি প্রাণ খুলিয়া একবার হাসিতেও পা না? এস ঠাকুর, আমার জীবনে।...বেণুর অব

খাটুনি পড়িতেছে। জীবনে যত সময় যত crisis আসিয়াছে, তাহা যখন চরমে উঠিয়াছে, তখনই তাহা মোড় ফিরিয়া একটা 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ঝড়ের ভিতর দিয়াই না চলিয়াছি। ঝড়ের ঠাকুর পথ বাহিয়া আগাইয়া নিয়া আসিয়াছেন। কোথায় উড়িয়া যাইতে পারিতাম ঝড়ের তাণ্ডবে। রাখিয়াছেন তো আজিও তাঁহার শ্রীচরণতলে।...আমরা তিনটী প্রাণী রহিয়াছি তোমার প্রতিষ্ঠানে আগলাইয়া। কোনও একজনই তো স্বাভাবিক তোমার পথে আগাইয়া যেন নাই। আসিয়াছে গিয়াছে প্রচুর লোক। তুমি আছ constant। বড় একা, বড় অসহায় বোধ হয়। এস তুমি সঙ্ঘ রূপে।...সকালে আমার অনুপস্থিতিকালীন মনোরঞ্জন গুপ্ত উদ্বোধনের ৬৲ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

...৩রা আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার জীবনের ভাষায় আমার ব্যাখ্যান হউক, আমার ব্যাখ্যান তুমি, তোমার ব্যাখ্যান আমি। সকল সাত্ত্বিক রাজস তামস ঘটনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তোমারই ইঙ্গিত। সব ঘটনাই পুরুষোত্তমকে ইসারায় ধরাইয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীরাধা তাই নৈর্গুণী। যিনি যাবতীয় ঘটনার মধ্যে তোমার ইঙ্গিত দেখিতেছেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। আর 'ঈশ্বরে তদধীনেষু ...প্রেম মৈত্রীকৃপোপেক্ষা য করোতি স মধ্যমঃ'। ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূর্খে করুণা, শত্রুতে উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম। তুমি আমাকে উত্তম ভাগবতে গড়িয়া তোল। তোমার সুস্পষ্ট প্রকাশ যেন বিশ্বের সব কিছুতে দেখিতে পাই।... আমার ঝড়ের জীবন, ঝড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছি, কবে যে ইহার শেষ হইবে, শেষ হইবেই কি না, ঠাকুর জানেন।

...৪ঠা আগষ্ট

ভগবান তো কোনও মানুষের বিশেষ কামনাকে পদদলিত করেন না, যতদূর পারেন বরং পূরণ করেন এবং মোড় ফিরাইয়া তাঁহার পথে নিয়া চলেন। নিত্য-গোপাল 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র মনীন্দ্রকে বাঁচাও' বলিয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জীবের সব কামনা সার্থক করিবার জন্যই তো তাঁহার অবতরণের গূঢ় প্রয়োজন। ভগবতীত ঠাকুরের কাছে জীবের কামনার কোনও মূল্য নাই। সংসারে যখন আগুন জ্বলিতে থাকে, তখন বহু জন তপ সত্যলোকে সাধকগণ চলিয়া যান। ভগবান আজ জগতের বুকে আসিয়াছেন। তাই আজ ভক্তকে এই জলন্ত আগুনের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। কঠিন সাধনা। এই অগ্নি-পরীক্ষায় আজ ভক্তকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। ১টায় পূর্ব ফিরি। ৩টার পর অয়াদের বাসায় যাই। ঠাকুর, তোমার জগতের বড় আসে অন্তর্নিহিত বড়-অতীত সত্তার সঙ্গে পরিচিত করাইবার জন্যই। আমরা তো ঝড়ের এপার অতীত কোনও বড়-অতীত সত্তা মানি না। অরবিন্দ বলেন, মনের অতীতে অতি-মানস, আমরা বলি, মনের মধ্যেই অতি মানস গূঢ় রহিয়াছে; মনের একটি কৌশলপূর্বক বিন্যাসের নামই অতিমানস। পুরুষোত্তম ঘরে দাঁড়াইয়া মনের বিশ্লেষণ করিলে এই মনের মধ্যেই অতিমানসের সন্ধান মিলিবে। ঝড় আসে বড়-অতীতের সঙ্গে সমন্বয় বিধানদ্বারা সত্তাকে সার্থক করিবার জন্য, ভাগবত রূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য। শ্রীরাধা, তোমাকে ও তোমার পুরুষোত্তমকে লইয়াই তো আমি জীবনপথে বওয়ানা হইয়াছিলাম, অগ্রগতির জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলাম। কী আমি চাহিয়াছি তোমাদের প্রতিষ্ঠা ছাড়া? যাহাদের মধ্যে আছি, সঙ্গে আছি, তাহাদিগকে তোমাদের পথের পথিক করিবার জন্যই আমি চাহিয়াছিলাম। কোনও ক্ষুদ্র অভিসন্ধি তো আমার ছিল না। আমি তো তোমায় জন মনে করিয়া যতদূর পারিয়াছি বুকে মাথায় উহাদিগকে বহন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু আর তো পারিতেছি না। ওগো প্রাণময়ী, আমায় বল দাও, তোমার সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার মত শক্তি দাও। ৭টার পর আফিসে যাই।...বেণু কলিকাতা ঘুরিয়া এখানে আসে। জিতেন লাহিড়ী আসে। তাহাদের কলোনীর গোলমালের বিবরণ শুনি। উদ্বাস্তুরা তো সর্বত্র গোলমাল করিয়াই চলিয়াছে। জিতেনবাবুর ওখানে থাকিতে ভাল লাগে না, বলিলেন। ঘুরে গেলেও ভাল লাগিবে না। মনের ত্যাগ বা ভোগ কিছুই চলিবে না। ছাড়িয়াও

বিপদ, রাখিয়াও বিপদ। তাই ভগবান মন চাহেন। ভগবানের লীলায় যাহা ভাল বা মন্দ তাহাই সাধকের সতিকার ভাল ও মন্দ।.. সকল মন সকল বুদ্ধি লইয়া শরণাগত হওয়াই একমাত্র পন্থা। ধীরেন আসে ৭।৮টার পর। প্রস্রাবের উদ্বেগ আজ বেশ ছিল। ইন্‌জেকসান নিব ঠিক করিলাম।

...৫ই আগষ্ট

ঠাকুর, তুমি আমার মহানির্ব্বাণ, আমার মনবুদ্ধি তোমাতে নির্ব্বাণ লাভ করুক। আমি 'অমনা অবুদ্ধি' হইব। তোমার মন দিয়া যেন আমি মনন করি, তোমার বুদ্ধি দিয়া আমি যেন সদসৎ বিচার করি, তোমার সর্ব্ব-সমন্বয়ঘন জীবন দিয়া আমি যেন বিশ্বের সব কিছু দর্শন স্পর্শন করি। তোমার জয় হউক আমার প্রতিটি স্পন্দনে। ৭টার মধ্যে আমরা আফিসে যাই।...রেণু এস, এন, রাজের ওখানে যায়, দেখা হয় না। ভোলানাথ, টেল কোম্পানী, মিঃ রমণ ও বাটাতেও যায়।...শিশুদের খেয়ালে যোগাইলে একদিন উহারা পাইয়া বসে, তখন আর তাহাদিগকে আমলে আনা যায় না।...সর্ব্বসংস্কারমুক্ত বিপ্লবী জীবন লইয়া সগৌরবে দাঁড়াইবে। তবে এক অসাধ্য সাধন হইবে। ২।১টী জীবন যদি এই ছাঁচে গড়িয়া উঠে তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া উঠিবে। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।

...৬ই আগষ্ট

ঠাকুর...সৃষ্টির পরতে পরতে তুমি আমার সহ, আমি তোমার সহ যুক্ত।...আমার আমি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিতে কত তৃপ্তি। তোমার 'আমি' নামই আমার প্রিয়তম নাম—'নিত্যগোপালোঽহম্'।...সর্ব্বত্র তোমার। জীবন পর্য্যন্ত তোমার। পুরুষোত্তম জীবন ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ তোমারের হাত হইতে রক্ষা নাই।...বিশ্বনাথ আমার ফল খাওয়ার জন্য ১০৲ টাকা রেণুর কাছে দিয়া যায়।...সুবোধকে সঙ্গে করিয়া ধীরেন আসে। সুবোধ আমার প্রাণ পরীক্ষা করে।

...৮ই আগষ্ট

ওগো পুরুষোত্তম, নিশ্চয়ই তোমার রাধাপ্রকৃতিই সাত্ত্বিকরূপ, রাজস রূপ, তামস রূপ। তুমি প্রতিটী রূপের স্বয়ং মর্য্যাদা দিয়া, স্বীকার করিয়া নিজ জীবনের মাঝে একীভূত করিয়াছ, তাহার দিব্য রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছ। আমাকেও তোমার শরণ দিয়া পুরুষোত্তম বানাইয়া দাও। আমি শরণাগত। আমার চারিদিকে তামসী প্রকৃতি ঘিরিয়া রহিয়াছে, তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া আমি তাহাকে পরাপ্রকৃতিরূপে, রাধারূপে উদ্ভাসিত দেখিতে চাই।...ইহার মধ্যে কি তোমার পরাপ্রকৃতি রূপ ফুটিয়া উঠিবে না, আমায় কৃতার্থ করিবে না? বিশ্বের প্রতিটী ঘটনাকে যে আমি পরারূপে দেখিতে চাই।...ধীরেন আমার ইন্‌জেকসান দিতে রহিয়া আসিবে।...আমি বেশ আছি—চতুর্দিকে সব এলোমেলো ...কি বিপদেই আছি! আমার প্রস্রাবের অবস্থা খুব ভাল নয়।

...৮ই আগ

ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধনহীন গ্রন্থিবন্ধন কোনও অভিসন্ধি নাই, কেবল তুমি আর কেবল আমি এই কেবলে কেবলে মিলনের ছাঁচেই না তুমি বিশ্বকে গড়িয়াছিলে। জীব জ্ঞানেও কেবল, রসেও কেবল বন্ধন আছে, অথচ গাঁট নাই, complex নাই। সংসারের সব সম্পর্কে একটি গাঁট রহিয়াছে, আসক্তি রহিয়াছে, আটকাইয়া যাওয়া রহিয়াছে। যখন দুইয়ে মিলন আছে, তখন গ্রন্থি তো থাকিবেই, কিন্তু বন্ধন নাই। হৃদয়ের খোঁচায় সে কত জড়াইয়া ধরিল, আবার কত না সে ছাড়িয়া দিল। এই জড়াইয়া ধরা ও ছাড়িয়া যাওয়ার দোললীলায় সে ছুটিয়া চলিয়াছে। সকালে আফিসে যাই।...রেণু প্রভৃতিকে বলি—তোমাদের সঙ্গে আমার বন্ধনহীন গ্রন্থিবন্ধন। বিচার ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ না থাকিলে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংসারে পরস্পরে যতই বিরুদ্ধমনোভাবযুক্ত হউক কেন, ছাড়াছাড়ি হয় না। কিন্তু যেখানের সম্বন্ধ বন্ধনহীন গ্রন্থির, সেখানে মানুষ চলিয়া যাইতে পারে, যায়ও। তাই চাই উন্নত জীবনযাপন। জীবন্ত মানুষের বন্ধন গ্রন্থিহীন হইলে তাহা নিত্য। কেহ কাহাকেও অনন্তকালে ছাড়ে না

অথচ ছাড়িয়া যাইবার অধিকার দুইয়েরই থাকে।... অরবিন্দ consciousness কেই মূল ধরিয়াছেন। কিন্তু কোনও দিনই কি sub conscious ও unconscious স্তর conscipusness-এর স্তরে আসিবে? উহারাও যে সৃষ্টিতে অনাদি অনন্ত। Consciouness কিছুতেই ঐ দুইটি স্তর ভেদ করিতে পারিবে না। Consciousness-এর এত শক্তি নাই। এইখানেই প্রাণস্তর প্রয়োজন। প্রাণই ঐ দুইটী স্তর উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম। শ্রীনিতাই-গোপালের জড়াজড় সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দেরও পরের স্তর। বোধহয় দুইখানেই অরবিন্দের সঙ্গে বারীনবাবুর মতবৈধতা।

...৯ই আগষ্ট

ঠাকুর, তুমি কত দীনদুঃখীকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়াছ, যাহাদের আপন বলিয়া কেহ নাই, যাহাদের দাঁড়াইবার কোন স্থান নাই। তুমি নবদ্বীপে 'ঝুলির মা'-কে নিজ আশ্রমে আশ্রয় দিয়াছিলে, নিজ ভক্তগণদ্বারা অন্তিম সময়ে ঔষধ পথ্যাদিদ্বারা সেবা করাইয়াছিলে, মৃত্যুর পর মহোৎসব দিয়াছিলে। তোমাকে পাইলাম, কিন্তু জীবনে তো তোমাকে তেমন করিয়া নিতে পারিলাম না, তুমি বলিয়া যাইতে পারিলাম না, তোমাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে পারিলাম না। তুমিই আমার সব।...বুঝিবার শিখিবার জন্য যাহার ব্যাকুলতা আছে, তাহাকে মানুষ করা সহজ।...গিয়া নিজের মত থাকাই ঠিক হইবে।

...১০ই আগষ্ট

ধরার ভার হরণ করিতে তুমি কংস-কারাগারে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলে, যখন অজ্ঞানের সুষুপ্তিতে ছিল ধরা মগ্ন। আজ তাহা স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতেছি। সকল শোষণকে শুষিয়া লইবার মহাব্রত লইয়া তুমি আসিয়াছিলে, তুমি মূর্ত্তিমান শোষণ। চৈতন্য শোষণ করিয়াছে জড়কে, আকাশ শোষণ করিয়াছে মাটিকে, নর শোষণ করিয়াছে নারীকে, দেবতা শোষণ করিয়াছে মানুষকে, মানুষ শোষণ করিয়াছে পশুপক্ষীকে, কুলীন শোষণ করিয়াছে অকুলীনকে, বড় শোষণ করিয়াছে ছোটকে, বিদ্যা শোষণ করিয়াছে অবিদ্বানকে। তুমি আসিয়াছ পরস্পর বিরুদ্ধদের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিয়া দুইয়ের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, অদ্বৈত রস আস্বাদন করিতে। তোমার অবতরণ সার্থক হউক।... বেণু সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবুর স্থানে যায়। সাবিত্রীবাবু আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহার ভবিষ্যৎ আছে, প্রয়োজন আছে, উহা বাঁচিবে। তবে সাহিত্য-সেবীদের কিছু কিছু দিলে তাহারা ইহার ভাবধারার সঙ্গে adapt করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিত। নহিলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আর অতি শীঘ্র একটি স্কুল করা কর্ত্তব্য। যে টাকা আছে, তাহাদ্বারা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়াই আরম্ভ করা উচিত।...কুসুম এখানে থাকিবে স্থির বলিল।... জ্ঞানবাবুর জন্য দিল্লীর টিকিট (Air) বেণু কিনিয়া আনে।...২০শে আগষ্ট শনিবার কৃপালনী সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'গীতাভবনে' যাইবার কথা দুইটি যুবক বলিয়া গেল, আবারও আসিবে।...৭।০টার পর অরুণা ও উমা...আসে।...কুসুম প্রতিভা গীতার অবতরণিকা পাঠ করে। প্রস্তাবের অবস্থা মন্দ নয়।

...১১ই আগষ্ট

পুরুষোত্তম, তুমি এলে এমন এক ভিখারীর দুয়ারে, যাহার সম্বল কিছু নাই। ধনহীন, জনহীন, শক্তিহীন। দেহ আজ আমার ভাঙ্গা, মন ক্ষতবিক্ষত, প্রাণ ঝালাপালা। কি দেবা আমি তোমায় করিব? কত সাধ ছিল আমার সবটুকু দিয়া তোমায় যাচণ করিব, বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া দিব, তোমার ছাঁচে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিব। আসিয়াছ তুমি, একথা সত্য। কী প্রয়োজন আছে তোমার আমার এ জীবন দিয়া? তোমার করুণার চাপ যেন আর সইতে পারি না। আমায় আত্মসাৎ কর। তুমি মহানির্ব্বাণ।...

ক্রমশঃ

কঠিন দান

।। শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য ।।

রহিলে মোরে দুখের বহনে
কঠিন তব কাজের বহনে।

চাহিয়া দেখি পিছন ফিরে
ঝঞ্ঝা এসে ফেলেছে ঘিরে,
মেঘের দল করেছে ভীড়
সাঁঝের গগনে।

নদীর কূলে দাঁড়াছ যবে
একাকী দিনশেষে,
প্রলয়ঘন শ্রাবণধারা
নামিল খল হেসে।

ডাকিনু যত কাণ্ডারীরে
সে ডাক সবি আসিল ফিরে,
রহিনু নত বেদনাহত
আঁধার গহনে।

আশা

।। শ্রীআশুতোষ পাল ।।

এখনও জীবন আছে রিক্তপত্র শাখায় শাখায় ?
রাতের দুরন্ত মায়া রহস্যের ঘন আবরণে
চাঁদের আলোয় হাসে। শুষ্ক শান্ত তারাদের বনে
উড়ে যেতে চায় মন ভর করে হাল্কা কুয়াশায়।
এখনও মৃত্যুর হাত ডাক দেয় ? ঘন তমসায়
দৃপ্ত এক প্রভাতের প্রতিশ্রুতি। নতুন জীবনে
যে এক মধুর স্বাদ—তারই মাঝে স্বপ্ন-সঞ্চয়নে
বাসনার পাত্রখানি ভরে নিই কানায় কানায়।

ঘুরে আসে দিনরাত, ঘুরে আসে জীবন মরণ,
সূর্য-শিখা জ্বলে আর চাঁদ হাসে মেঘের সাগরে,
ঝটিকার ক্ষুব্ধ রোষ মাঝে মাঝে অভিশাপ ঢালে
এই পৃথিবীতে, তবু চঞ্চল চৈত্রের বিস্মরণ
একদিন অকস্মাৎ মাঘের ছোঁয়ায়। থরথরে
কাঁপে এই দেহ-মন কোনো কোনো করুণ সকালে

সাময়িকী

সরস্বতীপূজা—নরনারায়ণ শিল্প বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র মিলিত হইয়া গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ (৫ই ফাল্গুন ১৩৪৯) নরনারায়ণ আশ্রমে সরস্বতী-পূজার অনুষ্ঠান করে। প্রতিমা গড়িয়াছিলেন শিল্প শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী দাস। এ বিষয়ে তাহার একটা স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা ও নিপুণতা আছে—তাই প্রতিমা সুন্দর হইয়াছিল। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই পূজায় বিশেষ আনন্দ—কাজও তাহারাই অনেকটাই করিয়াছে। আগের দিন চাল ডাল বাড়া, তরকারী কোটার কাজ তাহারা করিয়া রাখিয়াছিল। পূজা করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষক যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, রান্না করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষিকা মৃণালিনী বিশ্বাস। আশ্রমের কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা সকল কর্মে ছেলেদের লইয়া সহযোগিতা করিয়াছেন। অঞ্জলি দিয়া সরস্বতীদেবীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন অনন্তঃ দুইশত ছেলেমেয়ে ও বড়রা। এই দিনটাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। বুনিয়াদী শিক্ষিকা ছায়া রায়ের পরিচালনায় কয়েকটী ছেলেমেয়ে গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে আনন্দ দিয়াছে। সেলাইর স্কুলের মেয়েদের তৈরী অনেক সেলাইর প্রদর্শনী হইয়াছিল, প্রদর্শনী মঙ্গলবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত খোলা ছিল। কাটিং, উল ও এম্‌ব্রয়ডারী—তিন বিভাগের প্রথমকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। লেডী ব্রাবোর্ন ডিপ্লোমার ছাত্রীদের সেলাইও প্রদর্শনীতে আলাদাভাবে রাখা ছিল—তাহাদের সেলাই বেশ দেখিবার মত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সরস্বতী পূজার দিনটিকে শুধু পূজা ইত্যাদির অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন না—তিনি মাটির জগতের প্রত্যেক নারীকে সরস্বতী হইতে আহ্বান জানাইতেন। সরস্বতী রসের দেবী—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা রসসত্তা আছে—এই রসসত্তা বিকৃত হইয়া কুৎসিৎও হইতে পারে, উন্নীত হইয়া ভাগবতীও হইতে পারে। এই রসসত্তাকে কি ভাবে ভাগবতী করা যায়, সরস্বতীপূজায় তাহারই সাধনা। সরস্বতী সম্বন্ধে লিখিতেছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, 'শীত-ঋতুর অবসানে রস-সাধনা আকাঙ্ক্ষা যখন প্রকৃতির নিয়মে ফুটে ওঠে, তখন যোগমায়া তোমার ভাববিহ্বলী বিদ্যা-পদস্পর্শ ছাড়া কে শোষণের হাত থেকে পরিবার সমাজ বা জাতিকে রক্ষা করবে? তোমার আবির্ভাবের চরম সার্থকতা শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমায়, নিত্যমদনমোহনের প্রকৃতির সহিত অদ্ভুত দোলিক্রীড়ায়। ভক্তের জন্মগত অধিকার এই রাসলীলায় যোগদানের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্যই তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব 'শুভ্রকান্তি' মূরতি।...বর্তমান যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে চলছে যে একটা লুট করবার কৌশল-শিক্ষা, তুমি তোমার উদ্যত ঐ স্বয়ম্ভ স্থিত সোণার-মাখা লেখনী ও পুস্তকের শ্রীতে সমগ্র জগতের বিদ্রী এই ভাবকে তাড়িয়ে দাও। বিশ্বের লেখনী আজ অসির কাজ চালাচ্ছে, পুস্তক যোগাচ্ছে তার ইন্ধন, রক্ত হচ্ছে তার খাদ্য...। যেদিন রক্ত-লালসায় মানুষের হৃদয় অসির ঝনৎকারে মাতাল, সেদিন থেকে সকল বিভবসিদ্ধি সুদূরপরাহত, সেদিন থেকে বাক্যের মিথ্যা চাকচিক্য জগতে এক আসুর-শিক্ষা প্রবর্তন করেছে। মা বাগ্‌দেবতা, তুমি আমাদের বাক্‌শুদ্ধি এনে দাও, আমাদের বাক্ যেন বিকারের আয়ত্ত না হয়ে বস্তুতন্ত্রতার জননী হয়। বাক্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব আজ মরতে বসেছে, তুমি সেই বাক্যকে সংযত কর, উজ্জ্বল কর, জগতের বুকে ক্রীড়া করার উপযুক্ততা প্রদান কর, আমরা বাক্যের ভিতর দিয়ে বিশ্বকে রক্ষা করব, পালন করব।'

সরস্বতী পূজাকে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই দৃষ্টিতে দেখিতেন—সরস্বতীকে পূজা করিয়া আমাদের রসসত্তাকে

শোষণের যন্ত্র না করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিব, জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে যে লুট করিবার কৌশল শিক্ষা চলিতেছে, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান যেন তাহা হইতে মুক্ত হয়—তাহা শিখিব, বাক্যদ্বারা মানুষ যে মিথ্যাকে সত্য করিয়া সমাজে স্তরে স্তরে বিকৃতি আনিতেছে, সরস্বতী-দেবীর পূজা করিয়া আমরা যেন সেই বাক্যের বিকৃতি হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারি—সরস্বতী পূজার দিনে ইহাই আমাদের সাধনা হউক। বর্তমান কালের সমস্যা হইতেছে বাহিরের দিকে অনেক কিছু হইতেছে, কিন্তু খুঁটি না থাকায় সব শূন্য ফাঁকা হইয়া যাইতেছে —এত জ্ঞানবিজ্ঞান, এত শিক্ষাদীক্ষা, এত বিধি ব্যবস্থা—কিন্তু মানুষের অন্তরের শূন্যতা ভরিতেছে না, মানুষে মানুষের মিলন আনন্দময় হইতেছে না। তাহার কারণ আমরা খুঁটি হারাইয়া ফেলিয়াছি, সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্ঞানচর্চা হইতেছে, কিন্তু সেবাবুদ্ধি কল্যাণ-বুদ্ধি না থাকায় তাহা তামসিকতাতে পরিণত হইতেছে—সরস্বতী পূজা করিয়া আমরা এই সেবা-বুদ্ধি কল্যাণ-বুদ্ধি লাভ করিব। কিন্তু এ কথা সমাজের নিকট তুলিয়া ধরিতে পারিলাম কোথায় ?

'পূর্ব্বে নিজের অহম্‌কে ও অহম্‌পূর্ব্ব কর্ম্ম-বুদ্ধি-মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করা হইলে সেই অর্পিত অহম্ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যে কর্ম্মে স্ফুরিত হইবে, তাহাই হইবে 'ভক্তি'। এক কথায় ভগবানে মনোলয়, বুদ্ধিলয় ও অহম্-লয়ের পরই ভক্তির আস্বাদন জমিয়া উঠে। নির্ম্মলা ভক্তিতে কর্ম্ম-জ্ঞান হইবে ভক্তির ঘন আস্বাদন।...বর্ণাশ্রমের আরম্ভ জীবের অহম্ হইতে, ভক্তি সাধনার আরম্ভ ইহারই উজান গতিতে ভগবান হইতে, 'পুরুষোত্তমোঽহম্' হইতে। বর্ণাশ্রম বিশ্ব হইতে বিশ্বনাথে পৌঁছিবার কথা শুনাইয়াছে, আর ভাগবত শুনাইয়াছেন বিশ্বনাথ হইতে বিশ্বে আসিবার খবর।... ..ভক্তিবাদ কখনও ভগবানকে বিশ্বের ওপারে নির্ব্বাসন করে নাই। ভগবান তাঁহার immanent aspect এই বিশ্বকে 'সর্ব্বতোবৃত্ত্যা' অতিক্রম করিয়া আছেন (অত্যতিষ্ঠৎ)।.....'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীযুত মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 26th February, 1964.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

কৃষ্ণকে কৃষ্ণির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার পৌঁছও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের রচিত :

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
— ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১।০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত) ৮৲
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬৲
২। ঈশোপনিষৎ ২৲
৩। কেনোপনিষৎ ১৲
৪ কঠোপনিষৎ ৩৲
৫। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে ১৷০
৬। স্বরূপের পূর্ণরূপ ।০
৭। গীতাতত্ত্বসন্ধী /০
৮। উদ্ধবগীতার (পুস্তিকা) ৷০
৯। ঐতরেয়োপনিষৎ ১৸০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
১০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২৸০
১১। প্রশ্নোপনিষৎ ১৷০

: পাণ্ডুলিপি :

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
৩। তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৭। স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৮। অগণিত পত্রাবলী
৯। বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীযুতী প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ঐতিহ্য ১৷০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা /০

শ্রীযুতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৷৵০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। রবীন্দ্র-স্মরণ ৫৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

SHREE HANUMAN FOUNDRIES LTD.

GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS, ENGINEERS, FOUNDERS, STEEL REROLLERS, BUILDERS, STRUCTURAL FABRICATORS

LIGHT AND HEAVY FERROUS CASTINGS/ROLLED LIGHT-SECTIONS AND RAILWAY PERMANENT-WAY MATERIALS.

Associated Concerns :

SHREE BAIDYANATH IRON & STEEL CO, LTD.
Wagon Builders, Founders, Manufacturers of Pig Iron and Steel Castings, Engineers, Government and Railway Contractors.

AGARWALLA PROPERTIES LTD.
Owners of Real Estate.

THE LAKSHMI PRINTING WORKS LTD.
Printers and Publishers—Artistic Job a speciality.

Head Office
AGARWALLA MANSIONS
370, Upper Chitpore Road,
Calcutta-6.
Phone : 33-6422 (4 lines)

Branch Office :
25-H CONNAUGHT CIRCUS
NEW DELHI
Phone : 40317

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

চৈত্র ১৮৮৫, ঃ ৩৭৩ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ, সপ্তদশ বর্ষ ৩য় ঃ সংখ্যা

"আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না যাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের টানে গোপীগণকে সহজ ও অনায়াসে (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রীয়ায় ও দ্রব্যে অবৈত হইয়াই ভক্ত অতি দ্রুত দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান যুগ বর্ত্তমান ভজনের যুগ, ইহাও তাঁহারই নির্দ্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

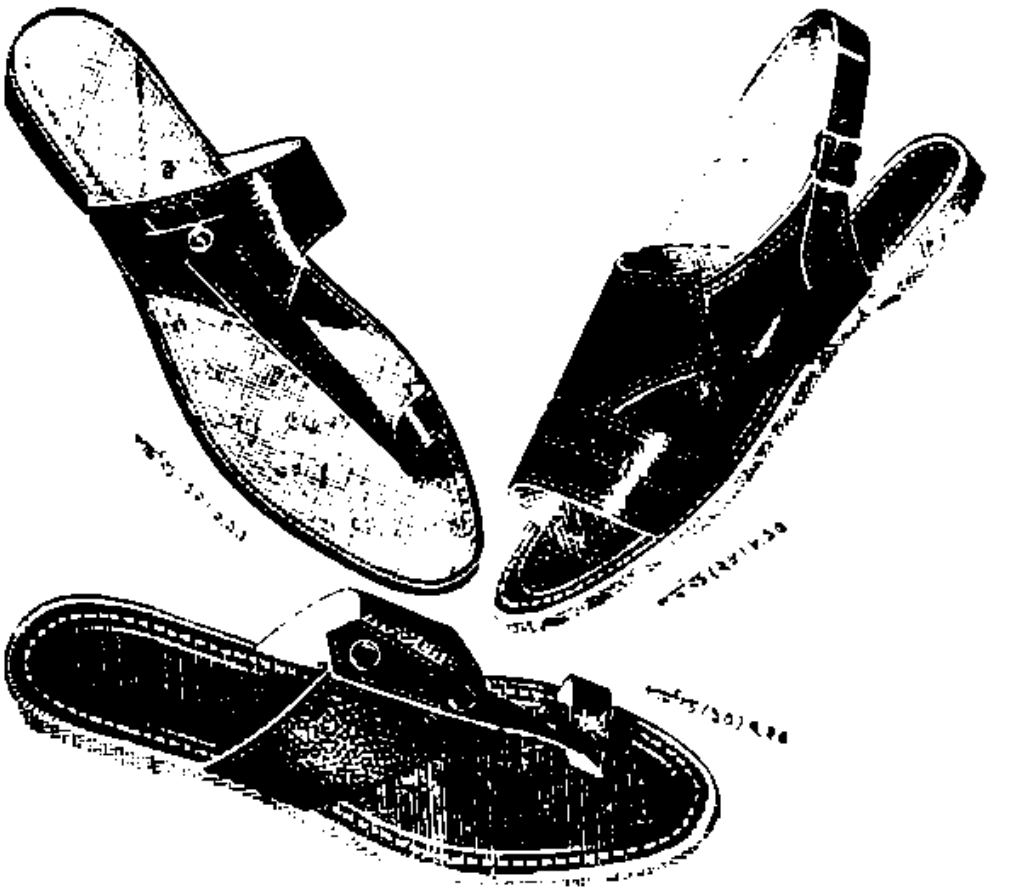

পরম তৃপ্তি
[illegible] পরিচয় পাবে।
[illegible] চমৎকার আরামদায়ক
[illegible] আপনি তুষ্ট হবেন,
[illegible] সুখ হবেন এর
[illegible] সৌন্দর্যকৌশলে। দেখেশুনে
[illegible] এই নতুন কৌশল। এই
[illegible] অপসারণে বাটা
[illegible] নিহিত বিচিত্র আরাম।

Bata
PALMBEACH

বিজ্ঞপ্তি

'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ গত মাঘে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যগণকে সপ্তদশ বর্ষের চাঁদা শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপন-দাতা প্রভৃতি সকলের সহযোগিতাতেই 'উজ্জ্বলভারত' এই ষোল বৎসর চলিয়া আসিল বটে কিন্তু আজও অত্যন্ত অধিক অসুবিধার মধ্য দিয়াই চলিতে হইতেছে—কর্মীর অসুবিধা তো আছেই। তাই শ্রীশ্রীৎ পুরুষোত্তমানন্দের কাজ ও কথাকে মানুষের কাছে উপস্থিত করার দায়িত্ব সকলেই প্রাণ দিয়া খানিকটা গ্রহণ করুন—সকলের নিকট এই আবেদন জানাই এবং সভ্যগণকে এইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব চাঁদাটা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। ইতি ১৮ই মাঘ, ১৩৭০।

কার্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৭শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৯ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনীনগর
জি: ২৪ পরগণা

নরনারায়ণ আশ্রমে একটি চরকা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·২০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

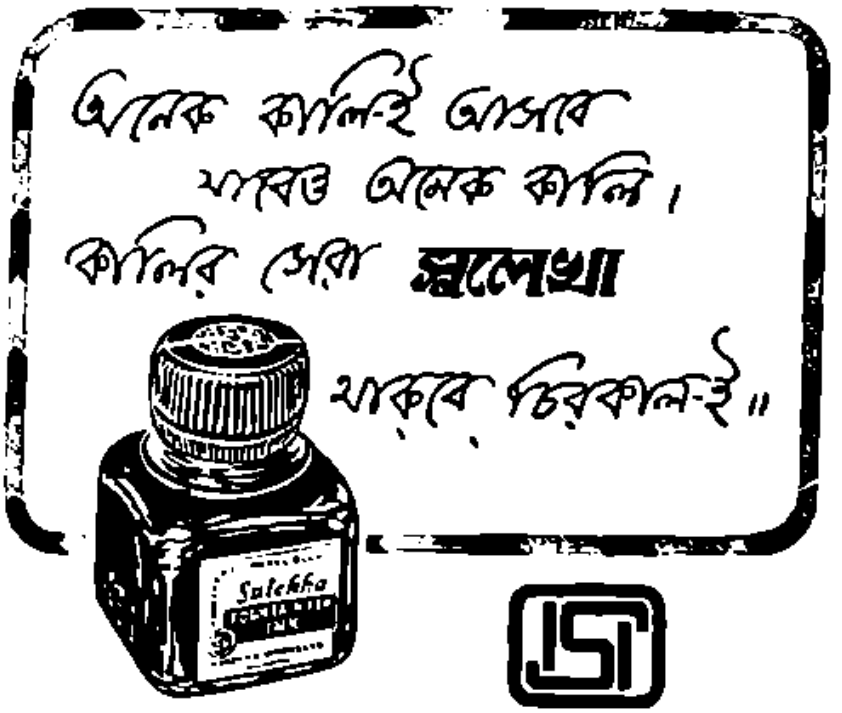

৪৬

সূচীপত্র, চৈত্র, ১৩৭০

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ৫১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৫)

২। সান্নিধ্য ... ৬২
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

৩। মানুষ (কবিতা) ... ৬৩
শ্রীযামিনীকান্ত দাস এম. এ. বি. টি,

৪। শিবমঙ্গল কাব্য ও অন্নদামঙ্গল কাব্য ... ৬৪
শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। ভারত ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যা ... ৬৬
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২) ৬৮

৭। ভগবান বুদ্ধের 'পদ্ম' ও শরৎচন্দ্রের 'কমল' ৭৬
শ্রীরেণু মিত্র

৮। সর্বধর্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য .. ৮০
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

৯। কর্মযোগ .. ৮২
শ্রীশঙ্কর নাথ চট্টোপাধ্যায়

১০। অমৃত পেতেই হবে (কবিতা) ... ৮৩
শ্রীশান্তশীল দাশ

১১। সাময়িকী : বর্ষশেষ ... ৮৪

উদ্বোধন

চৈত্র, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
(৩৫)

এই মাটির জগৎকে গড়িয়া তোলার বুদ্ধিতেই জাতীয়তা-বোধ জন্মায়। কে এদেশে মাটির মুক্তি চায়?...আকাশের ভগবানের পূজা আমি করি না··· ভাল মানুষেরা সব সংসার ছেড়ে যাবে, আর সংসারটা হবে brute-দের আবাসস্থল?···নাগরিক বেদান্ত প্রচারের দিন এসেছে আজ—আরণ্যক বেদান্তের দিন ফুরিয়েছে। বয়স শেষ হয়ে এল···একটা দার্শনিক বিপ্লবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ওরা যা করছেন করুন, আমি কুম্ভমেলা ও জাতীয়তাকে একত্র করব।···দুটো calture-এর সমন্বয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য, বুদ্ধ শঙ্কর সমন্বয় প্রয়োজন—নিত্যগোপাল তাই দিতে এসেছেন।··· অনেকদিন পর এসেছ, আমি নিত্যগোপালের দাস হিসাবে তোমাদের অভিনন্দন জানাই···হাবড়ায় গিয়ে একদিন থাকতে বলছ—I feel at home everywhere in nature—আমি দুঃস্থ দরিদ্র জনসাধারণের—আমি ছেঁড়া মাদুরের দলের।···আমি মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে যদি একটা নূতন পথ খুলে দিতে পারি, ধন্য হয়ে যাব···আমি দেশ-ভক্তি ও কৃষ্ণ-ভক্তি মেলাব···। (১৫ই আগস্ট শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ হাবড়া হাটখুরা গ্রামসেবা সঙ্ঘে গিয়া ছিলেন।)

১৮, ৮, ৫৬।···প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবান অনন্ত সম্ভাবনা রেখে দিয়েছেন—অনেক কিছু হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন—সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রকৃতির মধ্যে আহ্বান এসেছে—···যেমন তেমন করে বিকাশ হলে হবে না—বিকাশের ছন্দ আছে···সুরের বিকাশের জন্য সাধনা করতে হয়—চেঁচালেই গান হয় না; কথা কইলেই কথা হয় না—কথা বলতে শিখতে হয়—কথা বলা, হাঁটা, বসা, মনন করা সব শিখতে হয়; সেবা শিখতে হবে।···ট্রেনিং-এর উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে ট্রেনিং ছিল···এ রকমের চলতে দিলে তা পুরুষোত্তম-চলা হবে না।···গুরুজনের দিকে পা ছড়িয়েই বললাম···। ভগবান যা বললেন, তাই গান, উপনিষৎ গীত হয়েছিল · যাতে লোকের উদ্বেগ হয় না, সাধারণ লোককে তেমন ভাবে চলতে হবে। তবে নূতন কথা বলতে যারা আসেন তাঁদের কথা তো সংস্কারাবদ্ধ মানুষের কাছে উদ্বেগজনক হবেই—যীশুখ্রীষ্টের কথা অনেকের কাছেই উদ্বেগজনক হয়ে ছিল—এদেশেও তাই···।...সত্য কথাও মনোমুগ্ধকর ভাবে বলতে হবে—...কথা কম করো...কথার মধ্য দিয়ে আগুন জ্বলে। কম কথা কইবার ট্রেনিং সকলকে নিতে হবে।...প্রাচীন-কালে রাজাদের ন্যায়শাস্ত্র তর্কশাস্ত্র পড়তে হত...কথায় ঘরে আগুন লাগান যায়—কথা দিয়ে হাজার হাজার লোককে উঠান বসান যায় আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি ...যেমন তেমন করে লাউ গাছ লাগালেও ফল ফলে না—আর মানুষের জন্য কোন সাধনা লাগবে না?··· পুরুষোত্তম যেভাবে দেখতেন, সেই খোঁজ রাখো—তাঁর লীলা আছে, সে লীলা বুঝতে চেষ্টা কর। যেমন করে তিনি

কথা বলতেন, কেমন করে মানুষকে মর্যাদা দিতেন, কেমন করে সকল মানুষকে নিজের সঙ্গে এক বলে মনে করতেন, কেমন করে তিনি হাঁটতেন চলতেন—সব তাঁরটা দেখে শিখতে হবে।···পশুর স্বভাব মানুষের—যা খুশী হল বলল, এখানের কথা সেখানে লাগাল।...সেই কথাই কথা যে কথায় প্রাণ জুড়ায়—তোমরা তেমন কথাই বলো।... তাই অতীত জীবনের অনেক জিনিষ ভুলতে হবে—unlearn করা প্রয়োজন—আগের স্বভাব ভুলে যেতে হবে...ইংরেজ যেমন আমাদের প্রথমেই ভুলিয়ে দিয়েছিল যে আমরা ভারতীয়—আজ আবার ভারতীয় হতে হলে ইংরেজী সভ্যতার আচরণ ভুলতে হবে···। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলছেন—ঠাকুর, যেদিন আমার মন তোমার পাদপদ্মে দিয়েছি, সেদিন থেকে আমার বাক্য ভুল হয় না, আমার পা ঠিক পড়ে...। কেমন করে পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষা করা যায়—কেমন করে চলতে ফিরতে হয়—নরনারায়ণ আশ্রম তারই আদর্শ হবে—এইটেই ইচ্ছে করেছিলাম।...ভ্রমকে অপনোদন করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য—সংসারের ভ্রম।.. বৃন্দাবনে যাবে বৃন্দাবনের ভাষা শিখবে না? কৃষ্ণের বাঁশী সকলেই তার তার মত শোনে, কেননা সেটা প্রাণের ভাষা...। বুদ্ধির ভাষা হচ্ছে ভেদের ভাষা, ঔদ্ধত্যের ভাষা, অপরকে খোঁচা দেবার ভাষা···। ব্রজলোকের অনুসরণ করতে করতে শিখতে হবে···ছন্দ ছাড়া সংসারে এক পাও চলতে পারবে না··· আমার শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বাস্তব জীবনে চলবার ছন্দ আছে... আরতির অর্থ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে তোমার জীবনে জীবিত হব...। তোমার অহংকার নিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে তুমি মরতে পারবে—কিন্তু সংসার তোমার জন্য ভ্রূক্ষেপ করবে না···তুমি যদি ছন্দ না শিখে চল তুমি পুড়ে মরবে···। বৈষ্ণব অর্থ বিশ্বের ছন্দ যে শিখেছে...। বিষ্ণুর চক্র সর্বদা এই বৈষ্ণবদের রক্ষা করবে।...যুগ খুব ভাল নয়—সমস্ত পৃথিবী বারুদের উপর বসে আছে—শুনতে হয় শুনবে, নয়তো তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।··· যতটুকু নিত্যগোপালের ছন্দে ছন্দ মেলাতে পেরেছি, ততটুকু সার্থক হয়ে আজও নূতন কথা শোনাবার সামর্থ্য রাখি।··· সংসার বড় ভীষণ স্থান—পা পিছলালে আর উপায় নাই।

২০, ৮, ৪৬।·· শ্রীনিত্যগোপালের শেষ বাণী আমরা রোজই পাঠ করি—কিন্তু গভীরতা কতখানি জানি না। এটা সংসারী পিতা তার সন্তানকে বলছেন না—গুরু শিষ্যকে বলছেন। এখানে রক্তের সম্পর্ক নাই। কি রকমভাবে থাকতে হবে?—মেসে ছেলেরা যেভাবে থাকে, ততটুকু brotherly ভাবে চলবে না। ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ছিলাম—সে কি এই রকম ছিলাম? মেসের মত থাকতে হবে? না একই বাপের ছেলের মত থাকতে হবে? কোনটাই ঠিক নয়—দুটোকে মিলিয়ে। মেসে ব্যক্তিত্বের পুষ্টি—আর বাড়ীতে কেবলই মায়ের সেবা নিতে নিতে একেবারে অমানুষ হয়ে যায়। পারিবারিক জীবনে সহবেদনা মেসের থেকে বেশী।...মেসে স্বার্থপরতা অল্প,··ব্যক্তি স্বাধীনতা বেশী, পরনির্ভরতা কম। পরিবারে স্নেহপ্রীতি পরনির্ভরতা···। মেসে শৃঙ্খলা বেশী। নিত্যগোপাল স্নেহপ্রীতি ও শৃঙ্খলা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দুটোকে মিলিয়ে সমাজের রূপ দিতে চাইছেন।...ভাবের সম্পর্ক যেখানে, সেখানে ঝগড়া একবার হলে আর মিল হওয়া কষ্ট। পরিবারে তা নয়।·· আশ্রমে সব পর নিয়ে কাজ—এই পরের সঙ্গে আঠা লাগায় কেমন করে সেইটেই তো সমস্যা।...ভাইবোনের সঙ্গে, স্বামীতে স্ত্রীতে, মায়ে ঝিয়ে কত ঝগড়া হয়—আবার মেলে। আশ্রমে কি ঝগড়া হলে, ছোট অপমান করলে বড় তাকে কোলে তুলে নেয়?...নিতে হবে।···ভাইয়ে ভাইয়ে গুঁতোগুঁতি করে নিত্যগোপালকে পাওয়া যাবে না।···নিত্যগোপাল, নূতন কথা নিয়ে এসেছ, তোমার মঠ, তোমার সঙ্ঘ কি এই রকম হবে? ভাবের ক্ষেত্রে আদর্শের ক্ষেত্রে রসকে, হৃদয়কে আন, রসের ক্ষেত্রে আদর্শকে, ভাবকে তুলে ধর।···নিত্যগোপাল বলেছিলেন, আমার কাজ কর, তোদের জন্য প্রেম তোলা রইল।...সত্যি, তোলা আছে, আমি ছিটেফোঁটা পেয়েছি—তোমরা তাঁর কাজ করে, তাঁর অনুসরণ করে চললে তোমরাও প্রেমের অধিকারী হবে..তাঁকে যদি সত্যি করে শ্রদ্ধা করতে পার···সার্থক

হবে, নইলে ব্যর্থ হবে।...এখানের সম্পর্ক রাস্তার দাদাদিদির সম্পর্ক নয়, school friends নয় এটা—রাম-ভরত, রাম-লক্ষ্মণের মত ভাই হতে হবে...। আমি যাকে বোন ডেকেছি, সত্যিকারের বোনই ডেকেছি, যাকে মা ডেকেছি—মায়ের মতই দেখেছি—সব দায়িত্ব নিয়েই বলেছি।...সতীশ দাসের মা আমাকে বাবা বলতেন—একদিন তাদের ঘরে চলে নেই, উষাঙ্গিনী হাতের বালা খুলে তা বন্ধক দিয়ে চাল কিনতে বললো।...আমাকে উষাঙ্গিনী চিঠিতে জানালে আমি লিখেছিলাম তোমার মেয়েকে তুমি দিয়াছ, আমার বলবার কি আছে?... পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—পরস্পর পরস্পরকে ভাবনা কর—মতে না মিললেই চললুম মশায়?—এই হল সম্পর্ক? এটা কি ফ্যাক্টরীর সম্বন্ধ, চাকুরীর সম্বন্ধ? আশ্রম কি ফ্যাক্টরী?...একই সূত্রে গ্রথিত সকলে—সকলের সুখ সকলের, সকলের দুঃখ সকলের হোক—আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে কেহ নহ,...সকলের তরে সকলে...। সকলে সকলের জন্য হও।...কলিযুগের ত্রিতাপের কথা—তার একটা বাক্যবাণ—বাক্যবাণ বড় দুঃখ দেয়—তবু ভুলে যেতে হবে—আবার সেই আগের মন নিয়েই চলতে হবে...।

২১, ৮, ৪৬।...উপনিষদে ব্রহ্মের একটী নাম হৃদয়—ঋষি বলছেন হৃদি অয়ম্—হৃদয়ে ইনি। তাঁকে খুঁজতে হয় এই বুকের মধ্যে।...এই কলিযুগে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে সাধনার কথা ভাগবত বলেছেন—তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে—এই সংসার যাঁহাকে তিনি রচনা করেছিলেন।...ন প্রবচনেন লভ্য ন্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—তুমি জোর করে আমায় পাবে না, অবয়দক্তি করে জান পাবে না—আমি দিতে চাইলে এবং তুমি নিতে উন্মুখ হলে পাবে। বুদ্ধি দিয়ে পাবে না—বুদ্ধি মানে তোমার মতন করে বোঝা—তুমি ভাল দেখ মন্দ দেখ তোমার মত করে—ভালবাসলে বুদ্ধি লয় হয়—প্রেমের ধর্ম বুদ্ধি চালাতে ইচ্ছা করে না। বুদ্ধির ভার দিয়ে সম্পর্ক করে বলে সংসারে শোষণ; প্রেমই অদ্বৈত...। ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিলে তোমার মনের মত হয়ে পার্বতীসুত জয়োদয় গানের লাইন পাক দিয়ে শুতো লম্বা কর হয়ে দাঁড়ায় না...। ভগবানের বুক নিতে হলে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে, আমাকে ভালবাসতে হবে...। সাদৃশ্যে সত্য পাওয়া যায় না—উচ্চারণ সাদৃশ্যে পাদ্রীর কাছে হরিবোল horrible-এ পরিণত হয়।.. কর্ম সাদৃশ্যে বোঝায় ভগবানের মত কর্ম করি, কিন্তু আমার সংসার যেমন আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, কৃষ্ণের সংসার কি কৃষ্ণের ঘাড়ে চেপে বসেছিল?...সংসার যে তোমায় বাধা দেয় তার কারণ তুমি শরণাগত নও—যেহেতু সংসারের সঙ্গে বুদ্ধিগত সাম্য রাখ নি।...কৃষ্ণের পক্ষে সব কিছু লীলা হয় কেননা সব কিছু তাঁর কাছে খেলার মত সহজ—খেলা জিনিষটা সহজ—কিন্তু আমাদের পক্ষে সংসার করা, রাজনীতি করা জীবনের উপর চাপ হয়ে পড়ে—কিছুই সহজ হয় না—খেলার মত সহজ করতে শেখাতে, ভালবাসা শেখাতে তিনি এসেছেন।...বিবাহের মন্ত্র যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম...ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বিনিময় আছে।...হৃদয় গেছে বলেই বাইরের করোনারী থ্রোম্বোসিস, ভিতরেও তাই—একটা বিশ্ব এতো মরবে?...নিত্যগোপাল বড় বড় কথা বলেন নি—বলেছেন শুধু ভালবাসতে।...ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণসমীপে এলেন... নরনারায়ণ আশ্রম তোমাদের ঘর ছিল—এখানে এ নিজের স্থানে তোমরা এসেছ—হৃদয় দিয়া এই আমাদের এই আশ্রমকে গ্রহণ কর...।

২২, ৮, ৪৬।...এক সিংহী মেষের উপর ঝাঁপ দিয়ে বাচ্চা প্রসব করে মরে যায়—ভেড়ার সঙ্গে থাকতে থাকতে বাচ্চাটা ভেড়া হয়ে গেছে। আর একটা সিংহ তাকে স্বরূপ চেনাল—ওর অন্তর্যামী স্বরূপ বদলে দিলে, আবরণ উপাধি খসিয়ে ওর নিজরূপ সিংহত্ব ফুটিয়ে তুললে।... মুক্তি হচ্ছে অন্যথা রূপম্ হিত্বা স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।... আর একটা সিংহ দেখতে দেখতে আমার নিজের স্বরূপ মনে আসছে—দ্রষ্টব্যঃ; ব্রহ্মও আগে দ্রষ্টব্য, পরে শ্রোতব্য—সিংহের ডাক শুনতে হবে—...এমনি...।

ক্রমশঃ

সান্নিধ্য

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

জীবনে বেঁচে থাকাটা সত্য, না বেঁচে না থাকা? জন্মসূত্রেই যদি মৃত্যুর নাম লেখা থাকে, দেহের ছায়াতেই যদি আঁকা থাকে রোগ, জরা ও দুঃখ, হৃদয় যদি বিমুখ হ'য়ে ওঠে অবিশ্বাসে···তাহ'লে মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু মৃত্যুর মাঝ দিয়ে যদি পরম ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ঘটে তাহলে জীবনটাকে ছেঁড়া জামার মত ফেলে দিতেই বা আপত্তি কি? হয়ত সবই মায়া; জগৎ মায়া জীবন মায়া; এ পৃথিবী মায়ামরিচীকা শুধু। কিন্তু জীবনের অন্তীতে সেই ঈশ্বরই যে একমাত্র সত্য—তারই বা প্রমাণ কোথায়?

বিজ্ঞান বললে—ও সব তোমার কল্পনা। মিথ্যে ভাবনার ধোঁয়াতে ঘর ভরাচ্ছো। সত্য একমাত্র "বস্তু" অর্থাৎ এই দেহ। দেহ ও দেহের অন্তর্গত যন্ত্র কৌশল, স্নায়ু উপস্নায়ুর বিচিত্র সৃজনা। রেডিওর মত যান্ত্রিক সজীবতা। চিন্তা কে করে? মন? মন ত' দৈহিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া থেকেই জাত।

শঙ্করাচার্যকে পড়েছিলাম, অভিভূত হয়েছিলাম কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। বুদ্ধকে জেনেছিলাম, মুগ্ধ হ'য়েছিলাম কিন্তু শান্তি পাইনি। আর Behaviorism মনকে মোটেই টানে নি। মনকে যদি অস্বীকার করি, চেতনাকেই যদি ঘুলিয়ে দিই তবে বেঁচে লাভ?

তাই বই পড়ছিলাম কিন্তু স্থিতি পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দ্বীপ কোথায়? এমন সময় আলাপ হ'লো তাঁর সঙ্গে।

ঠিক মনে নেই কবে। হয়ত ১৯৪৯ কি ১৯৫০। তখন নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তাঁর ঘরে বসেই আলাপ হ'লো শ্রীমতী রেণু মিত্রের সঙ্গে। তিনি নেমন্তন্ন করে বললেন—আসুন না? স্বামীজি আপনাকে দেখলে খুশী হবেন।

স্বামীজি খুশী হবেন কিনা, সে কথা সেদিন আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। কিন্তু আমি স্বামীজিদের সম্বন্ধে খুশী ছিলাম না। তবু যাওয়ার ইচ্ছে হলো। কারণ 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি তখন পড়েছি। আর পড়ে মনে হয়েছে—কিছু একটা বলবার আছে এঁদের যা আমি বা অনেকে জানতে চাই।

মনে পড়েছে প্রথম দিনের কথা। আমার হাত চেপে ধরে বললেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ—জানো সন্তোষ, একটা গোটা দেশ, একটা গোটা সমাজ আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দেশ আর দেশের মানুষকে যদি বাঁচাতে না পারি তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?

অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। এক সন্ন্যাসীর মুখে ঈশ্বরের কথা নয়, দেশের কথা। বললাম—কিভাবে এ সমাজকে বাঁচানো যাবে?

স্বামীজির চোখ উদাস হ'লো। গভীর সুরে তিনি বললেন—একটা আচ্ছন্ন ধর্মবিশ্বাসের ধোঁয়ায়—গোটা দেশের মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে। তার মনের চিন্তাধারাকে বদলে দিতে হবে। তাকে জানাতে হবে তার ইতিহাস, তার দর্শন, তার ঐতিহ্য। স্বামীজি বলে চললেন—আমাদের দেশে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বেদান্ত প্রচার করতে। বেদান্তর ব্যাখ্যা বিকৃত করে গ্রহণ করেছি আমরা। জেনেছি এ জগৎ মায়া। এই জগৎ যদি মায়া হয়, তবে এ' দেশও মায়া, এই জীবনও। কি হবে তাহলে আপ্রাণ পরিশ্রম করে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে? কি হবে দেশকে ভালবেসে, সমাজকে মহৎ করে তুলে? সবই ত মায়া।'

স্বামীজি চাইলেন আমার দিকে—বললেন—বেদান্তর এই সত্যই একমাত্র সত্য নয়—এ কথাটা জানাবার জন্যই

ভারতবর্ষে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জন্ম হয়েছিল। সেই মহাবিপ্লবী হলেন বুদ্ধ। বুদ্ধই বললেন—শুধু জীবন সত্য না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তও সত্য। বুদ্ধ বললেন—ক্ষণকে নিয়েই মহাকাল। এক একটি জীবনের ঢেউ দিয়েই মহাজীবনের ধারা। স্বামীজি বললেন—সমন্বয় করতে হবে—এই দুই বিপরীতমুখী দর্শনের মধ্যে। সমন্বয় করতে হবে শঙ্করের সঙ্গে বুদ্ধদেবের। It is as true to say that God is transcendental and the world immanent as that the world is transcaudetal and God immanent.

মনে আছে সেইদিনই আমার মনের একটি অর্গলবদ্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। আমি নতুন করে ভাবতে শিখলাম।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ এমনই একটি সম্পূর্ণতার চেতনা নিয়ে এসেছিলেন। এই দেহ মন প্রাণ কিছুই অর্থহীন নয়, আমার কোনটাই একমাত্র অর্থও নয়। জীবন সত্য যেমন সত্য মহাজীবনের চেতনা। ঈশ্বর সম্পূর্ণ হয়েছেন আমার মধ্যে দিয়েই। কাজেই আমারই যে শুধু ঈশ্বরের দরকার—তাই নয়; ঈশ্বরেরও প্রয়োজন রয়েছে আমাকে পাওয়ার। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ প্রাণের সাধক ছিলেন তাঁর এই প্রাণদর্শনের সত্য-ই তিনি গোটা দেশকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করেছেন—কবে আসবে সেই দিন যেদিন মহাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শবের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে জগৎকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষণ আসবে!

মানুষ

॥ শ্রীযামিনীকান্ত দাস এম্. এ., বি. টি ॥

দেশে দেশে বসে মানুষের সভা
শুনাই কবির প্রাণের গান;
জগৎ জুড়িয়া মানুষের জাতি
তাই চাহি আগে মানুষের স্থান।

শিক্ষা সভ্যতার এ কি পরিণতি?
মানুষ মারিয়া বাঁচাইবে জাতি,
মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব নিতি নিতি,
হায়রে মানুষ ধন মান প্রাণ।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বৃথা অহঙ্কার,
শিখায় কি হিংস্র পশুর আচার?
নয় নিবাসেতে পশু নরাকার
করে নির্যাতিত মানব সন্তান।

জাতি বর্ণ দেশ ধর্মভেদ নিয়ে,
ছিন্নে মানুষেরা মানুষ দলিয়ে,
তাই বোন্ সবে শুভ বুদ্ধি দিয়ে
মানুষের মান রাখো ভগবান্।

শিবমঙ্গল কাব্য ও অন্নদামঙ্গল কাব্য

॥ শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শিবমঙ্গল কাব্যের শিব এবং মহাদেব-শিব এক নন। দেবতা শিবকে শিবায়ন কাব্যে মর্ত্যের ধূলি আঙিনায় নামাইয়া আনা হইয়াছে। তাঁহার সংসার আছে কিন্তু তিনি সংসারে নাই। তিনি কৃষকের দেবতা। কিন্তু কৃষিকার্যেও তাঁহার মন নাই। তাই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তিনি ভিক্ষা করিয়া বেড়ান—'সবার সর্বস্ব ধন চাহি'। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শিবকে লইয়া দুইখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়।

শিবমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। কৈলাসে শিবের সংসার। কিন্তু অভাবের সংসারে শান্তি নাই। গৌরীর সহিত তাহার নিত্য কলহ। শিব অকর্মণ্য, অলস, ভবঘুরে, বেকার। জটাজুটধারী শিবকে গৌরী সহ্য করিতে পারেন না। স্বামীকে তিনি বলেন—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফোঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি।
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড় খড়ি
শব্দে সাপ করে ইলিমিলি।

(রামকৃষ্ণ রায়)

স্ত্রীকে একগাছি শাঁখা দিবার মুরোদ নাই শিবের। গৌরী দুঃখ করেন যে—শাঁখা নাই বলিয়া তিনি কাহারও নিকট হাত নাড়া দিয়া কথা বলিতে পারেন না।

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥

শিব বলেন, বাপের বাড়ী যাও—

বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
মজাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

(রামেশ্বর ভট্টাচার্য)

এইভাবে দিন চলে না। তাই অবশেষে গৌরীর পরামর্শে বাধ্য হইয়া শিব কৃষিকার্য করিবার জন্য মর্ত্যে আসিলেন। কিন্তু বহুদিন কাটিয়া গেল। কৈলাসে গৌরীর নিকট শিবের ফিরিবার নাম নাই। গৌরী দেখিলেন মহা বিপদ। তাই তিনি বাশুলী ছদ্মবেশে অনেক ভাবে ছল চাতুরী দিয়া ভুলাইয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন।

কবি রামকৃষ্ণ রায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ শিবায়ণ বা শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্যটি রচিত। শিবের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায়, হরপার্বতীর দাম্পত্য কলহের চিত্র অঙ্কনে রামকৃষ্ণ রায়ের নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। শিবমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বরের নিবাস ছিল মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বহুপুর গ্রামে। হাস্যরস সৃষ্টিতে, হরপার্বতীর দারিদ্র্য নিপীড়িত জীবনের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় কবি রামেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব। শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মাণিকরাম প্রভৃতি কবিগণ শিবমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য স্থাপন করা হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ কবি হইলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যখানি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণা মঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এবং তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দ মজুমদার। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনায় চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নিকট ঋণী। অন্নদামঙ্গল কাব্যখানি খণ্ড খণ্ড ঘটনার সমাবেশে রচিত। সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশ, শিবের বিবাহ, হরগৌরীর বিবাদ, অন্নপূর্ণার

মাহাত্ম্য, অন্নদার অবতীরবেশে ব্যাস ছলনা, অন্নদার আত্মপরিচয় ও ভবানন্দ ভবনে গমন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যাংশে।

ভারতচন্দ্র কল্পনার রং এবং কথার তুলি দিয়া একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সতীর দেহত্যাগে শোকার্ত্ত শিবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটি ভারতচন্দ্রের এই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় দেয়। কথার চমক বা বাক্‌চাতুর্য হইতে ভারতচন্দ্র অভিনীত। 'অন্নদার আত্মপরিচয়' অংশটির কথা এ স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবী অন্নপূর্ণা ঘাটে আসিয়াছেন নদী পার হইবার জন্য—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটনী'। ঈশ্বর পাটনী তাঁহাকে বলিল—'একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?' দেবী অন্নপূর্ণা যার্থক ভাষায় উত্তর দিলেন—

বিশেষণে বিশেষিতে কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি যবে নারী॥
সোদরের প্রধান পিতা মুখ্য বংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
কু কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ করা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥

ঈশ্বর পাটনী সরল গ্রামের মানুষ। অন্নপূর্ণার কথার গূঢ় অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই। সহজ সরল অর্থটি সে বুঝিতে পারিয়া দেবীকে নদী পার করিয়া দিল। হঠাৎ পাটনীর নজরে পড়ল—যে সেঁউতির উপরে অন্নপূর্ণা তাঁহার বাঁ চরণ দুইটি রাখিয়াছিলেন তাহা সোনা হইয়া গিয়াছে। পাটনী বুঝিল—'এত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়'। দেবতাকে চোখের সামনে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। দেবী তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। পাটনী বর চাহিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'—এই একটি মাত্র ছত্রের দ্বারা বাংলা দেশের জীবন দর্শন, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পাটনী অর্থ চাহে নাই, ঐশ্বর্য চাহে নাই; কেবল তাহার সন্তান সন্ততি যেন দুধে ভাতে বাঁচিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় প্রার্থনা আর কি হইতে পারে?

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য ও অনুপ্রাসের পরিচয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্র শিবের রুদ্ররূপের পরিচয় দিয়াছেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট জটাজুট সংঘট্টে গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফণ গরজে।
দিনেশ প্রভাপে নিশানাথ সাজে॥

—বর্ণনাটির মধ্যে ধ্বনি তরঙ্গের কলকল্লোল, উত্তাল সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গর্জন ধ্বনি শুনিতে পাই। বাগ্‌-বৈদগ্ধে মণ্ডনকলার পারিপাট্যে ভারতচন্দ্র যথার্থই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন—"ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে অনুকূল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে তাহ'লে তাঁর লেখা মাইরেপীস হিসাবে গণ্য হতো।"

ভারত ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যা

॥ শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী ॥

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যাহারা ভারত বিভক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন তাহাদের যুক্তি ছিল যে বিভক্ত ভারতে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রদ্বয় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জাতীয় উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে, পরন্তু বৈদেশিক শৃঙ্খল মোচনে উভয় রাষ্ট্রই নিকটতর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হইবে, এমনকি কাহারও মনে একথাও উদিত হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে দুই রাষ্ট্র পুনরায় মিলিত হইয়া এক মহান ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহে আজ সে স্বপ্ন শুধু ধূলিসাৎই হয় নাই, এখন পাকিস্তান ভারতকে তাহার পরম ও প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করে।

পাকিস্তানে বিগত ১৮ বছরেও গণতান্ত্রিকতা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, আজও সেখানে জাতীয় সংবিধান তৈরী হয় নাই, সেখানের রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের আজও কোনরূপ হাত নাই। বিশের কোন ব্যক্তি মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তিতে দেশ-শাসন চালাইতেছে—যখনই প্রয়োজন হইতেছে তখনই জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র আকর্ষণ করিবার জন্য ভারতবিদ্বেষী প্রচার, সংখ্যালঘুদের উপর ঘৃণা ও হিংসাত্মক প্রচার ও কার্য চালাইয়া নিজেদের গদী পাকাপোক্ত করিয়া রাখিতেছে।

ভারত বিভাগের সময় পাঞ্জাব সিন্ধু ও সীমান্তের হিন্দু ও শিখেরা পাকিস্তান স্রষ্টাদের হালচাল লক্ষ্য করিয়া উক্ত দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাই সেখানে পূর্ববঙ্গের মত কোন সমস্যা তো নাইই, এদেশে আসিয়া আত্মবলে বলীয়ান হইয়া ও সরকারী সাহায্য পাইয়া তাহারা এতদিনে প্রবল বলিষ্ঠ ভারতীয় নাগরিক হইয়া জাতীয় জীবনের অংশীদার হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের বেলায় তাহা হইল না। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের অবিবেচনা ও বাঙালী নেতৃত্বের দেউলিয়াপনার ফলস্বরূপ বাঙালী হিন্দুর এক বৃহৎ অংশ পাকিস্তানে রহিয়া গিয়াছিল, আর তাহাই পাকিস্তানের শাসকবৃন্দের দাবার চালে নানা উপায়ে নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হইতেছে। আজ বোঝার সময় আসিয়াছে যে পাকিস্তানে কোন হিন্দুর পক্ষে আত্মমর্যাদা লইয়া বাস করা সম্ভব নহে। বিগত ১৬ বৎসরে পাকিস্তানে ৫৮৮ বার হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা হইয়াছে, উহাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ভিটামাটি হইতে উৎপাটিত হইতে হইয়াছে, জীবন বলি দিতে হইয়াছে, ধর্মান্তরিত হইতে হইয়াছে, অগণিত হিন্দু নারীকে ধর্ষিতা ও নিগৃহীতা হইতে হইয়াছে। ভারতীয় শাসকবর্গ বারম্বারাদের জন্য অনেক করিলেও ইহাদের প্রতি তাহাদের যানিকটা বিরূপ মনোভাবই লক্ষ্য করা গিয়াছে। পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি যে নিগ্রহ নির্যাতন চলিয়াছে চলিতেছে, বিশ্বে তাহার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। আদিম বর্বর যুগেও এরূপ পরিকল্পিত ও সরকার সমর্থিত অত্যাচারের কোন নজির আছে কিনা সন্দেহ। ইহুদীদের প্রতি জার্মান অত্যাচারও এমন বীভৎস বলিয়া মনে হয় না। এদিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে হিন্দু মুসলমান পার্শী ক্রিশ্চিয়ান সকলেই ভারতীয় মহান জাতির অংশ হিসাবে সমান অধিকারে অধিকারী। পাকিস্তানের অত্যাচারের 'বদলা' এখানে লইলে তাহা যেমন আমাদের সংবিধান বিরোধীও হয়, তেমনি ভারতীয় কৃষ্টিতেও বাধে। ভারতীয় হিন্দুরা কখনই কাহারো উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়—তবু যে এখানেও হাঙ্গামা হয় সেটা নানা কারণে। একে তো আত্মীয় স্বজনের উপর এমন নির্মম অত্যাচার সাধারণ মানুষকে চঞ্চল করিয়া দেয়, তাহাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগাইয়া তোলে, তাহার উপর রাষ্ট্র শক্তির

সময়োচিত সুদৃঢ় হস্তক্ষেপ ও ব্যবস্থাপনার দোষে ভারত পাকিস্তানের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে.—কিন্তু এই প্রচেষ্টারও একটা সীমা আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধটা আজ যে শুধু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। পাকিস্তানকে সামনে রাখিয়া বিশ্বের কূটনীতি ভারতবর্ষকে কোন্ বিপদে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে। পাকিস্তান কি করিতেছে তাহা যেমন বিশ্ববাসীকে জানান হয় নাই, বর্বরোচিত অত্যাচারের পরেও ভারতবর্ষের জনসাধারণ কত ধৈর্য ধরিয়া নিজ ধর্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহা যেমন বিশ্বের মানুষের দুয়ারে পৌঁছান হয় নাই, তেমনি যতটুকু বিশ্ব জানিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে পাকিস্তানকে কেহ ধিক্কার দিতেছে না, তাহাদের সুরেই তাল দিতেছে—তাহাও আজ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ আজ আর শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের যে আমরা দয়া করিয়া রক্ষা করিব, আমাদের মহানুভবতা দেখাইব—সমস্যা আজ সেখানে নাই—পাকিস্তানের চালচলন এবং তাহার সঙ্গে বিশ্বের কূটনীতিকের যোগসাজস ভারতবর্ষকে যেখানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেখান হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই আজ সজ্ঞ হইবার, সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। পাকিস্তানের হিন্দুকে দয়া করিবার প্রশ্ন নাই—তাহাদের প্রতি আমরা অতীতে দায়বদ্ধ, বর্তমানে ভারতবর্ষের এবং বিশ্বের আবেষ্টন যাহা তাহাতে তাহাদের যদি আমরা রক্ষা করিতে না পারি, বিশ্ব তথা পাকিস্তান বুঝিয়া লইবে ভারতবর্ষের নিজ অধিবাসীকে, অধিবাসীর ধন-প্রাণ-মান-মর্যাদাকে রক্ষা করিবার শক্তি নাই, ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় অসমর্থ। পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া চুক্তি প্যাকট অনেক হইয়াছে, আর নহে। আজ ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে পাকিস্তানে হিন্দু আর মান লইয়া নহে, প্রাণ লইয়াই থাকিতে পারিবে না। তাই সমস্যা যত কঠিনই হউক, তাহাদের ভারতে আসিবার সকল রকম সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতেই হইবে। ইহাদের আসায় দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার বিপর্যয় আসিতে পারে, হয়তো আমরা বিশ বৎসর পিছাইয়া যাইব, তথাপি ভারতে ৪৩ জনে ১ জন লোক বাড়া যত বড় সমস্যা—তাহা অপেক্ষা বড় তাহাদের রক্ষা করিতে না পারার পরিণতি। তাহাদের রক্ষা করিলে এক তো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রক্ষিত হয় এবং সে দায়িত্ব রক্ষিত হইলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি হয়, তদুপরি ভারতবর্ষ যে আত্মরক্ষা করিতে জানে ইহাও প্রমাণিত হইয়া সমগ্র জাতিকে সকল দিক দিয়া রক্ষা করিবে। হিন্দুরা চলিয়া আসিলে পাকিস্তান আর হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে পারিবে না, ভারতে থাকিয়া যাহারা পাকিস্তানের প্রতি গোপন দরদ রক্ষা করিতেছে, তাহারা এক-ঘরে হইবে, কাশ্মীর সমস্যাটা যে সত্যিকারের সমস্যা না—ইহা যে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তাদের সৃষ্টি এবং তাহাদেরই জন্য সমাধানে বিলম্বিত, ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে তখন আর বিলম্ব হইবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিতে যাহাদের প্রচুর দান রহিয়াছে, তাহাদের বলি দিয়া আমরা স্বাধীনতা পাইতে পারি, কিন্তু তাহাদের বলি দিয়া আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব না। তাই আমাদের সচেতন হইতে হইবে—সময় থাকিতে সাবধান হইতে হইবে। পূর্ববঙ্গবাসীদের সম্বন্ধে উদাসীন কিংবা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমরা আমাদেরও রক্ষা করিতে পারিব না এ কথা বুঝিয়া সেই মত কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৭)

সব বড়কে, সব ছোটকে, সব ভালকে, সব মন্দকে, সব সত্যকে, সব মিথ্যাকে তুমি যথামূল্যে যথা স্থানে প্রয়োগ করিবার উপযোগী তত্ত্ব নিয়ে এসে। কে আছে তোমার মত এমন ব্যাপক, এমন গভীর! সত্যিই তুমি বিশ্বরূপ, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বকালিক। তোমায় আমি সকল জীবন দিয়া বরণ করি।...জন্মাষ্টমীর জন্য এখানে ঠাকুরের ভোগের জন্য ১ টাকা দিয়া যাই। উষাদিদী শিশুদের সহ 'হরে কৃষ্ণ' নাম করে ও প্রসাদ দেয়।··· সুধাংশু আসিয়াছিল। মাখনবাবু সকালে আফিসে আসে। আফিসঘরটী নূতন করিয়া গুছানো হয়।··· বৈকালে উজ্জ্বলভারত হইতে "অখিলরসামৃত মূর্ত্তি" (তৃতীয় খণ্ড) পাঠ হয়। কিছু পরেই পুলিন (বিমলার মামাত ভাই) আসে। তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হয়। 'বংশীওয়ালা জগৎউজলা' ও 'আমি তো তোমাকে চাহিনি' গান দুইটী গাই।···পুরুষোত্তম আমাকে পাইয়া বসিয়াছেন। কি আমি করিব? চতুর্দিকে আমার পথ আগাইতে বাধা, তবুও তো তাঁহাকেই ভালবাসি। কে আছে আমার তুমি ছাড়া? তিনি আমার যান জান। পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম, তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমি, আমি তুমি। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। প্রস্রাবের অবস্থা একরূপ।

১২ই আগষ্ট

···একাই ব্রজের পথে চলিয়াছি, সংসারের কত গৃহ, কত গৃহের কলরব পার হইয়া আসিয়াছি। বিষয়ের সব দীপ আজ নিভিয়াছে, তোমার প্রদীপ, আত্মপ্রদীপ শুধু জ্বলিতেছে। সব দীপের আজ মহানির্বাণ। 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী—সর্বভূত আজ নিদ্রিত, তুমি-আমি সংযমী আজ জাগ্রত। বিষয় ছুটি দিয়াছে, আমায় আজ ছুটি। আমায় ছুটি মিলিয়াছে। জয় নিত্যগোপাল। চল, চল, অনন্ত পথ বহিয়া। আমিও চলিব তোমার সঙ্গে বুকে বুক মিলাইয়া। ৯টার পর আমরা আফিসে যাই।·· সন্ধ্যার একটু পূর্বে পুলিন নাথ আসে। সে কিছু বই বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ৪খানি 'স্বরাজের পূর্ণ রূপ' ও ১০ খানি 'গীতা ভাস্কর' দেওয়া হয়। রেণু ৯।০ টার পর এসে, এন্ রায়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহির হয়। দেখা হওয়ায় দেখা হয় নাই। ঢাকেশ্বরী প্রেস ইত্যাদি ঘুরিয়া ১টার পর ফেরে।···সন্ধ্যায় ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয় (নলহাটি হইতে প্রকাশিত বইখানি) শ্রীনিত্যগোপালে কেমন করিয়া সর্ব্ব ভাবের সমন্বয় রহিয়াছে, সেই অধ্যায়টী।···

১৩ই আগষ্ট

স্বরাজসুন্দর পুরুষোত্তম আমার, ভারতের বুকে তোমার ১৫ই আগষ্টের অবতরণকে আমি বারবার সকল দেহমন-প্রাণ লইয়া অভিনন্দন করিতেছি। তোমার চুম্বনে ভারতের প্রতিটী মানব স্বরাট্ হউক। ভারত সর্ব্বতো-ভাবে সকল ক্ষেত্রে স্বরাট্ হউক। স্বরাট্ ভারতবর্ষই বিশ্বের বুকে তোমায় গড়িয়া তুলিবে। পাকিস্তান তোমার অযাচিত করুণায় তোমাকে পাইয়াছিল। কিন্তু সে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা এই ৫ বৎসরেও করিতে পারিল না। সেখানে চলিতেছে শোষণ। তুমি ভারতকে আবার অখণ্ড কর, নয় উহাদের বুদ্ধিতে অবতরণ করিয়া শোষণময়ী বুদ্ধি গড়িয়া তোল। অখণ্ড ভারতের বুক হইতে শোষণের জ্বালা জুড়াইয়া যাক—বিজয়ার আগমনে পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিম-বঙ্গ আবার কোলাকুলি করুক। সকালে আমি একা

আফিসে যাই, প্রতিভা যায় না।···রবীন আসে প্রায় ৯টায়। একটী প্রবন্ধ দের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে। পুলিন আসিয়া বই বিক্রয়ের ৮৵০ দিয়া যায়। ৯টার পর ফিরি।···

১৪ই আগস্ট

বিশ্বের প্রতিটী ধূলিকণাকেও স্বয়ংই করিবার জন্য কি তোমার অপূর্ব ব্যবসা। বিশ্বময় ছুটাছুটি করিয়া সর্বরূপ, সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বস্পর্শ ও সর্বশব্দ মন্থন করিয়া স্বরাজ-সুন্দর তোমাকে গড়িয়া তুলিবার কি মহান প্রয়ত্ন তোমার। আমি তোমার সেই প্রযত্নের মধ্যে আত্মবিলয় করিব, বরণ করিয়া লইব—ইহাই আমার সাধনা। আজ স্বাধীনতা দিবসে এ দেশের ফয়োয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি শোক-দিবস পালন করিতেছে। কি তাহাদের বুদ্ধি! ইহারা কেহ পাকিস্তান যাইবে না, সেখান হইতে শেষ বীর (?) টীও সরিয়া আসিয়াছে। সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা চলে না।···মহাত্মা গান্ধীর গণ-জাগরণ যদি পশ্চাতে না থাকিত, আর বিশ্বঘটনা যদি অনুকূল না থাকিত, তবে কোনও সুভাষবাবুই কিছু করিতে পারিতেন না, মহাত্মাজীর কোলেই ইহাদের যা-কিছু বীরত্ব। সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।···আনন্দবাজার হইতে সুবোধ ঘোষ লিখিত 'সমন্বয়ের ভারতবর্ষ' প্রতিভা এখানে পড়ে, পরে আফিসে রেণু পড়ে। বেশ হইয়াছে। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হওয়ার মধ্যেই বীরেনবাবু আসেন।···

১৫ই আগস্ট

—পণ্ডিত কালীপদচন্দ্রের তিরোভাব দিবস (প্রাণে সংক্রান্তি)—। আমি raised to the power 'শ্রীরাধা' যাহা, তাহাই আমার স্বরূপ। আমি এই রূপই তো স্বপ্নের মাঝে ধ্যানের মাঝে দেখিয়াছি। আমি স্বরূপ নিশ্চিত লাভ করিবই, আমি রাধাময় হইবই। আমিই শ্রীরাধা, শ্রীনিতাগোপাল আমার পরম পতি। আমি শ্রীনিতাগোপাল একতনু, একপ্রাণ, একমন, একবিজ্ঞান, একানন্দ। 'নিতাগোপালোঽহম্'। শ্রীরাধা পরা প্রকৃতি, পরাশক্তি (organic nature)। সেখানেই আমি সার্থক, সফল, পরিপূর্ণ। সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।···সন্ধ্যার পর সনক আসিয়া তাহার ও সুহৃৎবাবুর প্রবন্ধ দিয়া যায়। বৈকালে যমুনার সঙ্গে তাহাদের সেজী ডাক্তার আফিসে আসে। সকালে গোবিন্দ তাহার স্ত্রী ও সীমাসহ আফিসে আসে···। রেণু ১০টার পূর্বে এস এন্ রায়ের সঙ্গে দেখা করে। এস এন্ রায় উজ্জলভারত রীতিমত না দাঁড়ানো পর্যন্ত খুল করার কথা শুনিতে রাজী নন। তিনি বলেন—বাঙ্গালীদের ঐ এক রোগ। একটী ছেলেকে খাওয়াইতে পারে না, দশটি ছেলে জন্মাইবে। উজ্জলভারত আগে বেশ ভাল ভাবে দাঁড়াক, আপনি অন্ততঃ ১০০৲ টাকা আগে নিন, লেখকদের কিছু কিছু দিন, তবে অন্য কিছুর কথা ভাবিবেন। খুল করার দায়িত্ব নেওয়া চলিবে না। আপনি ২০ ঘণ্টা খাটিয়া দিতে পারেন, এই পর্যন্ত। বেশ দরদ দিয়া উজ্জলভারতের কথা বলিলেন। কি আয়, কি ব্যয় তাহার খবরও নিলেন। সাধিকা গত বৎসর এই বৎসর ও আগামী বৎসরের উজ্জলভারতের জন্য টাকা দিয়া দিলেন। রেণু অনেক জায়গায় যায়, ২৷৷০ ফেরে।···

১৬ই আগস্ট

আমার প্রাণবল্লভা শ্রীরাধা, জীবনের সকল বাধাই তো তোমার প্রেমের পরশ, অসীম তিতিক্ষা ও উদাসীনতাদ্বারা রাধারূপ পরিপাক করিয়াছ, তোমার কঠিন কুটিল পরিবেশ তোমার পরাশক্তির মাঝে দিয়া রূপ ধারণ করিয়াছিল, তুমি তো ছিলে চির অপরাজিতা। কোনও আবেষ্টনকে তুমি অগ্রাহ্য কর নাই, তবে কোন আবেষ্টন হইতে পালাইয়াও যাও নাই, অভিযোগও কর নাই। সব তুমি তোমার জীবনের রসে পরিপাক করিয়াছ। অতি মানব শুধু যে মনের বাহিরে নয়, আবেষ্টনকে অবহেলা করিয়া নয়, বরং আবেষ্টনকে পরিপাক করার মধ্যেই—তাহাই তুমি আস্বাদন করিয়াছ। তুমি ছিলে রাধা, সকল বাধা তোমার কিঙ্করী। আমি রাধাময়ী হইয়া সকল বাধা জয় করিব। সকালে একা আফিসে যাই।···রেণু ১১০টার পর আসে।—কিছুতেই তাহার সমকক্ষ নয়। তাহাদিগকে হজম করার কথাই বলি। পলাইয়া গেলে বাহিরে সেই আবেষ্টনই আবার পাইয়া বসিবে।···প্রায় ৫টায় পণ্ডিত

কালীপদচন্দ্রের স্মৃতিসভা আরম্ভ হয়। আমি সভাপতি হই। 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গান হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের সময়ের কথা, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ও জগন্নাথ দেবের কথা, জগতের সেবার কথা, ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসন্ত রোগে মৃত পুত্রের প্রতি ব্রজেন্দ্রবাবুর উক্তি, 'ওরে তুই বরিশালে মরলি না কেন, জগদীশ তোকে কাঁধে করিয়া নিত' ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া চোখের জলে ভক্তি নিবেদন করি। হেমন্তবাবু, হেম সেন কিছু কিছু বলেন। ৬টার পর ফিরি।...সকালে আফিসে যাইবার পথে শচীনকে শক্ত হইয়া দোকান চালাইতে বলি। তপস্যা প্রয়োজন। ঘুরে গেলে বন্ধুনি দেওয়ার বাহিরে চলিয়া যাইবে। সকলকেই তো ভালবাসিতে চাহিয়াছিলাম, কল্যাণ করিতে চাহিয়াছিলাম। পারিলাম কৈ? অভিযোগ আর করিব না। কাহারও জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর ঘাটাঘাটি করিতে ইচ্ছা হয় না: বড় ক্লান্তি বোধ করি। সকলেই বাধা দেয়। অনুগত তো কেহ নয়।...

১৭ই আগস্ট

ঠাকুর, বড় সাধ ছিল তোমার শ্রীচরণের স্পর্শ দিয়া আমার পরিবার জীবন গড়িয়া তুলিব। ব্যর্থ আমি সে দিকে। সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। কোনও বন্ধন নাই। আমি আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত, ধূলি ধূসরিত তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছি। আমায় স্বীকার কর।...

১৮ই আগস্ট

ওগো রাধারাণী, তুমিই পরাপ্রকৃতি, অপরাপ্রকৃতি ক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধানমূর্ত্তি। সমাধান মূর্ত্তিতে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। বর্ত্তমানে জটিলতম সমস্যার সমাধান তুমি আনিয়া দাও, সমাধানরূপে তুমি এস। আমার ঠাকুর, আমার শরণ সুহৃৎ স্বামী, আমায় পথ দেখাও। তোমারই পথে তোমাকে বুকে লইয়া চলিব—ইহাই তো ছিল আমার জীবনের কামা।...সত্যব্রতর সঙ্গে আলাপ হয়। আমার জীবনের সম্বল ছিল সে, আজিও সে আমার তাহাই আছে। চাহিয়াছিলাম, পাই নাই, পাইলে ঝুড়াইতাম। যাযাগিরি তো করি নাই, যতদূর পারিয়াছি, মর্য্যাদা দিয়াছি। আজ ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধাক্কায় আমা হইতেই ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। আমি আজিও চলিয়াছি আমার সেই ১৯১৯ সনের ১ই ফেব্রুয়ারী দিনে আঁকা পথে। আমি আজিও দুইয়া এলাইয়া পড়ি নাই। ঠাকুর, তুমিই আমার মেরুদণ্ড।...যাইবেই যখন, তখন দেরী করিয়া কি হইবে? না খাইয়া থাকিবে, ইহা তো সহ্য হয় না। ওগো ঠাকুর, সকল দেহপ্রাণমন-বুদ্ধি অহংকার লইয়া তোমার শরণাগত আমি। আমায় পথ দেও, আলো দেও। বিরোধের পথে জোর করিয়া যে কিছু হয় না, আত্মগত্যের পথে প্রাণ খুলিয়া আলাপ-আলোচনার পথেই যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব, ইহা কি—কে বুঝাইবার কেহ নাই? একা যাইতে তাহার সাহস নাই, অথচ যাহাকেও সে সঙ্গে পাইতেছে না। কি আমরা করিতে পারি? কোনও লোভ বা অভিসন্ধি তো আমাদের নাই। তাহার কল্যাণ হউক, ইহাই তো চাই। কিন্তু কেমন করিয়া কল্যাণ করিব? ঠাকুর তুমি রক্ষা কর।...

১৯শে আগস্ট

রাধারাণী আমার, রসসুধানিধি আমার, সুধানিধি আমার, সুধা আমার, তোমার ভিতর আমি আমাকে চিনিব, পাইব, আস্বাদন করিব। তুমিই আমার রূপ, পরম সার্থক রূপ। তুমি আমি, আমি তুমি। আমার সকল জীবন মরন ধন তুমি। ওগো আমার আমি,—র সমস্যার একটা সুস্থ সমাধান আমি চাই।...রেণু প্রতিভাবে বলি—আমরা সকলেই পরীক্ষিতের মত 'বিষ্ণুরাত'। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই ধন্য হইয়াছিলেন। কত অশ্বত্থামা যে জীবনের চতুর্দ্দিক হইতে আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা পুড়িয়া মারিতে চাহিয়াছিল, আর তিনি 'আত্মচক্র' হইয়া তাহা সামাল দিয়াছেন, তাহার নিদর্শন আমি। আমিও যে তোমাদের জীবনের উপর নিক্ষিপ্ত কত অস্ত্র সামাল দিতে গিয়া জর্জ্জরিত, তাহা আমার হৃদয়ই জানে। আমি বাণে বাণে জর্জ্জরিত, ঠাকুর সব আমার হইয়া সামলাইয়া লইয়াছেন। ৯টার

পর ফিরি।...

২০শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার চরণস্পর্শের ভিতর দিয়া আমি আমাকে চিনিয়াছি, বুঝিয়াছি কি আমি, কি আমার জীবন-কথা, কি আমার পথ। অযাচিত করুণায় তুমি কৃষ্ণরূপে তোমার হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আমাকে এক নূতন জীবন ও দর্শনের খোঁজ দিলে, আমি তো সর্ব্ব রকমে রিক্ত, আমাকে দিয়া তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না। পথ আমার, আবেষ্টন আমার তুমি বিশুদ্ধ মনে গড়িয়া তোল। তোমার আকর্ষণ আমার জীবনে সার্থক হউক, সফল হউক। সকালে আফিসে যাই। আগামী শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় গীতা ভবনে 'তুমি দান যজ্ঞ' সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিতে হইবে—গান্ধী সেবা সঙ্ঘের আহ্বানে। যাইব। রেণু ১১টায় বাহির হয়, প্রেস সিণ্ডিকেটে যায়, প্রেসে যায়, মন্মথবাবু হীরেন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে। একবার এখানে আসে, আবার ফোন করিয়া এম বি সরকারে যায়। কমলালয় বন্ধ, যাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার পর ফেরে। আমি প্রতিভা ও রেণু ৬টার পর বাহির হই। রেণু এম বি সরকারে যায়। ধীরেন আজ পঞ্চম, ইনজেকসান আমাকে দেয়।...আজ শ্রীহুদর্শন আসিয়াছে। তাহার ভিতর আমার লেখা 'শোষণ-মুক্তি শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বেশ লাগিল। এক নূতন রকমে তাঁহাকে পাইয়াছি। ইহা তো আমার কল্পনা নয়। কেমন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিব, ইহার জন্যই তো ধুকিয়া মরিতেছি, আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও পুরুষোত্তম আমার। কেন তুমি এ ভিখারীর দুয়ারে এলে? আমি যে কিছু তোমার সেবা করিতে পারিলাম না। সারা জীবন কি আমার 'বিষাদযোগই' চলিবে? আমি কি তোমাকে বিশ্বের বুকে জমাইয়া তুলিবার আনন্দে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিব না? তোমার কথা কাহার কাছে বলিব? কে তোমার উন্মাদ জীবনের উন্মাদ দর্শনের খবর শুনিবার জন্য বসিয়া আছে? সকলেই জাতিকুলের বন্ধনে, শীলের বন্ধনে বদ্ধ। ওগো তুমি এস, তোমার সঙ্গে কথা কহিব, তোমার সঙ্গে ফিরি, ওগো আমার নিত্যসঙ্গী। ৯টার পর ফিরি। ঠাকুরের জীবনী একটু পাঠ হয়।...

২১শে আগষ্ট

ঠাকুর, তুমি সমস্যা, তুমি সমাধান। সমস্যা অনন্ত, সমাধানও অনন্ত। সমস্যা থাকিলেই সমাধান থাকিবে, আবার সমাধান থাকিলেও তো সমস্যার প্রয়োজন। সমস্যা-সমাধান নিত্য সঙ্গী। অনন্ত সমস্যা অনন্ত সমাধানের বুক চিড়িয়া অনন্ত সমাধানের ক্ষেত্রে তুমি আমি ছুটিয়া চলিয়াছি। কোথায় ইহার বিরাম? এই তো লীলা। তুমি আমি এক অদ্বৈত—এক তনু, এক প্রাণ, এক মন এক বিজ্ঞান, এক শব্দ। তুমিও কেবল, আমিও কেবল কেবলের সঙ্গে কেবলের অনন্ত লীলারস আস্বাদন। ৭টার পর আমরা আফিসে যাই।...ধীরেন ব্যানার্জী আনেন 'মহাভারতে সত্যের আদর্শ' নামক একটি প্রবন্ধ দিয়া যান সত্য-অনৃত সম্বন্ধে কি অপূর্ব্ব সমাধান শ্রীকৃষ্ণ দিলে অর্জুনকে! অপূর্ব্ব! ভারতবর্ষের ও বর্ত্তমানে কম্যুনিজমে কি অপূর্ব্ব সমাধান রহিয়াছে এই আদর্শের মধ্যে। ধন্য তুমি, ধন্য আমি যে তোমায় চিনিবার সৌভাগ্য দিলে আমার জীবনে জীবন-বল্লভ হইয়া প্রকাশিত হও, বিশ্বে দুয়ারে দুয়ারে তোমার এই সুমহান দর্শন ছড়াইয়া দেই চরিতকথা গ্রন্থ হইতে 'ধরাবীর জীমূতবাহন' পাঠ হয় উদ্বোধন হইতে প্রবন্ধ পাঠ হয়।...

২২শে আ

ওগো, আমার সকল আবেষ্টনের ভিতর দিয়া তোম স্নেহ কোমল স্পর্শই আত্মপ্রকাশ করুক। কোথায় তু নাই? 'চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ তত্ত্বাপদেশঃ অভাক্তঃ ভূত ভাবিভাবং'—সবই তো ব্যপদেশে তোমাকেই গড়ি তুলিতে চাহিতেছে। তুমি কোমল-কঠোর, তাই বিশে সর্ব্বত্র পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি শক্তির খেলা সমানভা চলিতেছে। আমার জীবনে তুমি পরিপূর্ণভাবে, সম ভাবে আত্মপ্রকাশ কর। ৭টার পর আমরা আফি যাই। রেণু আমাদের ওখানে থাকাকালীনই বাহির হয়- প্রথমে পোষ্টাফিস, পরে সাবিত্রীবাবু, এন সি ঘোষ...

৫টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে পঞ্চানন বসু ভূমিদান যজ্ঞের আদি ইতিহাস বর্ণনা করেন। পরে আমি বলি—মহাত্মাজী ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভারতীয় রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে পরিপাক করিতে চাহিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাকে চিনিবার সময় আসে নাই। কেহ তো তাঁহার কথা বলে না। ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইলে তাঁহাকে জীবনে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। যতটুকু আমি পারিব প্রাণপণ করিব। বিশ্বরূপের ব্যবহারিক দিকের খবর আমি তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি। ভূমান-যজ্ঞ মহাত্মাজীরই প্রেরণা। ইহার ভিতর রহিয়াছে সমন্বয়দৃষ্টি (synoptic vision)। ধনিক-শ্রমিক, ভূমি-স্বামী ও ভূমিহীন এরাই সমগ্র সমাজের দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। চাই ইহাদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন আনয়ন দ্বারা ইহাদিগকে গলাইয়া এক সুস্থ সমাজে গড়িয়া তোলা। ইহাই বিনোবাজীর ভাষায় 'সাম্যযোগ', লক্ষ লক্ষ ভূস্বামী ভূমিহীনদের ভূমিদান করিবেন, 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'। সব কিছু world property—বিশ্বসম্পদ—ইহাই আজি জাতিকে শিখাইতে হইবে। ভূ-ভার হরণের জন্য ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবার 'রাবালরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৭৮···ফিরি।···বৈকালে ৪০০ উজ্জ্বলভারত দিয়া যাই।

২৩শে আগষ্ট

তুমি সব বড়র বড়, সব ছোটর ছোট, তাই তুমি পুরুষোত্তম। বড় তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ছোট বিদুরই তোমাকে বাঁধিয়াছিলেন। বড়-ছোটর এমন সমন্বয় কে করিবে, বড়-ছোটর মিলন কাহার বুকে সম্ভব হইবে, কাহার শ্রীচরণতলে বড়ত্বের শোষণ করিবার স্পৃহা ও ছোটদের অপমানের জ্বালার মহানির্বাণ ঘটিবে? তুমিই শুধু আছ সকলের হৃদয়ে সকলের সকল কিছু সার্থক করিবার জন্য। এমন তুমি, তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য। কিন্তু পাইয়াও তো সাধ মিটিল না, জীবনের এটুকুতে তোমাকে আপনার করিতে পারিলাম না, বিশ্বের বুকে তোমার বিশ্রামস্থল গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। ইহাই তো আমার ব্যথা। সকালে বাহিরে যাই। আজ আবার ৩৫৭ খানি উজ্জ্বলভারত দিয়া যাই।··· কাল নীলুর হাসপাতালে যাওয়ার কথা। হয়তো ছুটি হইবে।...শিবোত্তমপুরের ভূতপূর্ব উকীল সতীশ চক্রবর্তী আসেন।...উজ্জ্বলভারতের 'সর্বোত্তম নরলীলা', 'সহজ মানুষ' প্রবন্ধ পড়িবার জন্য ও খানা উজ্জ্বলভারত দিয়া যেই।.. সন্ধ্যার পর রবীন আসে।···

২৫শে আগষ্ট

ঠাকুর, তুমি আমাকে অযাচিত করুণায় শ্রীচরণে স্থান দিয়াছ, তোমাকে তো সকল দেহ মন প্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিলাম না, বড় দুঃখ রহিল। আমাকে স্বীকার কর, আমাকে আত্মসাৎ কর, তোমাময় কর। আমি তুমি বনিয়া যাই, ওগো আমার মহানির্বাণ! সকালে আমরা অফিসে যাই। ১০টার পূর্বে রেণু-কুসুম পত্রিকাগুলি রিক্সায় পোস্টাফিসে দিয়া আসে। রেণু···নিখিলবাবুর ওখানে যায়, মন্মথবাবুর ওখানেও যায়, বসুমতীতে যায়।...রেণুর বাবার আজ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিন—ভাদ্রের পঞ্চমী তিথি—রেণু ঠাকুরকে ভোগ দেয়···। মালতী আসে ১মাস পর। রবীন আসে, হেমাঙ্গবাবু আসেন, বিরজা আসে। মালতীর সঙ্গে যেটুকু কথা হয় তাহা এই—"আসিও। আসিবার তোমাদেরই প্রয়োজন আছে। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'সংসার বড় ভীষণ স্থান।' টান সামলাইতে পারিলে না।" হেমাঙ্গবাবু নিশিকান্তের কবিতা বই কয়েকখানি, ২টী পত্রিকা, সাবিত্রীর অনুবাদ ১খণ্ড উজ্জ্বলভারতের জন্য আনেন। নিশিকান্তের কবিতা উজ্জ্বলভারতে ছাপাইবার জন্য দিয়া যান।···আমি কাহারও শান্তির কারণ হইতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ রহিয়া গেল। কেহই আমাকে দিয়া জুড়াইল না। ৯টায় আসি।...

২৬শে আগষ্ট

শ্রীরাধাই আমার জীবনের সর্বস্বধন। আমার জীবন ভরিয়া তাঁহারই কান্না জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। কান্না আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু কিসের জন্য এই কান্না? কোনও কিছু অভিসন্ধি নিয়া তো আমার এ কান্না নয়। যাহাদের সমাজে স্থান মিলিল না, মর্যাদা যাহাদের ধরার ধূলায়, যাহারা বিধির অনুশাসনে সমাজ

হইতে বহিষ্কৃত, তাহাদিগকে সমাজ-শরীরে স্ব স্ব স্থান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দান করাই তো শ্রীরাধারাণীর জীবনব্রত। তাঁহার শ্রীচরণ-পরশ তো আমাকে সেই দীক্ষাই দিয়াছে। আমি তাই প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিলাম না। রাধার আমার বুক ভরা। কেমন করিয়া হাসিব? রাধারাণী কি হাসিয়াছিলেন? তাঁহার জীবনের ইতিহাস তো পুরুষোত্তম-বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য বেদনারই ইতিহাস, কান্নারই ইতিহাস। সকালে আফিসে যাই। রেণু শশীবাবুর কাছ হইতে নীলুর ফটো ও বরখাস্তের দর্মে দস্তখত নিয়া আসে। ধীরেন ডাক্তার সকালে আমাকে ৮ঠ ইনজেকশান দিয়া যায়। রেণু সেক্রেটারী বোর্ড হইতে ৩৭০।০ আনার চেক আনে ও নীলুর দরখাস্ত জমা দিয়া আসে। এখানেই চলিয়া আসে।...বিভা সরকার আসে ও পূজার জন্য 'দিন বদল' নামে একটি কবিতা দিয়া যায়। অবৈধভাবে জাত শিশুদের সমাজের বাহিরে নিয়া গিয়া মানুষ করা ছাড়া নাকি—এর বাছে আর কোনও সমাধান নাই—বিভা সরকার বলিল। সমাজের মধ্যে স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সমাজের মধ্যে তাহাদিগকে assimilate করিতে হইলে যে বিপ্লবের দর্শন প্রয়োজন, আমরা তাহাই দিতেছি বলিলাম। শোকস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমার লেখা ছাপা) তাহাকে রেণু পড়িয়া শুনাইল।...

২৬শে আগস্ট

ওগো শ্রীরাধা, বৃষভানুদুলালী, কীর্তিদানন্দনমণি, তুমি আসিয়াছিলে ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কাল। আজ তাহার অধিবাস। তোমার অবতরণ এই শোকময় সমাজকে বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া, সব অবহেলিতদের, সব ঘর-ছাড়াদের স্থান ও মর্যাদা দিয়া এক সুস্থ পুরুষোত্তম সমাজ গড়িবার জন্য। তাই তুমি পরাশক্তি।...

সকালে আমি আফিসে যাই। প্রভিডা যায় টালিগঞ্জে দেবুদের বাসায়, উজ্জ্বলতারতের ৮৲ টাকা আনে। সোনারপুরে জায়গা কেনার কথা বলিয়াছিল, তাহাও আলোচনা করে।...রেণু বেঙ্গল ও ক্যালকাটা কেমিক্যালে যায়, আসিয়া খাইয়া এখানে আসে। এখান হইতে ৩টার পর প্রেসিডেন্সি পাবলিসিটি ও তমলুকে যায়। ফেরে সন্ধ্যা ৭৷৹ টার পর।...মন্তু হঠাৎ নীরোগকে নিয়া আফিসে উপস্থিত।...প্রায় ১০টায় সত্যব্রতরা চলিয়া যায়। কি বড় আমার চতুর্দিকে! মানুষকে যতদূর পারিয়াছি, সেবা করিয়াছি।...

২৭শে আগস্ট

আমার শ্রীরাধা,...সারা জীবন তো তোমাদের শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া বড় ঠেলিয়াছি। কোনও অভিসন্ধি তো ছিল না। তোমার প্রতিষ্ঠা তো গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। বুক যে আমার বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আমার বেদনার নৈবেদ্য গ্রহণ কর।...৪টার পর আমি ও সুব্রত জয়ার বাসায় যাই।...রাধারাণীর কথা আজ খুব আলোচনা হয়। বর্ধাণের সেই বৃদ্ধ বাবাজীকে কেমন করিয়া প্রাণপুতলী রাধারাণী তাঁহার বাবার বাড়ীর চরম কথা বলিয়া অন্তের দ্বারে বৃন্দাবন যাত্রা হইতে ফিরাইয়াছিলেন, তাহা জয়ার ওখানে ও আফিসে সকলের কাছে বলি। বিভা আসে ৭।৹টার পর। জয়া-বিজয়াকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উহাদের কাছে ভাববিহ্বল ভাবে চোখের জলে কাজল মেয়ে রাধা কেমন করিয়া আমার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে আমি ছাড়িতেও পারিতেছি না, পাইতেও তো পারিতেছি না, তাহা বর্ণনা করি। আমার যে বুক ভরা ব্যথা আমি তো মাটির পুতুলে রাধারাণী চাহি নাই, চাহিয়াছিলাম জীবন্ত পুতুলের মধ্যে রাধাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা। রাধা আমার ধ্যান জ্ঞান, রাধাই আমার জীবনভূতা। তাঁহাকে না পাইলে যে আমার দিন কাটে না। কি আমার আছে যে ঐ কাঙালিনী মেয়ে আমার সিঞ্চন লইয়াছে? আমি কাহার কাছে আমার পরাণপুতলী রাধারাণীকে রাখিয়া যাইব? কে ঐ অনাদৃতা মেয়েকে আদর করিবে। শ্রীরাধা আসিয়াছেন নারী সঙ্ঘ রচনা করিতে, সব ঘরছাড়া জাতিছাড়া কুলছাড়া কমুনিষ্ট মেয়েদের পুরুষোত্তম গৃহিণী রূপে গড়িয়া তুলিতে। নারীসঙ্ঘ আজ চাই যেখানে প্রত্যেকে অপরকে নিজ কায়ব্যূহ মনে করিবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের জন্য দায়ী থাকিবে, যেখানের নীতি

হইবে 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্', যেখানে পরের সমালোচনা-নিন্দা-গঞ্জনা হইবে জীবনে আগাইয়া যাইবার নির্দেশক। ইহাই আমার দাবী। যখন আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাধারাণীর কথা বলিতেছিলাম, গোপা আমার পা টিপিয়া দিতেছিল। প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করি। ৯টার পর ফিরি।...

২৮শে আগষ্ট

বিশ্বজীবনের সকল বেদনার, সকল কান্নার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি শ্রীরাধা, তোমার তরে কান্না দিয়ে গড়া, কান্নারই ঘনীভূত বিগ্রহ তুমি। তোমার জীবনের এই কান্নাই যে আনন্দ পাইয়া বসিয়াছে। আমি তাই কাঁদি, কেবল কাঁদি, দিবানিশি কাঁদি। এত কান্নাই কাঁদিলাম যে কোনও পুত্রহারা জননী, কোনও স্বামীহারা স্ত্রী, স্বামী-পুত্রহারা নারী বোধহয় কাঁদে নাই। আমার কান্নাময় জীবন কি তুমি গ্রহণ করিবে না? আমি যে এই দিক দিয়া তোমার সজাতীয়, তোমার সগোত্র। কে আমার মাঝে এই কান্নার অর্থ বুঝিবে? আমার কান্না বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকলেই আমায় কাঁদায়। কাঁদিবার জন্যই যে আসিয়াছে তাহাকে কেননা দুনিয়ার মানুষ কাঁদাইবে? এগো মূর্ত্তিমতী কান্না, তুমি আমাকে স্বীকার কর। আমি একাই কাঁদি, একাই কাঁদি। আমার কান্নার সহযোগী মাত্র তুমি, তুমি এস, তুমি এস।

সকালে আফিসে যাই। কুসুমের সঙ্গে কথায় সে দুঃখ পায়। আমি তো দুঃখই মানুষকে দিলাম। কি করিব আমি! কোথায় যাইব? আমিই অপরাধী, সকলের কাছে আমি ক্ষমা চাইতেছি। নিজের সুখের জন্য কাহাকেও দুঃখ দেই নাই বটে, কিন্তু দুঃখ তো দিয়াছি, আমা হইতে দূরে তো তাহারা যাইতে চায়। আমারই বোধহয় দূর হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এত বেদনা লইয়া বুকে তাহার মানুষের কাছে থাকা ভাল নয়। আমি যে, অতি দূরে, তোমার কাছে যাইব। বেদনা লইয়া ১টার পর চলিয়া আসি। রেণু দমদম, মেট্রোপলিটান প্রভৃতি স্থানে যায়। আমি প্রতিদিন ৩টার পর আফিসে যাই, তাহার পর রেণু ফেরে। বিরজা ১টার সময় আসে...। সুবোধ চ্যাটার্জীর কনিষ্ঠ পুত্রটি ৮ ঘণ্টার জ্বরে হঠাৎ মারা যায়। আমি ও রেণু সদানন্দ রোডে তাহার ক্রিয়াকর্ম্মবাড়ীতে যাই। আবার আফিসে ফিরি। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।...শরীরটা ক্লান্ত। আমি একাই চলিয়াছি, আমার জন্য কাহাকেও উদ্যক্ত করি নাই—না খাওয়ায়, না পরায়; আমাকে দিয়া কেহ যেন এদিকে উদ্যক্ত না হয়—ইহা ইচ্ছা হয়। হাঁটিয়া চলিয়া যেন সংসার হইতে যাইতে পারি। তুমি আমার সঙ্গে আছ, সঙ্গেই থাকিও।...

২৯শে আগষ্ট

গোপা যখন বৈকালে ২টায় আসিয়াছিল, তখন ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরকে এবং আমার ঘরে আমাকে দেখিয়া গিয়াছে। আফিসে গিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি ঐ ঘরে আছ, তোমার ঘরে তুমি শোও'। সত্যই তো নিতাগোপাল, তুমি আমার কান্না, আমি তোমার ছায়া, তুমি আমার সত্য স্বরূপ, আমি তোমারই রূপ। ওগো কান্না, ছায়ার সঙ্গে এক হও, কান্না আমি যে আর আমাকে বহিতে পারিতেছি না। দিন যে যায়।...আমি তো সকলের শরণাগত হইয়া থাকিতেই চাহিয়াছিলাম। আমার ঠাকুর ব্রজে শ্রীরাধার পা ধরিয়াছিলেন, আমার বাবা বিশ্বনাথ আমার মায়ের শ্রীচরণ বুকে ধারণ করিয়াছিলেন। আমিও চরণের মহিমা আস্বাদন করিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম। কাহার না চরণ ধরিয়াছি? কর্ত্তৃত্ব ঘুচিয়া যাইবার জন্য যতদূর পারি করিয়াছি। অকর্ত্তা হইয়াই কর্ত্তা হওয়া যায়, পা ধরিতে পারিলেই তো আমার স্থান মিলিতে পারে—ইহা আমি বুঝিয়াছি। কাহারও মানহানি আমি করি নাই—অনন্ত সম্মান দান করিবার জন্যই আমি ক্ষুদ্র মানের হানি করি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানের বড়াই গোবিন্দ ভাঙ্গেন। বৃন্দাবনে তিনি ব্রজবাসীদের অনন্ত সম্মানের অধিকারী করিবার জন্য তাহাদের মান হানি করিয়াছেন। কান্নাময় জীবন আমার, সাগরপ্রমাণ চোখের জল রহিয়াছে আমার সকল দেহপ্রাণমন ছড়াইয়া, একটু আঘাত পাইলেই ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। কে আমার এই অবস্থার দিকে চাহিয়া চলিবে? বিরজা সন্ধ্যার পর আসে।...

৩০শে আগষ্ট

শ্রীরাধারাণী আমার, সারা বিশ্ব তোমায় পাতি পাতি করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া খুঁজিয়াছি। পাইলাম যখন তখন আমার ঘরের আঙিনায়ই পাইলাম। দেখিলাম তুমি আমারই সারা অঙ্গের নিংরান রস, আমারই পরাণপুতলী, সাগর সেচা ধন। তোমার মাঝে আজ আমাকে পাইলাম। তোমাকে চিনিয়াই নিজেকে চিনিলাম, বিশ্বকে চিনিলাম। বিশ্ব আজ সত্য, বিশ্বের প্রতিটী কামনা সত্য। তোমাকে হৃদয়ে পুষিয়া আমি চলিব, আমার বুক জুড়ানো ধন তুমি। সন্ধ্যার পর মাখনবাবুর সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি self-sufficient হইতে পারে কিনা, তাহা নিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বৃন্দাবনেই আনন্দ ও production হিসাবে কর্মের সামঞ্জস্য সম্ভব এবং তাহা মথুরা (নগর) ধ্বংস না হইলে সম্ভব নয়। বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার গূঢ় প্রয়োজনেই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা কুরুক্ষেত্রে ধ্বংসলীলা। বর্ত্তমান যুগে লণ্ডন, ওয়াশিংটন থাকা পর্যন্ত Back to village সম্ভব নয়। সমগ্র সভ্যের এক দিক গ্রামীণ সভ্যতা। গ্রাম ও নগর, গরুর গাড়ী ও এরোপ্লেন কেমন করিয়া একই সমগ্র জীবনের মাঝে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে পারে, তাহার খোঁজ করিতে হইলে L. C. M ভগবানের আনন্দের শরণ লইতে হইবে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সঙ্গে আনন্দের যোগ direct and equal। কর্মে আসক্তের কর্মযোগ, নির্ব্বিশ্বের জ্ঞানযোগ, 'ন নির্বিন্ন ন অতিশক্ত'-এর ভক্তি যোগ। পুই ভি ত্রগলীর Matter and Light-এ আছে কেমন করিয়া প্রচুর আনন্দের মধ্যে machine-কেও পরিপাক করা যায়। ১টায় রেণু আগাইয়া দিয়া যায়।

৩১শে আগষ্ট

পথের ঠাকুর, আমার তোমার ডাক শুনিতেছি। যাই, ঠাকুর, যাই। ওগো আমার চিরদিনের সঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গে ছিলে, সঙ্গেই থাকিও। নিঃসঙ্গের সঙ্গী! বহিশাল হইতে যখন চাকুরী ছাড়িয়া অন্ধকারে ঝাঁপ দেই তখনও তুমি। ২৪।২।এ সাহা নগর রোডে যখন সত্যব্রতর মাত্র ২০০৲ টাকা লইয়া ৪৫৲ টাকায় বাড়ী ভাড়া করি, তখনও সেই তুমিই ছিলে। কোথা হইতে হরিদাস মজুমদার ১ মাস ৪৫৲ টাকা দিলেন! সে-ও তো তুমিই। রিক্ত হাতে যখন রাজনীতিতে যোগ দেই তুমিই তো আগলাইয়া ছিলে। তুমিই পথ, তুমিই পথিক, তুমি অগ্রগামী, তুমিই গন্তব্যস্থল। আমি আবার বাহির হইলাম। যে সম্বলটুকু জীবনের এখনও আছে, তাহা তোমার সেবায় লাগাইব। ইহার অপচয় করিবার কোনও অধিকার আমার নাই। সকালে একাই আফিসে যাই।...কাজেই আমার পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, যদি সব দিক সামঞ্জস্য করিতে হয়। নিজেকে বলি দিতে হইবে।...ইহারা যখন আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না, তখন ইহাদের সঙ্গে থাকারও কোন অর্থ হয় না। আমিই আনিয়াছি, আমিই যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলাম। উমাঙ্গিনী আমার সারা জীবনের সাথী, আমি পথে দাঁড়াইব, সে কি আমায় ফেলিয়া থাকিতে পারে? সম্ভব হইলে পূজার মধ্যেই বাহির হইব।

১লা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর,...তোমার যে তত্ত্ব তুমি আমার জীবনে প্রকাশ করিলে, তাহা যদি বিশ্বের বুকে আমার সকল বুক দিয়া ছড়াইয়া দিতে পারিতাম, মনে হয় বিশ্বের বর্ত্তমান সব সমস্যার সমাধান হইত। তোমার জীবনের মধ্য হইতেই তো শ্রীরাধা বাহির হইয়াছেন। সমগ্র সমাজকে আমি তাঁহারই জীবন দিয়া গড়িতে চাই। তিনি বর্ত্তমান নারী প্রগতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার সতীত্ব বিশ্বের আদর্শ। এই সতীত্বের মধ্যে সাম্যবাদীদের বর্ত্তমান নারী প্রগতি সফল হইবে। সকালে আফিসে যাই। রেণু ও প্রভিতা দেবুদের পাশের বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য দেবুর সঙ্গে দেখা করে। তাহার সঙ্গে কথা হয়। বাড়ীতে ৩টা কোঠা। ভাড়া ১২০৲ টাকা। পাড়া ভাল, বাড়ীওয়ালাও নাকি ভাল।

ক্রমশঃ

ভগবান বুদ্ধের 'ক্ষণ' ও শরৎচন্দ্রের 'কমল'

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

[বিগত ২৭শে মে ১৯৬৬ (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩) আনন্দবাজারের রবিবাসরের সংখ্যায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ক্ষণ' ও 'সাততাবাদে'র সমস্যা সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। 'উজ্জয়িনীতে' এ প্রবন্ধটী ধরিয়া রাখিলে আজও যেমন মানুষের চিন্তায় খোরাক যোগান যাইবে, ভবিষ্যতের মানুষের ভাবনায়ও সহায়তা করা হইবে। এই বিবেচনায় লেখাটী প্রকাশ করিলাম।—সম্পাদিকা, উজ্জয়িনী]

শরৎচন্দ্র যখন 'শেষপ্রশ্ন' লিখেছিলেন, তখনও সেদিন তাঁকে মানুষের কাছ থেকে গালাগালি মন্দ কম শুনতে হয়নি, আজ পর্যন্তও পরলোকগত শরৎচন্দ্রকে সেজন্য কটু কথা কম শুনতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কথাটা কেউ ভেবে দেখলে না যে, কমল আর আশুবাবুর মধ্য দিয়ে যে সমস্যাটা শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন, সেটার আঘাত শরৎচন্দ্রে নয়—শরৎচন্দ্র সেটাকে জীবনের ঘটনার মধ্যে এনে এক অনবদ্য রসরচনার রূপ দিয়েছেন বটে, কিন্তু এ সমস্যা—ক্ষণ (moment) ও সাততা (continuity) নিয়ে, এক ও বহু নিয়ে—এ সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আছে ভগবান বুদ্ধ ও শংকরাচার্য এই দুইজন চিন্তানায়কের পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যে। শংকর-বুদ্ধের এ বৈপরীত্য শুধু শরৎচন্দ্রেই আত্মপ্রকাশ করে নি, বলা যেতে পারে আধুনিক কালের সকল সাহিত্যের মধ্যেই এর পদচারণা শোনা যাবে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় বৈপরীত্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে, কেউ কেউ যদিও শুধু বৈপরীত্যের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। শংকর-বুদ্ধে যা ছিল দার্শনিক মতবাদ ও আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার, পরবর্তী কালে সাহিত্যিকদের কলমে তা জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভগবান বুদ্ধের ক্ষণবিজ্ঞানতত্ত্বের কথাই শুনি কমলের মুখে ও তার জীবনের ঘটনায়। দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধকে, বুদ্ধের চিন্তাধারাকে বিতাড়িত করে আমরা বেদান্তের শাংকর মতবাদের চিন্তাধারায় পুষ্ট হচ্ছিলাম। তাই 'শেষ প্রশ্নে'র অন্তর্গত চরিত্রগুলি কমলকে দেখে এতদিনের অভ্যস্ত চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিষম বিপর্যয় মনে করে কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, তার সুন্দর চিত্র বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে। মানুষ হিসেবে দ্বিতীয়তঃ কমলের যোগ্যতা দিয়ে—তার জন্মগত জাত দিয়ে নয়—এ কথা আজ আমরা বলবার সাহস পাচ্ছি যদিও শান্ত পাচ্ছি না, কিন্তু পঁচিশ বৎসর আগে যখন শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্ন লিখেছিলেন, সেদিন সে সাহসও ছিল না। কমলের জাতের পরিচয় নিয়ে যে বিপর্যয় আরম্ভ হয়েছিল, পর পর বহু ঘটনা দ্বারা তা কাহিনীর অন্যান্য সবাইকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিচ্ছিল বলা চলে। সংযম—বিধবাদের সংযম নিয়ে শরৎচন্দ্র কমলের মুখ দিয়ে যা বলিয়েছিলেন, তাতে তাঁর যে সাহসের পরিচয় মেলে, তা একমাত্র বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। মনের বার্ধক্য বলে যে কথাটা আশুবাবুকে সে বললে, তেমনি কথা তথাকথিত ভারতীয় সমাজকে আমরা কি বলতে পারতাম? চক্ষুলজ্জাহীন অজয় জিজ্ঞেস করেছিল কমলকে শিবনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল কি না। কমল তার যে জবাব দিল, তা কি আমাদের ভাবনার মধ্যেও ছিল? শিবনাথের মুখে তাদের বৈষ্ণবমতে বিয়ে হয়েছিল শুনে কমল বললে, 'সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি বৈষ্ণব মতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে?' কথাটা যে ওজনে ইঙ্গিত করে তা সংস্কারহীন একটা মুক্ত স্তর। কমলের জীবনে এটার সার্থকতা হয়নি বটে—কেননা, শিবনাথের আর যাই

থাকুন, শিবের মত যোগ্যতা ছিল না—তবু এ রকম সর্ত্ত-সংস্রবহীন মুক্তির মধ্যে দিয়ে প্রাণের স্তরে দাঁড়িয়ে একটা সম্বন্ধ যে হতে পারে—ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ যা হয়তো আস্বাদন করবে—তারই একটা আভাষ দিতে শরৎচন্দ্র এর প্রয়োগ করেছেন। কমল বলছে, 'উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাবো তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? সত্য যাবে ভুবে আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে'? সংসারে অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয় অভয়বাবু এ কথা বলাতে কমল বলতে পেরেছিল, 'মিথ্যে তো বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য—প্রাণ যখন যায়?' এমনি করে শেষ প্রশ্ন প্রশ্নের পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখা যাবে প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন বহু মন্তব্য করা হয়েছে যা সেদিনকার ভারতীয় সমাজে এক একটা বদ্ধ শেলের মত মনে হয়েছে। এক একটা কথা বলা হয়েছে আর সব শুদ্ধ যেন বোমা পড়ার মত চমকে চমকে উঠেছেন—সমস্ত বই জুড়ে এই ভাবখানা।

এ ভাবখানা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?—সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, সমস্ত রকম চিন্তাধারা ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে থাকলেও যে ভাবে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষ চিন্তা করে আসছিল, আর যাকে অনুসরণ করে তার সমাজ-কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল, সেটা বেদান্তের শাংকর চিন্তাধারা, সেই ভাবনাতেই এক সত্য, বহু মিথ্যা; সাময়িক সত্য, ক্ষণ মিথ্যা; যা দীর্ঘস্থায়ী চিরন্তন তাই সত্য, যা ক্ষণিকের জন্য, অন্যের মত তা সত্য নয়। এই রকম করে ভাবতে অভ্যস্ত আশুবাবু থেকে অবিনাশ, অক্ষয় সকলে। তাই সমস্ত শেষপ্রশ্ন জুড়ে দেখি দিনকে দিন নূতন নূতন কথা শুনে শুনে আর ঘটনা দেখে দেখে তাঁরা চিন্তার জগতে কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না। শরৎচন্দ্র যে সময়ে গল্প লিখেছিলেন সে সময় পর্যন্ত সাহসী শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্যের ধাক্কায় প্রবাসী আশুবাবুকে দিয়ে বাড়ীতে বারুচি রাখিয়েছেন, সব রকম খাদ্যও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত করিয়েছেন, মনোরমাকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়ে লেখাপড়া করিয়েছেন, গান-বাজনার আসর করে বন্ধুবান্ধবকে বাড়ী এনে আদর আপ্যায়ন করিয়েছেন—এটাও ভারতীয় হিন্দুত্বের সমাজে এক সময়ে অচল ছিল—এ জীবনের যে দিকটার কথা, সেটা জানা ছিল না এ সমাজে—তবু এর বেশী আশুবাবুরাও পারেন নি। আশু-বাবুরাও আবার কমলকেও পরিপাক করে উঠতে পারছেন না। এই পঁচিশ বৎসর পরে আজকের সমাজে (অবশ্য সমাজ বলে আজ ঠিক কিছু নেই) ঘটছে অনেক ঘটনাই—কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন করা যেতে পারে এবং সত্যিই যেতে পারে কি না তা আমরা আজও ভেবে দেখিনি। মনে হয় আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি এই মনে করে যে, ঘটনা যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তখন সমাজের অগ্রগতিও হয়ে গেছে। সেদিন শরৎচন্দ্রও যা কল্পনা করতে পারেন নি, এমন অনেক ঘটনাই আজ ঘটছে অহরহ—কিন্তু সেগুলি প্রগতির নির্দেশক কিংবা সর্বনাশের প্রথমাবস্থা, সে কথা বিচার করবার মত মাথাব্যথা তেমন দেখা যায় কোথায়? কিন্তু ভেবে দেখবার মত অবস্থা সমাজের সত্যিই হয়েছে। যা কিছু করাটাই প্রগতি নয়। আর তা যখন নয় তখন বর্তমান সমাজের স্থিতিটা হবে কোথায় কিসের ওপরে?

যাই হোক, প্রাচীন হিন্দুত্বের যারা রক্ষকের পরিপোষক সেই আশুবাবু অবিনাশ আর অক্ষয়—এরা কি কমলকে দেখে শুধু বিস্মিতই হয়েছিলেন? সে বিস্ময় কি একই সঙ্গে তাদের ভালো লাগাকেও আকর্ষণ করে তোলেনি? আশুবাবু বলছেন, 'বিবাহটা নয়, এর formটার প্রতি বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই।...শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে শৈবমতে ত সেই ভালো কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু'।...তাহলে কমলের কথাতে সনাতনীদের শুধু বিরক্তি বা বিস্ময়ই হয় না—ভিতরে ভিতরে ভালোও লাগে, তাদের আকর্ষণও করে। লেখক এরপর লিখছেন, 'ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা; কহিলেন আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা, ছাগা, করবে না কি তুমি এই রকম? দেবে না কি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই তো তারপরে হয়ে গেল

আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া একটুখানি মাথা নাড়িলেন। অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?'

—তাহলে যাকে বুদ্ধি দিয়ে ঠিক মানতে পারিনে, নিজের জীবনে গ্রহণ করতেও রাজী নই, তাকেও ভাল লাগে কেন? ভাল লাগে এই জন্য যে, আশুবাবুরা যা—সমস্ত জীবনের তা এক দিক—জীবনের তা সমস্তটুকু নয় বলেই কমলের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক জীবনের অপরার্ধের যে নূতন কথাগুলি আসতে চাইছে, তা মানুষের অন্তরতম প্রদেশে প্রীতি জাগায়। আমারও চাপাপড়া সত্তায় তার যে অস্তিত্ব আছে। কথাটা আশুবাবু বলেছেন, 'সুদীর্ঘ সংসারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্য দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুঁজে মাথা নাড়লেই হবে কেন মণি?'

সুদীর্ঘ সংসারে রক্তের মধ্য দিয়ে সত্য বলে পেয়েছিলাম শংকরাচার্যের জীবন-বোধকে—যেখানে গতির স্থান নেই। এরই অপরার্ধের কথাগুলি নিয়ে এসেছে কমল—যা গতির কথা, যা গতিধর্মাত্মক ক্ষণবিজ্ঞানবাদী ভগবান বুদ্ধের কথা। কমলের দু'চারটি মন্তব্য বিচার করলেই দেখতে পাব বুদ্ধ ও শংকরের বিরোধটা কমল ও অন্যান্যদের মধ্য দিয়ে কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে আছে।

কমল বললে, 'সত্যের সীমা যে কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় নি।'—এ কি আমরা বুঝতাম? আমরা জানতাম সত্য চিরদিন এক এবং একরকম, সুদূর অতীতে—বলতে পারি বেদ উপনিষদের যুগেই—ভারতবর্ষের সত্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। অতীতে দূরস্থান, আজও প্রায় আমরা ভাবতে পারি না যে, যুগে যুগে কালে কালে আবেষ্টনকে অপেক্ষা করে সত্যের রূপ বদলায়—চিরদিন যবে তা একই রকম নয়। যখন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলে না তখন আমরা বলতে চাই যে, ব্যবহার-জীবনে আজকাল মনস্তাবে না চললে নয়, কিন্তু সত্যিকারের সত্য যা তা সেই সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে দিয়ে গেছেন—ওঁরা যা নির্ধারণ করে গেছেন তার থেকে এক চুল এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। তাহলে কমল এসব কথা বলছে কেমন করে? বুদ্ধ যেখানে প্রতি ক্ষণকে সত্য বলে মানেন, কমলের আশ্রয় সেইখানে। প্রতি ক্ষণ যদি সত্য, তবে অতীতের ক্ষণের মত আজকের ক্ষণও সত্য। আজকের ক্ষণে জীবনের পক্ষে যাকে উপযোগী বলে মনে করা যায়, সেটা কেননা আজকের সত্য হবে? অতীতের মত করেই শুধু বর্তমান হবে, সত্যের এটা সনাতনি কথা নয়। প্রকৃতি অনন্ত বলে তার চলার পথে নিত্য নূতন সত্য আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এইখানে দাঁড়িয়েই—জীবনের এই গতিকে মেনে নিয়েই—বুদ্ধদেবের ভাবনায় ভাবিত কমল বলতে পারে, 'যে দুঃখকে ভয় করছেন তারই ভিতর দিয়ে আবার তার চেয়েও বড় আদর্শ অগ্রসর করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে সেই মৃত দেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ'। জীবন-দর্শন যখন গতিকে মেনে নেয়, দৃষ্টি যখন তার সামনের দিকে—তখনই বলতে পারি সত্য কোনো এক অতীত যুগেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় না, কিংবা বলতে পারি শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ শোধ করে। এই গতি ভগবান বুদ্ধের দান।

কিন্তু সত্য যদি যুগে যুগে বদলায়, চিরন্তন সত্য বলে যদি কিছু না-ই থাকে, তবে সেটা সুবিধাবাদে পরিণত হতে কতক্ষণ? আর হয়েওছে তাই। প্রতিক্রিয়ায় আজ চিরন্তন সত্য বলে কিছুর নিশানা হারিয়েছি, সত্যের পরিবর্তিত রূপের সুবিধার খপ্পরে পড়ে গেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে সত্য শুধু পরিবর্তনের মধ্যেও নেই, শুধু স্থিতির মধ্যেও নেই—আছে উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্যে। তাই আজ দরকার শংকর-বুদ্ধের সমন্বয়। দুটো বিরুদ্ধ চিন্তাধারার সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিতেই শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্নে কমলকেও কিন্তু-র মধ্যে রেখেছেন, আশুবাবুকেও শেষ

জবাব দিতে দেননি। প্রশ্ন যদি করি শেষপ্রশ্ন গ্রন্থে শেষ জবাব পাওয়া গেছে কি না এবং তা দিলেন কে, তাহলে স্পষ্টতই বলতে হবে যে, প্রথমতঃ শেষ জবাব পাওয়া যায় নি, তার কেবল ইঙ্গিত দিয়ে গেছে শেষপ্রশ্ন, দ্বিতীয়তঃ জবাবের ইঙ্গিত আশুবাবু দেননি, অবিনাশ-অক্ষয়ও দেননি, দেননি হরেন্দ্র-রাজেনও কিংবা শিবনাথও, দেননি কমল-নীলিমা কিংবা মনোরমাও। অথচ একটা বৃহত্তর মিলনের ক্ষেত্রের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন প্রত্যেকে। তা না হলে অক্ষয় শেষ পর্যন্ত আকৃতি জানায় কমলকে একটা চিঠি দিতে? আর লেখককেই লিখতে হয়, 'কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।'

কমল বলেছিল, শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয় আশুবাবু, সত্যিকার ভালোবাসাও সংসারে এমনি ভেঙে পড়ে।...' নীলিমা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই ভেঙে পড়ে, মানুষ তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকি থাকবে কি?' কমল জবাব দিলে, 'যে স্বর্গবাসের মেয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র।... লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়ে যা হাতে থাকে মাণিকের মত তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে—বলে ঐ তো সর্বনাশ।'

—বুদ্ধের ক্ষণবিজ্ঞানবাদকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কমলের কথাগুলি।

ক্ষণিকের এই চির মায়ার জগতে 'অনিত্য তারা তবু ইতিহাসে নিত্য-নাচন নাচে'—এই কথাটি বুঝতে পারলেই জগৎকে মায়াময় বলে উড়িয়ে দেবারও দরকার হবে না, সেইখানেই একটু স্থিতি মনে করে আসক্ত হবারও প্রয়োজন থাকে না। ভগবান বুদ্ধ এই কথাটা নিয়ে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁকে আমরা বুঝতে পারিনি—কিন্তু বুঝতে পারার দিন এসেছে।

এমনি করে কমলের এক একটি কথা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে ভগবান বুদ্ধের এই ক্ষণবিজ্ঞানতত্ত্বকে শরৎচন্দ্র কেমন করে জীবনের পাতায় পাতায় অনুস্যূত করে তুলে ধরেছেন। মনে হয় বুদ্ধদেবের অবদানের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা তাঁর অহিংসা মৈত্রী ও সঙ্ঘের কথা আলোচনা করে থাকি—কিন্তু তাঁর এই ক্ষণবিজ্ঞানতত্ত্ব যে জীবনের কত বড় একটা দিক—সে কথা আড়ালেই থেকে গিয়েছিল। শেষ প্রশ্নে সে দিকটি চমৎকার বাণী-রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য শরৎচন্দ্রের যে এজন্য তাঁকে আদর করার চেয়ে অনাদরণ গালমন্দ করেছে বেশী। তবু দিন আসবে যেদিন বুদ্ধদেবের এ ক্ষণবিজ্ঞানতত্ত্বকে এমন অপরূপ রূপ দেবার জন্য প্রাণ-সাধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে মানুষ তাদের প্রাণের অকুণ্ঠ আন নিবেদন করবে।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য

॥ শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ ॥

[সাম্প্রদায়িক সংহতার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে চিন্তাধারা সতেরো বৎসর আগে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, সে চিন্তা নেতৃবৃন্দ বা জনসাধারণ সকলের কাছেই আজও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাম্প্রদায়িকতাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে ইহার সমাধান নাই—ইহাকে ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। আমরা তাই সতেরো বৎসর পূর্ব্বের রচনাটি সকলের নিকট তুলিয়া ধরিলাম। সঃ—উঃ ভাঃ]

মানুষ বিশ্বধর্ম্মী, বিশ্বকর্ম্মী। দেশ কাল পাত্রের আবেষ্টনে, দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বা কর্ম্মের সম্যক্ আস্বাদনের জন্যই সৃষ্টি হয় বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের। মানুষ এই হিসাবে একাধারে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই-ই; কোনও একটিকে বাদ দিয়া অপরটী হইবার যো নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় বা কর্ম্মসম্প্রদায় যখন অখণ্ড মানুষকে ছাপাইয়া ওঠে, মানুষের অন্তরের বিশ্বরূপ-জীবনকে দাবাইয়া রাখিয়া সেই "সহজ" মানুষটীকে একান্ত ভাবে সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলে, তখনই সত্য মানুষটী শিহরিয়া ওঠে, চীৎকার করিয়া ওঠে, যাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে বিশ্বে তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তপাত সুরু হয়, নিজের অন্তরাত্মার কান্নার সহজ সরল অর্থ ধরিতে না পারিয়া ছিন্নমস্তার মত নিজের মস্তক নিজে ছিন্ন করিয়া নিজেরই রক্ত নিজে পান করে। হিন্দু-মুসলমান যখন একের বুকে অন্যে ছুরি মারে, তখন নিজের বুকেই তাহা মারা হইতেছে, বিশ্বরূপ মানুষই আৎকাইয়া উঠিতেছে। আজ আর মানুষের জন্য ধর্ম্ম নয়; ধর্ম্মের জন্যই মানুষকে বলি দেওয়া হইতেছে। যে ধর্ম্মের নামে এমন অবাধ নরবলি চলিতে পারে, সে ধর্ম্ম কি মানুষের যোগ্য? উহা কি পৌত্তলিকতা নয়? সত্যধর্ম্ম লইয়া টানাটানি হয় না, ধর্ম্ম মানুষকে রক্ষাই করে।

ধর্ম্মের খোসা লইয়াই অভিসন্ধির লড়াই চলিতে পারে। দোল, রথ, ঈদ লইয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অহরহই হইতেছে; এই দাঙ্গা হাঙ্গামা কি ধর্ম্মের মৌলিকতা ও অন্তঃসার-শূন্যতারই প্রমাণ দিতেছে না? সত্যিকার ধর্ম্ম যদি হইত, তবে ধর্ম্ম ও মানুষের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত না, ধর্ম্ম মানুষের রক্ত পান করিত না, রক্ত সকারই করিত। তখন মানুষের জন্য ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইত। মানুষের মুখ চাহিয়া ধর্ম্ম নিজের রূপ ও গতি ঠিক করিত, প্রয়োজন হইলে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত; আবার ধর্ম্মের মুখের দিকে তাকাইয়া মানুষও নিজকে সংযত বা প্রদায়িত করিত, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মরণ বরণ করিত। ধর্ম্ম ও মানুষ আজ পরস্পরের প্রতিস্পর্দ্ধী। কি অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও নির্লজ্জ একটা অবস্থার ভিতর দিয়া জাতি চলিয়াছে! কোথায় হইবে ইহার প্রতিকার? ধর্ম্ম যখন মানুষের চেয়ে বড় সত্য, তখনই ধর্ম্মরক্ষার নামে মানুষ অন্যধর্ম্মীর রক্তপান করিতে ছোটে, তখনই সে ভুলিয়া যায় যে, মানুষের জন্য ধর্ম্মেরও আত্মবিসর্জ্জনেরও প্রয়োজন হইতে পারে। মানুষের জন্য ধর্ম্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইলে ধর্ম্ম একদিন মানুষের মুখ চাহিয়া দুদিনও বাঁচিতে পারিত। ভগবান্ বুদ্ধ এমনই একটী ধর্ম্মের ভিত্তিপত্তনের সূচনা দিয়া গিয়াছেন।

মানুষের জন্য ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত, যদি ধর্ম্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম্ম না বুঝাইয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্ম্মী, সর্ব্বধর্ম্মী। গান্ধীজী বলিতেছেন "এই প্রকার ঐক্য লাভের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক কার্য্য হইতেছে প্রত্যেক কংগ্রেসীর এই ভাব অনুভব করা যে, তিনি তাঁহার নিজের ভিতরেই হিন্দু-

মুসলমান-জরথুস্ত্রীয়। সংক্ষেপ বলিতে গেলে তিনি ভাবিবেন যে, তিনি নিজের মধ্যে হিন্দুও বটেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের বহিঃস্থ যত ধর্ম্ম আছে সেই সব ধর্ম্মীও বটেন"—পৃ ৬। বাঙ্গলার রামকৃষ্ণ, নিত্যগোপাল বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথমে এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বীজ বিশ্বের মাঝে নিজেদের জীবনের আস্বাদন দ্বারা বপন করিয়া গিয়াছেন। আর সেই বীজই বৃক্ষাকারে ফুলে ফলে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্নিগ্ধ ছায়াদানে সন্তাপ দূর করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোনও একটী বিশেষ ধর্ম্ম কি মানুষের অন্তরাত্মার ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারে না? সর্ব্বধর্ম্মী হইবার কি প্রয়োজন তাহার আছে? শুধু কি রাজনৈতিক প্রয়োজন হাসিলের জন্যই, অন্য সম্প্রদায়কে তোষণের জন্যই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা, না ধর্ম্মাস্বাদনের দিকে চাহিয়াই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের তেমন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছেন? ইহা সত্য যে, প্রতি ধর্ম্মই বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে, বিশেষ পাত্রের জন্য বিশেষ দৃষ্টি কোণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাও সত্য যে, প্রত্যেকটী ধর্ম্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টি কোণের মধ্যে সমগ্র মানব সমাজকে, এমন কি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানব সমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও। বালা যেমন বালা হিসাবে স্বয়ংপূর্ণ হইলেও যৌবন জীবনকে নিজের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই, জীবন যেমন বাল্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া যৌবনে ছুটিয়া আসিয়াছে, যৌবন যৌবন হিসাবে স্বয়ংপূর্ণ থাকিলেও জীবন যেমন যৌবনকে ডিঙাইয়া প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনি কোন ধর্ম্ম স্বয়ংপূর্ণ হইলেও সহজ মানুষের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের, জীবন্ত ধর্ম্ম লাভের ক্ষুধা মিটাইতে পারিবে না। জীবন্ত মানুষের ধর্ম্ম ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতেই পারে না। কোনও বিশেষ ধর্ম্মে আটকাইয়া যাইবার অর্থ সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যুলাভ বা কবর প্রাপ্তি। কোনও বিশেষ নদীর মধ্যে যেমন বিশাল ও গভীর সাগরকে প্রবেশ করানো সম্ভবপর নয়, বিশেষ কোনও জেলার মধ্যে যেমন সমগ্র বাঙ্গলাকে ঢুকাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা, তেমনি বিশেষ কোনও স্বর্গের মধ্যে সমগ্র মানবকে টানিয়া আনিবার চেষ্টাও বদ্ধ পাগলের চেষ্টা। সমগ্র মানব-সমাজ হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান কিছুই হইবে না—এই সহজ সরল সত্য কথাটা ভুলিয়া গিয়া হিন্দু যদি বিশ্বের সব জাতিকে তথাকথিত হিন্দু বানাইতে চায়, ইসলাম যদি তাহার বুদ্ধির ভিতর সারা বিশ্বকে গ্রাস করিতে চায় খ্রীষ্টান যদি স্বপ্ন দেখিয়া থাকে যে সমগ্র বিশ্ব অদূর ভবিষ্যতে খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে, আমরা বলিব তেমন ভবিষ্যৎ অনন্তকালেও আসিবে না। ভারতের বুকে অদ্বৈতবাদের বজ্রনির্ঘোষে সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন কেহই ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায় নাই। বহু বক্তপাতের ভিতর দিয়াও সবই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; পৃথিবীর বুকে অনন্তকাল ধর্ম্মবৈচিত্র্য বজায় রহিয়াছে, থাকিবেও একটা বৈচিত্র্য অপর বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু বৈচিত্র্য থাকিবেই। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির শোভা ও প্রাণ।

ক্রমশ

কর্ম্মযোগ

।। শ্রীশঙ্কর নাথ চট্টোপাধ্যায় ।।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে শ্রীভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিভিন্ন উপদেশ বাণীর দ্বারা, বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি তৎকালীন পথভ্রষ্ট, ধর্মচ্যুত এবং বিধর্মী-দিগকে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমসাময়িক কোন বিশেষ ধর্মব্যবস্থাকে বা বিশেষ কোন অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যুগে যুগে আবির্ভূত এই শ্রীভগবানই শিষ্ট-সাধুর পরিত্রাণ কর্ত্তা তথা দুষ্ট অসতের সংহার-কর্ত্তা।

দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে বিষন্ন অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্র ও দর্শনের সারোদ্ধার করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই বিশ্ববিশ্রুত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। গীতায় প্রধান তিনটি বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, 'যোগ' কি? গীতা বলেন, "……যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"২ দ্বিতীয়োঽধ্যায়।৫০। অর্থাৎ কর্ম্মের কৌশলকেই যোগ আখ্যা দেওয়া হয়। মানুষ পৃথিবীতে আসে কর্ম করিতে। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম সমাপনান্তে পরলোক গমন করে। কিন্তু কর্ম সাধনের সময় এমন অনেক সংগ্রাম, অন্তরায়, ভ্রান্তি প্রভৃতি আসিয়া পড়ে যে, মানুষ তখন ক্রমে অক্ষম হইয়া, আশাহীন হইয়া পড়ে। উপমা হিসাবে অর্জুনের কথা বলা যাইতে পারে। কর্মী যখন এ হেন অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সময়ই দেবতা তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশাদি ও উপমাদির দ্বারা তাঁহার যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন পরিচয় তাহার কর্ম। মানুষ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি যথার্থ কর্মী, কর্মই যাহার ব্রত, তিনি সর্ব্বজন কর্ত্তৃক আদৃত হন। জীবনের সার্থকতা কর্মে, কর্মশূন্যতাই মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত হয়। গীতা বলেন—"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তেন ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥৩
তৃতীয়োঽধ্যায়।৮।
কিন্তু মানুষ যে কর্মই করুন না কেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যয় রাখিয়াই তাঁহার সে কর্ম করা উচিত। কর্ম করিতে গিয়া যদি কেহ ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান তবে ঈশ্বর তাঁহার অপরাধ গ্রহণ করেন।

এই পৃথিবীতে যে সকল মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বে অমর হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষ কর্মী ছিলেন। পন্থা ও নীতি ভিন্ন হইতে পারে, তবে লক্ষ্য ছিল একই। তাঁহারা যে সকল কর্ম করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতের কল্যাণ কামনায়, আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে।

অনেকে হয়ত বলিবেন—'কর্ম করিব কী, প্রতিপদে অন্তরায়'। প্রতি পদে যে অন্তরায় এই কথা সত্য। কিন্তু কেন অন্তরায়? কর্মীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কর্মের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বর। এক্ষণে ঈশ্বরই যদি অন্তরায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা হন, তবে তিনিই ইহার সংহার-কর্ত্তা। অতএব যে মুহূর্ত্তেই অন্তরায়ের সম্মুখীন হইব, সেই মুহূর্ত্তেই সেই পরমেশ্বরকেই স্মরণ করিব। তিনিই সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন, যখন দেখিবেন কর্মী স্বয়ং উৎসাহী ও অগ্রণী। যে কর্মই করি না কেন সেই পরমেশ্বরের কর্মই করিতেছি এই প্রকার চেতনা বদ্ধমূল থাকা উচিত। তাঁহারই কর্ম তিনিই আমার দ্বারা সম্পাদন করাইতেছেন এইরূপ চেতনা লইয়া সকল কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করা মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। কর্মীর প্রয়োজন দেখিয়া পরমেশ্বর তাহাকে আশাতিরিক্ত সাহায্য ও শক্তি দান করেন—তাহাতেই কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং কর্মীও সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যলাভ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়দের

মৃত্যু দেখিয়া অর্জুন যখন শোকাভিভূত হইয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

"মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥"৪

তৃতীয়োঽধ্যায় ৩০।

অর্থাৎ, তুমি আমাতে সকল কর্ম সমর্পণ করিয়া, 'আমি অন্তর্যামীর হইয়া কার্য্য করিতেছি' এইরূপ ভাবিয়া নিষ্কাম ও মমতারহিত হইয়া শোকত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। এই উপদেশবাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্জুন দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া শত্রুনিধনপূর্ব্বক শান্তিরাজ্য ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অনেকে কর্মসম্পাদন অপেক্ষা মুক্তিকেই প্রাধান্য দেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কর্মের মধ্য দিয়াই মুক্তিলাভ করা যায়। মুক্তি বা মোক্ষ কর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। যথার্থ কর্ম করিলেই মোক্ষলাভ ঘটে। তবে একটি মূলমন্ত্র স্মরণ রাখিতে হইবে যে—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥"৫

সৎ প্রবৃত্তি লইয়া আমি যে কর্ম করিতেছি, তাহার ফল ভালই হউক বা মন্দই হউক তাহার অধিকারী আমি নহি—এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি লইয়া সকল কর্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করাই মনুষ্যোচিত কর্ম। একাগ্রচিত্তে কর্ম করিলে তবেই নিষ্ঠা জন্মিবে। নিষ্ঠা জন্মিলেই কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। কর্ম করিতেই সকল মনুষ্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন এবং কর্ম ব্যতিরেকে তাঁহার মুক্তি নাই। অতিচ, কর্মই মোক্ষলাভের প্রশস্ততম মার্গ—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥"৬

তৃতীয়োঽধ্যায়।

অমৃত পেতেই হবে

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

অমৃত পেতেই হবে, হলাহল যতই উঠুক
নীলকণ্ঠ হয়ে সেই হলাহল পান ক'রে নিয়ে
বিষমুক্ত এ পৃথিবী করতেই হবে একদিন,
শেষ করে সব বিষ; তারপর সে-আলো-উজ্জ্বল
আসবে প্রসন্ন দিন—সে-দিনের আভাস আজিও
যদিও পাইনি এই অনেক কালোর-ভরা রাতে,
তবু সে আসবে, তার প্রতীক্ষায় কাটাই প্রহর।
আর মনে মনে সেই অমৃতের মন্ত্র জপ করি।
সেই মন্ত্র পেয়েছি যে কত মহা জীবনের কাছে;
তাদের চোখেও ছিল স্বপ্ন আর কণ্ঠে মহাবাণী,
অনেক আঁধার মাঝে আলোকে আশ্বাসে গভীর।
সেই মহাজীবনের মহামন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে আর
আলোকের স্বপ্নে দিন আমরাও কাটাবো, কখনো
আঁধারের কাছে নত হবো না, হবোনা কোনদিন।
অমৃত পেতেই হবে, হলাহল যতই উঠুক—
নীলকণ্ঠ হয়ে সব হলাহল পান করে যাব।
নির্বিষ পৃথিবী হবে—এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাঁচি;
আমরা পেলাম নাকো, পাবে যারা রয়েছে পশ্চাতে

সাময়িকী

বর্ষশেষ ও বঙ্গাব্দ বা শকাব্দের হিসেবে একটা বৎসর—১৩৭০, ১-৮৪—শেষ হয়ে এল। পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডারে এখনও নূতন বর্ষ আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু প্রকৃতির বুকের মধ্যে নূতনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু দিন ধরে। শীতের শুষ্কতায় জড়ত্ব কাটিয়ে অনেক গাছই নূতন পাতায় ছেয়ে গেছে, মুকুলে ভরে গেছে, অনেকদিন পর্যন্ত যে শীর্ণডালি অলক্ষ্যে মাটিতে চাপা পড়ে গিয়ে অন্ধকারে নিঃশব্দে ছিল—সেগুলির কিছু কিছু মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে চেয়েছে আকাশের আলোর দিকে—কাননে নানা কিছুতে প্রাণের জয় যাত্রার ইতিহাসে। প্রাণ মরে না—আলো-মাটি-জল-হাওয়ার নিজেকে সে গড়িয়ে তুলবেই। এই প্রাণ কি বস্তু? কোথায় নিবাস? উপনিষদীয় ঋষি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জিজ্ঞাসু চিত্তকে এ বিস্মিত করেছে। মানুষের সত্তাতার কাছে এই প্রাণ কি ইঙ্গিত বহন করে আনে? জীবনের ভিত্তি মূলে এই যে প্রাণ এর সম্বন্ধে উপনিষদ লিখছেন,…'প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।…ন বৈ বাচঃ ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন, মনাংসি ইতি আচক্ষতে, প্রাণঃ হি এব এতানি সর্বাণি ভবতি। উপনিষদের এই প্রাণধর্মকে ব্যাখ্যা করে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, '…প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই বুঝিতে পারিল যে সে না থাকিলেও প্রাণ ছিল বলিয়াই সমগ্র দেহ অস্তিত্ববান ছিল। চক্ষু কর্ণ মন—ইহারা তো মানুষের পক্ষে খানিকটা পোষাকী বস্তু। কিন্তু প্রাণেই মানুষের অস্তিত্ব—এই অস্তিত্ববোধক প্রাণ যখন জীবনের সামনে থাকে, তখনই জীবন হয় সহজ। কিন্তু মানুষ যখন যাহার উপর তাহার অস্তিত্ব, সেই ভিত্তিকে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহার আসে চরম বিকৃতি। আজিকার বিশ্ব জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এই প্রাণকে ভুলিয়া গিয়াই না এতদূর অধঃপতিত ও বিকৃত হইয়াছে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সমগ্র প্রাণদৃষ্টি হারাইয়া মনে করিয়াছিল 'আমিই বড়'। কিন্তু এই সকল প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, ইহারা কেহই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ নহে, ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহে, কেহই সমগ্র নহে'। প্রাণই সমগ্র। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'চোখে দেখিস প্রাণে কানা? হৃদয় মাঝে দেখনা করে ভুবনখানা'। এই প্রাণের দৃষ্টির সমগ্রতা নিয়ে দেখতে হবে জীবনকে, জগৎকে। তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারব, 'পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনও আমরা দেখি নি,' তখন দেখব এ দেশের আকাশের তারা-গুলিতে, মাটির ফুলগুলিতে শুধু পরিচিতির আহ্বান, বহু দিনের চেনাশোনা, ফেলে-আসা দিনগুলির দোলা। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তহীন প্রাণের সামগ্রিক প্রকাশ, আমাদের মানুষী সত্তাতাকে সেই প্রাণ দিয়ে গেঁথে তুলতে পারলে বুদ্ধির কলঙ্কিনী ভেদবাদ থেকে আমরা রেহাই পাব। প্রকৃতির এই প্রাণধর্মের মানুষের কাছে এই-ই ইঙ্গিত—সমগ্র হও, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রক্ষা কর, ব্যক্তির বাইরে সর্ব ব্যক্তির সঙ্গে, প্রাণের সর্ব প্রকাশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র হও। সমগ্র হওয়াতেই, প্রাণবান হওয়াতেই মানুষী জন্মের সার্থকতা। বর্ষশেষ প্রকৃতির মধ্য দিয়া এই ইঙ্গিত বহন করে আনে।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার পৌঁছও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরূপের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাতত্ত্বসার	৵০
৮।	উদ্ধবভাগবত (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১।০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	মুণ্ডকোপনিষৎ	
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা	
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ	
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ	
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী	
৮।	অগণিত পত্রাবলী	
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ	

শ্রীযতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির ভ্রান্তকথা	১।০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৴০

শ্রীযতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৪৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৮৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

SHREE HANUMAN FOUNDRIES LTD.

GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS, ENGINEERS, FOUNDERS, STEEL REROLLERS, BUILDERS, STRUCTURAL FABRICATORS

LIGHT AND HEAVY FERROUS CASTINGS/ROLLED LIGHT-SECTIONS AND RAILWAY PERMANENT-WAY MATERIALS.

Associated Concerns :

SHREE BAIDYANATH IRON & STEEL CO, LTD.
Wagon Builders, Founders, Manufacturers of Pig Iron and Steel Castings, Engineers, Government and Railway Contractors.

AGARWALLA PROPERTIES LTD.
Owners of Real Estate.

THE LAKSHMI PRINTING WORKS LTD.
Printers and Publishers—Artistic Job a speciality.

Head Office
AGARWALLA MANSIONS
370, Upper Chitpore Road,
Calcutta-6.
Phone : 33-6422 (4 lines)

Branch Office :
25-H CONNAUGHT CIRCUS
NEW DELHI.
Phone : 40317

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

বৈশাখ ১৮৮৬ ১৩৭১, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ, সপ্তদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

★

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২ ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·২০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	১·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ । ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

বিজ্ঞপ্তি

'উজ্জলভারত' পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ গত মাঘে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যগণকে সপ্তদশ বর্ষের চাঁদা শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপন-দাতা প্রভৃতি সকলের সহযোগিতাতেই 'উজ্জলভারত' এই ষোল বৎসর চলিয়া আসিল বটে কিন্তু আজও অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধার মধ্য দিয়াই চলিতে হইতেছে—কর্মীর অসুবিধা তো আছেই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কাজ ও কথাকে মানুষের কাছে উপস্থিত করার দায়িত্ব সকলেই প্রাণ দিয়া খানিকটা গ্রহণ করুন—সকলের নিকট এই আবেদন জানাই এবং সভ্যগণকে এইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব চাঁদাটা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৭১।

কার্যাধ্যক্ষ, উজ্জলভারত

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৭শ বর্ষ)

উজ্জলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৭৫ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উজ্জলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনীনগর
জি: ২৪ পরগণা

নরনারায়ণ আশ্রমে একটি চরকা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী
১·২৫

বাংলার লোকনৃত্য গীতিবৈচিত্র্য
শ্রীনণি বর্ধন
২·৯০

বাংলার শিকার-প্রাণী
শ্রীশচীন্দ্র নাথ মিত্র
৩·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা
শ্রীআশীষ বসু
১·২৫

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

গান্ধী রচনাবলী
প্রথম খণ্ড (১৮৯৪-১৮৯৬)
(দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬-৯৭)
প্রতি খণ্ড : ৫·০০

॥ স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র ॥

॥ ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও
মণি অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ॥

প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র

নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রকাশন শাখা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৫৫, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

W. B. (P) Adv.-D 1898 (4) /64

৪।	নিত্যগোপাল প্রশস্তি (কবিতা)	... ৮৫	৬।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ	... ৯৯
৫।	শ্রীনিত্যগোপাল	... ৮৬		শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৫)	
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত		৭।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪২)	১০২
৬।	শ্রীনিত্যগোপাল স্মরণে (কবিতা)	... ৮৯	৮।	মুণ্ডকোপনিষৎ (অবধূত ভাষ্য সমেত)	১১০
	শ্রীবিষ্ণুপদ রায়			শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত	
৭।	শ্রীনিত্যগোপাল	... ৯০	৯।	বিশ্বনাগরিকত্ব ও শ্রীনিত্যগোপাল	... ১১৪
	শ্রীরেণু মিত্র			শ্রীসনাতন মণ্ডল	
৮।	ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল	... ৯৬	১০।	সাময়িকী :	... ১১৪
	শ্রীপ্রতিভা রায়			শ্রীনিত্যগোপাল তিথি উৎসব	

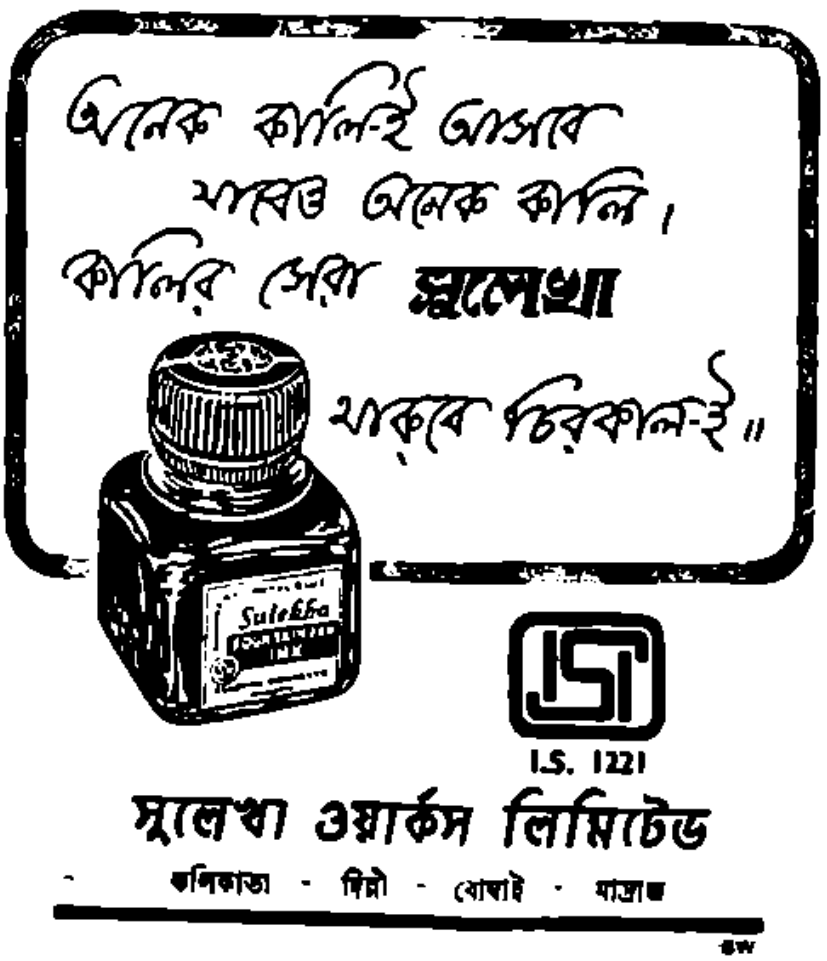

উজ্জ্বলভারত

বৈশাখ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

নিত্যগোপাল-প্রশস্তি

জয় জয় জয় নিত্যগোপাল হে যুগ-সূর্য জয়।
জয়তু জ্ঞানানন্দ দেব জয়তু হে জয় জয়
মহামিলনের বাণী সুমহান,
ধরার মানুষে করে গেলে দান,
চির শাশ্বত সে অমৃতবাণী সর্ব সময়য়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।

ধর্ম জ্ঞানের ভেদের দ্বন্দ্ব করে গেলে সমাধান,
সর্ব জাতির মিলনে বিশ্ব হল মহা গরীয়ান।
মহাযোগী মহা সমন্বয়ে তব
লভিল বিশ্ব জ্ঞান অভিনব ;
তব জড়াজড় মিলন বীণায় ধ্বনি জাগে মধুময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।।

বিশ্ব তোমার মহামঠ, তুমি বিশ্ব-নাগরিক,
গৃহ সন্ন্যাসী তোমাতে অভেদ তুমি যে সামগ্রিক :
সব বিপরীতে মিলে গেছে আজ,
জাগিছে বিশ্বে প্রাণের সমাজ,
ব্রহ্ম আমি জগৎ আমি আমি যে সর্বময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।।

শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[বর্তমান প্রবন্ধখানা 'শ্রীগুরুদর্শন' পত্রিকায় ১৩৬১-র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের লেখা গীতা উপনিষদাদিই ছাপা হইল না, তাঁহার অন্যান্য রচনা বিশেষ করিয়া যাহা অন্যান্য পত্র পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে, তাহা কবে পুস্তকাকারে বাহির হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই—ততদিনে এই সব বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা যেন থাকে, তাই কিছু কিছু লেখা উদ্বোধনাদি পত্রিকায় ধরিয়া রাখিতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের এই লেখাটি প্রকাশ করিলাম। সঃ উদ্বোধনাদি]

আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুণ্যভূমি পাণিহাটীতে শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার মাতুলালয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃভূমি ছিল কলিকাতার আহিরীটোলার বসু পরিবারে। পিতা অল্পেরই বসু ধনী অথচ ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। মাতা গৌরীমণি পরম ভক্তিমতী, দানশীলা ও দয়ালু রমণী ছিলেন।

শ্রীনিত্যগোপাল আজও মানুষের কাছে অপরিচিত। যতদিন তিনি দেহে ছিলেন ততদিন তিনি একান্ত সতর্কতার সঙ্গে মানুষের, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত কুলীন ধনীর, সংসর্গ এড়াইয়া চলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব'। মানুষের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাকে যাহারা তাঁহার সমকালে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার স্বরূপ জানিতে ও চিনিতে পারেন নাই। একজন মাত্র সেদিনই তাঁহাকে জানিতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি নিত্যগোপালকে বলিয়াছেন, 'তুই এসেছিস ; আমিও এসেছি।' নিজেকে নিত্যগোপাল প্রকাশ করেন নাই বটে কিন্তু ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য তিনি বিশেষ সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। সারাজীবন ধরিয়া অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল—যেমন স্বাভাবিক ছিল তাঁহার পক্ষে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হওয়া। অথচ এই তিনিই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নিজের হাতে বহু গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে সবল গ্রন্থ নানা রকমের। ভক্ত ও ভগবানের জীবনের ঘটনা লইয়া তিনি যেমন দৃশ্যকাব্য রচনার প্রয়াসও করিয়াছিলেন, তেমনই প্রার্থনার গীতিও অনেক লিখিয়াছেন, তেমনই আবার হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে তাহাদের প্রত্যেকের যথাস্থানে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের সত্যতা মানিয়া লইয়াও এককভাবে তাহারা কেহই যে সমগ্র সত্য নহে, তাহাদের প্রত্যেকের হাত ধরাধরিতেই যে সমগ্র সত্য আত্মপ্রকাশ করে—তাহাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে 'জাতি দর্পণ বা নিত্যদর্শন' নামে হিন্দুর প্রচলিত সমাজের পক্ষে এক বৈপ্লবিক দর্শন আজ হইতে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মথিত করিয়া অস্পৃশ্যতা যে শাস্ত্রসম্মত নয়, তাহাও তিনি শাস্ত্র দিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অথচ তখনো পর্যন্ত কংগ্রেস বা গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা আন্দোলন আরম্ভ করেন নাই।

ভক্তিযোগদর্শন, সিদ্ধান্তদর্শন, সর্বধর্মনির্ণয়সার, বিবিধতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থে শ্রীনিত্যগোপাল নূতন করিয়া যে কথাটা বলিলেন, তাহা হইতেছে জড় ও অজড়ের সমন্বয়, আলো ও অন্ধকারের সমন্বয়, অন্ন ও ক্ষুধার সমন্বয়। তিনি তাই লিখিলেন, 'নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম-সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার

নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।' এইভাবে শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়ের এক সর্ব্বাঙ্গীণ ও চরমরূপ দিয়া গিয়াছেন।

অন্তরে নিত্যগোপাল স্বতন্ত্র মূল্যে স্বীকার করিতেন বলিয়া সকল মানুষকে তিনি মানুষের মর্য্যাদায় গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক মানুষকে তিনি এমন সম্মান ও এমন প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন যে তাঁহার চরিত্রের আবহাওয়াটাই ইহাতে বদলাইয়া যাইত। নিজের শিষ্যের প্রতিও তিনি কোন দিন অশ্রদ্ধাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। পাপীকে ঘৃণা করিবে না—এই কথা বলা সহজ, কিন্তু পাপীকে বুকে জড়াইয়া ধরা সহজ তো নহেই সাধনার বিঘ্নকারক বলিয়া ভীতিপ্রদ। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল, জারজ তারাপদ যখন কোথাও স্থান না পাইয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প, সেই সময়ে তাহাকে আশ্রয় না দিয়া এমন একটি গুরুর খবর পৌঁছাইয়াছেন যাহা তাঁহার সমন্বয়ের চরম রূপ। অবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের অবতরণের বাণী দিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল। তাই অবিদ্যার প্রকাশ যেখানে সেখানে তিনি ঘুরে থাকিবেন কেমন করিয়া? সেই জন্যই চরিত্রহীন গোলাপ গয়লানীর প্রতি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহের অভাব ছিল না। ঔপনিষদীয় সর্ব্বগ্রাসী প্রাণের তত্ত্বের দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন—তাই 'আ প্রয়াঃ আ বসুনিষ্যঃ' সব কিছু তাঁহার জীবনের মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল। তাই হরিশ মুস্তফী বলিয়া অনেক ভক্তিমান ব্যক্তি যখন শ্রীনিত্যগোপালকে সভক্ত নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তারাপদকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া শ্রীনিত্যগোপালের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তারাপদকে না লইয়া যান। ইহার উত্তরে শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছিলেন তাঁহার যদি মুস্তফী মহাশয়ের বাড়ী যাইতে হয় তাহা হইলে তারাপদকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং সে-ই তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিবে—অন্য ভক্তরা অন্য পংক্তিতে বসিবেন। অবশ্য অগত্যা মুস্তফী মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। প্রচলিত আছে শ্রাদ্ধের খাইলে প্রেমভক্তির হানি হয়, নিজে শ্রাদ্ধের খাইয়া শ্রীনিত্যগোপাল সে কথার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল ইহাও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মানুষ সর্ব্বপ্রথমে মানুষ—তাহার জন্মদোষ তাহার পথের বাধা হইতে পারে না। সে যদি বৃহত্তর সুন্দরতর জীবন যাপন করিতে চায়, তবে জন্মদোষ তাহার চলার পথের বাধাস্বরূপ হইবে এমন হইতে পারে না। তাঁহার এই আশ্রয়দান ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, ভগবৎ করুণা ত্রিগুণাতীত তাহা আপনার স্বভাবে আপনি ঝরিয়া পড়ে। সে তো অভক্ত বাছে না, সত্ত্বগুণী তমোগুণীর অপেক্ষা রাখে না সূর্য্যের আলো কি পাপীর নিকট হইতে নিজেকে সংবরণ করে? বাতাস কি দুর্জ্জনের নাকে প্রবেশ করা হইতে বিরত থাকে? এই অহৈতুকী করুণা আছে বলিয়া শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন ভগবান শুধু ভক্তবৎসল নহে তিনি অভক্ত বৎসলও বটেন।

১২৭৭ সনে কালীঘাট ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে শ্রীশ্রীমদ্বধূত ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ শ্রীনিত্যগোপালকে একবারে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। নিত্যগোপালের সন্ন্যাস গ্রহণের নাম শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বাঙ্গালী ছিলেন। দীর্ঘকাল হইতে বেলুড়মঠের অন্তর্গত হিঙ্গুলায় আশ্রম করিয়া বাস করিতেছিলেন তিনি অবধূত সম্প্রদায়ের কেবলানন্দ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দীক্ষাকালে শ্রীনিত্যগোপাল গুরুদেবের নি হইতে যখন যে বেশ তাঁহার পরিবার প্রয়োজন হই তখন তাহা পরিবেন, এই অনুমতি চাহিয়াছিলে গুরুদেব বলিলেন, 'তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহি দীক্ষার অনেক পরে নিত্যগোপাল গৈরিক পরি করিয়াছিলেন। বাহ্যিক কোন আচার ব্যবহারই মানু সত্যিকার পরিচয় দেয় না—ইহা প্রমাণ করাই তাঁ উদ্দেশ্য। লিখিতেছেন, 'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য সন্ন্য এক বলিয়া মনে হয়'। সহজ জীবন এই মহা সিদ্ধাবস্থ জীবন।

শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার হুগলী আশ্রমে দেহর করেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার দেহ আনিয়া কা কাতা ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ ম

সমাহিত হয়। সেই সমাধির উপরেই বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপালের যেমন আড়াই বৎসর বয়ঃক্রমকালে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল, তেমনই সারাজীবনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁহার সমাধি অবস্থাতেই কাটিয়াছে। এমন একজন সমাধিস্থ পুরুষ হইয়াও তাঁহার জাগ্রত জীবন এমন মাধুর্য্যময় এমন সহজ ছিল যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির নিকট ধরা পড়িত না। তিনিই আবার বলিয়াছেন, সকল রকম অবস্থাই মায়িক, সমাধিও একটা অবস্থা; তাই উহাও অমায়িক নহে।

শ্রীনিত্যগোপাল দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। এমন অপরূপ লাবণ্য এবং এমন আকর্ষ্য রং দেখা যায় না। তাঁহার কথাবার্ত্তা ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত মধুর। অল্প বয়সেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সমস্ত শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষের দিকটায় যখন তিনি কলিকাতা নবদ্বীপ ও হুগলীতেই প্রধানতঃ কাটাইয়াছিলেন, তখন দিনের বেশীরভাগ সময়ই একটা বন্ধ ঘরে কাটাইতেন। যখন ভক্তদের সঙ্গে এক আধবার সাক্ষাৎ হইত, তখন অতি আপনজনের মত তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন, ঘরের লোকের মত ঘরের খবর লইতেন। কাহার কোথায় কি অসুবিধা, কাহার কি দরকার তাহা বুঝিতেও তাঁহার দেরী হইত না—এমন মায়ের প্রাণ ও দৃষ্টি লইয়া সকলের ছোট ছোট সুখ দুঃখকেও পূরণ করিতেন। ভক্তদের গান গাহিতে বলিতেন, অথবা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে বলিতেন। শুনিতে শুনিতেই সমাধিস্থ হইতেন—পাঠ বেশীদূর অগ্রসর হইত না, সঙ্গীতের পরপারে তিনি চলিয়া যাইতেন। শেষের বহু বৎসর এইভাবে গিয়াছে। শাস্ত্রাদি পাঠ ও গ্রন্থাদি রচনা ইহার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল।

মাত্র ছাপান্ন বৎসর তিনি দেহে ছিলেন। যে তত্ত্ব ও জীবন লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন তাহা সমাজের কাছে পৌঁছাইবার সেটা সময় নহে। তিনি নিজের মধ্যে নিজে ছিলেন একেবারে একক—সমস্ত তিনি নিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু কালের অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষায় তাহা রহিয়াছে। সময়ের সম্বন্ধে কয়েকটি স্তব পাঠ হইয়াই আমরা শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব। সেদিন খুব দূরে নয়।

'পূর্ব্বে নিজের অহম্‌কে ও অহম্‌পূর্ব্ব কর্ম্ম-বুদ্ধি-মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করা হইলে সেই অর্পিত অহম্ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যে কর্ম্মে স্ফুরিত হইবে, তাহাই হইবে 'ভক্তি'। এক কথায় ভগবানে মনোলয়, বুদ্ধিলয় ও অহম্-লয়ের পরই ভক্তির আস্বাদন জমিয়া উঠে। নির্ম্মলা ভক্তিতে কর্ম্ম-জ্ঞান হইবে ভক্তির ঘন আস্বাদন।...বর্ণাশ্রমের আরম্ভ জীবের অহম্ হইতে, ভক্তি সাধনার আরম্ভ ইহারই উজান গতিতে ভগবান হইতে, 'পুরুষোত্তমোঽহম্' হইতে। বর্ণাশ্রম বিশ্ব হইতে বিশ্বনাথে পৌঁছিবার কথা শুনাইয়াছে, আর ভাগবত শুনাইয়াছেন বিশ্বনাথ হইতে বিশ্বে আসিবার খবর।... ..ভক্তিবাদ কখনও ভগবানকে বিশ্বের ওপারে নির্ব্বাসন করে নাই। ভগবান তাঁহার immanent aspect এই বিশ্বকে 'সর্ব্বতোবৃত্ত্যা' অতিক্রম করিয়া আছেন (অত্যতিষ্ঠৎ)।.....'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীনিত্যগোপাল স্মরণে

॥ শ্রীবিমলপদ রায় ॥

তোমার আবির্ভাব তিথি আসে
বর্ষে বর্ষে যেমন এসে থাকে।
সভা হয়, গান হয়, তোমার জীবন-দর্শন-তত্ত্ব
আলোচিত হয়—
জনতা ভীড় ক'রে কথা শোনে, গান শোনে
আসে—চলে যায়।
তবু কি অচেনা তুমি চিরকাল রবে
আমাদের মানুষের ঘরে!
পৃথিবীর জনতার মুখে
প্রাণ-হীন বাক্যের অবাধ প্রচার।
বুদ্ধির শাণিত কৃপাণে
অর্দ্ধমৃত মানুষেরা যবে
খুঁজে ফেরে শান্ত স্নিগ্ধ
সত্যের কোন পথ।
অতীতের চিন্তাধারার
পৃষ্ঠ পোষকেরা,
বর্তমানের জড়বাদী
মানুষের মন,
খুঁজে ফেরে খুঁজে ফেরে
এ-পৃথিবীর আদি অন্ত রহস্যের লীলা;

কেহ খুঁজে পায় নাকো' পথ।
এ পৃথিবী দুর্বোধ্য বড়
অজস্র তর্কে আর
অহমিকার তিমিরান্ধকারে।

অথচ তুমি এক মূর্ত্তিমান
পথিকৃৎ মানব-মনের।
তোমাকে পেলে যে সব পাওয়া যায়—
সব বোঝা যায়
বোঝা যায় জীবনের, যৌবনের সব কিছু মানে
একথা বদ্ধমূল হবে করে মনে,
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যীশু আল্লাহ্—
ভগবান তুমি,
তোমাকে পেলে যে সব পাওয়া যায়।

তুমি 'বিশ্বনাগরিক'
তুমি বিশ্বের অধিবাসী।
জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর তুমি,
নিরাকার আকারিত তব জীবনে
বাস্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ তুমি।

তোমার জীবন-সমুদ্রে যে নীরে
ডুবে ক্রমে যায়
সে কি পারে হিংসা, দ্বেষ,
মলিনতার পঙ্কে নিমজ্জিতে।

তোমার আবির্ভাব তিথি আসে
বর্ষে বর্ষে যেমন এসে থাকে।
তোমার আবির্ভাবে আমাদেরও
মনের, প্রাণের, দেহের, সমাজের
টুটে যাক যত হীনত্বের, দাসত্বের
সুদৃঢ় বন্ধন।

শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

বিশ্বের কোন দেশ বা জাতিই আজ তার নিজ আখি স্বরূপে নেই। বিশ্ব জুড়ে ভাবের আদান প্রদানে, যোগাযোগ, যাতায়াত সকল দেশ সকল জাতিরই চিন্তাধারা ও জীবনযাপনকে মিশিয়ে মিশিয়ে ওলোটপালট করে দিয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীর জীবনে অন্য দেশের প্রভাব যত বেশী, এর দৈনন্দিন জীবন যাপনকে যতখানি তা ওলোটপালট করে দিয়েছে, এমন বোধহয় পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিগত পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসরে জনসাধারণের জীবনে পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া, চাল চলন যেমন বদলে দিয়েছে, তেমনি বদলে দিয়েছে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এর গোড়াকার দৃষ্টিভঙ্গি। সে ছিল মূলতঃ আধ্যাত্মিক, তাকে করে দিয়েছে জড়বাদী—সত্য কথা বলতে বিকৃত জড়বাদী, কিংবা আরও শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে রক্তের ভিতরে সেই পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গি, বাইরে বিদেশী আচার আচরণ—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যে এখনও সে তা ঠিক করে নিতে পারে নি। কোন কোন দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার যে পরিবর্তনটা এসেছে সেটা শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নানারকম সুখ সুবিধা যাকে একটিমাত্র মান-উন্নয়ন শব্দ দ্বারাই বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে—কোনো চিন্তাধারাগত ওলোটপালট আসে নি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তনেও তাদের কোন উল্লেখযোগ্য কথা নেই। আর কোন কোন দেশ আছে যেখানের অধিকাংশের জীবনে চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে তাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু এ পরিবর্তনটা এসেছে তাদের ভেতর থেকে, এ তাদের নিজস্ব হয়েই ফুটে উঠছে—বাইরের ধার করা নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলাতে ঘটেছে—তার জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন এসেছে সেটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখসুবিধা নয়—তা চিন্তাধারাগত, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন—এবং তার থেকেও বড় কথা এ আমাদের নিজস্ব নয়, সমগ্র জীবনের যে অর্ঘ্য আমাদের ছিল তার পরিপূরক এই অপরার্ধ আমাদের নিজস্বও না, এ সম্বন্ধে আমাদের সচেতনও করে তুলেছে বহির্বিশ্ব। বহির্বাগত এই চিন্তাধারার প্রাবনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ভারতবর্ষকে শুধু রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস-ভূগোলের মাধ্যমে কিংবা বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে না দেখে ভারতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্যে—আধ্যাত্মিকতার অর্থ দিয়েও—দেখতে চেয়ে ছিলেন। তিনি ছাড়া রাজনীতিবিদের বা ভারতবর্ষীয় কোন রাজনৈতিক নেতাই চিন্তাধারার এই প্রাবনকে ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নেবার চেষ্টা করেন নি। মহাত্মাজী প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে ষোল বৎসর আগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখেছেন, 'মহাত্মাজী ছাড়া অন্য সব কংগ্রেস নেতাদের প্রথম বিপদ আসিয়াছে, 'দেশ প্রথমে, ধর্ম পরে'—এই মতবাদ প্রচারের ভিতর দিয়া। 'ভারতবর্ষ' 'ধর্ম'কে ডিঙাইয়া 'প্রথম' থাকিবে কোন্ যুক্তিতে বা প্রয়োজনে?—ইহার মীমাংসা দিবার দুঃসাহস কংগ্রেসের করা ঠিক হয় নাই। যেহেতু তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে, ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও বাস্তব ধারণা নাই, যেহেতু তাহারা বিশ্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসেরই সহিত অধিকতর পরিচিত, সেই হেতুই ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপর তাহাদের জোর পড়া স্বাভাবিক। মহাত্মাজীর সুদূর প্রসারিণী দৃষ্টি তাহাদের এই ভুল ভাঙিবার জন্যই এই কর্মপদ্ধতি (মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি) প্রকাশ করিয়াছেন। কতখানি ভুল

আছিয়াছে ভগবান আনেন। ভারতের কুম্ভমেলাও যে কংগ্রেস হইতে কম শক্তিশালী নয়, ভারতের কোটী কোটী নর-নারীর অন্তরাত্মাতেই যে উহার 'স্থান', উহার প্রভাব যে আজও ভারতের সংসারী সন্ন্যাসী সকলের উপরই বেশ শক্তভাবেই আছে, কংগ্রেসের মত বাহিরে কোন আন্দোলন সে না করিলেও যে অন্তঃসলিলা ফল্গুরই মত ধীরে ধীরে শান্ত সমাহিতভাবে ভারতের অন্তরাত্মাকে সে পুষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি দেওয়া কংগ্রেসের উচিত ছিল। কংগ্রেস মনে করিয়াছে কুম্ভমেলাকে দিয়া কি তাহাদের প্রয়োজন? কিন্তু কুম্ভমেলার মত এতবড় শক্তিশালী সঙ্ঘ যদি ভিতরে ভিতরে স্থিতিপ্রধান (static) অবস্থার উপদেশ দেন, কংগ্রেস কি সে জাতিকে গতিবেগযুক্ত (dynamic) করিতে পারিবে? ব্রিটিশ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সত্যিকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কুম্ভমেলার গোড়াকার চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয় লাভ আজ হউক, কাল হউক করিতেই হইবে। এত বড় শক্তিশালী সঙ্ঘের কোন খোঁজ না করিয়া ভারতের কোনও স্থায়ী কল্যাণ হইতেই পারে না।...কুম্ভমেলা মস্ত দেয় কানে কানে কংগ্রেসের আড়ালে।...'

বিদেশী সভ্যতার মারফত এবং বর্তমান বিশ্বের বৈষয়িক চিন্তাধারা মারফত চিন্তাধারাগত যে প্রাবন এসে গেছে তাকেই এক কথায় রাজনীতি বা কংগ্রেস এবং প্রচলিত অধ্যাত্মবাদকে কুম্ভমেলা নামে অভিহিত করেছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। পাশ্চাত্ত্যের প্লাবনকে ভারতীয় সত্য প্রেম পবিত্রতার সঙ্গে মিলাতে চেয়ে ছিলেন গান্ধীজী রাজনীতি ক্ষেত্রে, রাজনীতিকে তিনি কূটনৈতিকতার শোষণক্ষেত্র হয়ে না পড়া থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, আর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এসেছেন পাশ্চাত্ত্যের প্লাবনকে সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তাধারা, জীবনধারার সঙ্গে মেলাতে; ধর্ম আধ্যাত্মিকতা দর্শন আর বাস্তবের জীবন—এই দুইকে একই জীবন সূত্রে গেঁথে দুইকে দিয়ে দুইকে ভাবিত করে বিশুদ্ধ করতে, সুন্দর করতে এসেছিলেন শ্রীনিত্যগোপাল ১০৯ বৎসর আগে। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু নেই, কিংবা স্থূল ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রে যেমন আছি চিরদিন এমনই থেকে যাব, জীবনের বা মানব সভ্যতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল খাওয়া দাওয়া করেই জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দেব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে একে অপরকে অভিভব করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে, যা কিছু মানুষের প্রয়োজন তা আছে এর মধ্যেই, বাইরের কিছুর জন্য মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই, এর থেকে মহত্তর বৃহত্তর সুন্দরতর আর কিছু এর মধ্যে নেই—এ-ও যেমন মানুষের জীবনে শেষ কথা নয়, তেমনি বস্তু মাত্রই বন্ধনের কারণ, বাস্তব রূপরসের জগৎটাই ক্লেদপূর্ণ, যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ সব এই রূপরসগন্ধস্পর্শ জগতের বাইরে—সেটাও মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়, সবটুকু কথা নয়—এই কথা বলতেই এসেছেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। পাশ্চাত্ত্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনটাকে একমাত্র সত্য বলে যদি শান্তি ও আনন্দ পেতো তাহলে কোনো ভাবনা ছিল না—সবাই সেই পথে শান্তি ও আনন্দ পেতে সহস্র চেষ্টা করে যেতাম। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য তার এই শক্তি ও সামর্থ্য-দম্ভ দিয়ে পরস্পরকে অভিভব করার পথে কোন শান্তিই তো আনতে পারে নি। তারা যখন বলে বেশী সংখ্যা মিলে মিশে থাকলে এতেই শান্তি তখনও দুটো কথা থেকে যায়—প্রথমতঃ 'সবাই' মিলে মিশে থাকব—এই কথাটা তারা বলতে পারে না—দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে অনন্তকাল ঝগড়া করবে বলে, তারা প্রত্যেকে যে অর্দ্ধেক হয়ে পরস্পরকে নিয়ে পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করছে, এ কথা তারা আজও বুঝছে না—পরস্পরকে যদি তারা সমগ্রের অংশ বলে বোঝে তাহলেই পরস্পরের অবস্থা ও মান বদলে যাবেই, সে কথাও বোঝে না তারা; দ্বিতীয়তঃ মিলতে যে তারা পারছে না, তা তো দেখাই যাচ্ছে—মিলতে পারছে না বলে শান্তিও পাচ্ছে না; অথচ পাশ্চাত্ত্য আইনের বলে বা শক্তি-দম্ভে অপরের মুখ বন্ধ করে রেখে মারামারি করেই জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ শান্তি চায়, সবাই মিলে মিশে থাকতে চায়—এ তো করতেই হবে—তাই

কাজের অবকাশ রয়েছে প্রচুর যে কি করে শান্তি হয়। চিন্তাজগতের এই শূন্য স্থানে এসে শ্রীনিত্যগোপাল দাঁড়ালেন। এই যে দুই রকম চিন্তাধারা বিশ্বে বিশেষ করে ভারতবর্ষে ঠেলাঠেলি করছে, এই দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীনিত্যগোপাল দুটোরই ঐকান্তিকতাকে মিথ্যে বললেন। তিনি বললেন, দুটো চিন্তাধারাই সত্য, মিথ্যা শুধু একের অপরকে অস্বীকার করবার মূঢ়তা। তিনি বললেন, সত্য সৌন্দর্য মঙ্গল এই জাগ্রত বিশ্বের সব কিছুকে অস্বীকার করে এর বাইরেই একান্তভাবে নেই, এই যা কিছু দেখছি শুনছি এই সব কিছুকেই এমন ছন্দে গড়ে তোলা যাতে যাতে এই সবই সত্য সুন্দর মহৎ হয়ে ওঠে।

রাজনীতিতে গান্ধীজী কেন সত্য প্রেম পবিত্রতার কথা বলতে চেয়েছিলেন, কী তাঁর গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল, এ তাঁর অনুগামীরাও যে বুঝতে পেরেছিলেন এমন সাক্ষ্যের অভাব, কার্যকরী করতে পারা তো দূরের কথা। শ্রীনিত্যগোপালও এই দুই রকম চিন্তাধারার সমীকরণকে ধর্মের ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে রেখে গেলেন বটে, এই ব্যাপকতর সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের জীবনকেও রেখে গেলেন বটে, কিন্তু এ তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ বলেই আজও বিদগ্ধ জনেরাও জানেও না শ্রীনিত্যগোপাল কে ছিলেন, কি ছিলেন—যারা তাঁর নাম শুনেছে তাঁরাও তাঁর দেওয়া এই বিশ্ব-দর্শনের খোঁজ পায় নি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সর্ব শক্তি শ্রীনিত্যগোপালের এই সর্ব সমন্বয়ের মহা সমীকরণকে প্রকাশ করবার জন্য নিয়োগ করেছিলেন, আজ একটু একটু করে তারই প্রকাশ হচ্ছে, একটু একটু করে শ্রীনিত্যগোপাল ফুটে উঠছেন—কিন্তু ধীরে, অতি ধীরে। তবে নিত্যগোপাল যে কথা দর্শন ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বললেন সে কথা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে এসে গেছে, যাচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সমীকরণের ধারণা দিয়েই প্রাক-সাহিত্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং-সাহিত্যেও কাঁপায় কাঁপায় এই দুই দিকের স্বীকৃতির আবেদন। বাঙালীর জীবন-যাপনও অনেকখানি এই চিন্তাধারার অনুযায়ী, কিন্তু সচেতনভাবে আজও সে একে জানেও না, মানেও না। আর পাশ্চাত্যের আধুনিকতম পদার্থ-বিজ্ঞানীগণ পদার্থ বা বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়েছেন, তাতেও এই সমীকরণের কথাই—বস্তু ও চৈতন্য সেখানে একান্ত বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। এই দুই দিকের কোনোটা একান্ত হয়ে উঠলে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠলে যে বাস্তবের সত্তা ব্যাখ্যা তারা দিতে পারে না—সত্য ব্যাখ্যা পেতে হলে যে 'a subtle and almost indefinable fusion of the two terms' প্রয়োজন, সুই ভি ব্রগলী এই কথাটা তাঁর 'Matter & Light' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল যুগের দুই দিকের কথাকে সম মান ও সম মর্যাদায় উপস্থিত করে একটি 'চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়' রূপ নিয়ে একশ' নয় বৎসর আগে চব্বিশপরগণা জেলার পানিহাটি গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অপরূপ জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কেমন করে যুগের সংটুকু কথাকে তিনি ভাষা দিচ্ছেন। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ, প্রাচীন ভারতবর্ষ অন্তর্মুখীন গতিতে ধ্যান করাকেই বেশী মূল্য দিতেন, আজকের ভারতবর্ষ বাস্তব জীবনের মূল্য দিতে চায় বেশী। নিত্যগোপাল তাঁর আড়াই বৎসর বয়সে নির্বিকল্প সমাধিতে তিন দিন বাহ্য চৈতন্য হারিয়ে ছিলেন, বড় হয়েও জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই তাঁর কেটে গেছে সমাধিস্থ থেকে, আবার তিনিই বাস্তবের মূল্যকে কম করে বাস্তবাতীতকে বড় না করে লিখলেন যে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, সেই যুক্তিকেই তিনি বেশী মানবেন, আবার লিখছেন, 'সমাধিও একটা রোগ', দুইকে মূল্য দিয়ে লিখলেন, 'জড় অজড় সমন্বয়, চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়' ইত্যাদি। যিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে থাকতেন অর্থাৎ এই দেহেই জাগ্রত জীবনের বাইরে ধ্যানের মধ্য দিয়ে কোথায় কোন্ সুদূরে চলে যেতে যার মুহূর্ত সময় লাগত না, তিনিই আবার বাস্তব জীবনের ছোটখাট [সুখদুঃখ হাসি কান্নায় কেমন সহজ হয়ে মানুষের কাছে ধরা দিতেন—যেন তিনি আমাদেরই মত একজন। এই খানেই তিনি বিরাট, এইখানেই মহান মহীয়ান যে তিনি যেমন বড় হতে পারেন, সব কিছুকে ছাড়িয়ে চলে যেতে

পারেন, কোন বিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারে না, কোন বিছুতেই তিনি আসক্ত নন, আবার তেমনই তাঁর ঘরের বইপত্রগুলি এমনি করে গোছান যে সকল সময়ই মনে হবে এই মাত্র গুছিয়ে রাখা হল, বৃন্দাবনের স্মৃতিটা পর্যন্ত যত্ন করে তিনি রেখে দিচ্ছেন, বাগানের ঘাস শুকিয়ে রেখে বর্ষার সময় জালানীর অভাব মেটাচ্ছেন, তার পরণের কাপড় নেই, দূর পাল্লার পথে যেতে সে খাবার সঙ্গে নিয়ে গেল না, গুরুর আশ্রমে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন বলে কোন্ শিষ্যের পিতার অন্নজল জুটছে—এই সব সাধারণ ও ছোটখাট ঘটনাগুলিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুণ।

কিন্তু সাধারণ জৈব মনের স্বভাবই এই যে সে বড় হলে ছোট হতে পারে না, ছোট হলে বড় হতে পারে না—তাদের মনের এতখানি নমন-ধর্মশীলতা নেই। নিত্যগোপাল প্রাণবন্তর বলেই অতি মানসিক স্তর তাঁতে এমন সহজ ছিল। সন্ন্যাসী ও সমাধিস্থ পুরুষ হয়েও তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভোট দেওয়া রূপ নাগরিক কর্তব্যকে কখনও অবহেলা করেন নি, শিষ্যের স্ত্রী বিয়োগে শিষ্যের সাথে চোখের জল ফেলেছেন তিনি অত্যন্ত সহজ ভাবে—তাতে তাঁর সাধুত্ব নষ্ট হতো না, যে তাঁকে বিষ খাইয়েছে তার সম্বন্ধে এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে, তার সাথে আগের মতই, সহজ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করার মত বিশাল হৃদয়বত্তা নিত্যগোপালের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল—তিনি নিজে শুধু তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করেননি, শিষ্যদের পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন, 'তাকে যেন কিছু বলা না হয়'। আরও আছে, যার তার দেওয়া কিছু না খেতে শিষ্যের অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কিছু দিলে আমি তা অস্বীকার করতে পারব না'। নিত্যগোপালের ঐশ্বর্যের দিক, বিভূতির দিক যদি দেখতে চাই তাহলেও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাব—আবার সহজ মানুষ রূপে যদি তাঁকে খুঁজি তাহলে দেখব অতিমর্ত্যধর্মকুশলীলপিকোপীক্ষা সব কিছু নিরপেক্ষ সর্ব মানুষের জন্য তাঁর পরমাত্মীয়তার মণ্ডিত এক অপরূপ মানুষী রূপ—যা মাধুর্যের ঘনি অঙ্ক বিরাটত্ব হেতু ক্লেদবর্জিত। শ্রীনিত্যগোপালের জীবনের বিভূতি বা ঐশ্বর্যের দিকের সহস্র ঘটনার মধ্যে দুই একটি এই স্থানে উল্লেখ করি যার একটি শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর লিখিত 'দিব্যদর্শন' পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছেন 'সতীশ— সেদিন রাত্রে খোকামণী আপনার মস্তকে মুকুট দিয়া কণ্ঠে পুষ্পমালা এবং মুণ্ডমালা প্রভৃতি দিয়া পুষ্পাভরণে সাজাইয়াছিল, সে দিবস রাত্রে আপনাকে প্রথমতঃ কালী হইতে দর্শন করিয়া তৎপরে দশভুজা দুর্গা হইতে দর্শন করিয়াছিলাম।

নিত্য—সে সময় আমি কি করিতেছিলাম?

স—আপনি সমাধিস্থ ছিলেন।...

নিত্য—তুমি যখন আমাকে কালী হইতে দুর্গা হইতে দর্শন করিয়াছিলে তখন কি তুমি ভাবাবিষ্ট হও নাই?

স—তখন আমি ভাবাবিষ্ট হই নাই। তবে আপনার সে সমাধি অবস্থা দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল আপনার মনোহারিণী সজ্জা দেখিতে বড় সুখ বোধ হইতেছিল, তাই একাগ্রতার সহিত ঐ প্রকার আপনাকে দর্শন করিতেছিলাম।

নি—হঠাৎ কি আমাকে কালী এবং দুর্গা হইতে দর্শন করিয়াছিলে?

স—আমি পূর্বকথিত মত আপনাকে দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ আপনার নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে আপনার সর্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইল, তৎপরে আপনার চতুর্ভুজ দর্শন করিলাম। তৎপরে লোলজিহ্বা দর্শন করিলাম। লোলজিহ্বা দর্শনান্তে আলম্বিত মুক্ত কেশকলাপ দর্শন করিলাম। মস্তকে খোকামণী বা চন্দ্রমালী প্রদত্ত মুকুটের পরিবর্তে অপর দিব্যমুকুট দর্শন করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার দর্শন করিতে করিতে আমার নিজ ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেই দর্শন জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ঐ প্রকারে দর্শন জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই কালীমূর্ত্তিই দুর্গা হইয়া ছিলেন...গৃহে সে সময়ে অত্যন্ত জনতা ছিল বলিয়া আমার কালীদর্শন সময়ে সময়ে ঐ দুর্গাদর্শনের মতন ব্যাঘ

হইতে ছিল। ব্যাঘাত অপসারিত হইলে আপনার এই মূর্তি বিলুপ্ত দর্শন করিয়া তৎপরে কালীদর্শন করিতে-ছিলাম। ঐ প্রকারে বারম্বার কালীদর্শন এবং প্রতিবন্ধক-বশতঃ অদর্শন করিতেছিলাম।

নি··· ··· ···বে সমস্ত বিষয় আমার নিকট এবং এই অন্তরঙ্গদিগের নিকট কীর্তন করিলে কোন বহিরঙ্গের নিকট আপাততঃ কীর্তন করিও না। কীর্তন করিবার সময় উপস্থিত হইলে তোমরা জানিতে পারিবে এবং সেই সময়ে লোকহিতার্থ প্রকাশ ভাবেই সকলকে বলিতে পারিবে বা অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করিতেও পারিবে।'

আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করি যেখানে একজন বিদেশীও যে নিত্যগোপালের মধ্যে তাঁর ইষ্টকে দর্শন করে ছিলেন তার খবর আছে। "এমনসময়ে সেবক লাটু আসিয়া নিবেদন করিল, 'একজন সাহেব আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীনিত্য-গোপাল···মৃদুস্বরে আদেশ করিলেন, ভিতরে আসিতে দাও'। অনুজ্ঞা পাইয়া লাটু চলিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরেই উইলিয়ম প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার অভীষ্ট দেব যীশু সম্মুখে পালঙ্কো-পরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রেমাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল ভরিয়া গেল, কণ্ঠ গদগদ হইল, অঙ্গে পুলকাবলীর আবির্ভাব হইল। উইলিয়াম শ্রীনিত্যদেবের দোলায়মান রাতুল চরণ-তলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন।··· উইলিয়াম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'Here is my Jesus'···"—'শ্রীনিত্যগোপাল' প্রথম খণ্ড—শ্রীমৎ নিত্যগৌরানন্দ অবধূত—পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪।

এইরূপ সহস্র ঘটনার মধ্যে দুইটি উল্লেখ করা গেল। এটা জীবনের যে দিক, সেজন্য আমাদের সর্ব সাধারণের শ্রীনিত্যগোপালকে প্রয়োজন নেই আজ। বহুকাল ধরে ভারতবাসী জীবনের এ দিককে আস্বাদন করেছে, কিন্তু এত বড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিদিনকার জীবনে এত অসৌন্দর্য কেন, কেন সে পরাধীন থেকেও খুশী থাকে, কেন ভারতবাসী মিলতে পারে না, কেন জাতীয়তার ক্ষেত্রে সে অদ্ভুতরকমভাবে পিছনে পড়ে আছে, কেন সীমাহীন কর্মকুণ্ঠা তাকে কর্তব্যকর্ম থেকেও বিরত রাখে, কেন সে শিশু-খাদ্য, রোগীর ওষুধ থেকে সব কিছুতেই ভেজাল দিয়ে নিজের পকেট ভারী করতে এতটুকু দ্বিধা করে না—যা করে না বিশ্বের কোন অসভ্যতম জাতিও—কেন উদ্বাস্তু-শিশুর মুখের দুধ কেড়ে নিয়েও কালোবাজারী করতে তার এতটুকু বাধে না? যে আধ্যাত্মিকতার বড়াই করে ভারতবর্ষ, সে আধ্যাত্মিকতা যদি তার দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করতে না পারে, তাহলে এ আধ্যাত্মিকতা তো তার বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে, এড়িয়ে গিয়ে আরামে থাকবার মোহ মাত্র। এ ধর্ম নিত্যগোপালের নয়। তাই তাঁর জীবনের যে দিক বাস্তবকে ছাড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে কোন্ সুদূরে চলে যাচ্ছে—প্রয়োজন নেই বলে সে দিকের কথা বড় করে তুলে ধরলেন না শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-নন্দ। শ্রীনিত্যগোপালের যে চরিত্র সম্বন্ধে পরিচয় দিতে শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, টাঁকে টাকা আর সমাধি নিত্যগোপালেই সম্ভব—সেই চরিত্রের কথাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-মুগ্ধ ভারতবাসীর সামনে বড় করে তুলে দেখাতে চাইলেন যে টাকা অর্থাৎ বাস্তব জীবনকে ছোট করে সমাধি অর্থাৎ বাস্তবাতীত কিছুকে বড় করবার কথাটা আজ বড় নয়, আজ বাস্তবকে তার যথামূল্যে যথা স্থানে স্বীকার করেই বাস্তবাতীত থাকার যোগ্যতা লাভ করতে হবে। সেটা সম্ভব কেমন করে, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-নন্দ তাইই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর সারা জীবন ধরে।

তাই যে ভারতবর্ষ ধর্মের নামে দলাদলি, ভেদবাদ, ছোটবড় সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাকে এক করতে নিত্যগোপাল যখন দেখেন আমি হিন্দুস্থানবিরোধী, আমি মুসলমান নই, খ্রীষ্টান নই, বৈষ্ণব নই, প্রচলিত তথাকথিত হিন্দুও নই, আমার কোন দল নেই, সকল দল নিয়ে আমার এক অখণ্ড দল—তখন তার মধ্যে পুরুষোত্তমানন্দ কেবল সমস্ত ভারতবাসীর নয়, বিশ্বের মানুষের মিলিত হওয়ার ক্ষেত্র দেখতে পেয়ে আনন্দিত হন, তাই শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন মানুষের কাছে তুলে ধরতে তাঁর প্রাণপণ প্রয়াস।

ধর্ম যদি বাস্তবকে ভুলিয়ে দেয়, ধর্ম যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে মানুষে মানুষে ভেদ আরও বাড়িয়েই তোলে, ধর্ম যদি দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ না করে, ধর্ম যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না শেখায়, ধর্ম যদি কালোবাজারী বন্ধ করতে না পারে, ধর্ম যদি স্বার্থ-বুদ্ধি দূর করে পরকে আপন করাতে না পারে—তাহলে সে ধর্ম মানুষের গ্রহণ অপেক্ষা বর্জন করাই শ্রেয়:—এইটে নিত্যগোপালের কথা। কেবল নিজ সম্প্রদায় নয়, পর মানুষকে ভাল না বেসে ভগবানকে ভালবাসলে তাতে ভগবান খুশী হন না—এইটাই নিত্যগোপালের কথা। আসক্তি বিদ্বেষে আটকে না গিয়ে বাস্তব জীবনটাকে শুদ্ধিয়ে বিশ্বের ও বিশ্বেশ্বরের সেবাবুদ্ধিতে চালিয়ে নিলে সেইখানে ভগবান প্রতিষ্ঠিত হন, সেইখানে ব্যক্তি ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি—কেবল আধ্যাত্মিক বিভূতি ঐশ্বর্য একটা জাতিকে জাতি হিসাবে রক্ষা করতে পারে না—এইটেই নিত্যগোপালের কথা। অতীত ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতেই শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে নির্বিকল্প সমাধি আর অত অত বিভূতির ঐশ্বর্য—এগুলি লাভ করাই বর্তমানে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নয় এ তাঁর জীবন অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে। একটা ব্যাপক গভীর বিরাট জীবন-চেতনা যেখানে কোনো কুসংস্কার নেই অথচ মুক্তি বা সংস্কারহীনতা মানে যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেখানে উন্নততর পরিবার সমাজ রাষ্ট্র-জীবন রক্ষার কারণ, তেমনই একটি জীবন-চেতনাকে রেখে দিয়ে গেছেন শ্রীনিত্যগোপাল, আজকের দিনে তাই তাঁকে প্রয়োজন খুব বেশী।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যত বড় কথাই হোক, কিংবা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মানুষকে যাহাই দিক না কেন, পথ-চলার নিশানা মানুষকে মানুষেরই কাছ থেকে লাভ করতে হবে—কোন একজন মানুষেরই কাছে নিজেকে প্রস্থাপন করে জেনে নিতে হবে নূতন যুগের চলার পথ কি? বিশেষ করে পথ যেখানে জানাশুনা, নূতন সমস্যা যেখানে নেই, সেখানে তবু কেতাবী বিদ্যায় চলে, কিন্তু বিপ্লবের দিনে সামনের দিকে যখন অন্ধকার, তখন মহা প্রাণকে বহন করে আনেন যারা, তাঁরাই দিতে পারেন পথ চলার দিশা। নিত্যগোপালকে তাই প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিকতা কিংবা যে কোন শক্তি-দম্ভের অত্যাচারে মানুষ যখন বিক্ষুব্ধিত, তখন বর্তমান কালে এলেন মার্কস্ তাঁর কম্যুনিজম নিয়ে—কিন্তু কম্যুনিজম যে শেষ সমাধান নয় এ কথা বুকবার সাথে সাথে দাঁড়াচ্ছেন শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে সঙ্গে করে যেখানে কম্যুনিজম যতটা বলতে পেরেছে তা জীবনে পরিপাক করে নিয়েই যা সে বলতে পারে নি, তার খোঁজ পাওয়া যাবে। এঁদের চিন্তাধারা মানুষের কাছে উপস্থিত করতে পারলে মানুষের সভ্যতা নগণ্য ঘটনা বা জীবনোন্মেষ পর্যন্ত গতির উদ্দামতার মধ্যেও একটা স্থিতি লাভ করে শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হবে। তাই শ্রীনিত্যগোপালের এই ১১০-তম জন্মতিথি ক্ষণে বার বার তাঁকে স্মরণ করি, তাঁকে নিবেদন করি আমাদের সকল সত্তার আহুতি—বিশ্বের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে জাগ্রত হয়ে উঠে তিনি বিশ্বকে সর্ববিশেষ সমন্বিত নির্বিশেষ জীবন দান করুন। বিশ্ব সুস্থ হোক।

ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

আজ বাসন্তী-অষ্টমী তিথি, আজকের এই দিনে ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল ধরার বুকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তত্ত্ব-মূর্ত্তি, তত্ত্ব-মূর্ত্তিরে বলিয়া আমরা প্রতিদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকি, আজ এই শুভ জন্মতিথিতে তাঁহার চরণে তত্ত্ব-মূর্ত্তিরে বলিয়া বার বার আমাদের প্রণাম জানাইতেছি। আজ তাঁহার অবতরণ-গীতি গাহিবার দিন, তাই আমরা সমবেত হইয়াছি তাঁহার শ্রীচরণতলে। তাঁহার কথা আলোচনা করিয়া সকলে মিলিয়া আমরা আজ আপ্লাবিত হই আনন্দিত হই।

শ্রীনিত্যগোপালকে আমরা ভগবান বলি কেন? তিনি যে অবতার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আমাদের কিছু আছে? শ্রীনিত্যগোপালেরই নিজ শ্রীমুখের বাণী, 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি'। আমরা তাঁহার জন হইয়া বহু অবতারে ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষে আর একজন আনুমানিক ভগবানকে খাড়া করিয়া মানুষকে আরও ভারাক্রান্ত করিব ইহা তো যুক্তিযুক্ত হইবে না।

প্রথমেই বলিয়াছি তিনি তত্ত্বমূর্ত্তি, তাঁহার কথা বলিতে হইলেই তাঁহার তত্ত্বের কথা বলিতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'। ভগবানের অবতরণের মূলে থাকে একটি তত্ত্ব, অবতার-জীবনে থাকে একটা নিজস্ব কথা এবং সেই কথার ভিতর থাকে সেই যুগের সমস্যার সমাধান। শ্রীনিত্যগোপাল এই যুগ-সমস্যা সমাধানের বাণী লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই স্থানেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া না মানিয়া পারি নাই। আমরা সেই বাণী জন-সাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিব। তাঁহারা যুগ-জীবনের সহিত তাঁহার বাণী মিলাইয়া লইয়া তাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয় করিবেন, না করিতে হয় করিবেন না। সত্য স্ব প্রকাশ, তবে একটি কথা সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্', 'আদৌ শ্রদ্ধা'; শ্রদ্ধা থাকিলেই সত্য সেখানে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের যুগে বিনা বিচারে কেহ কাহাকেও স্বীকার করিবে না, করা উচিতও না, কিন্তু বিশ্বাসকে মূল ভিত্তি করিয়াই বিচার করিতে হইবে, বিশ্বাস ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব বোধই হয় না, সে বিচার হয় শুধু তর্কে পর্য্যবসিত। শ্রীনিত্য-গোপালকে বুঝিতে হইলে বিশ্বাস ও বিচারের সমন্বয় করিয়াই বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের একান্ত বিশ্বাস ও আচার্য্য শঙ্করের একান্ত বিচারের ফল এই বর্ত্তমান ভারত, এখানে না আছে সত্যকার বিশ্বাস না আছে সত্যকার বিচার। ভারতকে তাহার স্থানে দাঁড়াইতে হইলে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শ্রীনিত্য-গোপাল-প্রবর্ত্তিত বিচার ও বিশ্বাসের সমন্বয়-ভূমি খুঁজিয়া লইতে হইবে।

এখন যুগ-প্রয়োজনে শ্রীনিত্যগোপাল কি তত্ত্ব, কোন্ বাণী আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই একটু আলোচনা করিব। ভারতীয় দর্শনের আচার্য্যগণ যে ভাবধারা চিন্তাধারা প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, যাহার উপর সমাজ গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু দেখা যাইতেছে যখন তাঁহারা এই ভাবধারা চিন্তাধারা প্রচলন করিয়া-ছিলেন সে যুগের প্রয়োজনে লাগিয়াছিল সত্য কিন্তু কালের ধাক্কায় সেই সমস্ত নীতি আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম আজ বিকৃত, মানুষ আজ দিশেহারা। অতীতের চিন্তাধারায় বর্ত্তমান যুগ আর চলিবে না, চলিতেছে না, নূতন যুগের নূতন চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, এই নূতন চিন্তাধারার স্রষ্টা শ্রীনিত্যগোপাল এবং সেই চিন্তা ধারার ধারক ও বাহক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-

নন্দ অবধূত। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবনে শ্রীনিত্য-গোপালের প্রবর্তিত জীবন-দর্শনকে, যুগ-দর্শনকে দারণ করিয়াছিলেন ও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে, কি সে নূতন কথা তাহাই একটু বলিব। ভারতীয় দর্শন বহুকে মুছিয়া ফেলিয়া মিথ্যা বলিয়া এক ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন. শ্রীনিত্যগোপাল বহুকে বহু রাখিয়াই এক ও বহুর সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন। ভারতীয় প্রচলিত দর্শন ব্রহ্ম এবং মায়াকে, পুরুষ এবং প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া লইয়া সেই ভেদের দৃষ্টিতে দর্শন সাহিত্য সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সেই চিন্তাধারার উপর সমাজ গড়িয়াছিল, যাহার ফল এই বর্তমান ভারত। তাঁহারা এই বিশ্ব প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া যত কিছু হেয়ত্ব তাহার উপর আরোপ করিয়া বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহার ফলে সর্বত্র আজ শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক হইয়াছে। সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই, সমস্যা আরও জটিলতম হইয়াছে। যে দর্শন বিশ্বজগতের মূল ভিত্তি পত্তন করিল উচ্চ নীচ, হেয় উপাদেয়ের কোঠা বিভাগে, সে সৃষ্টি গড়িয়া উঠিল সেই আদর্শ অনুযায়ী। তখন গুণের ভিতর সত্ত্বগুণ বড়, রজঃ তম ছোট, বর্ণের ভিতর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ছোট, কর্মের ভিতর পূজা জপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ, মুচির জুতা সেলাই, মেথরের মলা পরিষ্কার আদি ছোট কর্ম। এমনি রাজা-প্রজা, পুরুষ প্রকৃতি, ধনিক-শ্রমিক, গুরু শিষ্যের উচ্চ-নীচের স্তর ভেদে গড়িয়া উঠিল এই জগত, ইহারই ফলে চলিল সকল ক্ষেত্রে বড়র শোষণ নীতি ছোটর উপর; দেখা গেল কিছু দিন এই শোষণ নীতি চলার ফলে প্রকৃতির সকল ক্ষেত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, কেননা প্রত্যেকেরই যে একটা নিজস্ব পুরুষোত্তম-সত্তা রহিয়াছে, তাহারা অন্য কর্তৃক শুধু শোষিত হইবে কেন? তাহাদেরও অধিকার রহিয়াছে, গৌরবময় সত্তা রহিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও রহিয়াছে, সে জন্য তাহাদের মূল্যও রহিয়াছে। অস্বীকার করিলেই সে অস্বীকৃত হইবে কেন? বর্তমান সমস্ত বিদ্রোহের ভিতর দিয়া বিশ্ব প্রকৃতি ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এই সমস্যা-সমাকুল বিশ্বের বুকে শ্রীনিত্যগোপাল ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—'নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্বসমন্বয়।' শ্রীনিত্যগোপালের এই সর্ব সমন্বয়ের ভিতরেই রহিয়াছে বিশ্বের সর্ব সমস্যার সমাধান। তিনি বলিলেন, 'জগৎ সত্য, ব্রহ্ম সত্য'। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের মতই সত্য এই জগৎ। মায়া তখনই মায়া হয় যখন তাহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দৃষ্টিতে দেখি কিন্তু ব্রহ্ম-আলিঙ্গিত মায়াই ব্রহ্মের মত সত্য। নির্মল ব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎ মলিন হইবে কেন, মিথ্যা হইবে কেন? ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া লইয়া যে জগৎকে মায়া মিথ্যা বলা হয়, সে দৃষ্টিতে সে বিচারে তো জগৎ মায়া, মিথ্যাই হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন 'ব্রহ্মের মত মায়াও সত্য'। 'দারুতে ব্রহ্ম নয় দারুই ব্রহ্ম'। দারুতে ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মেরই মূল্য দেওয়া হয়, দারুর নিজস্ব কোন মূল্য থাকে না, ব্রহ্ম ব্যতিরেক দারু জড় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীনিত্যগোপাল দারুই ব্রহ্ম বলাতে জড়ের মূল্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদিন এই জড় জগৎকে মায়া মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রচারিত করিয়া আসিয়াছেন। সেই জড় জগৎকে অজড় ব্রহ্মের সমমূল্য দান যিনি করিলেন তাঁহাকে অবতার বলিব না কেন, ভগবান বলিব না কেন?

বিকৃত জড় সভ্যতা ও বিকৃত অধ্যাত্মবাদের সংঘর্ষে ভারত আজ বিপন্ন। সুস্থ সভ্যতা গড়িতে হইলে শ্রীনিত্য-গোপালের সমন্বয়বাদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রচলন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। জড়াজড় সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাখ্যাত হইলেই বিশ্বসমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যাইবে। শ্রীনিত্যগোপাল সমাধিমান পুরুষ, তিনিই আবার বলিলেন, 'আমি বিশ্ব নাগরিক' 'এই বিশ্বই আমার মহাস্থান'। অধ্যাত্মবাদের সহিত জড়বাদের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার জীবন ও বাণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরমহংসদেব শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'টাকে টাকা ও সমাধি নিত্যগোপালে সম্ভব'। আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় যাঁর জীবন তিনি

আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। আজ আর একান্ত জড়বাদ বা একান্ত আদর্শবাদে জগৎ চলিবে না, তাই তিনি জড়কে বাদ দিয়া, মায়া মিথ্যা বলিয়া একান্ত জ্ঞানের কথা বলেন নাই, তিনি আত্মজ্ঞান প্রয়াসী ভারতবাসীর সামনে এক অভিনব বাণী বলিয়া গিয়াছেন। "আত্মজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা। সর্ব্ব জড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।" শ্রীনিত্যগোপালের এই জড়াজড় সমন্বয়কে সূত্র ধরিয়া শ্রীনিত্যগোপালের প্রিয় শিষ্য পুরুষোত্তমানন্দ সমস্ত উপনিষদ্ বেদান্ত ও গীতার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত বেদান্ত-ভাষ্য ব্রহ্মকে বলিয়াছেন অনাদি অনন্ত, কিন্তু প্রকৃতিকে বলিয়াছেন অনাদি, অনন্ত সে নহে, একদিন তাহার অন্ত হইবেই, তাই সে মায়া মিথ্যা। মুক্ত ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইলে গোড়ার এই বেদের দৃষ্টি বদলাইতেই হইবে। শ্রীনিত্যগোপালের ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়ে এই বেদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ লিখিলেন—ব্রহ্ম যেমন অনাদি ও অনন্ত, প্রকৃতিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। উভয়ের প্রাণ খোলা সব মর্য্যাদার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে ভারতীয় সভ্যতা।

অবতারবাদের গূঢ় রহস্যই হইতেছে ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয় তত্ত্ব বিশ্বে স্থাপনা করা। ইহাই ধারাবাহিকরূপে অবতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নরহরি, রাম, কৃষ্ণ, গৌর, শেষ শ্রীনিত্যগোপাল। নরহরির ভিতর প্রথমে যে পশুত্ব ও দেবত্বের মিলন ধারা ধরার বুকে অবতরণ করিয়াছিল তাহারই বিকাশ শ্রীরাম-জীবনে বিশ্ব দেখিল। সকল ছোটর দল, বনের বানর, গুহক শবরী যাহারা এত দিন হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছিল সেই সকল বহুকে বার বার বুকে রাখিয়াই রাম ব্রহ্ম-জীবনে তাহাদিগকে এক করিলেন। এক অব্যয় ব্রহ্ম বহুর ভিতর নিজকে বিলাইয়া দিয়াও তাহার অটুট ব্রহ্মত্ব বজায় রাখিয়া ভগবান বলিয়া বিশ্বের নিকট স্বীকৃত হইয়াছেন। সেই পুরুষ-প্রকৃতি ব্রহ্ম-মায়ার, জড়-অজড়ের মিলনধারাই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইল শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে, যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি বৃন্দাবন-লীলায়। পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির বুকে অবতরণ করিয়া প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রকে পরা প্রকৃতির স্তরে উত্তোলন করিয়া সম মর্য্যাদা দান করিলেন। জড় রাধে বলিয়া প্রকৃতির জয় গান করিয়া প্রকৃতির গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন। আবার এই ব্রহ্ম-মায়ার মিলন ধারা বিশ্ব-জীবনে প্রবাহিত করিবার জন্য বাংলায় শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইলেন, জীব ব্রহ্মের, ভক্ত-ভগবানের মিলন কৌশল-বীজ ছড়াইয়া গেলেন। যে তত্ত্বধারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিল, তাহারই আস্বাদন শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনে বিশ্ব পাইল। বর্ত্তমান যুগে শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে ও তাঁহার দেওয়া দর্শনে সেই ব্রহ্ম-মায়ার মিলনের তত্ত্বধারা পরিপূর্ণরূপে বিশ্ব আস্বাদন করিবে। এই নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক বলিয়াই তো নিত্যগোপালকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে তত্ত্বধারা নরহরি রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়া নিত্যগোপালে আসিয়া এক দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই স্থানে ভারতীয় সভ্যতা স্থিতি লাভ করিবে। শ্রীভগবানের তত্ত্ব, বিশ্ব প্রকৃতির তত্ত্ব, জীব ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধ তত্ত্ব এই সমস্ত না জানাইয়া শুধু সেবা কর, ভালবাস, আত্ম সমর্পণ কর ইত্যাদি প্রচলিত নীতি বাক্য বলিয়া ভারতের এই আত্মঘাতের পথ রোধ করা সম্ভব হইবে না, হইতেছে না, হু হু করিয়া জগৎ মরণের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। এই বিকৃত সভ্যতার সম্মুখে শ্রীনিত্যগোপালের এই মাঙ্গলিক বাণী শুনাইবার দায়িত্ব তাঁহার নিজ জনদের রহিয়াছে। তিনি বিশ্ব নাগরিক, এই পথে বিশ্বের সেবা করাই তাঁহার ইঙ্গিত। তত্ত্ব-মূর্ত্তরে, ভক্ত-ভগবতে, যুগলমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের চরণে প্রণাম জানাইয়া আমার আলোচনা শেষ করিলাম।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩৬)

জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ—শঙ্করাচার্য, জীব নিত্যকৃষ্ণ দাস—মহাপ্রভু, মমৈবাংশঃ—কৃষ্ণ। মানুষ যখন নিজের এই স্বরূপের খোঁজ পায়, তখন সে তা আস্বাদন করতেচায়।... ব্রহ্মের মত কৃষ্ণেরও কুল নাই, পাণ্ডিত্য নাই, ধন নাই (কুল পাণ্ডিত্য ধন—এসব উপাধি)—তাই তাঁকে পেতে কুলীন হবার দরকার নাই, ধনী হওয়ার দরকার নাই... স্বরূপানন্দ আস্বাদন করতে ওসব কিছুরই দরকার নেই, প্রচারের জন্য দরকার হতে পারে।...তাছাড়া বুদ্ধি আর বিদ্যা আলাদা—আপনি কিনা বাঘ: দুনিয়ার সকল লোককে যে আপন মনে করে, তার মত বিদ্বান আর নাই।·· প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষকে নিম্ন করে ভগবান পাঠান নাই—তোমার স্বধর্মকে চেন।···কোন্ জিনিষটা একেবারে খারাপ? প্রত্যেকের একভাবে না একভাবে সংসারে প্রয়োজন আছে।···এক ভাবে না এক ভাবে এই বিশ্বে সবলেই প্রথম—ছাই ছাই হয়েই ব্রহ্মবস্তু—প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে সার...।

২৩, ৮, ৫৬।...ভাগবত পুরুষোত্তমের একটি নাম দিয়াছেন স্বরাট্—জন্মাদ্যস্য যত...। স্বরাট-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আদি কবি ব্রহ্মার নিকটে বেদ বিস্তার করেছিলেন হৃদয়ের মধ্য দিয়া।···স্বরাজসুন্দর বিশেষণ শব্দটী জলপাইগুড়িতে একদিন কীর্তন করতে করতে আমি প্রয়োগ করে ফেলি।···নিজের ধাম বা জ্যোতিদ্বারা কুহক নিরস্ত করেছেন কৃষ্ণ—সেই নিরস্ত-কুহক পর সত্যের আমরা ধ্যান করি।···কি করে কুহক নিরস্ত করেছেন? ধাম=জ্যোতি, স্বান—নিজের জ্যোতি দিয়ে, নিজের স্থান দিয়ে। নিজের স্থানে যদি মানুষ স্থিত থাকতে পারে তাহলে সে অনেক কিছুই করল।···আমার মনের মধ্যে বসে তিনি···সারাটী ধরণী খুঁজিয়া মরিনু কে জানিত এত কাছে?···আমাকে—কোন মানুষকে—এত হীন করিয়া তিনি সৃষ্টি করেন নাই···জুতো জামা কিনিতে বাজারে যেতে হয়—কিন্তু আলো বাতাস ঘরে বসিয়াই পাই—যিনি যত বড়, তিনি তত কাছে। তাঁকে নিজের মধ্যে খুঁজতে হবে···মানুষ নিজের জন চিনে না···নিত্যগোপাল নিজের জ্যোতির কথাই বলে গেছেন—নিজের ভিতর থেকে বেড়ে উঠতে হবে...নরনারায়ণ আশ্রম নিজের ভেতর থেকে বাড়তে চাইছে—চতুর্দিকের আবেষ্টন অনুকূল নয়, তবু এ কুহক, এ মায়া নিরস্ত করা যাবে যদি সকলে মিলে আমরা প্রাণে প্রাণে মিলতে পারি···শিশু যেমন মাতৃগর্ভে বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে—বেরিয়ে পড়াটা মানুষের ধর্ম, আশ্রমের ধর্ম···যেমন তেমন করে কি টাকা নেওয়া যায়?··স্বরাট হলাম কি? আমাদের আজকের সৌন্দর্য কি তেমন হয়েছে যেখানে গান্ধীর মত বলতে পারি আমার জীবনই আমার বাণী? ব্রহ্মসূত্রে লিখেছি আমার জীবনের ভাষায়···তোমরা আমার সেবা করছ, আমি যদি লোভী হতাম, স্বার্থপর হতাম তোমরা কি হতে আমার দেখবার দরকার ছিল না—আমি তা নই বলেই তোমরা মানুষ না হলে আমার ঋণশোধ হয়না—তাই তোমাদের বকাবকি করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিশু রামচন্দ্রকে (নিত্যগোপালের মাসতুতো ভাই) নিত্যগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তোর ঘরে কি আছে তার খোঁজ রাখলি না···। ব্রহ্মসূত্র দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবি আক্ষরিক ভাষ্য লিখতে হলে আমি কি শংকরাচার্যের পায়ের কাছে বসবার যোগ্য? কিন্তু আমি তো হৃদয় দিয়ে লিখেছি—প্রতিমাতাকে শংকর মাতা

বলেন, আমি মূর্খ, আমি না বলি।···ভাবগ্রাহী জনার্দনের কাছে বিদ্বান ও বিদ্বেষে সমান ফল প্রদান করে।···এক মূর্খ গীতা পড়ে আর কাঁদে—পণ্ডিত বলে, তুমি যে কাঁদ, তুমি তো বোঝই না—মূর্খ বলে যখন গীতা পড়ি তখন দেখি অর্জুনের রথে কৃষ্ণ গীতা বলছেন।···যীশু ও juggler-এর গল্প—juggler দরজা বন্ধ করে শিশু যীশুকে তার ভোজবাজী খেলা দেখাত—শিশু যীশু সে খেলা দেখে ভারী খুশী—juggler দেখল তার তো কোন যোগ্যতা নেই এই ভোজবাজী দেখানো ছাড়া—এই দিয়েই সে যীশুকে খুশী করে, যীশুর পূজা করে··। প্রত্যেকের অন্তরের নিজের জ্যোতির খবর রাখ—যাদের জীবনে জ্যোতির প্রকাশ হয়েছে, তাদের সাথে যুক্ত থাকতে হয়—নিত্যগোপালের সঙ্গে যুক্ত থাক।···আমার এখানে খুব বই নেই—যখন যে এই পড়বে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো—বিরুদ্ধ বইও আছে, সেগুলি পড়লে ক্ষতি হবে—সকল বই সকল অবস্থায় পড়া উচিত নয়।··শ্রীনিত্যগোপাল অনেককে দীক্ষার সময় রাসলীলা পড়তে নিষেধ করে দিয়েছিলেন—প্রেম সম্বন্ধীয় লেখাই শুধু পড়ো—বিদ্রূপাত্মক লেখা এখন পড়ো না। নিত্যগোপালের লেখাও এখন বুঝবে না—আমার ও আমাদের লেখা বুঝতে হবে আগে ···নিত্যগোপালকে আমার কাছ থেকে বুঝতে হবে··· খরাট হও। তোমাদের দেখে অপরে শিখবে—এটাই আমি চাই।·· আমাকে সেবা করা সার্থক হোক—তোমরা নিত্যগোপালের ঘরে মানুষ হও।···আমার কোন সংস্কার নেই···এই স্থান তোমাদের স্বস্থান হউক—সেদিকে দৃষ্টি আমার পুরোমাত্রায়। আমি শোষণ করি না, তোমরাও আমাকে করতে পারবে না।···এই স্থানই তোমাদের স্বধাম, বিশ্রাম ধাম—এ যদি তোমরা নিজেরা না বোঝ আমি আর কত বলব ?···

২৪, ৮, ৫৬।···ভগবান অর্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করেছিলেন—অর্জুন, তোমার ঐ চোখ দুটোতে তুমি ষোল আনা দেখতে পাচ্ছ না—আসক্তিবশতঃ তুমি ভীষ্মদ্রোণকে বধ করতে পারছ না—অথচ তুমি দ্রৌপদীর দুঃখ অপমান দেখতে পাও না। এটা জীবের দেখা। শিব ত্রিলোচন—সামগ্রিকতা বিধান করে যে তৃতীয় চক্ষু তা চক্ষুর চক্ষু—চক্ষুদঃ চক্ষুঃ। সামগ্রিক দৃষ্টি না থাকলে এদিক দেখে তো ওদিক দেখে না—কর্মীরা এক-চক্ষু হয়—জ্ঞানীর লক্ষণ সবগুলোকে এক সময়ে দেখা।···দেখতে অনেকদূর পাওয়া যায়—কিন্তু হাতে করতে বা পায়ে যেতে পারা যায় না—করার সঙ্গে দেখার তফাৎ। নিত্যগোপাল যা দেখে ছিলেন, সেই সময় অনুযায়ী তা করে গেছেন, সেই দেখা পুরো কাজে পরিণত হতে কত কাল লাগে! কল্পনা করা যায় এক সেকেণ্ডে, করতে লাগে অনেক বেশী···। অর্জুনকে তাই বলছেন আমার চক্ষু নাও, নইলে ভীষ্মদ্রোণকে বধ করতে কেন বলছি তা বুঝবে না। তোমার দৃষ্টি জীবের, আমার দৃষ্টি শিবের।··· বিদ্যুতের আলো আগে দেখা যায়, তারপর বজ্রের শব্দ শোনা যায়। আলোর—দেখার—গতি অনেক বেশী—শব্দ (কর্ম) অপেক্ষা।...কর্ম কালাধীন। সামঞ্জস্য রক্ষা করা তৃতীয় চক্ষুর কাজ। তৃতীয় চক্ষু সবখানি দেখে আর তা করে।·· কর্মীকে জ্ঞানী করতে হবে···। আশ্রম বলতে সব বুঝায়—রবিবারের পাঠ, কৃষি, খাওয়া, অপরের সুখদুঃখের হিসাব নেওয়া...। কালাতীতের স্বার্থকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে কালাধীন মানুষের দরকার, সঙ্ঘের দরকার। সর্বকর্ম সমন্বয়ের নাম জ্ঞান···। এসেছ এখানে, কল্যাণ যাতে হয় তাই কর—ত্রিলোচন হতে হবে, দিব্য চক্ষু লাভ করতে হবে। সম দর্শনম্—সব কাজগুলো সমান···সামগ্রিক দৃষ্টি লাভ কর·· অন্তের একজনকে মানবার দায়িত্ব তার—মানিয়ে নাও··। আমি কোনদিন ইস্কুল আর বাসা ছাড়া করি নাই—নিত্যগোপালস্পর্শে আমার দৃষ্টি খুলে গেছে।···তোমাদের কাছে মিনতি—নিজের দেখার উপর অত জোর দিও না—অল্পদর্শী হলে বড় বিপদ হয় যদি সে কর্তৃত্ব করতে চায়।···নেত্র যার খোলে, আপন পর ভেদবুদ্ধি তার লোপ পায়, নেতৃত্ব করা তারই সাজে।..

২৫, ৮, ৫৬।···। আমরা বর্তমানে যে সাধনার ভিতরে লালিত পালিত হয়েছি, সে সাধনার কথা ছিল পাই নাই, পাইব; পাওয়ার আমি যোগ্য নই—যোগ্য হয়ে

পেতে হবে—বর্ণাশ্রম সাধনা এইটেই। ইংরেজও এই কথা শোনাত। এর ভেতরে ফাঁকি থাকে। যোগ্যতার বিচার করবে কে? না দেওয়াই যার ইচ্ছে সে? যাকে পাব আর যে পাবে—এরা কি দাতা গ্রহীতার মতন? আমার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কি যোগ্য অযোগ্যের সম্পর্ক? দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক?..ভাগবত ধর্মে—অবতারবাদে—আগে পাওয়া পরে সাধনা।...বর্ণাশ্রমের পাশ দিয়ে এটা চলেছে—কলিযুগে এক পোয়া বর্ণাশ্রম, তিন পোয়া ভাগবত ধর্ম।...রজনী সেন গাইলেন, অধম অকৃতি বলে মোরে কম করে কিছু দাওনি। যা দিয়েছ তার অযোগ্য বলিয়া কেড়েও তো কিছু নেওনি। বুদ্ধিমানের বিপদ হয়—অযোগ্য বলে তো নিজেকে তারা বুঝতে পারে না··অযোগ্য যদি নিজেকে অযোগ্য বলে সত্যি বুঝত তবে দীনতা আসত, দীনতা আসলে সত্য তার মধ্যে প্রবেশ-পথ পেতো··কিন্তু তারা 'নাই' পেয়ে মাথায় ওঠে...। ঠাকুর বললেন ছুঁচি কুঁচি তোর ঘরে হবে না—তুই আয়; আমরা ঘরে ঢুকতে পেয়ে মাথায় উঠেছি। তিনি কোলে টানবেন সে তাঁর ধর্ম, কিন্তু আমরা কি কোলে উঠবার যোগ্য হয়েছি? আমরা বলব, প্রভু, আমি যোগ্য নই··কিন্তু নেমকহারাম আমরা, তা তো বলতে পারি না—বরং মনে করি তিনি আমার জন্য দায়বদ্ধ···। সুদামাকে কৃষ্ণ একাসনে বসাতে চাইছেন—সুদামার কত কুণ্ঠা।···তোমার আদর পাবার অধিকার কি আমার হয়েছে?···তোমার সেবা করে করে আমি যোগ্য হব।...(রজনী সেনের লাইন দুটো গান করলেন..) ঠাকুর, তুমি বার বার বলেছ পাব আর না পার সব ভার আমার উপর। তুমি এ কথা বলতে পার, কিন্তু আমার কি উচিত তোমার উপর ভার দেওয়া?··· যেহেতু তুমি কিছু বল না, কোলে নিয়েছ, আমি কি আমার পূর্ণ অভ্যাস বজায় রাখব? আমি কি আমার প্রকৃতি বদল করব না?···অধিকারের অপব্যবহার করলে অধিকার হতে চ্যুত হতে হয়···। তাঁর প্রকাশকে তিনি সরিয়ে নেন না—God is love—তিনি প্রেমস্বরূপ···তিনি ভালবাসা দিয়েছেন—আমি কি ভালবাসতে পেরেছি?··· তুমি আদর করেছ, আমি অপমান করেছি।···তুমি কারোকে সাধন করার কথা কও নি—কিন্তু তাই বলে কি আমরা সাধন করব না? লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোব? তুমি ভার চেয়েছ বলে কোনো প্রেম কি বলে সে ভার আমি তোমার ঘাড়ে চাপাতে পারি?···নিজের কথা বলি—প্রত্যেককে কোলে টেনে নেই··গুরুভাইরা বলেছেন দুঃখ পাবে—তিনি যখন এসেছেন যোগ্য অযোগ্য বিচার করি নি, গোত্র জিজ্ঞাসা করি নি। বুকে তুলে নিয়েছি··বিচার করে ভালবাসা কেউ বুঝেছে? এই বিচার করে বলে যুগে যুগে প্রাণের উপর অত্যাচার হয়েছে আমার প্রাণ নিয়ে আমি বিপন্ন।···পাওয়ার পরেও সাধন করো—পেলেই পাওয়া হয় না···। আশীর্বাদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হয়···। নিতাগোপাল, তোমার স্নেহকে আমরা দলিত করেছি, তোমার ভালবাসার মর্ম আমরা বুঝি নি।...অহংকার-উন্নত শিরে জল বেয়ে পথ যায়—ধারণ করতে পারে না। নমস্কার অর্থ দেহমনপ্রাণকে নুইয়ে দেওয়া···। নিতাগোপাল আমার কুলের দেবতা··তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হও। তিনি এই ধারা প্রবর্তন করতে এসেছেন—তোমরা সেই ধারাকে ধারণ কর—ধারণ করে বিশ্বে ছড়িয়ে দাও—স্নেহ পেলে, মানুষ হও···আমার বুকে এসেও যদি চলে যাও, তবে কী বলব? আমার যে জগতের জন্য রইল···পেয়েছ তাঁর কৃপায়, এখন সাধন কর।···

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৮)

উষাঙ্গিনী থাকিবে। যিনি সকল অন্ধকারের মাঝে আবরিয়া রাখিয়াছেন, এবারেও তিনি রাখিবেন। ভয় কি? তিনি তো টানিয়া তুলিবেনই। ১১টায় ফিরি। রেণু ১টার পর হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে কুমারেশ, ইণ্ডিয়া ল্যাম্প, বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ যায়। আমি ও প্রতিভা ৩-১০-এ বাহির হই। পথে রেণুর মুচির কাছ হইতে সকালে দেওয়া জুতা প্রতিভা নেয়। মুচি ৵০ আনা পয়সা (যাহা সকালে চাহিয়াছিল) নিল না। বলিল দিদিমণির জুতা, সেদিন দিদিমণি ৵০ আনা আমাকে ঔষুধ কিনিবার জন্য দিয়াছিলেন, আমি পয়সা নিব না। আমি বলিলাম, দিদিমণি তোমাকে ছোট ভাই মনে করিয়া সেই পয়সা দিয়াছে, ইহা তোমার খাটুনীর পয়সা, তুমি নেও। সে নিল না—কত কৃতজ্ঞ! বুদ্ধিমানদের মধ্যে কয়জন এইরূপ মুচি আছে? যে ভদ্রলোক সেদিন রাস্তা হইতে রেণুর কাছে চাহিয়া ২৲ টাকা ফেরত দিবে বলিয়া নিল, সে তো দিল না। আজও তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, দিবার নামটিও করে নাই।···কুসুমের সঙ্গে বর্তমান যুগ-সমস্যায় তাহাদের জীবনে কি পথ নিলে সার্থকতা মিলে তাহার আলোচনা হয়। বীরেন ১টায় আসিয়া অষ্টম ইনজেকসান দেয়।···

২রা সেপ্টেম্বর

পথের ঠাকুর, পথেই রাখিলে, কোথাও স্থির হইতে দিলে না। তুমি-আমি দুই পথিক অনন্ত পথ বহিয়া চলিয়াছি, ঘর করিতে দিলে না। কত যুগ ইহাদের সঙ্গে ছিলাম, আজ তাহাও ভাঙিয়া দিলে। তোমারে চরণ চাহিয়া চলিব তোমায় বুকে লইয়া। যেখানে যাইব, সেই তো তোমার ঘর। তোমার চরণতলে পড়িয়া উঠিবে আমার ঘর। আমি নিতাগোপালের ঘর করিব—সেই সাধ তুমি পূর্ণ করিও। এই বিশ্ব তোমার ঘর, আমি সেই ঘরের ঘরণী হইব। সকালে রেণু আসে, প্রণাম করিয়া প্রতিভাসহ টালিগঞ্জে ঘর ঠিক করিবার জন্য যায়। ঘর ঠিক হয়। ২ মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর যাইবার কথা হইয়াছে। কিন্তু পত্রিকার জন্য কি তাহা সম্ভব হইবে? বিজ্ঞাপনের জন্য রেণু সুরেন বিশ্বাসের বাসায় যায়। আমরা ১১টার পর চলিয়া আসি। রেণু ১টার পর কলিকাতা যায় —ফেরে ৪টার পর।···যাহাদের নিয়া একদিন পথে বাহির হইয়াছিলাম বিশ্বের সেবা করিবার জন্য, তাহারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি তো তাহাদের আজিও বুকে করিয়া রাখিয়াছি। কল্যাণ হউক। আমার যেটুকু আয়ু ও শক্তি আছে, সেটুকুকে সার্থক করিতে হইলে বাহির হইতেই হয়। ইহাদের জন্য দুঃখ রহিল। ইহাদের কাছও ছাড়িতে হইল। কণ্ব শকুন্তলার স্বামিগৃহে যাওয়ার সময় যাহা বলিয়াছেন, আমারও তাহা মনে হয়। কিন্তু ঠাকুর যে আমার সবলের চেয়ে প্রিয়তম। তাঁহার কাজের জন্যই বাঁচিয়া থাকিব। ১টার পর আশ্রমে ফিরি।···

৩রা সেপ্টেম্বর

ওগো পথিক, ওগো পথ, তোমাকে সকল জীবন দিয়া বরণ করিতেছি। পথই সকল ঘরের যোগসূত্র, বন্ধনরজ্জু। পথই সকল ঘরের সমন্বয় বিধাতা। তুমি পথে দাঁড়াইয়া, মানুষও পথে দাঁড়াইয়া। ব্রজের পথে ঘাটে, নদী প্রান্তরে গিরি গুহায় তোমার লীলা জমিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে ঘরের ক্ষুদ্রতা, ঘরের নোংরামি বিলুপ্ত, সকল সঙ্কীর্ণতা

নিশ্চিহ্ন। উন্মুক্ত আকাশতলে বিশাল ধরণীর বুকে তোমার আমার জীবনলীলা জমিয়া উঠিবে। পথ; তোমায় নমস্কার; পথিক, তোমায় নমস্কার।···রেণু সকালে একবার বাহির হয়, আবার ১১টার পর। ফেরে ৫টায়।···কুসুমের আর পাবনা যাওয়া হইবে বলিয়া মনে হয় না। জিমিষ-পত্র যদি ধীরে ধীরে আনা যায় ভাল, নচেৎ সব 'গোবিন্দায়-স্বাহা' বেশ প্রফুল্ল মনে। লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ টাকা গিয়াছে, যাইবে। সে জন্য আর দুঃখ কি? জীবন অফুরান, আবার সৃষ্টি করিবে—'দিয়া বিয়া কর্মভিঃ'। মানুষ অক্ষয় সৃষ্টির অধিকারী। যাহা গেল, সে জন্য অনুশোচনা করিয়া ফল কি? ঠাকুরের জীবনী (অমৃত লীলা) পাঠ হয়।···

৪ঠা সেপ্টেম্বর

বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে তুমি মিশিয়া আছ, যেমন মিশিয়া আছে নবনীত দুগ্ধের মাঝে, যেমন মিশিয়া আছে তৈল তিলের মাঝে। আমি তোমাকে আমার জীবনধারা মন্থন করিয়া ঘন করিয়া তুলিব, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দান করিব...। তোমাকেই যে অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বময় পাতি পাতি খুঁজিয়াছি—স্বর্গে নরকে, পশু পক্ষী জলমে, দেব-মানব জলমে, জড় অজড় দেহে।···রেণু প্রতিভা প্রণাম করিয়া যায় বাড়ী চূড়ান্ত ভাবে ঠিক করিতে। ২৪০৲ টাকা আগাম দিয়া আমার নামে বাড়ী ঠিক করিয়া আসে। ঠিকানা ৮৯ রসা রোড সাউথ, এক তলা, কলিকাতা ৩৩। ···ধীরেন নবম ইনজেকসান দেয়। আরও ৩টা দিবে। রেণু ১২টার পর প্রেসে প্রুফ দিয়া বহু জায়গায় যায়। ফেরে ৪।৷ টায় পর। খাওয়ার পর প্রিমিয়ার ও কমলালয়ে ঘুরে··· ইহার পর রেণু আসে।···মন কুসুমের বিরহ তাহার নিজের গড়া ভুলের পরিণাম মনে করিয়া। কিন্তু যে জন পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহার পক্ষে সকল জানিই তো ভগবানের দান বলিয়া আদরে নিতে হইবে। জীবনে কতবার ভাঙিয়াছি, কতবার গড়িয়াছি। আজ আবার ভাঙিবার ভিতর পড়িলাম। পুত্রবধূ লইয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলাম। ইহারা পথে থাকিতে পারিল না! আমি আবার পথে বাহির হইলাম। পথের ঠাকুর চিরদিন পথ আগলাইয়া রাখিয়াছেন, এবারও রাখিবেন। মাসিক ৬০০৲ টাকার বেশীর দায়িত্ব মাথায় আসিল।···

৫ই সেপ্টেম্বর

নিগৃহীতা, অবহেলিতা সকল অঙ্গের ঘনীভূত কান্নার দিয়া রূপখানি গড়া শ্রীরাধা, তোমার জীবনই আমার জীবন, তুমিই নৈর্ঋতী, নৈর্ঋতী। আমার মন তোমার মনে গড়িয়া উঠুক। মন অর্পণ করিতে হইলে দ্বিমুখী সাধনার প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ তাঁহার নামরূপ-লীলা স্মরণ মনন এবং দ্বিতীয়তঃ মনের যে পরস্পর বিপরীত দুই দিক আছে—dialectic আছে, তাহাদের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা পুরুষোত্তম-জীবন ও আদর্শের ছাঁচে। প্রথমটী অন্তর্মুখী, দ্বিতীয়টী বহির্মুখী সাধনা। এই দুই দিক হইতে সাধনা বরণ না করিলে একান্ত কোনও একটী দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না। কেন্দ্রের সাধ্য নাই পরিধির সব কিছুকে স্পর্শ করে, পরিধিরও সাধ্য নাই যে সে সব-কিছু লইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়। দুই যখন দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই দুই হয় সাধনা। একান্ত কেন্দ্রের বাহিরে পরিধির অনেক কিছু থাকিয়া যায়, একান্ত পরিধি কিছুতেই কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারে না বা স্পর্শ করিতে পারে না।··· ৬/০ আনা দরে ৴৮ সের চাউল ইকনমিক সপ হইতে ১৩-ই-র জন্য কেনা হয়।···

৬ই সেপ্টেম্ব

যাহারা একদিন নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার দি যুক্ত ছিলেন, নরনারায়ণ আশ্রমের অগ্রগতির পথে সহায়ত করিয়াছেন, আজ তাহাদের সেই সহায়তা বুকে লইয় তাহাদের সঙ্গে একান্ত হইয়া আবার নূতন পথে চলিতে যাইতেছি। ঠাকুর, তুমি আমার কূলের দেবতা, আমা নরনারায়ণ আশ্রমের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তোমার চর চাহিয়া চলিব তোমারই পথে তোমারই বিশ্বকে তোমা জীবন ও দর্শনের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য। আমাদে এই যাত্রা সফল হউক।···বাধধান বাড়াই নাই, জানিতা মানুষকে পাওয়াই তো চরম পাওয়া। দ্বন্দ্বাতীত না হইলে দ্বন্দ্ব সমন্বয় হয় না। আমি আজ সকল দ্বন্দ্বে সমন্বয় করিবার জন্য দ্বন্দ্বের ওপারে চলিয়া যাইব। কাম

অকায়ের বন্ধ দ্বার খুলিয়া সমর্পিত হয় পুরুষোত্তম-তত্ত্বে। তাহাই আমার জীবনে লোকের সামগ্রী। আজ পুর কন্যার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি, আরার ব্যাপকের ক্ষেত্রে পাইবার জন্য। সেখানে সকলের দ্বার অবারিত :...

৭ই সেপ্টেম্বর

স্বামী আমার, মালিক আমার, রাজা আমার, তোমার চরণ অনুসরণ করিয়াই আমি চলিব। আমি পথ চিনি না, তুমিই আমার মহাজন।...তোমার পথই আমার পথ। সারা দুনিয়ার বিনিময়েও আমি তোমাকে চাই। কত জনম জীবনে আসিয়াছে। তোমাকে বুকে লইয়া উৎরাইয়াছি। আমি আগাইব তোমার অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া। তোমার ডাক আমি শুনিয়াছি। যাই প্রভু যাই। পার যদি আমার সঙ্গে চল যাহারা আমার আপন জন, আমাকে ভালবাস। আমাকে যাইতেই হইবে : আমার যে উপায় নাই। অহঙ্কার ছাড়, মান অভিমান ছাড়, আমার সঙ্গে চল। নির্বিচারে, নিশ্চিন্ততার মধ্যে, নিঃশেষ হৃদয়ে আমাকে ধরিয়া চল। আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিও না। আমি ক্ষত বিক্ষত। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমাকে মুক্ত হইয়া পথ চলিতে দেও। সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। একটা cowlac দুধ কেনে। কুসুমকে বলি—আমাকে চিন্তার অংশীদার কর, নিজে নিজে চিন্তা করিও না, সিদ্ধান্ত করিও না। আমি তোমাদের বুকে নিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে তোমাদের বুকে নেও নাই। 'মন্নি তে তেষু নো ত্বয়ি'। আমি তো এতটুকুও তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া করি না।...ব্রজাদের বাসায় যাই।...ব্রজগোপীদের প্রাণে প্রাণে ডাকিয়া দেখে কি না বলেন, 'ঘরে ফিরিয়া যাও'। মানুষ বুঝিয়া আসিবে এই তিনি চান। তাই তাঁহার ডাক সত্তার এক অর্দ্ধ, মানুষের বুঝিয়া আসা হইতেছে অপর অর্দ্ধ। ১টার পর আসি।...

৮ই সেপ্টেম্বর

প্রতি যুগের তুমিই পুরুষ, অগ্রগামী। যিনি অগ্রগামী, তিনিই পুরুষ। 'পূর্ব্ব অগ্রগমনে'। তোমার পথই সেই যুগের সকল মানবের পথ। সর্ব পথ-সমন্বয়ে এই পথ গড়া ; ইহাই প্রাণের পথ,...। প্রাণই জ্যেষ্ঠ, প্রাণই শ্রেষ্ঠ। প্রাণসাধনার খবরই শ্রুতিতে আছে। প্রাণ-সাধনাই সহজ সাধনা। মানুষ অহঙ্কার হইতে মুক্ত করিয়া সব কিছু দিয়া প্রাণকেই শুধু বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছে। প্রাণ অসহায় হইয়া শুধু কাঁদে, শুধুই কাঁদে। এই কান্নাই যন হইয়া শ্রীরাধা। ব্রজলীলায় ব্রজা তাই প্রাণের শ্রীচরণ-তলে। Instinct rules, not intellect. সেদিন রাধাকৃষ্ণন্ মেয়েদের সম্বন্ধে অতি সুন্দর কথা বলেন। পুরুষ অর্দ্ধ অসভ্য, পুরুষ শিশু, তাহাদের মানুষ করিবার ভার মেয়েদের উপর। আমি তো সারাজীবন ধরিয়া মেয়েদের ঠেলিয়া আগাইয়া দিবার জন্য প্রাণপাত করিলাম। মেয়েরা আসিল কয় জন? সকালে আফিসে যাই। প্রতিভা গোপা-কুসুম সহ মঠে ঠাকুরকে প্রণাম করতে যায়...বেণু বাহির হইয়া গিয়াছিল প্রেসে, এস সরকার, এম বি সরকার ইত্যাদির কাছে। আসিয়া পুলিন প্রতিভাসহ বাজার করিতে যায়।.. তিনিয়া আনে। পুলিন সব দিকে সাহায্য করিবে। শনিবার রাত্রিতে প্রতিভার সঙ্গে থাকিবে। রবিবার জলতোলা প্রভৃতি সব-কিছু করিবে। খুকুবাবু আসে। তাহাকে রবিবার যাইতে বলি। রাধাচরণ দাস আসেন। ধীরেন্দ্র আসে। তাহাকে রবিবার যাইতে বলা হয়। সে যাইবে বলিল :...

৯ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনে 'বেশ আছি' বলিয়া তো আরামে থাকিতে দেও নাই। অনন্ত আগাইবার অনন্ত লালসা বুকে লইয়া অনন্ত ছুটিয়াছি। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—ইহাই তো আমার জীবনের মন্ত্র। মনে পড়ে সেই দিনের কথা যেদিন এখান হইতে বেদনা লইয়া শিশিরের সঙ্গে কুসুমের ওখানে জুড়াইবার জন্য গিয়াছিলাম। কেহ আমাকে সেদিন ফিরায় নাই। 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্বস্মাৎ অন্তরাৎ'—জীবনের বিপ্লব সব কিছু হইতে প্রিয়। তাহাই আমাকে

পাইয়া বলিয়াছে। আত্মার আহ্বান, পুরুষোত্তমের আহ্বান শুনিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি। যাই প্রভু যাই, আমি তোমার শ্রীচরণতলে মিলিব। আমি আফিসে যাই। ইহার পূর্বে 'খণ্ডিত ভারত ও ডঃ তারকনাথ দাস' কিছুটা লিখি। প্রতিভা আফিসে যায় না। ফিরি ১১টার পর। আমি ও প্রতিভা ৩টায় আফিসে পৌঁছি। রেণু তাহার পর কলিকাতা হইতে ফেরে। ৩টার পর কুসুম ও প্রতিভা উড়ন তৈয়ার করিবার জন্য টালিগঞ্জ যায়। দুর্যোগের যাহারা যাত্রী, তাহাদের আবার ভাত্র মাস কি? দুর্যোগের ঠাকুর আমার সহায়, ডুবিয়া তো যাই নাই, কোলে করিয়া তো রাখিয়াছেন। সকল দুর্যোগই তো আমার জীবনে সুযোগে গড়িয়া উঠিয়াছে শ্রীনিতাগোপালের আশীর্বাদে। ভয় আমার নাই। 'ভয় কি? টেনে তুলব'—ইহাই আমার জপের মন্ত্র। বৃষ্টি হয়।... পুলিন সহ রেণু...কিনিতে যায়। টালিগঞ্জের বাসার ইলেকট্রিক লাইন কাটিয়া দিয়াছে। ১৫৲ টাকা জমা দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। কুসুমের সঙ্গে তাহার জীবনে 'বেশ আছি' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। যে বেদনা আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই অংশীদার হইবার জন্য আমি সকলকে ডাকি। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—অল্প নিয়া থাকিও না। ২০টি মেয়ের স্থানে ২০ লক্ষ মেয়ের জন্য পাগল হইতে হইবে। তবে মিলিবে সার্থকতা। ৮॥টার পর ফিরি।...

১০ই সেপ্টেম্বর

প্রিয়তম, তোমার আহ্বান আসিয়াছে, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—আমি সে আহ্বান শুনিয়াছি। আমি সকল ধর্ম সকল অধর্ম ছাড়িয়া তোমার মাঝে ডুবিয়া যাইব। সারা জীবন তো এই আহ্বানকেই জীবনে মূর্ত করিতে চাহিয়াছি। সব ধর্ম, সব অধর্ম, সব ভাল, সব মন্দ আমাকে ছাড়িতে চাহিতেছি। আমি কেবল হইয়া কেবল তোমাকে পাইতেছি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাই না এই দুর্যোগের পথে আমিও তোমার আহ্বানের পিছু পিছু ছুটিতে পারিতেছি। তুমি আমাকে সঙ্গে রাখিও, ওগো মুক্তির দেবতা। সকালে বেশ বৃষ্টি হয়। তাহারই মধ্যে আফিসে যাই। বীরেন প্রায় ১১টায় আসে বৃষ্টির ভিতর। একাদশ ইনক্রিমেন্ট দেয়। রবিবার টালিগঞ্জে যাইবার কথা বিশেষ ভাবে সন্তোষ ও বড় বৌকে চিঠিদ্বারা জানাই। রেণু প্রথমে ব্যাঙ্ক হইয়া পরে ইলেকট্রিক আফিস প্রিন্সিপার প্লেসে যায়। ইলেকট্রিক বাবদ ৮৮৲ টাকা জমা দিতে হইবে। পূর্ববর্তীদের খরচের হিসাবে জমা দিতে হয়।...মানুষ নিজের জন্য নিজে সৃষ্টি করে। ভগবানের দেওয়া সুযোগকে মানুষ সুযোগরূপেও আস্বাদন করিতে পারে, দুর্যোগরূপেও সৃষ্টি করিতে পারে। —র জন্য ঠাকুর স্বর্গের পথ খুলিয়া দিতে চাহিতেছেন, সে তাহা নিতে পারিল না। আমার কি যে দুঃখ তাহা আর কি বলিব? তাঁহার পথে তাঁহার বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া চলিলেই মঙ্গল। 'নান্যঃ পন্থা'। তাঁহার শ্রীচরণ চাহিয়া চলা ছাড়া আমার আর কি সম্বল আছে? আমি তো আশ্রম নিয়াও সংসারী হইতে পারিব না। আমি বিশ্বনাগরিক হইব—ইহাই আমার সত্য সঙ্কল্প।...

১১ই সেপ্টেম্বর

নিতাগোপাল, তোমার আমার দিব্য মৈথুনের ভিতর দিয়া আমি গড়িয়া উঠিয়াছি, আবার তুমিও গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে অন্যোন্য মৈথুনের ভিতর নিহিত তোমার আমার অনন্ত অগ্রগতি অনন্ত রসলীলা। একদিন ছোট সংসার ছাড়িয়া তোমারই আহ্বানে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সেদিন পুত্রকন্যাও ছিল সঙ্গে। কিন্তু তাহা যখন আবার ক্ষুদ্রই হইল, তখন তোমার ডাক আবার আসিল বাহির হইতে। আমি বাহির হইলাম। তুমি আমার আছ—ইহাই আমার জীবনের সম্বল। তোমাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি বলিয়াই আমি বাঁচিতে চাহিতেছি। আমার বাঁচিবার সাধ ও সফলতা তুমি।

সকালে 'খণ্ডিত ভারত ও ডঃ তারকনাথ দাস' সাময়িকী শেষ করি। রেণু ইলেকট্রিক সাপ্লাইর সঙ্গে agreementটা ৫/০ আনা জমা দিয়া আনিতে যায়। ১২টায় আসিয়া আমার দস্তখত নিয়া যায়। সাবিত্রী-প্রসন্নবাবু সাক্ষী হিসাবে দস্তখত দিয়াছেন। সেখান হইতে

রেণু গ্রামোফোন কোং-তে যায়। সেই গাড়ীটার সামনের চাকা খুলিয়া যাওয়ায় উল্টাইয়া যাইতেছিল। আরও ২ বার এইরূপ ঘটে। ঠাকুর, তুমি রক্ষা করিও। একমাত্র সে-ই তো পথে দৌড়াদৌড়ি করে তোমার সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য। আমি তো জড়, অকর্মণ্য। তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিও। ৪টার ফেরে। খাইয়া সে ও প্রতিভা টালিগঞ্জ বাসায় যায়। উষ্ণন ইত্যাদি দেখিয়া আসে। পরে আবার পুলিনের সঙ্গে বাল্‌ব ইত্যাদি কিনিতে যায়। ধীরেনবাবু আসেন। মহাভারতে হস্তিনাপুরে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতার কথা হয়। তাহাকে রবিবার ৪টায় মহাভারত পাঠ করিবার কথা বলা হয়। নীরোদকে রবিবার যাইতে বলি।.. ৪টার পর মহানির্বাণ মঠে যাই। ঠাকুরের দিব্য দেহ তো সেখানে আছে। একটি নমস্কার জানাইয়া আসি। বিশ্বদেহের তৃপ্তি হউক আমাদের এই নূতন অভিযানে।

১২ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আমার জীবন-দেবতা, আমার এই শেষ অভিযানে তুমি সঙ্গে থাকিও। চিরদিনই তুমি আছ। তোমার বলা আমার ধৃষ্টতা, আমায় মার্জনা কর। আমার সব কিছু তোমাকে কেন্দ্র করিয়াই চলিবে। বাবা নীলকণ্ঠ, মাতা মুক্তকেশী, আমায় আশীর্বাদ কর। পথা আমার শিব হউক। পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠান যেন গড়িয়া তুলিতে পারি। কুসুম ও প্রতিভা এখানের কি কাজের মা সহ টালিগঞ্জের বাসার ঘরগুলি ঠিক করিতে যায়। ফেরে ১০॥টার পর। রেণুদের পাশের বাড়ীর সুষমাকে উৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করি। মেয়েটি বেশ, কর্মী। সে তাহার লোক দিয়া একটী ঠেলাগাড়ী ভাড়িয়া আনে। রেণু পুলিন সহ বাজার করিয়া আনে ···।... প্রথম ঠেলা রওনা হয় প্রায় ১টায়। আমি ও প্রতিভা তখন রওয়ানা হইয়া আসি। রেণু ট্রামে যায়, পুলিন ঠেলার সঙ্গে যায়। দ্বিতীয় ঠেলা পৌঁছায় ৩॥০ টায়। এখান হইতে ২৪০টার পর প্রতিভা গেলে রেণু চলিয়া আসে। সে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর ওখানে যায়।···নিত্যব্রত প্রায় ৪টায় ঠেলা আনে, এখানের মালপত্র নিয়া সে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। আমি আফিসে যাই। রেণু জয়ার বাসায় যায়।·· মাখনবাবু আসেন। আমি আফিস ঘরের নীচে মাদুর বিছাইয়া শুই। রেণু মাখনবাবুকে লইয়া ৮৯ রসা রোড সাউথে যায়। ৮॥টায় আমার সঙ্গে বিহসায় রেণু আসে। মন্থর সঙ্গে কথা বলে। মন্থ ৫০ টাকা উৎসব বাবদ দেয়। সে উদ্বোধনের জন্য দিয়াছে ১৫০৲+৫০৲, পুরী যাইবার সময় দিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র ছাপাইতে দিয়াছে, এবারকার এই যাত্রাপথেও সে দিল। ঠাকুর, তুমি উহাকে রক্ষা করিও।...তাহাকে বুদ্ধি প্রদান কর।···কত ভাবনাই না ভাবিলাম। ঠাকুর, তোমাকে গড়িতে পারিলাম কৈ ?

১৩ই সেপ্টেম্বর

৮৯ রসারোড সাউথে প্রথম আসি। ঠাকুর, তুমি আসিয়াছিলে অযাচিতভাবে। তুমি চলিয়া গিয়াছ। কেহ তো তেমন করিয়া তোমাকে জীবনে ধরিয়া রাখিল না। পটে তুমি থাকিবে, হয়তো কাঠে বা প্রস্তরে। তোমার সর্বদময় মূর্তি জীবন লইয়া আর কে বিশ্বময় বিচরণ করিবে ? আমি চাহিয়াছিলাম তোমার জীবনে জীবন লাভ করিব। আমি নিভিয়া যাইব, তুমি জ্বলিয়া উঠিবে। আমাকে দেখিয়া মানুষ তোমাকে দেখিবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে। সে অধিকার কি আমাকে দেবে না ?···সকালে রেণু গোপা-কুসুম-খুকু সহ আশ্রমে যায়। ৬॥০টার পর শিশির ও কমলা আসে।...জয়ার জন্য অপেক্ষা করি। জয়া আটটার মধ্যে না আসায় আমি চলিয়া আসি। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্থকে জড়াইয়া ধরিয়া বলি, যখন ইচ্ছা হইবে, আমার ওখানে যাইও। বধূঠাকুরাণীকে প্রণাম করি। ভুকারাম ঘুমাইতেছিল। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিয়া আসি, খোঁজ নিও। নিত্যব্রত ট্রাম পর্যন্ত আসে। পথে চোখের জলে অনেক কথা বলি। নিতার স্নেহ দিয়া রক্ষা করিয়াছি, রক্ষা করিতে চাহিব। বড় বৌ ৬॥০টার মধ্যেই আসিয়াছে। কুমড়া, কলার পাতা, নারিকেল ও আনাজ আনিয়াছিল। সত্যব্রত দুলালী সহ ১১টার পূর্বে আসে। রবীন আসে ১০টার

পূর্বে। গান গায়। ১ টার মধ্যে রান্না হয়। উষাঙ্গিণীও পাশের ঘরে ছিল। বড় বৌ রান্না করিয়াছিল। নিতাপ্রভ দুই বৌ ও শিশুদের সহ ১১।০টার পর আসে। নীরোদ আসে। দেবুদের নিমন্ত্রণ করা হয়। বাড়ীওয়ালার ছেলেকে বলা হয়। আশার বাসায় বেণু যায়। অংশ ছিল না, বিনয় ১২টায় আসে। ঠাকুরের সামনে আসন বিছাইয়া আলোচনা হয়, রবীন গান গায়—'স্বরগ আসিছে ধরার আঙ্গিনায়'। দেবু আলোচনার সময় আমাকে হাওয়া করিতেছিল। তাহাদের বাড়ীর বৌ তরকারী কোটা প্রভৃতি অনেক কিছু করিয়াছে। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন ঠিক ৫টায়। মহাপর্ব হইতে দ্রৌপদীর দাহনের ইতিহাস পাঠ ও আলোচনা করেন। পায়েস ও হালুয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। বীরেনবাবু আসেন। তাহাকে সব প্রসাদই দেওয়া হয়। বিমল ও পবিত্র আসিয়াছিল। ভাল লাগিল।...

১৪ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া কত দেশে ঘুরিলাম, তোমার আসন রচনা করিতে পারিলাম না, তুমি ভ্রাতা, সর্বসংস্কারবর্জিত, কে তোমাকে নিয়া অশুচি হইবে, ভ্রান্ত হইবে, পতিত হইবে? তুমি বাহিরেই পড়িয়া রহিলে—নিজ জীবনের বাহিরে, পরিবারের বাহিরে, সমাজের বাহিরে, রাষ্ট্রের বাহিরে, বিশ্বের বাহিরে। অথচ এই সব স্থানে তোমাকে বসাইবার জন্য সারা জীবন ধরিয়া যাহা কিছু পারিয়াছি করিলাম। অন্য কোনও অভিসন্ধি তো ছিল না। আজও নাই। তোমাকেই চাহিয়াছি। বিশ্বের আবেষ্টন এমনই তোমার প্রতি বিমুখ যে সে কিছুতেই তোমাকে তাহার বুকে স্থান দিতে চায় না। আমি যে বড় বিপদে পড়িলাম। তুমি আসিয়াছ পরা অপরা প্রকৃতির সমন্বয় করিতে। তাহা কি আমার জীবনের মধ্য দিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিবে না। খুব ভোরে ৮৯ রসা রোড সাউথের ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদন জানাই। আমি ছিলাম ঠাকুর ঘরের মধ্যে আর কুসুম প্রতিভা রেণু যমুনা ও গোপা ছিল বাহিরে।... দেবু...আসে। পুলিন আসে।...রেণু ১২টার পর বাহির হয়, আসে রাত্রি ৮টায়। বেশ দুশ্চিন্তা হইতেছিল।... ৮এ রাসবিহারীতে আসি। এখানে খাই।

১৫ই সেপ্টেম্বর

৮৯ রসারোড সাউথ

৮এ রাসবিহারী এভিন্যুতে আশ্রমে প্রার্থনা করি। তুমি অযাচিত আসিয়াছিলে, অনাদরে চলিয়া গিয়াছ। তোমার ঐশ্বর্য দেখিয়া মানুষ সেদিন পাগল হইয়াছিল। কিন্তু জীবনের খোঁজ কেহ করিয়াছে কি? তুমি পটে থাকিতে, হৃদয়বৃত্তিকায় না থাকে নয় তো প্রস্তরে, কিন্তু জীবন দিয়া কে তোমাকে রাখিবে? চাহিয়াছিলাম তোমাকে জীবনে, সকল স্পন্দনে তোমাকে ধরিয়া রাখিব, ওগো বিশ্ব-কল্যাণ-মূর্তি। তুমি না হইলে বর্তমান সহস্রধা বিচ্ছিন্ন বিশ্ব কি করিয়া বাঁচিবে? তোমার যে বড় প্রয়োজন ছিল। আমি পারিলাম না তোমাকে ধরার ধূলিতে পড়িয়া তুলিতে। ৭টার পর ওখান হইতে আমার রেশন-এর চাউল লইয়া আসি।...দেবু আসে। তাহার সঙ্গে খোলা প্রাণে আবেগযুক্ত আলোচনা হয়। সকল শুনিয়া দেবু বলিল ইহা ভারতীয় বস্তুনিষ্ঠ। মানুষ যাহা সঙ্গত বলিয়া বুঝে, তাহা জীবনে আনিতে পারে না, সামাজিক ভাবে রূপদান করিতে পারে না। এই জন্য চাই সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াকার দর্শনকে বদলানো। দার্শনিক বিপ্লব সংগঠিত না হওয়ার ফলেই বুদ্ধ হইতে মহাত্মাজী পর্যন্ত কেহ সমাজদেহ হইতে অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সমাজদেহ হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছেন। সেই কাজ ঠাকুর করিয়া গেলেন আমার জীবনের মধ্য দিয়া। বীজপ্রদ পিতা তিনি। আমি শুধু তাহা ধারণ করিয়াছি মাত্র। বিপ্লব ছড়াইতে ছড়াইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলিলে সমাজ নিশ্চয়ই বদলাইবে। পুলিন আসে। ১২টার পূর্বে পাবনা হইতে লক্ষ্মীর ভাই...আসে।...

১৬ই সেপ্টেম্বর

৫টার পর প্রার্থনা হয় কুসুমের করতাল সহযোগে। জলযোগ করি চিঁড়া-নারিকেল-গুড়। রেণু ১০টার পর বাহির হইয়া ব্যাঙ্ক, প্রিমিয়ার প্রেস ইত্যাদি স্থানে যায়।

কালীঘাট হইতে বুহুমের রেশন আনিয়া আশ্রমে যায়। ফুলটুকে লইয়া রিক্সায় ফেরে এটায়।···আশা আসে।··· পুলিন বিরজাকে রাখিয়া যায়। এই আশ্রমের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ··কতখানি প্রাণ দিয়া আমি মানুষকে ভালবাসি, তাহাদের অপরাধ নিজেও উজ্জীবিত স্নেহে কেমন করিয়া তাহা ভাসিয়া যায়, তাহা এখানের ইহাদের কাছে ব্যক্ত করি। ঠাকুরকে শোকহরণবাবু (আমার এক গুরুভ্রাতা) নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া মঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঠাকুর, আমরা আপনার উপযুক্ত আদর করি না, অনাদরই করি। আপনি কি অপরাধ নেন'? ঠাকুর বলিলেন, 'ঠিক এই প্রশ্ন এক সময়ে পরমহংস মহাশয়ের কাছে করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন আমি অপরাধ নেই না বটে, কিন্তু কর্মফল আছে'। শোকহরণবাবু বলিলেন, আমি তাঁহার কথা শুনিতে চাই না। আপনি কি বলেন? ঠাকুর বলিলেন, 'আমি অপরাধ নেই বটে, তবে স্নেহ যখন উজ্জীবিত হইয়া উঠে তখন সব ভেসে যায়'। ঠাকুর ইহা বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন। আমার standpoint বুঝিয়াই তবে আমার কথার বিচার করিতে হইবে। নচেৎ অবিচার হইবে, ভুল করা হইবে। বুদ্ধদেব কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া, কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। বুঝিলে দেখা যাইবে বেদান্তের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ নাই। উহারা পরস্পর পরিপূরক। কিন্তু আমার মত করিয়া বুদ্ধকে বুঝিলে আমার ধারণার বেদান্ত যাহা তাহার সঙ্গে কিছুতেই সমন্বয় হইবে না। বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ অবগত হইলে দেখা যাইবে যে স্বরূপে স্বরূপে কোন ভেদ নাই। আমাকে বুঝিলে অনেক কিছু সমস্যার সমাধান হইত। ঘুরে যাইতে হইত না। আমি 'প্রাণ' লইয়া চলিয়াছি। বুদ্ধির পথে চলিলে সংসারের আঘাতে আঘাতে ভাসিয়া যাইতাম। সাটার পর প্রণাম পাই।···যে ভুল করে তাহার নিজেরই সে ভুলের কথা গুরুর কাছে প্রাণ খুলিয়া বাক্যদ্বারা বলা উচিত। অন্যে বলিলে মনে করা যাইতে পারে যে সে গুরুর কাছে লাগাইয়াছে। Confession of St. Augustine-এর কথা হয়। স্বীকার করিতে পারার সৎ সাহস চাই। ··

১৭ই সেপ্টেম্বর

অনন্ত অতীত আমার পিছনে, অনন্ত ভবিষ্যৎ আমার সামনে। আমি দাঁড়াইয়া আছি অনন্ত বর্তমানে। দেবী মহালয়া এই অনন্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিয়া চলিয়াছেন। অতীত মহালয়ার ভিতর দিয়া বর্তমান, বর্তমান মহালয়ার ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই ষোল আনা। ষোল আনা থেকে ষোল আনা গেলে ষোল আনাই বাকী থাকে। অনন্ত অতীতই পিতা, আজ তাহারই শ্রাদ্ধ দিন। অনন্ত অতীতের নিংড়ানো রস বর্তমান। মহালয়ার বুকেই কালের এই লীলা চলিতেছে। ··রেণু ১১টার পর শোভাবাজার পাহাড়পুরের ব্লক আনিতে যায়, পরে প্রেসে যায়। গতকাল নলিনী দত্তের মেয়ের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া নলিনীবাবু রেণুকে এক পত্র দেন। রেণু আজ তাহার বাসায় যায়।···সংসারে সকল বস্তুই ষোল আনা। কাড়াকাড়ির কোনও স্থান এখানে নাই। মানুষ এত বড় যে সে এক জনের থাকিয়াও বিশ্বের হইতে পারে। হইতেও হইবে তাই। এক জনের হইয়া থাকিলেই তো মানুষ ফুরাইয়া যাইত। অনন্ত হইলেই তো রক্ষা। কে আমাকে পাইয়া নিঃশেষ করিতে পারিবে? বিশ্বশুদ্ধ আমাকে চাইলেও আমি ফুরাইয়া যাইব না। কোটি কোটি মায়ের সন্তান হইলেও মায়ের পাওনা এতটুকুও কমিয়া যায় না। ইহাই তো সহজের দেশ। এখানে সকলে মিলিয়া মিশিয়া সকলকে, সকল বস্তুকে লইয়া লীলারস আস্বাদন করে। বীরেনবাবু ৯।০ টায় আসেন···

১৮ই সেপ্টেম্বর

মা, সারাজীবন ব্রজের পথ খুঁজিয়া বেড়াইলাম, পথে পথে কাঁদিলাম, কিন্তু আজও তো ব্রজ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলাম না ধরার বুকে সমাজের প্রতি স্পন্দনে। তুমি ব্রজ-প্রতিষ্ঠার গুরু। একদিন তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদেই ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। নিত্যগোপাল, তুমি গৌররূপে আসিয়া বাহিরের দেশে

ব্রহ্মধাম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, এইবার শ্রীনিতাগোপাল-রূপে বিশ্বমনের বুকে, সমাজের বুকে ব্রজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তুমিই আমাকে শ্রীদুর্গামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলে। শ্রীদুর্গা তো কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেন আমাকে ব্রহ্মধাম প্রতিষ্ঠার উপযোগী বল বুদ্ধি প্রদান করিবে না মা? আমি তোমার খেলার পুতুল। আমায় শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও। রেণু ১০টার পর বাহির হইয়া যায় ... সংসারে থাকিলে কত কর্ত্তব্য, কত দায়িত্ব পালন করিতে হয়, অথচ মায়া ত্যাগ করা তো চলিবে না। কাহার সঙ্গে কতটুকু মাত্রায় চলিলে সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তাহাই তো পুরুষোত্তম কৃষ্ণের অনুধাবন করিবার বিষয়। কুসুমের সঙ্গে ৩টার পর আলোচনা হয়। যাহাদের সঙ্গে এরূপ সারা জীবন বিশেষভাবে ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারীর পর হইতে ছিলাম, সে দিন গত ২৯শে ভাদ্র মৃতের মত বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম অথচ আমি জীবিত মানুষ! কি বেদনাভরা চিত্ত লইয়াই না আসিয়াছিলাম! নিত্যব্রত বোধহয় বেদনা বোধ করিয়াছিল। সে খড়ম পায়ে দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম লাইন পর্যন্ত আসিয়াছিল। কেহ তো রাখিবার জন্য তেমন কিছু করে নাই। সংসারেই তো থাকিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া তো থাকা চলে না। যে রকম সংসার করিলে সেখানে থাকিতে পারিতাম, তেমন করিয়া তো সংসার করিতে ইহারা পারিল না। আমি মায়ের আহ্বানে মুক্তির পথযাত্রী। ছাড়িয়া তাহারা দিতে পারিয়াছে। আমিও ছাড়িয়া আসিয়াছি। এখন এখানের ইহাদের মধ্যে আসিয়াছি। কত বড় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ইহাদের উপর বর্ত্তাইল, সে সম্বন্ধে ইহারা কি সম্পূর্ণ সচেতন? কুসুমদের আসাই বাহির হইবার অব্যবহিত কারণ। কিন্তু সে কি তাহা বুঝে? ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করি। কুসুম আগামী বুধবার পাবনা যাইবে।...পুলিন আসে সন্ধ্যার পর। তাহাকে লইয়া আমার ঘরটা রেণু গুছায়।

১৯শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, আমাকে তোমার পথে তোমাকে বুকে লইয়া তোমার বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার মত শক্তি দাও। তোমাকে কি ধরার মাটিতে গড়িয়া তুলিতে পারিব না? জীবনে আমার আর তো কোন কামনা নাই। ইহাই আমার দিবারাত্র ধ্যান। তোমার জীবন তোমার দর্শন ছাড়া এই বিশ্ব বাঁচিবে কেমন করিয়া? দুর্নীতিতে বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। সেদিন যে ছেলে-ধরার কথা পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, পুলিশী তদন্তে নাকি এইরূপ জানা গিয়াছে যে উহা স্কুল-পালানো বখাটে ছেলেদের কারসাজি অভিভাবকদের চোখে ধূলি দিবার জন্য। কোথায় তাহা হইলে দাঁড়াই? রেণু ১০টায় বাহির হইয়া ...কে প্রায় ৫টায়। তাহার পর খায়। একটু বিশ্রাম করিয়া গোপালসহ বেশন আফিসে গিয়া কার্ডগুলি জমা দিয়া রসিদ নিয়া আসে। দুই দিন হইল বৈকালে ঠাকুরের ওখানে আরতি হয়, বাতাসা ভোগ দেওয়া হয়।... আগাইতেই হইবে। এই আমার শেষ chance। আর তো পিছনে ফেরা চলিবে না।...৮এ বাসবিহারী আসি।... মন্থ চিঠি দিয়াছিল। কাল সে যাইবে।...টালিগঞ্জে আশ্রমে অনেক অসুবিধা। তবুও আগাইতে হইবে এখানে হাত পা লাগিয়া পড়িয়া থাকিয়া মরিব? কি কাজ এখানে আমি করিতে পারিব? দুর্যোগ! সে তো আমার নিত্যসঙ্গী। সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখি যিনি সুযোগে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তিনি আমার সখা, সাথী, বন্ধু, শরণ, সুহৃৎ, স্বামী। আমি তাঁহার শ্রীচরণতলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছি।

২০শে সেপ্টেম্বর

সকালে কালীঘাট আশ্রমে প্রার্থনা করি। তোমার নামই আমার নাম, তোমার রূপই আমার রূপ, তোমার বিশ্বই আমার বিশ্ব। আমি তোমাকে দিয়া ভাবিব, চলিব ফিরিব, তুমিময় হইব। তুমি আমি, আমি তুমি। ওখানে দইখই খাইয়া এখানে আসি।...রেণুসহ আবার ৯টায় বাহির হই। আমি ঐ আশ্রমে যাই।...মন্থ যাওয়ার সময় খুব কাঁদে, উষাদিদি কাঁদিয়া বিহ্বল হয়। ক্রমশঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভদ্রং [কল্যাণ] কর্ণেভিঃ [কর্ণৈঃ, কর্ণ সমূহ দ্বারা] শৃণুয়াম [শুনিতে যেন আমরা সমর্থ হই] দেবাঃ [হে দেব সকল] ভদ্রং [ভদ্র, শোভন দ্রব্য] পশ্যেম [দর্শনে যেন সমর্থ হই] অক্ষভিঃ [চক্ষুদ্বারা] যজত্রাঃ [হে যজনীয় দেবগণ] স্থিরৈঃ [স্থির, অটল] অঙ্গৈঃ [হস্ত পদাদি অবয়বসমূহ দ্বারা] তনূভিঃ [তনুসহকারে] তুষ্টুবাংসঃ [আপনাদের স্তব করিয়া] ব্যশেম [যেন প্রাপ্ত হই] দেবহিতং [প্রজাপতি কর্ত্তৃক দেবার্থে জন্য বিহিত, দেবকর্ম্মে নিরত] যৎ আয়ুঃ [যে জীবন কাল] সর্ব্বাস্থিরা বিশ্ব-শক্তিসমূহের সঙ্গে সকল দেহ মন প্রাণের শ্রদ্ধা-ভক্তিযোগ সাধিত না হইলে ভদ্র দর্শন, ভদ্র শ্রবণ, স্থির দেহ লাভ কিছুরই সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বের ক্ষেত্রই ভদ্রের ক্ষেত্র, স্থিরতার ক্ষেত্র, শান্তির ক্ষেত্র।

হে দেবগণ, কর্ণসমূহের দ্বারা কল্যাণ শ্রবণ করি, হে যজনীয় দেবগণ, চক্ষুর দ্বারা যেন শোভন বস্তুই দর্শন করি, স্থির অবয়ব ও তনুদ্বারা আমরা যেন আপনাদের স্তব করিয়া দেব কর্ম্মে নিরত আয়ু প্রাপ্ত হই।

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১

(ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী শ্রুতিমাতা প্রথমেই সন্তান সাধকের সামনে এই আশার বাণী শুনাইতেছেন যে, তাহার পথায় বুকে চক্ষু মেলিবার পূর্ব্বে, কোন্ অনাদিকাল হইতে তাহার বর্ত্তমানের সকল চাওয়া পাওয়া, সাধ্যসাধনার পশ্চাতে একটী করুণাময়ী জ্ঞান-প্রেমপীযূষ ধারা গুরুপরম্পরা-ক্রমে কত শত মরণকামীর বুকের তাজা রক্ত দিয়া পুষ্ট হইয়া আজ তাহারই সামনে পরিবেশিত হইতে যাইতেছে; ইহা গলিয়া গলিয়া আসিয়াছে, সাধকের বুকের রক্তে জমিয়া জমিয়া ঘন হইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রয়োজন সাধককে পিছনে হটাইয়া এই ধারার 'মূল' উৎসের ভিতর স্নাত করাইয়া, ডুবাইয়া, আমিটুকু খোয়াইয়া দিয়া ধারার সঙ্গে সঙ্গে ক্রম পরিণতির দিকে, সামনের দিকে, সাধনার ক্ষেত্রে উপনীত করা। আলো একবার পাওয়ানো, পরে সেই পাওয়াকে সাধনার ভিতর জমাইয়া দেওয়া। 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ'—মন্ত্রের প্রয়োজন মূলের ভিতর ডুবিয়া মূল হইতে যাত্রা সুরু করা, এই সংসার বৃক্ষে আরোহণ করা। এই উপনিষৎ পিতা দিতেছেন পুত্রকে; কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব! আজ রক্ত-ধারা ও চৈতন্য-ধারা সনাইয়া ব্রহ্মা এক আশ্চর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার ধারা পুত্র অথর্ব্বনকে দিতেছেন। অথর্ব্বা আজ সবদিক দিয়া ব্রহ্মার আত্মা, দেহ হিসাবেও, আত্মা হিসাবেও। সংসার সন্ন্যাস আজ এক। বিদ্যা ধারা এবং অবিদ্যা ধারা বা কর্ম্মধারার সমন্বয় প্রদর্শনই শ্রুতির প্রয়োজন। নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ যে অবস্থায় কর্ম্ম না করাই সিদ্ধ হয়, স্বীকার করিলে কেমন করিয়া ব্রজবাসী গোপ-গোপী পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে পাইলেন, সেবা করিলেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণের লোভনীয় পদবী লাভ করিলেন?

তাবদ্রাগাদয়স্তেনা তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড় যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিতেছেন—সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই যখন আমাকে পাইবার যোগ্য, তখন ব্রজবাসীরা আমাকে পাইলেন কি করিয়া? ইহারই উত্তরে ব্রহ্মা উপরোক্ত শ্লোক বলিয়াছেন—'হে কৃষ্ণ, রাগদ্বেষ সেই পর্য্যন্তই স্তেনা (চোর), সেই পর্য্যন্তই ঘৃণ্য কারাগৃহ, সেই পর্য্যন্তই মোহ পায়ের বেড়ী, যে পর্য্যন্ত না মানুষ তোমার 'জন' হয়'। রাগদ্বেষ, ঘৃণা, মোহ কিছুই মার্কামারা (absolute) চোর, জেলখানা বা বন্ধন নয়; উহারা বিশেষ ঢংএ কৃত হইলেই পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয়। কোনও গুণ, ধর্ম্মই একান্ত হেয় বা উপাদেয় নয়। যাহা কিছু তোমার সাধনার দৃষ্টিতে হেয় বলিয়া তোমার বুদ্ধিতে প্রতিপন্ন হইতেছে, একটু তলাইয়া দেখ উহারই আশে পাশে একটী উপাদেয় দিক্ প্রবাহিত হইতেছে কিনা। সন্ন্যাস পুরুষোত্তম-সংসার করিবার একটী ঢং মাত্র, কৌশলমাত্র। সন্ন্যাসে কোনও উপাধির (convention) অবসর নাই। শ্রুতি ইহাই দেখাইতেছেন।) ব্রহ্মা [পরিবৃঢ় ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যে মহান্; জ্ঞানপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যাক্ষ জগৎপতেঃ।
ঐশ্বর্য্যাকৈব ধর্ম্মস্য সহ সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্॥

দেবানাং [দীপ্তিমান্ দেবগণের] প্রথমঃ [গুণদ্বারা প্রধান হইয়া কিম্বা অগ্রে] সম্বভূব [সম্যক্ প্রকারে স্বতন্ত্র থাকিয়া এবং স্বাতন্ত্র্যের বলে সব সৃষ্টবস্তুকে সিঞ্চিত করিবার লালসা বুকে লইয়া অভিব্যক্ত হইলেন] বিশ্বস্য কর্ত্তা [বিশ্বের কর্ত্তা; 'স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা'—পাণিনিঃ। তিনিই প্রচলিত সমাজে কর্ত্তা, যিনি স্বাতন্ত্র্য রাখেন নিজের জন্য, পারতন্ত্র্যের বন্ধনে বাঁধেন অন্য সবকে, কিন্তু ইহাতে কি কর্ত্তা স্বতন্ত্র থাকেন? স্ব-পর-ভেদ রাখিয়া কর্ত্তা কি স্বাতন্ত্র্যের নামে নিজে স্বাধিকার প্রমত্ততারই প্রশ্রয় দিতেছেন না, যাহার ফলে একদিন তাহার স্বাতন্ত্র্যও পারতন্ত্র্যের চরণতলে লুটাইবে? স্ব-পর ভেদশূন্য যে 'স্ব', সেই 'স্ব'-কে কেন্দ্র করিয়াই যাহার তন্ত্র (system), তিনিই স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা] ভুবনস্য [ভুবনের] গোপ্তা [রক্ষক; বিশ্ব রক্ষা যাহার ব্রত, সে চায় সকলকেই স্বতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে। স্রষ্টার কর্তৃত্ব ও গোপ্তৃত্ব তখনই সার্থক, যখন সব সৃষ্ট বস্তু স্ব-তন্ত্র কর্ত্তা-গোত্তাকে হজম করিয়া নিজেরা সব স্ব তন্ত্র হইয়া সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল। সেই জন্যই তো প্রজাপতি যজ্ঞের সহ, আত্ম-সমর্পণের সহ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন] সঃ [প্রজাপতি ব্রহ্মা] ব্রহ্মবিদ্যাং [ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তমের বিদ্যা] সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং [সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্ব অবিদ্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, রাজবিদ্যা] অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় [জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বার নিকট, যিনি জ্যেষ্ঠ এবং পুত্র তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, ব্রহ্মার অনেক প্রকারের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন সৃষ্টির প্রথমে আসিয়া জন্মিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ] প্রাহ [বলিলেন]

বিশ্বের কর্ত্তা, ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবগণের অগ্রণী ও স্বয়ম্ভূরূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অথর্ব্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন। ১।১।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাই-
থর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥২

অথর্বণে [অথর্বাকে] যাং [যাহা] প্রবদেৎ [প্রাবদৎ, বলিলেন] ব্রহ্মা [ব্রহ্মা] অথর্বা তাং [তাহা পুরা [পূর্ব্বে] অঙ্গিরে [অঙ্গির্নামক ঋষিকে] ব্রহ্মবিদ্যা [ব্রহ্মবিদ্যা] সঃ [অঙ্গির্] ভারদ্বাজায় [ভরদ্বাজ গোত্রীয়] সত্যবাহায় [সত্যবাহকে] প্রাহ [বলিলেন ভারদ্বাজঃ [ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহ] অঙ্গিরা [অঙ্গিরাকে বলিলেন] পরাবরাম্ [পর হইতে, উৎ হইতে অবরে অর্থাৎ নীচে প্রাপ্ত যে ব্রহ্মবিদ্যা, গুরু পরম্পরা ক্রমে যে ব্রহ্মবিদ্যা, অথবা পরবিদ্যা ও অবর বিদ্যার সমন্বয় ব্রহ্ম বিদ্যা]

ব্রহ্মা যে বিদ্যা অথর্বাকে উপদেশ দিলেন, অথর্বা তাহা

পূর্বে অঙ্গির নামক ঋষিকে বলিয়াছেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে বলিলেন। উক্ত বিদ্যা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত অথবা পর-অপরবিদ্যা সমন্বিত এই বিদ্যা তৎকালে অঙ্গিরাকে দিলেন। ১.১।২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩

শৌনকঃ [শুনকের অপত্য] হ বৈ [প্রসিদ্ধার্থে] মহাশালঃ [মহাগৃহস্থ] অঙ্গিরসং [অঙ্গিরার কাছে] বিধিবৎ [যথাশাস্ত্র] উপসন্নঃ [উপ (সমীপে) স্থিত হইয়া] পপ্রচ্ছ [জিজ্ঞাসা করিলেন] কস্মিন্ নু [কোন্ বস্তুটী।] ভগবঃ [হে ভগবান্] বিজ্ঞাতে [বিজ্ঞাত হইলে] সর্বম্ ইদম্ [এই সব] বিজ্ঞাতং ভবতি [বিজ্ঞাত হয়] মহাগৃহস্থ শৌনকের এই বিপুল সংসারের জটিল কুটিল পথে বিচরণ করিয়া বহু সজাতীয় বিজাতীয় উদাসীন বস্তুনিচয়ের পিছু পিছু ছুটিয়া কোনও কিছু বস্তুর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারার ফলে এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, এই পরিণামশীল জগতের ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিয়া অনন্তকালেও ইহার কূল কিনারা মিলিবে না; কোন বস্তুই তাহার কাছে ধরা দিবে না, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাহার স্থিতি মিলিবে না; এমন কি কিছু নাই যাহাকে জানিলে, এমন কি কোনও সূত্র নাই যাহাকে ধরিলে সব জানা যায়, সব ধরা যায়? জানিবার আকাঙ্ক্ষা যখন নিবৃত্ত হইল না, অথচ জানাও গেল না, 'ধরি ধরি' করিয়া যখন কাহাকেও ধরা গেল না অথচ ধরা দিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত, তখন এমন নিশ্চয়ই কিছু আছে যাহা জানা যায় নাই বলিয়া, যাহা ধরা হয় নাই বলিয়া আজ বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহ (events) সব ধরা দিয়াও এড়াইয়া গেল। শৌনকের বহু ঘটনাপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমের শিক্ষা এই যে, বিচ্ছিন্নকে ধরা যায় না, যদি সব ছিন্নের মধ্যে এক সূত্রের অস্তিত্ব না থাকে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়াই এবং অন্তরে অন্তরে ঐ 'এক' সম্বন্ধে একটা সহজ জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হইয়া শৌনক সদ্গুরুর সমীপাগত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—'কিম্, বিজ্ঞাতে'—যে বস্তু একেবারেই অবিদিত, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইলে 'কস্মিন্ নু' ইত্যাকার প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত হয়? অবিদিত বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইলে কিম্ এই প্রশ্ন সঙ্গত হয়। শৌনকের বুকের মধ্যে একের সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, যাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে 'কস্মিন্ নু'—এই প্রশ্নের মধ্যে। যাহা শৌনকের কাছে অস্পষ্টভাবে বিদিত, তাহাকেই স্পষ্ট করিবার জন্য এই প্রশ্ন। না-জানা দিয়া এখানে সুরুয়ানা নয়। অস্পষ্ট জানাটা শৌনকের অনুবাদ, স্পষ্ট জানাটা তাহার বিধেয়। সংসার-আশ্রমই শৌনককে এই মহান্ শিক্ষার অধিকার দান করিয়াছে। মন্ত্রোক্ত 'মহাশাল' পদের বিরাট সার্থকতা এইখানে।

মহাগৃহস্থ শৌনক যথাশাস্ত্র অঙ্গিরার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন ভগবান্, কোন্ বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সব বিজ্ঞাত হয়? ১।১।৩

তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥৪

তস্মৈ [শৌনককে] স [অঙ্গিরা] উবাচ হ [বলিলেন] দ্বে বিদ্যে [দুইটী বিদ্যা] বেদিতব্যে [জানিবার আছে] ইতি হ স্ম যৎ [এই যে কথাটী] (তাহাই) ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি [বেদবিৎগণ বলেন] পরা চ এব অপরা চ [পরা এবং অপরা নামে প্রসিদ্ধ]।

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন—'দুই বিদ্যা জানিবার আছে'—ইহা ব্রহ্মবিৎগণ বলিয়া থাকেন। উক্ত বিদ্যাদ্বয় পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ। ১।১।৪

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥৫

তত্র [উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে] ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ববেদঃ [এই চারি বেদ] শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণম্ নিরুক্তম্ ছন্দঃ জ্যোতিষম্ [শিক্ষা-কল্প-ব্যাকর-

নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গ] অপরা [অপরা বিদ্যা, অবিদ্যা] অথ [আর] পরা [পরা বিদ্যা] (এই) যয়া [যাহা দ্বারা] তৎ [অনন্তর বক্ষ্যমান] অক্ষর [অক্ষর পুরুষ] অধিগম্যতে [অধিগত হন] ঋগ্বেদাদি যদি অপরা বিদ্যা, অবিদ্যা অথচ উপনিষৎ নিজেই যখন ইহার অন্তর্ভুক্ত, তখন 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'—উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করি—এই শ্রুতি বাক্যের মূল্য কোথায়? ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উপনিষৎকে পৃথক দেখা অসঙ্গত অসম্ভব। সত্য কথা এই যে, মানুষ যখন অন্তরে একের একটা অস্পষ্ট প্রেরণা অনুভব না করিয়া সংসারের তত্ত্ব জানিবার জন্য ঐ চতুর্বেদ ও ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করে, তখন তাহার পড়া হয় শুধু অক্ষররাশি; অক্ষররাশির অন্তর বাহিরে ওতপ্রোত সেই সূত্রটী তাহার কাছে থাকিয়া যায় আড়ালে। অথচ মানুষকে এই সূত্র বাহিরও করিতে হয় বহু জন্মের সংসারের পিছু পিছু ছুটিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়া। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যবান জীব।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥ এই 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে'-ই শৌনকের জীবনে একের প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়াছিল। তাই যদিও শৌনক একের প্রশ্নই করিয়াছিলেন কিন্তু উত্তর দিবার সময় আচার্য্য দেব দুইটী বিদ্যার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই বাস্তবের দেশে অনেকের ক্ষেত্র নিজের জীবন দিয়া না ঘাটিলে (যতই ইহা একত্বের কোনও আভাসশূন্য হউক না কেন), বহু ব্যর্থতা সঞ্চয় না করিলে, ব্যর্থতার বুক চিড়িয়া সার্থকতা লাভের জন্য ব্যাকুল না হইলে, একের একটা 'সন্ধান' কোনও রকমে না মিলিলে, সেই একক্কে স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য প্রশ্ন না জাগিলে গুরুর কাছে যাওয়ারও খুব ফলও মিলে না। তাই অবিদ্যাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যেই রহিয়াছে পরাবিদ্যাক্ষেত্রের বীজ। পুরুষোত্তম-সূত্র না ধরিয়া সংসার বুঝিতে গেলে, আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে মিলিবে কতগুলি অনন্ত ব্যবধানযুক্ত টুকরা জ্ঞান, যাহাকে একত্র করিয়া, জোড়া দিয়া এক অখণ্ড জ্ঞানে পরিণত করা অসম্ভব; অথচ মানুষের বুদ্ধি চায় তাহাই। হেয় মধ্যে একক্কে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বুদ্ধিতে জ্বালা হয়। উর্দ্ধমূল এক পুরুষোত্তমকে লইয়া যাত্রা না করিয়া বেদাদির শুধু উপর উপর অধ্যয়নই অপরাবিদ্যা; অপরা-বিদ্যার ক্ষেত্রে এই প্রবরূপ স্মরণও ব্যর্থ নয়; ইহাতে একত্বের খোঁজ আনিয়া দেয়। ব্রহ্মবিদ্যা-ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও পুরুষোত্তম এক ও অব্যবহিত। 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ'—ব্রহ্মসূত্র। তিনি শাস্ত্রের যোনি, শাস্ত্রও তাঁহার যোনি। পরা-অপরার সমন্বয়ই ব্রহ্মবিদ্যা। অপরা বিদ্যার স্তর ব্যবধানের স্তর, প্রয়োজনের স্তর; পরাবিদ্যার স্তর অহৈতুকের-স্তর, অব্যবহিতের স্তর]

তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এই সকল অপরাবিদ্যা। আর পরা বিদ্যা এই—যাহাদ্বারা অক্ষর অধিগত হন্। ১।১।৫

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬

যৎ [যাহার 'ক্ষীণ আভাস' তুমি সংসারের অভিজ্ঞতা মাঝে ভ্রমিতে ভ্রমিতে লাভ করিয়াছ] তৎ [তাহাকে অদ্রেশ্যম্ [অদৃশ্য; দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যের শক্ত কাঠামো (steel frame constitution) ব্যবধানের মাঝে যি দর্শনক্রিয়ার বিষয় হন না; অনন্ত দৃশ্য বস্তুতে পূর্ণভা থাকিয়াও যিনি কোনও দৃশ্যে আটকাইয়া গেলেন না অধরই রহিলেন; সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে যিনি 'না' রূ নিজের সবটুকু যেন মুছিয়া ফেলিয়া দৃশ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই দৃশ্যবৎ হইয়া রহিয়াছেন, যাহারই জন্য সংসার-সর্ব্বস্ব মা দৃশ্যের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব টের পাইতেছে এবং যাহার অধিষ্ঠান হেতু সব দৃশ্য বস্তুই অনন্ত হই রহিয়াছে, দেখিয়াও ফুরান গেল না] অগ্রাহ্যম্ (কর্ম্মেন্দ্রি যাহাকে গ্রহণের আমলে আনিতে পারিল না

ক্রম

বিশ্বনাগরিকত্ব ও শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীসনাতন মণ্ডল ॥

আজ বর্তমান বিশ্বের দিকে চাহিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এ বিশ্বে বহু ধর্ম, বহু জাতি আছে এবং তাদের জাতিত্ব ধর্ম ছাড়া এ বিশ্বে আরও বহু জাতি-ধর্ম আছে। তারাও যে স্ব স্ব জাতি-ধর্ম লইয়া বাঁচিতে পারে, তা যতই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম হোক না কেন—এই চিন্তা-ধারা বর্তমান বিশ্বের পরতে পরতে ঘাবিয়া যাইলেও তাহা মানুষ ঠিক ধরিতে পারিতেছে না। সমস্ত মানুষ একদেশদর্শী হইয়া পরস্পরকে দাবাইয়া নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে ঐকান্তিক মনে করিয়া এক ভূত-নাচে মাতিয়াছে। এই একদর্শিতার হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইয়া সামগ্রিক চিন্তাধারার আওতায় আনিতে যিনি আসিয়াছিলেন—সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব, তাঁর পবিত্র ১১০তম জন্মদিবসকে কেন্দ্র করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রয়াস।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ১২৬১ সন, ১৩ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমীতে ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর দেহে থাকাকালীন সময়ে নিজের চিন্তাধারাকে পঁচিশ ছাব্বিশখানি গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ১৩১৭ সন, ৭ই মাঘ শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমীতে চুপে চুপে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিত্যগোপাল বার বার বলিতেন, আমি বিশ্ব-নাগরিক I am a cosmopoliton ; এই বাক্যটি লইয়া আমরা একটু আলোচনা করিব।

বিগত জানুয়ারী মাসে পাকিস্থানের ঘটনাবলী প্রতিটি বিশ্ববাসীর অজানা নাই। পাকিস্থান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহাদের ধর্ম ইসলাম। প্রকৃত ইসলাম ধর্মে যে সত্য আছে এবং তাহা অনুশীলন করিলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যে আল্লাকে পাইতে পারেন ইহা কেহ অস্বীকার করিতেছে না। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদি অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করিয়া শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা উদ্যত হইয়াছেন—এবং এই বিশ্বের বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে এক পৈশাচিক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা অতীব বেদনাদায়ক!

এই পৈশাচিক ঘটনা হইতে আমরা কি বুঝিব? এমন কেন হইতেছে! মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে কোথায় দোষ আছে? ইহা কি আজ মানুষ সত্যই চিন্তা করিয়া দেখিতেছে? কই তাহা তো মনে হইতেছে না। কিন্তু আজ তো আমাদের চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রতিটি বিশ্ববাসীর পক্ষেই তাহা নিদারুণ অপরাধ হইবে।

যাহারা আঘাত খাইয়া মরিল, যাহারা আঘাত খাইয়া ফিরে মাটি, আত্মীয় পরিজন, মানুষের যা কিছু প্রিয় বস্তু ছাড়িয়া অন্ধকারে চুপে চুপে পলাইল—তাদের জন্য বিশ্ববাসী আমরা কি করিলাম?

ইসলাম রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইত্যাদি কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষ থাকিতে পারিবে না, ইহা কেমন ধর্ম? ইহা শুধু প্রেতের ধর্ম ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিব না।

এখানে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের প্রয়োজন। এখানে তাঁর অভিনব অভ্রান্ত সমন্বয়ের নূতন চিন্তাধারার প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন—আমি বিশ্বনাগরিক। আমি শুধু ভারতবর্ষের নই,—আমি বিশ্বের বাসিন্দা। আমার ভারতবর্ষ যেমন দেশ, তেমনি প্রতিটি দেশই আমার দেশ, প্রতিটি ধর্মই আমার ধর্ম, প্রতিটি জাতিই আমার জাতি। কি সুন্দর কথা! এই প্রতিটি দেশের বাসিন্দা হইতে হইলে মানুষকে 'প্রাণবান' হইতে হয়। প্রাণের ধর্মই হইতেছে সমস্তকে লইয়া চলা। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত

গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। "আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পরে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড্ না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপতপ পূজা অর্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহিল—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাহারা বলেন এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ভোবাতেই, পচিল পঙ্কপরিপূর্ণ পূতি-গন্ধযুক্ত পানাতেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি?—আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেইজন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল।"

কি অভিনব নূতন কথা। 'সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল'। এখানেই তাঁর আসার প্রয়োজন ছিল, এইখানেই 'আমি বিশ্বনাগরিক' বলা সার্থক। তাঁর মত আমরা যেদিন বলিতে পারিব—আমি বিশ্বনাগরিক, সেদিন আমরা প্রাণবান হইব এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া সার্থক হইব। ইহা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

সাময়িকী

নিত্যগোপাল তিথি-উৎসব: বিগত ৬ই বৈশাখ ১৩৭১ (ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৪) রবিবার বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১১০তম শুভ জন্মতিথি দিবস ছিল। শ্রীনিত্যগোপালের পবিত্র দেহ সমাহিত আছে ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্বাণ মঠে। ঐ দিন সেখানে সহস্র সহস্র ভক্ত শিষ্যের উপস্থিতিতে শ্রীনিত্যগোপালদেবের বিশেষ পূজা আরতি ভোগ প্রসাদবিতরণ কীর্তন ইত্যাদি হয়। বিকালের এক জনসভায় সভাপতির আসনে জালগোলারাজ রাও শ্রীশ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় যাহা বলেন তাহা এইরূপ (যুগান্তর—২৫শে এপ্রিল ১৯৬৪-তে প্রকাশিত)—"মহানির্বাণতন্ত্রে উল্লিখিত অবধূতের পরিচয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবনে সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছিল। সীমিত মতবাদ, সমস্ত বৃত্তি, গুণ, ক্রিয়া, সমস্ত অতীত ও বর্তমান বিভিন্ন বিশেষত্বের সমন্বয় সাধন করে জীবন-দর্শনকে তিনি প্রাণের স্তরে স্থাপন করেছেন। স্থিতি ও গতি, সগুণ ও নির্গুণ, আলো ও অন্ধকার, ব্রহ্ম ও মায়া সবই যে নিত্য, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল অবধূত মহারাজ এই সহজ তত্ত্বের বাণী নিয়েই আমাদের কাছে এসেছিলেন। রাজা রাও বলেন: একদিকে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব, বাংলার আধ্যাত্মিক জগতে দুই দিক পাল। পরমহংস দেব শ্রীনিত্যগোপাল দেবকে বলেছিলেন 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি'। রাজা রাও আরও বলেন, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রচলিত জাতিভেদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখে রেখে গেছেন, 'ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে, সমস্ত জাতি এক ধর্ম মানিবে, তখন ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো কোনো বিদ্বেষ থাকিবে না'। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি।"

প্রকাশিত সংবাদে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল যে বর্তমান যুগের দুই দিকের কথাকে সমন্বয় করিতেই আসিয়াছেন, বিশ্ব দীর্ঘ সহস্র বৎসর

"আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না যাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ রূপের টানে গোপীগণকে সহজ ও অজস্র (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রিয়ায় ও দ্রব্যে অদ্বৈত হইয়াই ভক্ত অতি দ্রুত দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান যুগ বর্ত্তমান ভজনের যুগ, ইহাও তাঁহারই নির্দ্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প. বার্ষিক পাঁচ টাকা

Cover Printed by : Narayan Printing Works, 95, Narkeldanga North Road, Cal-11

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সকল সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

কৈলাষ ১৮৮৬, ১৩৭১, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ, সপ্তদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

ওয়াটারপ্রুফ স্যান্ডেল (১১) ৩.১৫

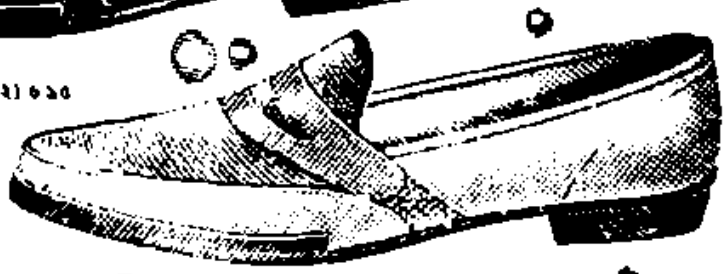

ওয়াটারপ্রুফ স্যান্ডেল (১২) ৩.১৫

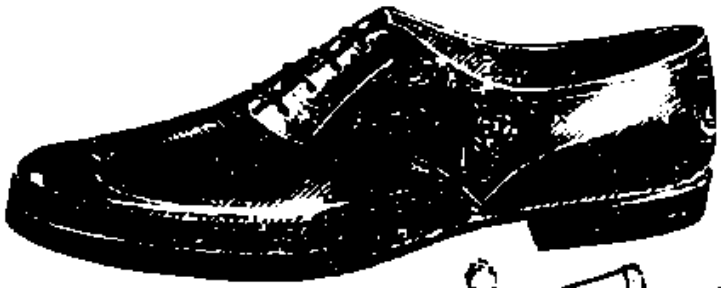

ওয়াটারপ্রুফ স্যান্ডেল ৪.৭৫

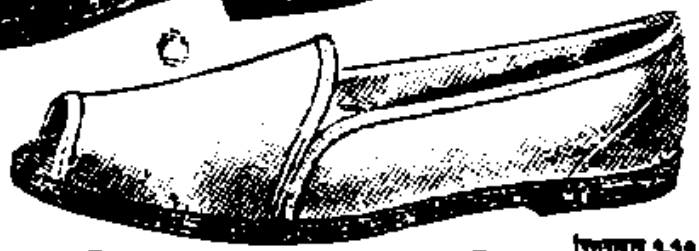

বিলাসবহুল ৫.৭৫

বর্ষার
পথে
ভরসা

ওয়াটারপ্রুফ সিটিস্টাইল ৪.৭৫

বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। এই ধরনের জুতোর প্রয়োজন উৎকৃষ্ট হবার, বাটার জুতোয় তা পাবেন।

আরামের জন্য প্রতিটি কাপড়ের লাইনিং। সোল আর হিল-এ এমন মসৃণতার কৌশল যা পায়েপথকে বন্ধুত্বপূর্ণ করে। চওড়া, বেমানান রঙ জলে ভিজুক, কাদা লাগুক, একবার ধুলেই কেনার প্রথম দিনের মতো ঝলমলে, ঝিলমিলে।

Bata

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও সূচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর কাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর কাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?.....যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।.....এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।..... ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।..... তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?....."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ১১৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৬)
২। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ... ১২০
শ্রীদুর্গামোহন সেন
৩। মুণ্ডকোপনিষৎ (অনুধৃত ভাষ্য সমেত) ১২২
৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২) ১২৬
৫। পুস্তক পরিচয়—শ্রীশ্রীঅমৃতকথামালা ... ১৩৪
৬। একটি ঝরা পাতা (কবিতা) ১৩৬
শ্রীবিভা সরকার
৭। হে রাজরাজেশ্বর (কবিতা) ১৩৬
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
৮। সাময়িকী : পণ্ডিত নেহরু ... ১৩৭
একখানি পত্র

গান্ধী স্মারক নিধির বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

সর্বোদয়

গান্ধীজীর সর্বোদয় ভাবধারার একখানি পূর্ণাঙ্গ সংকলন

মূল্য ২·৫০

অছিবাদ

গান্ধীজীর 'Trusteeship' বইয়ের সরল বঙ্গানুবাদ। অছিবাদ তত্ত্বের লক্ষ্য ও তাৎপর্য ভাল করে বুঝতে হলে এই বইটি অবশ্যই পড়া দরকার।

অনুবাদ : **শ্রীমতী সাবলা ঘোষ**

মূল্য ·৬২ ন. প.

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রচিত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিসমৃদ্ধ গান্ধীজীর একখানি অনবদ্য জীবনী। মূল্য ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)

৫·৫০ (সাধারণ বাঁধাই)

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

নারী ও সামাজিক অধিকার	৪·০০
গীতাবোধ	১·৫০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩·০০
সত্যই ভগবান	৬·৫০
কর্মের সন্ধান	০·৭৫
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
উৎপাদক শ্রম	০·৬০
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২·৫০

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)

প্রকাশন বিভাগ

১২ডি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

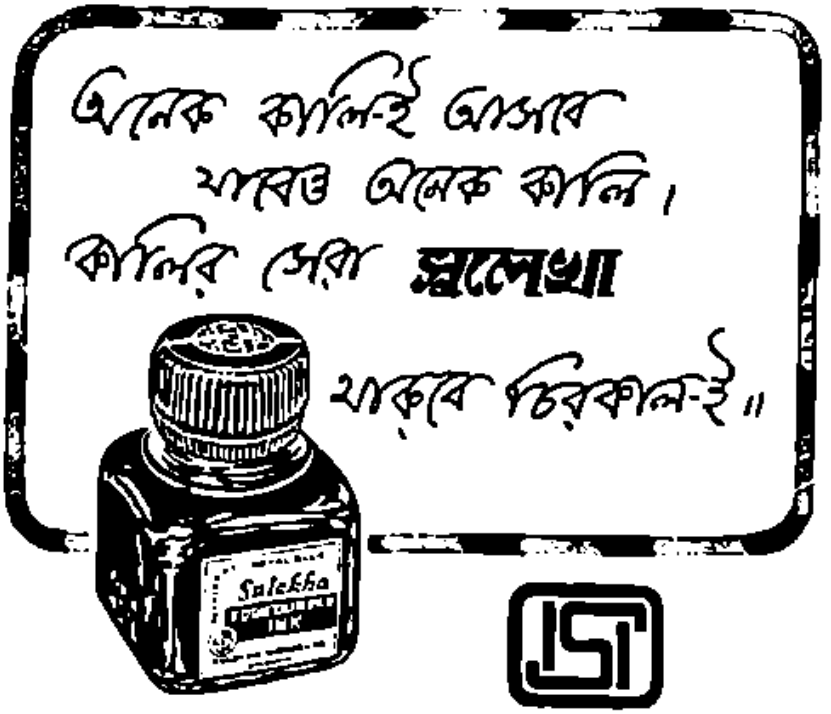

I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাবণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩৭)

২৭, ৮, ৪৬।...। উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথাবার্তা হয়েছিল, অনেক প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। দরিদ্র কে, এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন, অসন্তুষ্ট যে সে-ই দরিদ্র।...সক্রেটিসের মাথায় রাস্তার ওপর থেকে কে ছাই ঢেলে দিয়েছে—তিনি নীরবে চলে গেলেন—বললেন, যার মাথায় জলন্ত অঙ্গার পড়া উচিত ছিল, তার মাথায় ছাই পড়েছে, এ আর বেশী কথা কি?... বেশী ভালও ভাল নয় (সেই গল্প বললেন)।... পত পেলেও সন্তোষ নেই একদল আছে, আবার একদল আছে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট।...সেই ইংরেজী গল্প—দরিদ্রের রুটি দেওয়া—একটি ছোট ছেলে রোজ রুটি আনতে যায়—একজন বড়লোক রুটি দান করেন—সে হড়াহুড়ি করে না, কাড়াকাড়ি করে না—সকলের শেষে সব চেয়ে ছোট রুটিটা হাসিমুখে নিয়ে দাতার হাত চুম্বন করে যায়।

একদিন রুটির মধ্যে একটা স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে দাতার কাছে গেল...দাতা বললেন, তোমার সন্তোষের মূল্য ওটা।...যারা ভগবানকে মানে না, তাদের দিয়ে পেট ভরানো যায় না...যোগী সতত সন্তুষ্ট—যখন যে ভাবে প্রভু রাখিবে আমারে—তাতেই খুশী থাকা প্রয়োজন।...উচ্চতম স্তরে যারা বিরাট কাজ করতে আসেন তাঁদের অসন্তোষ আলাদা স্তরের—তোমরা তা দাবী করো না। দুঃখের কথা আর বলিব না যা পেয়েছি তাই নিয়ে আছি হবেও, দুঃখ ভুলেছি ও কর-পরশে।...ভগবান লক্ষ্যের জন্য কাঁদেন—এটা তোমাদের জন্য না—তোমাদের সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। করুণার এক কণা পেলেও তৃপ্ত হয়ে যাওয়া দরকার—বিশ্বসেবা যারা করবে তাদের অসন্তোষ আলাদা—বার বার বলছি সেটার সঙ্গে তোমরা তুলনা করো না।...গভীর একটা সন্তোষ বুকের ভিতরে আছে—ছেলে যে অখাদ্য খেয়ে গেছি নির্বিবাদে তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—খাওয়া পরা কিছুর জন্যই তো, নিজের কিছুর জন্যই তো কোন অসন্তোষ নাই—অসন্তোষ শুধু নিত্যগোপালের জন্য—বিরাট কাজ নিয়ে পড়েছি... তোমাদের মনের মত করে গড়ে তুলতে পারলাম না—দুঃখ সেইখানে।...শোষণ করিনি বলে, কাঁকি দেই নি বলে মানুষের কাছ থেকে সেবা নিতে পারি না যদি সে আপন না হয়।...নিত্যগোপালের কাছে কোনদিন বলিনি আমায় মুক্তি দাও, মোক্ষ দাও—কোনদিন বলিনি কিন্তু রাস্তা ঘর এক করে ফেলেছিলাম, যাদের বুকের মধ্যে স্থান দিয়েছিলাম—তারা আমাকে আপন মনে করল না—সেই জন্য নিত্যগোপালকে বলি তোমার কাজের জন্য আপন জন দেও।...আমি কখনও কারোকে পর ভাবি নি—তাই যখন যেখানে রয়েছি মনে করেছি নিজ বাড়ীতে রয়েছি।...তোমরা তো তৃপ্ত নও—অনেক করুণা পেয়েছ কিন্তু তৃপ্ত করতে পারিনি—ঠাকুর করুন, তোমরা সন্তুষ্ট হও। অসন্তোষের গোড়ায় থাকে আমার পাওনা যত

পেলাম না এই বোধ।·· দুর্খ, বিন্দু তোমার পাওনা নাই—যা পেয়েছ অযাচিত করুণায় পেয়েছ—সন্তুষ্ট থাক। ···গোবিন্দানন্দ (আমাদের গুরুভাই) সাদা আঁখি চরণে যে ডুবে থাকত, সে যেন পুরুষ আজ নিত্যগোপালের চরণাশ্রিত হয়ে শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন করছে—একদিন বললে কিছুই হল না।···নিত্যগোপাল বললেন, গোবিন্দানন্দ, কোথায় ছিলে, আজ কোথায় এসেছ ?···শান্ত হও, সন্তুষ্ট হও।···কেবল অধিকার চাইলেই অধিকারী হওয়া যায় না।·· আমি যদি নিজে অতৃপ্ত থাকি, তাহলে কিছুতেই কেউ আমাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না—উপনিষৎ বলছেন, আত্মতুষ্ট থাক···। এইটে জীবনে অনুশীলন কর—সন্তুষ্ট ও তাঁর করুণার কাছে পড়ে থাকা—দুঃখের কথা আর বলিব না দুঃখ ভুলেছি ও বর-পরশে ···জগন্নাথ, আমায় তৃপ্ত কর—তোমার সেবা করবার জন্তে বেঁচে আছি—তবু আমার আশা—তারই দরকার কি ? যাক, নিত্যগোপাল, তোমায় বিশ্বকে ভালবাসতে গিয়ে, তোমার মানুষকে দুর্বাসনে টেনে নেবার জন্তে বুঝি বা আমার সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি—তোমাকে পেয়েছিলাম, তোমার মানুষকে পেলে পূজা সমাপন হতো—হয়তো অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হবে। নিজের জন্ত কিছু চাই নি—যা কিছু চেয়েছি তা মানুষের জন্ত···নিজের দেহ প্রাণ মন অর্থ সব দিয়ে মানুষকে আশ্রয় দিয়েছি (তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, গলা ধরে আসছিল)···।

২৮.৮.৫৬·· কাল যাঁর জন্মতিথি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রে যিনি এই ধরার বুকে পদার্পণ করেছিলেন—আমার জীবনে তাঁর প্রভাব কিছু কিছু বলেছি। সব বলা হয়নি—তবে আমার জীবন তাঁরই দেওয়া।···উদ্ধবকে বলছেন, সত্যং সমদর্শনম্—আজ কৃষ্ণকে বুঝতে হলে, নিত্যগোপালকে বুঝতে হলে, আমাকে বুঝতে হলে এই সত্যকে বুঝতে হবে। সম দর্শনই সত্য—একটা দৃষ্টান্ত :—দশরথ কৈকেয়ীকে বর দিতে চেয়েছিলেন—কৈকেয়ী যে কাঁকের মধ্যে দশরথের থেকে বর চাইলেন—সেটা সত্য হয় নি—রামচন্দ্রের যুগের সত্য হতে পারে, কৃষ্ণের যুগের নয়। কৈকেয়ী ও দশরথের দর্শনে সমতা ছিল না—দুই পক্ষ যেখানে এক রকম করে দেখে—সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে—একজন আড়াল করে বলে, আর একজন আড়াল করে শোনে সেখানে সত্য নেই, সমদর্শন নেই। শুদ্ধ উভয়ের মধ্যে সমদর্শন আনতে পারেন।·· তোমার সুখদুঃখ আমি বুঝতে পারি—তোমার দৃষ্টি আমার চোখে পড়ে—বিন্দুর চোখ চক্ষু···তোমার দেখা ও আমার দেখা মিললে তবে সত্য দর্শন।···আসল কথা গোপন করে, আর একজনের প্রাণকে বুঝতে চেষ্টা না করে···যে একটা ঘটনা ঘটানো—এটা সত্য দর্শন নয়।···তোমার কথা যেন বাচ্যার্থেও সত্য হয়, কেউ যেন অনর্থ করতে না পারে···কৃষ্ণ এই সম দর্শন স্থাপন করেছেন, গৌর নিত্যগোপাল সেই সমদর্শন নিয়ে এসেছেন।···পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই দৃষ্টিকোণ কৃষ্ণ বুঝতেন, উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায় এমন অবস্থাও তাঁর জানা ছিল···। সরল হও, সহজ হও, কথা গোপন করো না—নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম গৌর, পুরুষোত্তম নিত্যগোপাল।·· যারা আমার কাছে এসেছে, তাদের চক্ষু নিয়ে আমি তাদের দেখেছি।··· যেহেতু আমি কৃষ্ণ অনুসরণ করে চলেছি, তাই মানুষের কাছ থেকে আমি নিতে পারি।···আপন জনের কাছ থেকে নেওয়া চলে—সেখানে সমদর্শন আছে।···আমার কথা আর একজন কি ভাবে নেয়, দুজনার দেখা এক হয় কিনা—তারই উপর সত্য দর্শন।...পুরুষোত্তম ছাড়া আমার কিছু নাই···মানুষ আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছে, তার অনেক বেশী দায়িত্ব আমি নিয়ে থাকি। সমদর্শনে ফাঁক নেই···সমদর্শনে নিরন্ধ্র প্রীতি।···কাল তিনি আসবেন—বিশ্বের তিনি প্রাণপুরুষ, কারাগারে তিনি জন্মেছেন···। পুরুষোত্তম, আমি তো তোমাকে চাই নি—তুমি এসেছ—আমার কিছু নেই—ধন নেই, জন নেই—কিন্তু আমার জীবনে তুমি এসেছ—এই তো আমার গরব—তোমার এই আমাকে আমি সার্থক করব—সেই দায় আমার···।

৩০.৮.৫৬।···জন্মাষ্টমী আজও কেউ কেউ পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন এসেছিলেন সে কথা প্রত্যেক

ভারতবাসীকে ভাল করে বুঝতে হবে। তিনি বিশ্বের এক নব রূপায়ন রেখে গেছেন। কৃষ্ণ এই নিন্দিত বিশ্বকে স্বীকার করে ঐ নিন্দার প্রতিবাদ করে গেছেন।··· পুরুষোত্তম,···পুরুষেরা প্রকৃতির নিজস্ব মর্যাদা স্বীকার করল না—কিন্তু তারই উপর গড়ল নিজের ভিত্তি—এইটেই শোষণ ··ধনিকে শ্রমিকে অবিশ্বাস শোষণ—পরস্পরের মধ্যে একটা অন্ধকার—secrecy—থেকে··· ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধ শোষণের সম্বন্ধ··· পুরুষোত্তম এক নূতন স্তরের কথা বলে গেলেন—সমন্বয়ের স্তরের কথা—সম্+অন্+ট+ষণ্=সমন্বয়। সমান অনুগমন করে—দুই দল পরস্পরের সমান অনুগমন করে ··· নিত্যগোপালের বিশ্লেষণ দিয়েছি ভক্ত-ভগবতে—ভক্ত ভগবানের পিছনে, ভগবান ভক্তের পিছনে। মাটি দেয়া দিচ্ছে, কথা কয় না, কিন্তু তাই বলে মাটিকে যা তা করে ওপরে উঠবে তা হয় না···বুদ্ধির বিশ্লেষণ উপনিষৎ দিয়েছে কলঙ্কিনী···। বুদ্ধিই এই বিপর্যয় এনেছে···।···কৃষ্ণের মত ভক্ত কেউ নেই—তিনি সকলের অনুগমন করতে রাজী···। সংসারে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অনুগমন করে ··অন্ন ও মন —মন অন্নের কাছে বাঁধা।···উপনিষদে অন্ন কমিয়ে শিষ্যকে দেখাচ্ছেন মন অন্নের উপর নির্ভর করে।···খাওয়া কমিয়ে যাও, দেখি কার কতখানি চিন্তা করবার ক্ষমতা ···! মালিক আর বাড়ুদার এক না হলে কাজ চলবে না—এত বড় কাজ করিয়ে নিচ্ছ, মূল্য দেবে না? অন্ন ন নিন্দাৎ।···প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা —যা কিছুকে বুদ্ধি অবিচার করেছে আমি সেই সব কিছুকে মূল্য দিয়ে যাব···। মূল্য দেওয়ার গল্প: গানের আসরে হঠাৎ হনুমানের নাম ভুলে গিয়ে গায়েন দোহারদের গানের মধ্যে দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—লঙ্কা ডিভাইল বেটা তার নাম কি? দোহাররা উত্তর দিল দশ আনি ছয় আনি ভাগ আমরা জানি কি? গায়েন যখন বললে— আজি হইতে ভাগ হইল সামনে সমান, তখন তারা উত্তর দিল—লঙ্কা ডিভাইল বেটা বীর হনুমান। অন্যকে তোমার থেকে ছোট করে রাখলে সে তোমার দায়িত্বের ভাগ মাথায় নেবে না···গান ভুল হয়ে যাবে—তাই ধনিকে শ্রমিকে সমান সমান ভাগ কর। তার মূল্য কম? সরে দাঁড়াক সে—দেখি তুমি থাক কোথায়?···ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একটা অন্ধকার সৃষ্টি করেই কালো বাজারী সম্ভব···মধ্যবর্তীর দলকে মাঝখানে foreign করে রাখব না, ঘটক হতে হবে হৃদয়কে।···কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাগবত লিখছেন, ব্রহ্মা দেখলেন ভক্তের সঙ্গে ভগবান মিলে যায়— তিনি প্রমাদ গণলেন—কৃষ্ণ উদ্ভাসিতম্ আত্মানম্ আবার প্রজা সৃষ্টি করে নিলেন···প্রজার সঙ্গে জমিদার মেলে এটা কর্মচারীরা পছন্দ করে না, দেবতারা চান না যে মানুষ ভগবানকে পায় (উপনিষদের গল্প)।···ব্রহ্মা দেখলেন গো-গোপ সব ব্রহ্ম বস্তু।···হৃদয়ের ধর্ম লিখলে বলতে হবে যাকে খেয়ে বাঁচি সে আমারই another half—জেমস্ জিনস্ খুব চমৎকার করে এ কথাটা ফুটিয়েছেন—তিনি লিখছেন complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system...। সমাজে পরস্পরের সঙ্গে থাকতে হবে ভাগবত সম্বন্ধ—organic relation; subject and object, দ্রষ্টা দৃশ্য, নর নারী, রাজা প্রজা প্রত্যেকে part of a single system— labourকে বাদ দিতে কিছুতেই পারিবে না···দুই পক্ষ যেখানে মিলিবে, সেইখানে ব্রহ্ম ··সংসার নির্বাসিত হয়ে গেল প্রকৃতি পুরুষের ঝগড়ায়···অন্নকে ব্রহ্ম বলে বুঝতে হবে···রাধারে তাজিয়া রাধারমণ নাম পেয়েছি অনেক আগে··। রাধা হচ্ছেন প্রকৃতি, matter; রাধা হচ্ছেন ভুক্ত, enjoyed।···সকলকে ফেলে একলা খেলে অন্ন পালিয়ে যায়···। আজকাল মানুষ এত কর্মকুণ্ঠ হয়েছে যে ঘণ্টা বাটতে শিলনোড়া তার বোধ হয়, কিন্তু সিমেন্ট করা নোড়া গলায় ঝুলাতে তার বোধ হয় না ···মায়ের হাতের শাক ভাত অপেক্ষা হোটেলের অন্ন আজ মানুষের অধিক প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে···। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে রাজ-রাণী করে ঋণ শোধ করে গেছেন···এ সংসারে থেকে তিনি সংসারের মাধুর্য প্রমাণ করে গেছেন অথচ তার মধ্যে বন্ধন নাই ..যে ছোটকে এতদিন অপমান করা হয়েছে, কৃষ্ণ বললেন সেই ছোটর দুয়ারে ভিখারীর মত পড়ে থাকব···।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার দৈনিক প্রার্থনায় একদিন বলেন "ঠাকুর, তুমি সমস্যা, তুমি সমাধান। সমস্যা অনন্ত, সমাধানও অনন্ত। সমস্যা থাকিলেই সমাধান থাকিবে সমস্যা-সমাধান নিত্য সঙ্গী।" উদ্বোধন, ১৮৮৪ চৈত্র। সেই স্বামীজি ১৭ বৎসর পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন সর্বধর্ম সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য। বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় যখন অখণ্ড মানুষকে ছাপাইয়া ওঠে, মানুষের অন্তরের বিশ্বরূপ জীবনকে ঢাকাইয়া রাখিয়া সেই "সহজ" মানুষটীকে একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলে তখনই সত্য মানুষটী শিহরিয়া ওঠে, চীৎকার করিয়া ওঠে, যাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে বিশ্বে তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তপাত সুরু হয়। ছিন্নমস্তার মত নিজের মস্তক নিজে ছিন্ন করিয়া নিজেরই রক্ত নিজে পান করে। হিন্দু মুসলমান যখন একের বুকে অন্যে ছুরি মারে, তখন নিজের বুকেই তাহা মারা হইতেছে। বিশ্বরূপ মানুষই আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মহাত্মাজি বলিতেছেন, 'প্রত্যেক মানুষ স্বধর্মী, সর্বধর্মী। এই প্রকার ঐক্য লাভের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক কার্য্য হইতেছে প্রত্যেক কংগ্রেসীর এই ভাব অনুভব করা যে তিনি তাঁহার নিজের ভিতরেই হিন্দু-মুসলমান-জরথুস্ত্রীয়। তিনি ভাবিবেন যে তিনি নিজের মধ্যে হিন্দুও বটেন, এবং হিন্দু ধর্মের যতগুলি ধর্ম আছে সেই সব ধর্মীও বটেন।"

আজ ভারতবর্ষ এই সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে সতত ত্রাসিত চিত্ত এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য নানা স্থানে নানাভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আন্তিমাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, জিলায়, জিলায় বলিতে গেলে গ্রামে গ্রামে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মনে মনে হয় এই প্রচেষ্টা পরপ্রাহী অন্তস্পর্শী—অন্তঃস্পর্শী নহে। সভা-সমিতিতে ২।৫ জন নেতা বসিয়া এই সমস্যা পূরণ সম্ভব নহে। কারণ বিষয়টী জটিল, অতল-স্পর্শী। কাহারও কাহারও মধ্যে মন্তব্য শ্রবণে সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিবে না। কারণ সর্বপ্রথম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এইরূপ নরহত্যা করিবার প্রবৃত্তি আসে কোথা হইতে। এতো ধর্মান্ধতা নহে—হিন্দুকে মুসলমান করিয়া মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা তো নহে। এ যে বিধর্মীকে দেশ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নিজেরা ধনী হইবার অপচেষ্টা। তারপর দেখিতে হইবে ইহার প্ররোচক কাহারা। সকল মুসলমান এক যোগে এক মনে একার্যে লিপ্ত হয় না। অধিকাংশ মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি তাহারা এইরূপ হত্যা ও লুণ্ঠনের বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুষমনদিগকে শারীরিক বাধা দিতে সাহসী হয় নাই। কারণ তাহারা জানে ইহাদের পশ্চাতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা রহিয়াছে, তাই তো রাজদ্বারে ইহাদের দণ্ড হওয়ার আশা বা আশংকা নাই, তাই তো একবার ১৫ বৎসর পূর্বে ও একবার ১৫ বৎসর পরে এই পাশবিক কাণ্ড হইল; আর সমগ্র মধ্যবর্তীকালে শাসনদণ্ডই এমন ভাবে পরিচালিত করা হইতেছে যে সাধারণভাবে দেশ ত্যাগ ও সর্বস্বত্যাগে বাধ্য হইতে হইতেছে। তাই তো দেখা গেল ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব বঙ্গের হত্যা লীলার পর লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি করিয়া পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের বিগত পাপ ধৌত করিয়া দিলেন—আর হিন্দুগণ তিলে তিলে ত্যক্ত বিরক্ত ও হতাশ হইয়া চিরকালের জন্য জন্মভূমি ও ভূমি সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া অনির্দিষ্ট অদৃষ্টের পাথাবার যাত্রে ভাসাইতেছে জীবনতরী আশ্রয়ান, দণ্ডকারণ্য ও বিভিন্ন প্রদেশের বনজঙ্গলে। ভারত গভর্ণমেণ্ট নানা কারণে ইহার প্রকৃত

প্রতীকারে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। তাই তাহারা বাধ্য হইয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বোঝা স্কন্ধে লইতেছেন ও বাহ্যতঃ রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা করিয়া খোশ মেজাজে আপ পিজিয়ে আপ পিজিয়ে করিয়া ঘরবার গৃহ ত্যাগ করিতেছেন। কারণ ইহাদের কোনও পক্ষই ভুক্তভোগী বা মানব দরদী নহে। বিগত পর্য্যায় দেখা যাইতেছে যখন ভারতীয় কৃষিও গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়াই বল পথে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হাত বাড়াইয়াছে আমরা বলি এ পথ ওপথ নহে। এই পশু প্রবৃত্তি, এই বর্ব্বরতা আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল চলিবে। ইহা সংযত রাখার একমাত্র পথ ধর্ম প্রচার। আজকালকার পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার বন্ধ—কেবল বাহুবল বৃদ্ধি ও নানা ন্যায় ও অন্যায় পথে অর্থবৃদ্ধির কথাই আলোচিত ও প্রচারিত হইতেছে। খৃষ্টীয়ানগণ একদা ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট দলে বিভক্ত হইয়া হত্যালীলা চালাইয়াছে। মুসলমানগণও এক হাতে কোরাণ ও অপর হস্তে তলবার লইয়া বিধর্মীদিগকে ধ্বংস করিয়াছে কিন্তু অপর পক্ষে ধর্মপ্রাণ প্রচারক দল শাশ্বত ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে স্মরণীয় কালের মধ্যে অনেক ধর্ম বিপ্লব দর্শন করিয়াছেন ও আত্মধর্ম রক্ষার জন্য শত সহস্র প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। আজ সকল ধর্মের মানুষগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্য বৃদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। গুরু গোবিন্দ সিংহ—রামদাস স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় লোকের আবশ্যকতা হইয়াছে—অন্যথা এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশের শাসকগণের জনগণ-মনের উপরে কোনও প্রভাব নাই—কাজেই তাহাদের কাগুজে মন্ত্রণা কাগজেই থাকিবে, কোনও স্থায়ী শান্তি আনিতে পারিবে না। সকল সম্প্রদায়ের মনে মানবতার প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। মানুষ যখন পশু হয় তখন সে ভগবানের দৃপ্ত ঘোষের প্রমাণও স্বীকার করে না। ভগবান যখন রুদ্ররূপে বজ্র-প্রাণন দ্বারা লোক দমন করেন—দেশকে দেশ উচ্ছেদ করেন তখনও উর্দ্ধস্থানে অবস্থিত হিংস্র নেতাগণ ভ্রূক্ষেপ করে না—এবং তাহার ফলও পৃথিবীতে বারংবার দেখা গিয়াছে কিন্তু তথাপি যুগে যুগে অসুরের আবির্ভাব বন্ধ হয় নাই—তথাপি মানুষ নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশো রক্ষ করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিয়াছে, আজও নান্যঃ পন্থা অদ্যনায়।

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অথচ সকল গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে যিনি 'ন' রূপে লুকাইয়া 'গ্রাহ্য' বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছেন, যাহার অন্তঃপ্রবেশ হেতু দুনিয়ার এই সব বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মাদ হইলেও বস্তু সকল অগ্রাহ্যই রহিয়া যায়] অগোত্রম্ [গোত্র অর্থ অন্বয়, মূল ; তাহার অন্বয়ও নাই, মূলও নাই। সকলের সঙ্গে যাহার অন্বয়, যাহার সঙ্গে সকলের অন্বয়, সকলের পরস্পরের মধ্যে যিনি অন্বয়, তাহার অন্বয় কাহার সঙ্গে? যিনি নিজেই নিজের অন্বয়, মূর্ত্তিমান অন্বয়, তাহার আর অন্বয় নাই। পুরুষোত্তম নিজেই নিজের মূল, তিনি অমূল, অগোত্র] অবর্ণম্ [যাহার দ্বারা বর্ণনা করা যায়, তাহাই বর্ণ। ধর্ম্ম দিয়া বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার মত কোনও ধর্ম্ম তাহাতে নাই ; কোন্ বর্ণ দ্বারা তুমি তাহাকে রঙীন করিবে? ব্যর্থ তোমার চেষ্টা] অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ [তাহার চক্ষুও নাই, শ্রোত্রও নাই ; অথচ পশ্যতি অচক্ষুঃ স শৃণোত্য-বর্ণঃ—তিনি অচক্ষু হইয়াও দেখেন, অবর্ণ হইয়াও শ্রবণ করেন, দ্রষ্টা-দর্শন-চক্ষু-দৃশ্য এবং শ্রোতা-শ্রবণ-শ্রোত্র-শ্রোতব্য। যে জীবন অনন্ত ব্যবধানহীন, যে জীবনে চক্ষু ও শ্রোত্র রাগদ্বেষযুক্ত, দৃশ্য শ্রোতব্য শুধু ভোগ যোগাইবার যন্ত্র, স্বয়ং মর্য্যাদাহীন, পরতন্ত্র, তেমন চক্ষু ও শ্রোত্র তাঁহাতে নাই ; এ চক্ষু-শ্রোত্রের দেখা শুনা ভ্রম মাত্র, ব্যর্থ, পুরুষোত্তম চক্ষু দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হইয়াই দর্শন করে ; শ্রোতব্যের সহিত এক হইয়াই শ্রবণ করে, সেখানে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য ত্রিভঙ্গ, এক—ঃ কেন বং পশ্যেৎ—আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মাকে দেখেন—'পশ্যতি'র ইহা ছাড়া আর কৌশল নাই] তৎ [সেই] অপাণিপাদম্ [তিনি পাণি-পুরুষোত্তমের একটু লুকানো রূপ রহিয়াছে, যাহা পাণিপাদের মধ্যে নিজকে হারাইয়া পূর্ণ পাণি, সর্ব্ব পাণি, অপাণি পূর্ণপাদ, সর্ব্বপাদ, অপাদ হইয়া আছে।] নিত্যং [সকল পরিণামকে রসলীলার মধ্যে হজম করিয়া যিনি আছেন, তিনিই নিত্য ; অনিত্যকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অনিত্য হইতে পৃথক রূপে গা বাঁচাইয়া যিনি, তিনি আপেক্ষিক নিত্য মাত্র ; তিনিও মহাকালের বিধানেই একদিন অনিত্যই হইবেন] বিভুম্ [ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিবিধ প্রাণিভেদের দ্বারা যিনি হন তিনি বিভু (আচার্য্য শঙ্কর)] সর্ব্বগতম্ [প্রতি বৈচিত্র্যকে নিজ পূর্ণত্বে পূর্ণ রাখিয়া, প্রতি একত্বে সর্ব্বত্বরূপে যিনি ঘনত্বরূপে সঙ্ঘত্বরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বকে পাইয়া রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বগত] সুসূক্ষ্মম্ [সকল স্থূলকে বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় সূক্ষ্মকে, সেই সূক্ষ্মের ত্বক্-অস্থি ছাড়াইলে পাওয়া যাইবে সুসূক্ষ্মকে—ইহাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু ব্যাপার কি বাস্তবিকই এইরূপ? স্থূল-সূক্ষ্ম স্তরের ভেদমাত্র। নিম্নস্তরের স্থূলকে যতই বিশ্লেষণ করিয়া সেই স্তরের সূক্ষ্ম কর না কেন তাহা যে উপরের স্তরের স্থূলের তুলনায় স্থূলই রহিয়া গেল। যিনি স্থূলধর্ম্মের উপর লেশমাত্রও আঘাত না করিয়া স্থূলকে স্থূল রাখিয়াই তাহার সঙ্গে বেশ মিলিয়া মিশিয়া রহিতে পারেন এবং স্থূলের বুকে প্রয়োজন হইলে গলিয়া গিয়া বিভিন্ন স্তরের স্থূল-সূক্ষ্মে পরিণত হইবার কৌশল অন্তঃপ্রবেশ করাইতেছেন তিনিই সুসূক্ষ্ম ; সূক্ষ্মেরও স্থূলের উপর চাপ আছে, যাহার জন্য সেও স্থূলেরই সমপর্য্যায় মাত্র] তৎ [সেই] অব্যয়ং

নিজের অনন্ত গুণরাশি সব হারা করিয়া, লুট করিয়াও যিনি কিছুই লুট করিতে পারিলেন না, নিজকে বিশ্বরূপ হইয়া গিয়া নিঃশেষে লুটাইয়া দিয়াও ফুরাইয়া ফেলিতে পারিলেন না, তিনিই মহাকৃপণ, অব্যয়] যং [এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত যাহাকে] ভূতযোনিম্ [সর্ব্ব ভূতের যিনি কারণ ; কিম্বা ভূতই যাহার কারণ] পরিপশ্যন্তি [নিজের জীবনে প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ লাগাইয়া এক করিয়া দেখেন] ধীরাঃ (ধীমান বিবেকী)

সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণকে, সেই অচক্ষু, অশ্রোত্র, অব্যয়, নিত্য, বিভু সর্ব্বগত ও সুসূক্ষ্মকে, সেই ভূতযোনিকে ধীরগণ সর্ব্বতোভাবে দেখেন ১।১।৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। ৭

অক্ষর পুরুষের ভূতযোনিত্ব বলিতেছেন—যথা [যে প্রকারে] ঊর্ণনাভিঃ [মাকড়সা] [স্বমুখ হইতে কথিত লালারস হইতে কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই, সহজ ভাবেই] সৃজতে [স্বশরীর হইতে যেন পৃথক্‌কৃত সূত্র প্রসারিত করেন] (পুনরায়) গৃহ্লতে চ [গৃহ্লাতি—গ্রহণ করে, আত্মসাৎ করে] যথা [যেমন করিয়া] পৃথিব্যাং [পৃথিবীতে] ঔষধয়ঃ [ব্রীহিযবাদি ঔষধি সকল] সম্ভবন্তি [নিজ হইতে বাতিরিক্ত ভাবেই প্রভূত পরিমাণে জন্মে] যথা [যে প্রকারে] সতঃ [সজীব] পুরুষাৎ [পুরুষ হইতে] কেশলোমানি [তদ্বৎ, বিলক্ষণ, বিজাতীয় কেশ এবং লোম] তথা [সেইরূপ] অক্ষরাৎ [নিমিত্তান্তরানপেক্ষ অক্ষর হইতে, যাহার ক্ষয় নাই, যিনি ক্ষর নন্—এই অর্থই যদি অক্ষরের সংটুকু হয়, তবে অক্ষর হইতে বিশ্বের জন্ম অত্যাস ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু সৃষ্টি যদি বাস্তব হয়, এবং উপনিষদের যদি যাচার্থে লইতে হয়, যদি 'বিশ্বের সম্ভাবনা'র উপর লেশমাত্রও অতিসন্ধিপূর্ণ যুক্তি বা চুলচেরা বুদ্ধির চাপ না দেওয়া হয়, তবে 'অক্ষর' পদের অর্থ করিতেই হইবে 'ন' এর সর্ব্বার্থ লইয়া। যিনি ক্ষয়ের ক্ষয়ন স্বভাব পরিপূর্ণ রকমে রাখিয়া সব ক্ষয়ণকে অক্ষয়ণের ভাবে ভাবিত করেন, ক্ষয়কে সনাতনরূপে, ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই অক্ষর ; 'ন' এর অর্থ তৎসাদৃশ্য, অভাব ইত্যাদি ছয়টী ; রস-স্বভাব ক্ষয়কে হজম করিয়াই জ্ঞানময় অক্ষর অক্ষয় ; জীবনে যাহার ক্ষয়ণ নাই, গলিয়া যাওয়া নাই, তাহা হইতে কোনও সৃষ্টি সম্ভব কি ? অক্ষয়ের গলিয়া-যাওয়াই যেন হয় বিশ্বরূপে] সম্ভবতি [সহজভাবে সম্ভব হয়] ইহ [এই সংসার মণ্ডলে] বিশ্বম্ [সলক্ষণ বিলক্ষণ সর্ব্ববস্তু] উপনিষদের দৃষ্টান্তগুলি অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে অক্ষরের ক্ষয়ন বাস্তব অবাধ নয়, (যেমন মাকড়সার মুখের লালা) ; এই ক্ষয়ন অতি সহজ, অতি অনিমিত্ত—মাকড়সা, পৃথিবী বা সজীব পুরুষের কোনও কিছুর অপেক্ষা নাই এই সব সৃষ্টি করিতে ; সহজ জীবন, সহজ প্রকাশ এইগুলি। সৃষ্টির প্রতি বস্তু এই সব মর্ম্মে দীক্ষিত। সৃষ্টি-বিজ্ঞানের এই স্তরে পৌঢ়ানোই উপনিষদের প্রয়োজন। যাহা আছে স্রষ্টার বুকে তাহাই ফুটিয়াছে সৃষ্টির বুকে, তাই স্রষ্টা বিজ্ঞাত হইলেই সৃষ্ট বিজ্ঞাত হয়। এই সৃষ্টি মানুষের মত এক ফুৎকারে ফুটিয়া উঠে না। ইহার মধ্যে একটা plan আছে, technique আছে যাহা ক্রম বজায় রাখিয়া অথচ ক্রমের মধ্যে উচ্চাবচ স্থাপন না করিয়া, প্রতি ক্রমের সঙ্গে প্রতি ক্রমের সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রতি ক্রমের পরিপূর্ণতা অঙ্গীকার করিয়া একটী জীবন্ত শারীর যন্ত্র (system) সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কাল এই সৃষ্টির প্রথম অংশ লইয়া পরিণমন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। কালই রসের মূল উৎস।

মাকড়সা যেমন নিজের মুখ-ক্ষরিত লালারস হইতে জাল বিস্তার করে, পরে আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধি জন্মে, সজীব পুরুষ হইতে যেমন বিজাতীয় কেশ লোম নির্গত হয়, সেই রূপ অক্ষর হইতে সংসারে সব বস্তু উৎপন্ন হয় ১।১।৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥৮

বিশ্বসৃষ্টির ক্রম বলিতেছেন—তপসা [তপস্যাদ্বারা, স তপস্তপ্ত্বা ইদম্ সর্বম্ অসৃজত—যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ (যাহার তপস্যা জ্ঞানময়); এই জ্ঞানই সৃষ্টির plan ও technique সম্বন্ধীয় জ্ঞান] চীয়তে [উপচিত হন্; অঙ্কুরোৎপাদক বীজের ন্যায় স্ফীত হন্, 'বহু হইব—' এইরূপ ঈক্ষণবিশিষ্ট হন্, যাহা সৃষ্টি করিবেন, তাহাকে বুকের মধ্য হইতে ভাসাইয়া তুলিয়া তাহাতে নিজের হোম করেন, তাহাকে নিজের মধ্যে হোম করেন; তপস্যা হোমেরও উপলক্ষণ। হোম ব্যতীত শুধু তপস্যায় সৃষ্টি হয় না। স ঐক্ষত ন তপস্তানন্তাম্যহং অহং সর্বেষু ভূতেষু আত্মানং জুহোমি সর্বাণি ভূতানি চ আত্মনি; পিতা যেমন পুত্রোৎপাদনের হর্ষে স্ফীত হন্, (তেমনি) ব্রহ্ম [অক্ষর] ততঃ [অক্ষর হইতে] অন্নম্ [সর্ব জীবের ভোগ্য স্বরূপ অব্যাকৃত মায়া] অভিধ্যায়তে [বিশেষ বিশেষ আকারে আকারিত (ব্যাকৃত) হইবার উপযোগী অবস্থারূপে উৎপন্ন হয়] অন্নাৎ [মায়াতত্ত্ব হইতে] প্রাণঃ [হিরণ্যগর্ভ; বাষ্টি জগতের সমষ্টিরূপ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট, অবিদ্যা কাম-কর্মভূত সমুদায় বীজাঙ্কুর, জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভ] (জাত হন) (সেই প্রাণ হইতে) মনঃ [সঙ্কল্প বিকল্প সংশয় নির্ণয়াত্মক সমষ্টি অন্তঃকরণ], মনসঃ [মন হইতে] সত্যম্ [আকাশাদি পঞ্চভূত] (সত্য হইতে অণ্ডোৎপত্তিক্রমে) লোকাঃ [ভূরাদি সপ্তলোক] (তাহাতে মনুষ্যাদি প্রাণীর বর্ণাশ্রমধর্মযুক্ত কর্ম সকল জাত হয়) কর্মসু চ অমৃতম্ [এবং কর্মসকলে অমৃত উৎপন্ন হয়; কর্মের অমৃতত্ব বিধানই সেই অক্ষর পুরুষের সব করণ লীলার, সৃষ্টির স্ফীত হইবার পরম-চরম প্রয়োজন। কর্ম শুধু অনাদি নয়, কর্ম যে অনন্ত, কর্ম যে অমৃত, কর্মই যে লীলা—ইহাই উপনিষৎ সিদ্ধান্ত। যে কর্মের পিছনে অক্ষরের তপস্যা ও হোমরূপী আছিল, সে কর্ম মরণ আনিবে কিরূপে? যে কর্ম অমৃত ফল প্রসব করে, তাহাই অক্ষরের কর্ম। কর্মের এই অমৃত আপেক্ষিক; ইহা পারমার্থিক সনাতন লীলা।

তপস্যাদ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত হন্; তাহা হইতে অব্যাকৃত মায়া-অন্ন জাত হন, মায়া-অন্ন হইতে প্রাণ-হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, পঞ্চভূত হইতে ভূরাদি লোকসকল, লোকসকলে কর্ম এবং কর্মসকলে অমৃত উৎপন্ন হয়। ১।১।৮

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥৯

যঃ [উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত অক্ষর] সর্বজ্ঞ [সামান্যভাবে, অভেদভাবে যিনি সব জানেন] সর্ববিদ্ [বিশেষ ভাবে, প্রভেদ ভাবে যিনি সব জানেন; শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে,'] যস্য [যাহার] জ্ঞানময়ম্ [সত্ত্বপ্রধান মায়ার সর্বজ্ঞ লক্ষণ জ্ঞানাখ্য বিকার বা রস পরিণামে সমন্বিত হওয়ারূপ] তপঃ [তপস্যা] তস্মাৎ [তাহা হইতে] এতৎ ব্রহ্ম [এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা] নাম [সকল নাম] রূপম্ [রূপ] অন্নম্ চ [এবং ব্রীহি যবাদি অন্ন] জায়তে [জাত হন] তপঃ [হোম চুম্বিত নাম-রূপ অন্ন-সবই ব্রহ্ম, সবই অমৃত, সবই পুরুষোত্তম-প্রসাদ। বিশ্ব সেই অক্ষর পুরুষের কত আরাধনার ধন, যুগ যুগ ধরিয়া কত তপস্যায় পাওয়া হারানিধি।]

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বজ্ঞত্বই যাহার তপস্যা, তাঁহা হইতেই এই হিরণ্যগর্ভ, নাম রূপ ও অন্ন জাত হয়। ১।১।৯

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্
তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১

সৃষ্টির মূল অক্ষর পুরুষে আত্মভূত হইয়া তাঁহারই আত্মকৃতি পরিণাম এই বিশ্বে যাহারা দেখিলেন না, যাঁহা

বিচ্ছিন্ন 'অহম্'কেই মূল ধরিয়া 'কর্ত্রাদিসাধনক্রিয়াফল ভেদরূপ' এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের বৃক্ষ চিড়িয়া, কর্ম্মের খোসা বল্কল ছাড়াইয়া জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করিলেন, বৈদিক যজ্ঞ কর্ম্মের শরণাগত হইলেন, তাঁহাদের এই কৃত কর্ম্মের ফল বর্ণিত হইতেছে, ইহার প্রয়োজন—কর্ত্রাধীন কর্ম্ম ফলের অনিত্য ও দুঃখস্বরূপত্ব প্রদর্শন এবং পাশাপাশি পুরুষোত্তম অচিন্ত অনির্দ্দিষ্ট, অব্যবহিত কর্ম্মের অনাদি অনন্তত্ব স্থাপনে, কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের সমন্বয় প্রদর্শন। তৎ এতৎ [সেই ইহা অর্থাৎ অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত বিচ্ছিন্ন অহংপূর্ব্ব যজ্ঞ কর্ম্ম এবং তাহার ফল] সত্যম্ [পুরুষার্থ সাধন হেতু নিশ্চিত রূপে সত্য] মন্ত্রেষু [ঋগ্বেদাদিতে প্রকটিত] কর্ম্মাণি [অগ্নিহোত্রাদি] কবয়ঃ [বশিষ্ঠাদি মেধাবীরা] যানি [যে সকল] অপশ্যন্ [দেখিয়াছিলেন] তানি [ঋষি-দৃষ্ট বেদবিহিত সেই কর্ম্ম] ত্রেতায়াং [ঋক্ যজু ও সামসমূহে কিম্বা হোতা-অধ্বর্য্যু-উদ্গাতা ভেদত্রয়ে অথবা ত্রেতা যুগে] বহুধা [বহু প্রকারে] সন্ততানি [কবিদের দ্বারা ক্রিয়মান রূপে ছড়ানো রহিয়াছে] (অতএব তোমরা) তানি [সেই কর্ম্ম সমূহ] আচরথ [আচরণ কর] নিয়তং [নিত্য] সত্যকামাঃ [যথাভূত কর্ম্মফল কামনা করিয়া] এষঃ [এই] বঃ [তোমাদের] পন্থাঃ [পথ] সুকৃতস্য [স্বয়ংকৃত কর্ম্মের] লোকে [ফল লাভের জন্য 'লোক্যতে দৃশ্যতে', দৃষ্ট হয় বলিয়া কর্ম্মফলই লোক] (ফল প্রাপ্তির ইহাই মার্গ); যে অক্ষর পুরুষ স্বয়ং 'আত্মানাত্মকৃতম্' বলিয়া সুকৃত আখ্যায় আখ্যাত, সেই সুকৃতকে বুকে লইয়া যদি কর্ম্মী যাত্রা করিত, তাহার এই আপেক্ষিক 'সুকৃত লোক' লাভ হইত না, হইত রসঘন ভাগবত সুকৃত লোক, পুরুষোত্তম লোক]।

বশিষ্ঠাদি মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদিতে যে সকল কর্ম্ম বিহিত দেখিয়াছেন—অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই কর্ম্মই সত্য। সেই কর্ম্মসমূহ ত্রয়ীতে বহু প্রকারে বিস্তৃত আছে। তোমরা যথাভূত কর্ম্মফলকামী হইয়া নিত্য ঐ সমুদয় আচরণ কর। তোমাদের সুকৃত কর্ম্মের ফল লাভার্থে উপায় ইহাই। ১।২।১

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ শ্রদ্ধয়া হুতম্ ॥২

সর্ব্ব কর্ম্মের প্রথম বলিয়া প্রথমে অগ্নিহোত্রকেই প্রদর্শন করাইতেছেন—যদা [যখনই] লেলায়তে [লেলিহান হয়] অর্চ্চিঃ [অগ্নিশিখা] সমিদ্ধে [ইন্ধন সংযোগে সম্যক প্রজ্বলিত] হব্যবাহনে [অগ্নিতে] তদা [তখন] আজ্যভাগৌ [আজ্যভাগয়োঃ—আজ্য ভাগদ্বয়ের] অন্তরেণ [মধ্যে আবাপ স্থানে] আহুতীঃ [আহুতী সমূহ] প্রতিপাদয়েৎ [দেবতার উদ্দেশ্যে প্রক্ষেপ করিবে] এইরূপ কর্ম্মই লোক প্রাপ্তির পথ। ইহার সকল অঙ্গ করা দুঃসাধ্য অথচ অন্যরূপে বিপত্তি আসিবে।] শ্রদ্ধয়া হুতম [শ্রদ্ধা সঙ্গে আহুতি দেওয়া হইবে।]

সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে যখন শিখাসমূহ লেলিহান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতিসমূহ অর্পণ করিবে। ১।২।২

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

এই মন্ত্রে যজ্ঞ সম্পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিপদ কি তাহা বলিতেছেন—যস্য [যে অগ্নিহোত্রীর] অগ্নিহোত্রম্ [অগ্নিহোত্র] অদর্শম্ [দর্শাখ্য কর্ম্মবর্জ্জিত, অমাবস্যা কৃত ইষ্টিযাগের নাম দর্শ] অপৌর্ণমাসম্ [পূর্ণিমা যজ্ঞ রহিত] অচাতুর্ম্মাস্যম্ [চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্ম বর্জ্জিত; বৎসরকে চতুর্ম্মাসে বিভক্ত করিয়া প্রতি বিভাগের প্রারম্ভে (কার্ত্তিক ফাল্গুন, আষাঢ়ে) কৃত ফলই চাতুর্ম্মাস্য যথা বৈশ্বদেবম্, বৈশ্ব প্রঘাসাঃ, সাকমেধঃ] অনাগ্রয়ণম্ [শরদাদিতে নবান্ন যাগ করণীয় ক্রিয়া রহিত] অতিথিবর্জ্জিতম্ চ [এবং প্রত্যহ অতিথি পূজা শূন্য] অহুতম্ [যথা সময়ে আহুতি প্রদান রহিত] অবৈশ্বদেবম্ [বৈশ্বদেব কর্ম্মবর্জ্জিত

ক্রমশ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৯)

উষার পর রেণু ও ভগ্না আমার বিছানা লইয়া রিক্সায় এখানে আসে। আমি উষাঙ্গিনী স্নান হইলে পর আসি। এখানে আসিয়া দেখি শিশির ও সমলা আসিয়াছে…

২১শে সেপ্টেম্বর

সেই কোন্ অনাদি কালে সৃষ্টির প্রভাতে তোমার জীবনরস বন্দিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে সকল ভালোতে, সকল মন্দতে, সকল পাপে, সকল পুণ্যে, সকল স্বর্গে, সকল নরকে তোমাকে শুধু শুধু করিয়া পাতি পাতি খুঁজিয়া চলিয়াছি তোমায় মন্থন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য। তুমি সকল বিশ্বমন্থন ধন। আজ আবার নূতন করিয়া পথে বাহির হইলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, সঙ্গে আছ। তুমি সবুজা সখা—সহযোগী সমভোগী, সংসারের সকল সুখদুঃখ ফলের সমভোক্তা। তুমি আমি, আমি তুমি—তুমিই আমার আমি। সকাল হইতেই বৃষ্টি। ১টার পর রিকসায় 'উজ্জলভারত' কালীঘাট পোস্টাফিসে দিয়া আসে। ৩টায় প্রতিভা দীনেশ রায়, হেমন্ত দাস প্রভৃতির বাসায় পত্রিকা দিয়া আশ্রমে যায়…বিছানাপত্র সহ রিক্সায় উষাঙ্গিনী প্রতিভাসহ চলিয়া আসে।… আমার এখানে আসার জন্য কেহ বা কোনও একটি ঘটনাই দায়ী নয়, অথচ সকলেই দায়ী। কাছে থাকিলে কার্যসিদ্ধি হইত না, তাই সবলেই যেন ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুলিন সন্ধ্যায় আসিয়া জল তুলিয়া দেয়।…

২২শে সেপ্টেম্বর

আজ প্রার্থনার সময় উষাঙ্গিনী ছিল। জীবনে তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সব কড়ক্ষয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।…উদ্বোধন হইতে 'যোগবাশিষ্ঠে সর্বত্যাগের আদর্শ' (অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা) প্রতিভা পড়িয়া শুনায়। প্রথমে বৃহস্পতি পুত্র বচ বাহিরের 'সব' ত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রশান্তি মিলিল না। তখন বৃহস্পতি বলিলেন, চিত্তত্যাগ, অহঙ্কার ত্যাগই বাস্তবিকপক্ষে সর্ব ত্যাগ। ভোগে যে 'আমি', ত্যাগেও সেই 'আমি'; 'বোধ' ব্যতীত আমিত্ব ত্যাগ হয় না। কিন্তু নির্বিশেষ-বোধ যাহাকে বলা হয়, সেখানেও আমি থাকে। যদি কোন জীবন্ত মানুষের 'Pull' আমাকে টানিয়া না ধরে, আমি কেমন করিয়া আমাকে ডিঙাইব? তিনিই গুরু, যিনি আমার সব-কিছু মর্যাদা দিয়াও আমার বাহিরে। এই অন্তর্মুখী টান ছাড়া বাহিরের দিকে আর একটি সাধনার প্রয়োজন হয় আমিত্ব ত্যাগের জন্য। সেটা হইল ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে, পরস্পরবিরুদ্ধদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই দ্বিমুখী সাধনাদ্বারাই আমিত্ব-ত্যাগ সম্ভব হয়। কেবল অন্তর বা কেবল বাহ্য সাধনা দ্বারা চিত্ত-ত্যাগ হয় না। মন-বুদ্ধি যে either or-এর পথেই চলিতে সক্ষম। সমগ্র দৃষ্টি ইহাদের নাই। ৯টার পর ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর

৫টায় প্রার্থনা হয়। আমার জীবনের সকল দুঃখ, সকল পথে দাঁড়ানোর বল জমাইয়া তোমার শ্রীচরণে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি। আমার দুঃখের ধন তুমি। সব হারাইয়া তোমাকে পাইয়াছি। ঝড়ের মধ্যে সবই একরূপ উড়িয়া গিয়াছে। কুসুম ১১টায় পাবনা যাইবে বলিয়া ৯টার মধ্যেই রান্না শেষ হয়।…তাহারা ৯।০টায় বাহির হয়।…বিজ্ঞাপনদাতাদের ভাউচার কপি ও বিল দেওয়া শেষ হয়। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়।

করে যে ঠাকুর তাঁহার জীবন ও দর্শন লইয়া দাঁড়াইবেন জানি না। কিন্তু আমার প্রাণ তো ব্যাকুল। কিছুতেই আমি সুস্থ হইতে পারিতেছি না। বিশ্বের যে আজ বড় প্রয়োজন ঠাকুরের জীবন ও দর্শনের। এত বড় গুরুভার আমি এই ২।১টী মেয়ে নিয়া কি করিয়া বহন করিব? 'তোমার পতাকা তুমি দাও যারে বহিবারে দাও শকতি'—ইহাই শুধু ভরসা। চলিতেই হইবে। সন্ধ্যায় আজ বেণু আরতি করে, শিশুরা উপস্থিত থাকে। শিশির ১৷০ টাকা দিয়া ১০০ ধূপকাঠী আনিয়া দিয়াছে। শিয়ালদহ যাইবার সময় ট্রাম ভাড়াও সে দিয়াছে ....

২৪শে সেপ্টেম্বর

অধিবাস

পরব্রহ্মমহিষী, কৃষ্ণ-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা শ্রীদুর্গা আমার, আমার দেহমনপ্রাণমন অধিকার করিয়া তোমার 'বাস' আজি সার্থক হউক, বাস্তব হউক। তুমি অধিবাস-রূপিণী, ধরার ধূলিতে, জীবনের সকল কামনা বাসনার ক্ষেত্রে, সকল কামের বুকে তোমার অধিবাস-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। সকল মধু, সকল কৈটভের বুক নিংড়াইয়া তুমি বাঙ্গালীর কন্যারূপে আবির্ভূতা হও। তুমি দেব-মানব পশু-পক্ষীকন্যা। তোমাকে নমস্কার। আমার পরাণ-পুত্তলী তুমি, তোমাকে বার বার আমার চুম্বন জানাই। তুমি কন্যা আমার। আমার সকল স্নেহ সকল আদর তোমাকে অভিসিঞ্চিত করুক। গোপা ঘুম ভাঙ্গিয়া আনে। শিশির আসে। তাহাকে বলিলাম—তুমি ছাড়িতেও পার না, আসিতেও পার না। একদিন হয়ত দেহের মনের সকল শক্তি খোয়াইয়া আসিবে। দেহের প্রয়োজনকে 'আত্মা' দিয়া মেটানো সম্ভবপর নয়। এরোপ্লেন, রেল, ষ্টীমার দ্বারা কি 'পায়ে হাঁটা'-কে কেহ বন্ধ করিতে পারিয়াছে, না পারিবে? সেই দেহের দাবী একটি জাতি আত্মার নামে অগ্রাহ্য করিয়াছে। আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। জাতিশুদ্ধ যুবকদল দেহাত্মবাদী হইয়াছে, কম্যুনিজমের কবলে পতিত হইয়াছে। আমি চাহিয়াছিলাম (অবশ্য ঠাকুরের শ্রীপাদ-[illegible] করিয়া) এমন একটি লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতে যেখানে দেহের দাবী ও আত্মার দাবী সম ভাবে পূরণ হইতে পারে।...উজ্জলভারত হইতে 'নমো নম' ও 'মানুষী মা'র পূজা প্রবন্ধদ্বয় বেণু পড়ে। যাদববাবু আসে। পুলিন আসে নাই, অসুখও দেয় নাই ....

২৫শে সেপ্টেম্বর

সপ্তমী পূজা

'আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালী নাম সার রে'—মা দুর্গা, মহাকালী, আমার দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব কালীময় হউক, সর্বসংস্কার বর্জিত হউক, অবধূত হউক। তোমার শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত গঙ্গা-ধারার মত মুক্ত জীবন প্রবাহ লইয়া ছুটিব, দুকূল পাবিয়া ভাসাইব, গড়িয়া তুলিব। বাঙ্গলার বুকে তোমার অবতরণ সার্থক হউক। এই নূতন যুগের ভোরে আজ নূতন করিয়া ধর্ম অধর্ম, শুচি অশুচি, সতীত্ব অসতীত্ব, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বুঝিয়া লইতে হইবে মহাকালী তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া। আমাকে বর্তমান যুগ গড়িবার উপযোগী দিব্য দৃষ্টি দাও। তোমায় আমার সকল জীবনের নমস্কার। ৮টার পর শিশির আসে ...কিছু পরেই নীলু ও মীনু দক্ষিণেশ্বর হইতে আসে।...সকালে বেণু আসে। অনেক কথা হয়। তাহাকে গত বৎসরের ভাদ্র সংখ্যার সমগ্র দৃষ্টি ও বর্তমান আশ্বিন মাসের 'মহাভারতে সত্যের আদর্শ' প্রবন্ধ ২টী বেণু পাঠ করিয়া শুনায়। খুব ভাল লাগিয়াছে 'সমগ্র দৃষ্টি' প্রবন্ধটী। ঐ সংখ্যাটি নিয়া যায়। সত্যই তো ঠাকুরের এই দর্শন অপূর্ব। ইহা বর্তমান যুগেরই দর্শন বটে। কবে ইহাকে ঝড়ের মত সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিব ঠাকুর? এখানে গীতা পাঠের কথা বলি পূজার গোলমাল যাওয়ার পর।...

২৬শে সেপ্টেম্বর

ওগো শ্রীদুর্গা মহালক্ষ্মী, সঙ্ঘশক্তি: কলৌ যুগে, কার্য-ব্যূহরচনার দেবী আমার, সঙ্ঘ গড়িবার লোকে পথে পথে কাঁদিলাম, মানুষকে ডাকিলাম সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য, কোনও খেয়াল, কোনও অভিসন্ধি ছিল না ইহার মধ্যে, এ সংসারের একরূপ কিছুই বাকী নাই পরি নাই, স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের লইয়া পরিবার গড়িতে চাহিয়াছিলাম তোমারই

সঙ্ঘশক্তির ছাচে, পারি নাই তো। আমার জীবন কি ব্যর্থ হইবে? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সঙ্ঘর্ষ, পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, উচ্চ বর্ণে নিম্ন বর্ণে, নরে নারীতে, ধনিকে শ্রমিকে। তোমার পূজা করিবার প্রহসন যাহারা পাইয়াছে, সেখানেই কি না সংঘর্ষ চলিতেছে? কোথায় যাইব? সঙ্ঘ গড়িয়া না উঠিলে মহালক্ষ্মী তুমি অধিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া? মা, তুমি এস না, সকল দ্বন্দ্বকে পরিপাক করিয়া কায়ব্যূহরূপে। তোমাকে নমস্কার নমস্কার।...পথ আমাকে ডাকে। পথের ডাক আমি শুনিয়াছি। তাই ঘর ভাল লাগে না। কাহাকেও নিয়া ঘর করিতে আমার মন সায় দেয় না। পথে বাহির হইয়া এস, এখানে সঙ্ঘ গড়িব, পরিবার গড়িব। ঘরে সঙ্ঘ হয় না, ঘরে হয় শুধু ঝগড়া, স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি। পথ, ওগো পথ, আমাকে তোমার বুকে স্থান দেও। তোমার বুকেই আমার স্থান! ৪টার পর কালীঘাট ও মন্থর ওখানে যাইবার জন্য রেণু ও গোপা সহ বাহির হই।...

২৭শে সেপ্টেম্বর

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে নবমী

মা মহাসরস্বতি, তুমিই পথের ঠাকুরাণী, অদ্বৈতামৃতবাহিনী, পথ দেখাইয়া চলিয়াছ গায়ত্রী-গান শুনাইয়া শুনাইয়া। যাহারা তোমার আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পথে দাঁড়াইয়া তোমাকে পাইয়াছেন। পথের তো শেষ নাই, পথ যে অশেষ। তাই মানবাত্মা চিরদিন মুক্তির খোঁজে পথে পথে ফিরিয়াছেন। পথই তো সকল গৃহের যোগসূত্র। পথে দাঁড়াইলে সব ঘর পাওয়া যায়। পথে যে দাঁড়াইল তাহারই অহং-এর ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ সম্ভব। অহং লইয়াই তো বিষয়—শেষ অহং, সৃষ্টিকর্ম্মের অহম্ গলিয়া যায় মহাসরস্বতীর কৃপায়। তখনই স্রষ্টাও মুক্ত, সৃষ্টিও মুক্ত। মা, আমাকে কোলে তুলিয়া লও। আমিই তুমি, তুমিই আমি। 'অহং হি দুর্গা'।...ঠাকুর আসিয়াছেন নিত্য পথা প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরশ দিয়া আমাদের 'মূল প্রকৃতি'র ভাগবত রূপ ফুটাইবার জন্য। তাই তিনি বলিতে আসিয়াছেন 'যা যায় যায় সব তার আমার উপর রইল'। প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকৃতি স্তরের সব সাধনাই পারা না-পারার স্তরের সাধনা—ইহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। জপ-ধ্যান, যজ্ঞ-তপস্যা, ত্যাগ-ভোগ সব অবেজো হইয়া গিয়াছে। রোগ আজ deep-seated, সর্ব ক্ষেত্রে আজ ক্ষয় রোগ, মূল জীবনী শক্তি আজ আক্রান্ত। আজ মূলের সাধনা প্রয়োজন, ভাল-পালার সাধনার দিন অতীত। এত দিন এই ভালপালা অবলম্বনে সাধনা চলিয়াছিল। তাই শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন জীবন দিয়া জীবনের রোগ ভরিয়া লইতে। কিন্তু আমরা তো তার তাঁহার উপর দেই নাই, এতদিনকার সাধনার সংস্কার আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ তিনি তার নিয়াছেন ভাবিয়া কিছুই করি নাই। তিনি তো তার নিয়াছেন, আমরা কি তার দিয়াছি? তার স্বেচ্ছায় না দিলে একজন নিতে চাহিলেও তিনি তাহা নিতে পারেন নাই। আমরা তার দেই নাই, তাই তাঁহার নেওয়া হয় নাই, অথচ তিনি সত্যই নিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই সাধনার কথাই রেণু-প্রতিভাকে শুনাইতেছি। বিনা সাধ্য সাধনায় পাইয়াছি ঠিকই; কিন্তু বিনা সাধ্য সাধনায় কি তাঁহাকে রাখিতে পারিব? পাইলেই রাখা যায় না। মানুষ পাইয়াও হারায়, আমাদের দশা হইয়াছে তাহাই। নিত্যগোপালকে পাইয়াও হারাইয়াছি। আজ পাইতেই হইবে, ইহাই আমার সঙ্কল্প।..

২৮শে সেপ্টেম্বর

ওগো শ্রীদুর্গা, মা আমার, মেয়ে আমার, তুমি মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহা সরস্বতী, তুমিই বিজয়া। তোমার শ্রীচরণতলে আত্মার বিজয়, অনাত্মার বিজয়, নিত্যের বিজয়, অনিত্যের বিজয়, সর্ব জাতির বিজয়, সর্ব বর্ণের বিজয়, সর্ব আশ্রমের বিজয়, সর্ব ব্যক্তির বিজয় ঘনীভূত। আমার জীবনে তোমার আহ্বান নাই, তোমার বিসর্জন নাই। তোমার সঙ্গে যে আমার নিত্য যোগ। তুমি আমার নিত্যা, আমার জীবনের প্রতি স্পন্দনে তোমার বিজয়া রূপ জমিয়া উঠুক। বিশ্বের গলাগলি

হউক, অবৈত হউক। যাহারা আমার জীবনের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও যুক্ত ছিল, আছে ও থাকিবে, তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তোমাকে, তোমার বিশ্বরূপকে আমি বরণ করিতেছি। ঠাকুর ভার নিতে চাহিয়াছেন কিংবা নিয়াছেন, আমরা কোন্ লাজে তাহা দিলাম? তাঁহার মাথায় ভার চাপাইতে কেহ কি সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি? নির্লজ্জ আমরা, তাই তাঁহার ভার নেওয়ার কথা আমরা বলিতে পারিতেছি। ভার যে নিতে চায়, তাহার উপর কোন্ হুতচ্ছাড়া ভার চাপায়? আর তাঁহার এই ভার নেওয়ার জন্য আমরা কি এতটুকুও কৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞ থাকিলে এ, ও অভিমান করিয়া তাঁহাকে জ্বালাইতাম না। একটু স্নেহ পাইয়াই জীবন বিকাইয়া দিতাম। তাঁহার আদরে আমরা অকৃতজ্ঞই হইয়াছি, অলসই হইয়াছি।··· বিশ্বনাথ বলিল, 'আপনার চলিয়া আসা আমাদের ভাল লাগে নাই, বেদনা পাইয়াছি। আপনি ছিলেন পাইলট। সব ভাঙ্গিয়া গেল'। আমার কাজ করিবার ব্যাকুলতা আজও আছে, ওখানে তো কাজের সুবিধা নাই। আমি তো চাহিয়া ছিলাম, উহাদিগকে জীবনে অঙ্গীভূত করিয়াই তো রাখিয়াছিলাম। তোমরা যে যা পার করিও। তোমরা এখানে আসিলেই তো আমার সঙ্গে থাকা হইবে। আজিও আমি উহাদের আছি। আমার উপর কাজের যে দায়িত্ব আছে, উহা ওখানে থাকিয়া পালন করিতে পারিব না। উহাদের মধ্যে থাকিয়া জনসাধারণের কাছ হইতে টাকাও নিতে পারিব না ইত্যাদি বলিলাম।···

২৯শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি আসিয়াছিলে অযাচিতভাবে। ওগো ভগবান পুরুষোত্তম আমার, অনন্ত স্নেহ ও ক্ষমায় তুমি আমাদিগকে পালন করিয়াছিলে। তুমি আসিয়াছিলে ধরা দিতে, আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। তোমার স্নেহ ও ক্ষমার গৌরব ও মাধুর্য কি আমরা বুঝিয়াছি, তাহার মর্যাদা কি আমরা রক্ষা করিয়াছি? ছোটখাট মান অভিমানদ্বারা তোমাকে জ্বালাপালাই করিয়াছি। সে কি আমরা করি নাই? তোমাকে যেন আমরা পাইয়া বসিয়া ছিলাম। তুমি তো খোলা প্রাণে ভার নিতে চাহিয়াছিলে। পোড়া ছাই, সে ভারই কি আমরা দিয়াছি? ভার দিলে জীবন আজ ভার বোধ হইত না। তোমার আদরে আমাদের মাথা খারাপ হইয়াছিল, spoilt child-এর মত এ আব্দার ও আব্দার করিয়া শুধু জ্বালাতনই করিয়াছি। কি লজ্জা! তুমি কত বড়, আর আমরা কত ছোট! সকালে দেবু আসে, অনেক কথা হয়—মানুষ-ভজন ভাগবত-কামের স্বরূপ। তখন দুইটি বাবাজী (সহজিয়া সম্প্রদায়ের) 'মানুষে'র মহিমা উচ্চারণ করিতেছিলেন, আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন ও দেবুর সঙ্গে আলোচনা শুনিতে লাগিলেন।···

৩০শে সেপ্টেম্বর

জাগো নারায়ণ শ্রীনিতাগোপাল, মহাসমাধি নিদ্রা হইতে সর্ব্ব সমাধানমূর্তিতে রক্তপ্লাবিত, সর্ব্বদগ্ধ প্রপীড়িত এই বিশ্বের বুক চিড়িয়া, সকল দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি মথন করিয়া। কাম-বিষে জর্জ্জরিত এই বিশ্ব; জাগো মদনমোহন দিব্য মথন। বিশ্ব-জীবনে স্ব-ছন্দ কাম তাঁহার নাম সমাহিত প্রবাহ ছড়াইয়া পড়ুক, বিশ্ব সুস্থ হউক, বিশ্বের নরনারী বিকৃত কামের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রাসলীলা আস্বাদনে আপ্যায়িত হউক।·· যাহাদের সহিত এক দিনেরও সম্পর্ক, তাহাদের আমি ছাড়ি না...এ দেশে মা'দের সম্বন্ধে ভাবিয়া আকুল হই। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া রাধারাণীর শ্রীচরণে উপহার না দিলে কি পুরুষোত্তম পাইব? প্রেম সস্তা, আসক্তির কি মূল্য? নিতাগোপাল আমার যথা সর্বস্ব। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিছু যেন না চাই। প্রায় ৯টায় শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন।···

১লা অক্টোবর

ওগো বিশ্বনাথ নিতাগোপাল, তোমার বিশ্বে তোমার বিশ্ব-জীবন তোমার বিশ্ব কর্মকে জীবনে বরণ করিয়া দাঁড়াইব। বিশ্ব-মানবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই আমার জীবন-ব্রত। ওগো বিশ্ব, আমাকে তোমার বুকে স্থান দাও, আমি তোমার ধূলিস্পর্শে পবিত্র হইব। জাতি-কুল-শীলের বন্ধন ছিঁড়িয়া মুক্ত জীবন-প্রবাহ শ্রীরাধা-জীবনে জীবন মিলাইয়া আমি ছুটি

—ইহাই আমার সাধনা। ৯টার পর কুসুম আসিয়া উপস্থিত।...আসিল না, সে আসিবে না, কালই তাহার মায়ের কাছে বলিয়াছে। আমি চিরদিনই সব কিছুর বাহিরে ছিলাম। আজ তো বিশেষভাবে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, আমার উপর আর দাবী কিসের? আমি মানুষের পিছু পিছু প্রাণ খুঁজিয়া ছুটিয়াছি। তবু কি পাইলাম? আজ একরূপ নিঃসঙ্গ। সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। পরে আনন্দবাজার হইতে 'মহাত্মা' এই সম্পাদকীয়, কমলা-কান্তের আসনে মহাত্মাজী সম্বন্ধে লেখা, আইনষ্টাইন-পার্লবাক, রবীন্দ্রনাথের মহাত্মাজী সম্বন্ধে প্রবন্ধের অংশ-উদ্ধৃতগুলি পাঠ হয়।...মানুষের দাবীর হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্যই কি ঠাকুর তরুণোদয়ে গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন? তাহাতেও কি রেহাই ছিল? তবু কিছুটা তো রক্ষা। আমি ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। কি জীবন দাবী!

৮ই অক্টোবর

গীতাপাঠ আরম্ভ

তুমি আত্মা, তুমি সর্ব, তোমাকে ঘর করিয়া পাইবার জন্য কতই না খুঁজিয়াছি। দেবাসুর হইয়াছি, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ হইয়াছি, স্বর্গ নরক পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি। তুমি সর্ব হইয়াও সর্বাতীত আত্মা। তোমাকে প্রবৃত্তির পথে খুঁজিয়াছি, নিবৃত্তির পথেও তোমাকে খুঁজিয়াছি। কূল তো পাইলাম না। তাই জীবনপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, কোথায়ও স্থিত হইতে দিলে না? তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।... কুসুমকে ব্যাকরণ কৌমুদী ও ইংরাজী ট্রানস্লেশান বই হইতে পাঠ দেই। নিশ্চিন্ত হইয়া এইবার ঠাকুরের সেবা করিতে বসি। আরতির পর মাঝখানের দালানে বসিয়া পাঠ আজ হইতে আরম্ভ হয়। এইখানে পাঠ হইলেই পাঠের dignity থাকে। আফিসে হইলে কোনও লোক আসিলেই তাহা বন্ধ করিতে হয়। একটা কঠিন করিয়া চলিতে হইবে, নইলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না।...কুসুমকে আগে পথঘাট চিনাইতে হইবে...পথঘাট না চিনিলে চলিবে কি করিয়া? মাসের জিনিষপত্র যতদূর সম্ভব এক সময়ে কিনিয়া রাখিতে হইবে। খুচরা জিনিষের জন্য বারবার বাজারে যাইতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। সময়, শক্তি বাঁচাইয়া কৌশলে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই জন্য চাই শৃঙ্খলা। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলার মত চলিতে হইবে।...রেণুকে পাড়ার কিন্তর নিজ জীবন ও আলাপ-আলোচনাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যাহা ঐ বাড়ীতে বসিয়া সত্যব্রত আদিয়া করিতে পারে নাই। ৯টার পর শুই, ৪টার পর উঠি।...

৩রা অক্টোবর

জীব স্বরূপতঃ আত্মা ও বিশ্বরূপ, সে নিজের জীবনে ভিতরে ও বাহিরে ইহাই আস্বাদন করিতে চায়। তাই সে বিশ্বময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া নিজ আত্মস্বরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে চাহিতেছে, কি তাহার আকুলি, কি তাহার ছুটাছুটি! সৃষ্টি যে তাহাকে করিতেই হইবে বিশ্বনাথকে তাহার জীবনে। তুমি আমি-নর-নারায়ণ দুই সখা, সাথী, বন্ধু, শরণ। তুমি সুহৃৎ, তুমি স্বামী।...রেণু বাহির হইয়া পি, এম্, জি,-তে যায়, দরখাস্ত দিয়া আসে। পরে মন্থর গতিতে, পোস্ট অফিসে, পরে আশ্রমে গিয়া আমার হাতের লেখা উপনিষদের ও গীতার বাকী অংশগুলি ফিরিয়া নিয়া আসে। এখানে পৌঁছায় ১১টার পর। ৪টায় উদ্বোধন পড়িবার জন্য উষাদিদী, কুসুম, প্রতিভাকে লইয়া আমার ঘরে বসিয়াছি ও কিছুটা পড়িয়াছি, তখন দেবু ও বাদল গঙ্গোপাধ্যায় আসে। বাদলবাবু প্রণাম করিতে চাহেন, আমি বুকে টানিয়া নেই, বলি—হৃদয় তো সব চেয়ে নিরাপদ ও উত্তম স্থান। প্রচলিত ভাষ্যগুলির ঐতদেশিকতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাদলবাবু সমাজের বর্তমান অবস্থার জন্য পোড়ায় শাস্ত্রের ভাষ্যকে দায়ী করিতে চান না। ব্রহ্মচর্যের বর্তমান রূপ কি হইবে, ইহা নিয়া আলোচনা হয়। তিনি বলেন, উহা absolute, আমরা বলি উহা relative। অনেকক্ষণ কথা হয়। তাহাদের যাওয়ার পর বীরু ও জিতু ভাগিনেয়দ্বয় আসে। সঙ্গে সঙ্গে আসে অমিতাভ, কিছু পরে বিমল।...তাহারা চলিয়া যাইবার পর ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়—ঠাকুরের রামদাস বিশ্বরূপ

দক্ষিণা প্রভৃতিকে সন্ন্যাস দান লীলা। লেখক লিখিতেছেন, ঠাকুর ভগবদ্দেব প্রবর্তিত অবধূত সম্প্রদায় স্থাপন করিবার জন্যই সন্ন্যাস দান করিলেন। আমার কাছে যে ঠাকুর আর এরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। ইহারা যাহা বলেন ও বোঝেন আমি তো ঠিক তাহা বুঝি না। নিত্যগৌরবানন্দ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমার চিন্তাপ্রণালী আমাদের চেয়ে অনেক ব্যাপক বলিয়া তোমাকে ঠিক স্বজাতীয় মনে করিতে পারি না। সত্যই ঠাকুরকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া মনে করি না। তাঁহার সম্প্রদায় হইবে অসাম্প্রদায়িক সর্ব-সম্প্রদায় সমন্বয়। ৯৷৹ টার পর শুই।

৪ঠা অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন আমাকে আত্মসাৎ করুক। আমি তুমিময় হইয়া যাই। মানুষ আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখুক, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাক, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁক। এমন করিয়া তোমাকে বহন করিবার সৌভাগ্য ও অধিকার দেও। কি উপায়ে তোমার অবধূত সম্প্রদায় দাঁড়াইবে? আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তোমার সম্প্রদায় কেমন করিয়া তোমার জনদের দ্বারা রক্ষা পাইবে! তুমি তো জড়-অজড় সমন্বয়মূর্তি। তোমার সম্প্রদায়ের আর কেহ কি জড়ের প্রাপ্য মূল্য দিতেছেন? তাঁহারা তো অতীতের পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। তাহা হইলে তুমি আসিলে কেন? আমাকে তোমার করিয়া লও।...৪৷৹টার পাঠ আরম্ভ হয়। দেবু, দেবুর কাকা, শিশির, রবীন এবং মেয়েরা আসে। গীতার আরম্ভে দেওয়া হয়—শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা পদের ব্যাখ্যা করা হয়। 'শ্রোণ্যত্রবিপুষ্টম্' শ্লোকটী বলা হয়—'সর্ব্ববাদিসিদ্ধপ্রতিরূপশীলম্'—শ্রীকৃষ্ণই প্রাণপুরুষ।...ব্রহ্ম-মায়ার সম্পর্ক ভগবানের তত্ত্বে কিরূপ এবং ব্রহ্মতত্ত্বে কিরূপ তাহা সকালে খাইতে বসিয়া ঊষাঙ্গিনী প্রতিভা ও কুসুমের কাছে বলা হয়।... ঠাকুর তখন আচার্য শঙ্কর ও ভর্তৃহরি বনিয়া গিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু উহাই কি তাঁহার সবখানি কথা এবং সর্বশেষ কথা? তাহা হইলে সর্বসমন্বয়ের দশা কি হইবে? নরনারী ধর্মের সমন্বয়ও কি তিনি স্থাপন করেন নাই?

৫ই অক্টোবর

ঠাকুর, আমি যতখানি তোমার জীবনে মহানির্বাণ লাভ করিব, ততখানিই আমি তোমাকে পাইব, তোমার বাহিরে আমার নামরূপের কোনও মূল্যই নাই। তুমি বিশ্বের L.C.M., বাসুদেব। তোমার ভিতর এক ও বহু দুই-ই পারমার্থিক, তোমার ভিতর বুদ্ধ ও শঙ্কর সমন্বিত। বুদ্ধের মতে 'স্থিরত্বাধিভ্রান্তিঃ অবিদ্যা', আর শঙ্করের মতে স্থিরত্বাধির জ্ঞানই বিদ্যা। তুমি নিত্য-অনিত্য সমন্বয় বিধান করিয়া দুয়ের মধ্যে একত্বতা স্থাপন করিয়াছ। তুমি আমার জীবন বল্লভ, বিশ্ব জীবন বল্লভ। বেণু ১১টার পর এন সি ঘোষ, মন্মথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে। ২টায় ফেরে। 'ঘোল আনার দেশ' কার্তিক মাসের প্রবন্ধ বেণু শেষ করে। শিশির আসে 'উজ্জ্বলভারত' সাইন বোর্ড লইয়া, দুয়ারে ঝুলাইয়া দেয়।...আমি ঠিক করিয়াছি, আমি একটু স্থির হইতে না পারিলে আর দায়িত্ব নিব না। আমার প্রাণ তো অবুঝ। বুদ্ধি আমার নাই। যে প্রাণ লইয়া আমি দায়িত্ব নেই সে প্রাণের মর্যাদা দিয়া তো মানুষ চলে না। অথচ তাহাদের চলার উপর আমার দায়িত্ব পালন নির্ভর করে। এখানে একটু দাঁড়াইয়া নেই, তাহার পর দেখিব। দায়িত্ব যে অনেক বড়, সে সামর্থ্য আমাদের হয় নাই। ইহা মিনুকে জানাইতে বলিলাম। সে কোথায় কি সাহায্য পাইবে তাহা চিঠি লিখিয়া স্থির করুক। শিশিরকে বলি, তোমরা আস, জল তুলিয়া দেও, কত কি জিনিষ দেও। আমি কি দিব? দিতে পারি জীবন-দর্শন যা আমি শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতে পাইয়াছি। আমি যাব-কথা কথা লিখি না, তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাকে শিখাইয়াছেন। ঠাকুরের কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করার কথা বলি। আমি ঋণী হইতে পারিব না। যদি তোমরা পুরুষোত্তম-দর্শন না নেও, আমাকে কিছু দিও না। আমার পুরুষোত্তম কৃতজ্ঞ। কেহ পায়ের পাতা তাঁহার জন্য বিছাইলে তিনি হাঁটু সমান জলে নামেন। আমি তাঁহারই আশ্রিত। রাত্রি ১২৷৹টার পর উঠি, আর

ঘুম হয় না। রাধারাণী, আমার আবেদন অনুকূল কর। তোমার পুরুষোত্তমের সেবার জন্য ধন দেও, জন দেও। আমি তো বেশী খাই নাই, পরি নাই। আমি ভোগ করিতে জানি না। বিশ্লেষণেরও শেষ নাই। বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে ঘুরেই সরাইয়া দিতেছি কি? যাহারা কাছে থাকিতে চায় তাহারাও কি শেষে চলিয়া যাইবে আমার বিশ্লেষণের ভয়ে? না, আর না।

৬ই অক্টোবর

শ্রীরাধারাণী, শাস্ত্রে সাধুসমাজে লোক-ব্যবহারে নিন্দিতা নারী-প্রকৃতির ব্রহ্মময়ীর মর্যাদা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিলে, আমার জীবনের আঙ্গিনায় আসিয়াছিলে অযাচিত ভাবে। কে মেয়েদের আদর করে? সেই মেয়েদের চাহিয়াছিলাম নিন্দিতা ধিক্কৃতা নারীদের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে, পারিলাম না তো রাধারাণী। কেন আসিয়াছিলে আমার মত ধনহীন জনহীন সহায়হীনের কাছে? মেয়েরাও বুঝিল না তাহারা কত ছোট সমাজ-ব্যবস্থায়। আমি তো চাহিয়াছিলাম আদর দিতে, ব্রহ্মমূল্য প্রদান করিতে। তাহারাই কি আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিল? কি আমি করিব? ছেলেরা তো আসিল না। যে ২.৪টী মেয়ে আমার কাছে আছে, তাহাদিগকে আর বিশ্লেষণের মধ্যে ফেলিয়া দুঃখ দিব না, বিপন্ন করিব না। তাহারা তো মানুষ হইতে চায়। আমি বড় অধৈর্য, তাই তাহাদের দুঃখ দেই। সকাল হইতেই বেশ বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই প্রভিডা বাজার করিয়া আনে। কোনও প্রয়োজন ছিল না। বেণু ১৷৷০টার পর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে চেক জমা দেয়, সেখান হইতে বই নিয়া আসে। উদ্বাস্তুদের রেশন কার্ডও নিয়া আসে। কেবল না পারার কথা শুনিলে মানুষের পক্ষে আগুয়ান অসম্ভব হয়। উহাও তো negative। তবে আমি যে প্রাক্-এর background-এ এই সব ভুল ত্রুটি ধরাইয়া দিতে চাই, তাহা বুঝিলে negative আর negative থাকিত না। Negative তখন রস যোগাইত। কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়তো আমার নাই। যতদূর পারিব মিষ্টি করিয়া বিশ্লেষণ করিব। সেবা লইব, অথচ ভুলত্রুটি চলিতে থাকিবে, ইহা তো আমি সহ্য করিতে পারিব না। ইহাতে যে exploitation হয়। আমি কি তাহা পারি? সত্যিই তো ইহারা সব ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়াছে—'যা মা তখন দুর্দ্দিন গৃহশূন্যানাং সংবৃত্তা', আমি তাহার সাধুকৃত্য কেন না করিব? ঠাকুর এই সুরে সুরে মিলাইয়াই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা কত ভালবাস, আমি তো তোমাদের ভালবাসিতে পারিলাম না'। প্রেমের সাধ কি মিটে? ৪টার পর প্রভিডার সঙ্গে সঙ্ঘগঠনের কথা হয়। একটা কঠিন করিতেই হইবে। নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চরকায় সুতা কাটিবে, সুধা প্রভৃতিকেও টানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ২টা ৩টা উজ্জয়িনীর পাঠের বন্দোবস্তও করিতে হইবে। আজ রাত্রিতে ঘুম হইয়াছে। সারাদিনই এবম্প্রকার বৃষ্টি ছিল, রাত্রিতেও।

৭ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি ধরা দিয়াছিলে, কিন্তু আমরা তো ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি তোমার অহৈতুকী প্রেমের টানে আমাদিগকে আদরে যত্নে সংসারের উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিয়াছিলে—ইহা সবই সত্য। কিন্তু তুমি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ আকর্ষণ বাস্তবতঃ প্রত্যাহৃত হইবার ফলে সংসার পাইয়া বসিয়াছে। আমরা তো চিনি নাই তোমাকে, জীবনের সর্ব বৃত্তিকে সমন্বিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোমাকে সেখানে রাখি নাই। আজ আর তোমাকে সেই রূপে পাইব না। আজ তোমাকে বিশ্ব-সঙ্ঘ গড়িয়া, বিশ্বের প্রতি কণার মধ্যে ঘর্ষণ স্থাপন করিয়া মন্থন করিয়া তোমাকে রসঘনরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিব।·· তোমাকেও বিশ্বপুত্ররূপে গড়িয়া তুলিব। এখানের আশ্রমকে, শক্তি-সমন্বয়কে ছন্দোবদ্ধ সুশৃঙ্খল করিয়া তোমার প্রকাশের ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিব। সঙ্ঘরূপে তোমাকে পাইলেই আবার সত্য করিয়া পাওয়া হইবে। ৮৷৷০টায় নীলুর বোন কমলার বাসা হইতে দুইটী ছেলে আসিয়া খবর দিল নীলুর আজ অপারেশান। বেণু তখনই বাহির হইয়া যায়। ১১৷৷০টার পর অপারেশান হয়। সেখান হইতে মুখার্জী এণ্ড কোং-তে এন্, সি ঘোষের নির্দ্দেশমত কাগজের খোঁজ করে।··· ৮ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি পুরুষোত্তম, প্রকৃতির মর্যাদাদাতা তুমি। তোমার 'সিদ্ধান্ত-দর্শনে' তুমিই না লিখিয়াছ, মায়া যদি নির্মল ব্রহ্মকে মলিন করিতে পারে তবে তো মায়া ব্রহ্ম হইতেও বড়। ঠিক তেমনি নারী যদি অনাসক্ত পুরুষকে আসক্ত করিতে পারে, তবে নারী তো নরের চেয়েও বড় হইয়া পড়ে। 'আসক্ত' করা কি কম যোগ্যতা নাকি? আসক্ত ব্রহ্মই ব্রহ্মঘন পুরুষোত্তম, অনাসক্ত ব্রহ্মে জীব-জগতের কি প্রয়োজন? আর সৃষ্টিই কি তাহাতে সম্ভবপর হয়? তুমি যাথার কুরে নারী সাজিয়া রাই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলে। আমি তোমার শরণাগত। তোমার পথে আমার যাত্রা সফল হউক, আবেষ্টন বিশুদ্ধ হউক, নির্মল হউক। সকাল হইতেই বৃষ্টি। খিচুড়ী যাত্রা হয়…। ৯॥০টার পর রেণু বাহির হইয়া মেডিক্যাল কলেজে যায়, নীলুর সঙ্গে কথা হয়।…মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাইবার জন্য আমি ও রেণু রওয়ানা হই। … ৫-৪এ সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া বালীগঞ্জ আসি … রাস্তা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, আমরা জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করিয়াছি।…

১ই অক্টোবর

ওগো বরণীয়, আমি আমার সকল দেহপ্রাণমনবুদ্ধি অহঙ্কার দিয়া বরণ করিতেছি। তুমি আমার দেহের বর, প্রাণের বর, মনের বর, বুদ্ধি অহঙ্কারের বর। কিন্তু আমার সব কিছু যে রিক্ত। কোনও ঐশ্বর্য্য তো আমার নাই। কাঙ্গালিনী আমি, তাহা দিয়াই নিরাভরণা আমি তোমাকে বরণ করিতেছি। এস আমার সকল সত্তায়, ওগো 'সহজা' সহযোগী। একই প্রেমযোগে মৈথুনযোগে তুমি আমি যোগী, যেন অর্দ্ধনারীশ্বর। একই রসসত্তার তুমি আমি দুই দিক; তুমি আমি নর-নারায়ণ, যুগযুগের যোগেশ্বর। তোমায় আমার নমস্কার। 'তুভ্যং মহ্যম্ নমো নমঃ'।…-এর হাতে কিছু নাই, মাহিয়ানাও পাইবে না যতদিন হাসপাতালে থাকিবে। কে তখনকার খরচ যোগাইবে? কি আর ইহাদের বলিব? আমার এখানে ঘন ঘন যাতায়াত থাকিলে আমি জোর করিয়াও কিছু রাখিতাম। ইহাদের বুদ্ধিতে ভবিষ্যতের সংস্থান করার কোনও কিছু ভাবনা নাই।…সন্ধ্যার সময় আভা আসে।… এটার পর 'সুদর্শন' হইতে 'গোপগৃহে শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধ পাঠ হয়, সামনের বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলাটি থাকেন, আমি ব্যাখ্যা করি। প্রায় ৭টায় ঘরে আসে।…

১০ই অক্টোবর

শ্রীনিতাগোপাল, তুমিই আমার জীবনের, বিশ্ব জীবনের পরম অর্থ। তোমার ভিতরেই বিশ্ব অর্থবান, সার্থক তোমার বাহিরে বিশ্ব অর্থহীন, নিরর্থক। তোমাকে না পাইলে, তুমি ধরা না দিলে আমি কি আমার অর্থ, বিশ্বের অর্থ, কামের অর্থ, নরনারীর আকর্ষণের অর্থ, 'একোঽহং বহু স্যাম্'-এর অর্থ, গীতা উপনিষদের অর্থ বুঝিতাম কেন মানুষ সংসার লইয়া এমন উন্মাদ তাহার পরম অ কি আমি বুঝিতাম যদি না তুমি তোমার cosmo politan পাদস্পর্শ আমাকে না দিতে? বিশ্বের যাবতী কিছুর divine value তোমারই শ্রীচরণ-স্পর্শে আ বুঝিয়াছি। আমাকে আস্বাদন করিতে দেও, ধন্য কর তোমাকে ধরার মাটিতে ধরার আবার গড়িয়া তুলিব ৭টার পর আভা ও হিমানী আসে "সন্ধ্যার পরই নলিনী বাবু উকীল ও সন্তোষনাথ কর আসেন। কিছু পরে দেবু আসে। বর্ত্তমানে যুবক-যুবতী সমস্যা, হিন্দু-মুসলমা সমস্যা, ধর্ষিতা নারীর সমস্যা, সাধনার ক্ষেত্রে activit method ইত্যাদি বিষয় আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হয় প্রায় ১ ঘণ্টার উপর। ইহারা খু আগ্রহের সঙ্গে শোনে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বমা সমস্যাগুলির সামাধান মূর্ত্তি।…ঠাকুরের জীবনী পা হয়।…

১১ই অক্টোব

পুস্তক পরিচয়

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (শ্রীশ্রীরাসলীলা) : শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। মূল্য কুড়ি টাকা ; প্রকাশক : তারকনাথ সমাজদার, সন্ধ্যা ভবন, ৭৭নং রাজেন্দ্রদত্ত রোড, বাটগাছি, কলিকাতা ২৮। পৃষ্ঠা ২৬০।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (শ্রীশ্রীরাসলীলা) পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ: অধ্যায় হইতে ৩৩শ: অধ্যায় পর্যন্ত পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী কৃত ভাবার্থ-দীপিকা-টীকার সহিত লেখক কর্তৃক আলোচিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। পুস্তকের বিষয়-বস্তু অতীব নিগূঢ় ভাবোদ্দীপক, সৃষ্টি তত্ত্বের মূল রহস্য নিহিত রহিয়াছে যাহার ভিতর, লেখক সেই শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্বঘন মধুর রাসলীলাকে অতি সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণের নিকট পরিবেশিত করিয়া দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তক খানিতে ভাবানুযায়ী স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বিলাসকে সন্নিবেশিত করায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণভাবাপন্ন ভক্তগণের চিত্তে অপার আনন্দরস সঞ্চারিত করিবে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গীতা, উজ্জ্বলনীলমণি, গীত-গোবিন্দ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতির শ্লোকগুলি উপযুক্ত স্থানে স্থাপনা করায় পুস্তকখানি খুবই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক হইয়াছে।

জীবের সহিত ভগবানের যে কত নিকটতম, কত নিবিড় সম্পর্ক এবং শ্রীভগবান যে মানুষকে পাইবার জন্য, ভালবাসিবার জন্য কত ব্যাকুল তাহা লেখকের লেখার ভিতর দিয়া বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ভক্ত সাধককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'তোমার কাছেই এই আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধূলার পৃথিবীতে নরবপুরূপে আসিলেন—স্বয়ং অসঙ্গ হইয়া বিশ্বের বিহীন হইয়া জীবকে ভালবাসিতে এবং জীবের ভালবাসা গ্রহণ করিতে। যে আত্মা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে ছিলেন—যিনি অধোক্ষজ, যাহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া না, সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা প্রেমময় মূর্তি ধরিয়া এই ধরণীতে আসিলেন। যাহাকে কোন প্রকারেই পাওয়া সম্ভব ছিল না, তিনি স্বয়ং আসিয়া ভক্তকে দেখা দিলেন—'আত্মেবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণঃ', কারণ এই বৃন্দাবনেই অধোক্ষজ পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র তাহাই নহে—প্রেমময় রূপ ভক্ত-হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন সফল করবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। ভগবানও মানুষকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং ভালবাসিয়াছেন ও ভালবাসা পাইয়া নিজে আনন্দ পাইয়াছেন।'

আর একটি জিনিষ লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা রাসক্রীড়ার মূল তত্ত্ব। মানুষ শুধু ভাবের ক্ষেত্রে ভগবানকে পাইলে তাহার পাওয়ার স্বাদ মেটে না, তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া হয় না। জীবের যে 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগতের এই সকল ইন্দ্রিয় দিয়া সেই অখিল পুরুষটিকে আস্বাদন করিতে না পারিলে তাহার যে পাওয়া হয় না, তাহার কাছার যে নিবৃত্তি হয় না। এই ভাবে তাঁহাকে পাইতে হইলে শ্রীবৃন্দাবনের গোপিনীগণের প্রেম অনুসরণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। সকল ইন্দ্রিয় দিয়া, সকল অঙ্গ দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। লেখক এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—'ওহে সাধক! আজ রাসলীলা আরম্ভ হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিলেন—জীবের সঙ্গে রমণ করিতে মনন করিলেন। কেবল মাত্র মনে মনে ইচ্ছা করিয়াই প্রেমঘন লীলা-বিগ্রহ ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি সক্রিয় ভাবে সেই

পরমানন্দময় ভাবকে বাস্তব রূপ দান করিলেন।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কাম-বীজে পূজা করা হইয়া থাকে অর্থাৎ সকল কামনার সকল কর্ম্মের যে বীজ তাহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই ভালবাসিতে হইবে, এই বীজ উৎসর্গ করাই হইল অবিদ্যার মূল দহন করা'। 'ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণকাম আত্মারাম শ্রীহরিও মানুষের ভালবাসার ভিখারী হইয়া নরবপু ধারণ করিয়া মানুষের নিকট অতি ব্যাকুলভাবে বলেন—আমাকে ভালবাস—আমার বুকে আসিয়া আমার ভালবাসার পিপাসা মিটাও। তাই তো দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি প্রেমদী শ্রীশ্রীরাধারাণীকে বলিতেছেন—ওগো! তোমার অভিমান ত্যাগ কর—অহমিকা দূর কর—আমাকে ভালবাস—তোমাকে ভালবাসিতে দাও।' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমস্ত আত্ম সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া শুধু তাঁহার সেবা করিয়া যাইবে, ইহাতেই মানুষের পরম পুরুষার্থ লাভ, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। লেখকের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

কামের যে একটা বিশুদ্ধতম, উচ্চতম রূপ রহিয়াছে তাহাই বৃন্দাবনের রাসলীলায় প্রেম নামে আখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ পতঙ্গের মত কামানলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কে এই মরণোন্মুখ বিশ্বকে রক্ষা করিবে? শ্রদ্ধা সহকারে এই রাসলীলার তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে জীবের যে কামরূপ হৃদ্‌রোগ তাহা অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া পরমানন্দময় শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমরস হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে। আমাদের শ্রীগুরুদেব পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ বলিয়াছেন—যদি কোন দিন কালগর্ভে এই ভাগবত গ্রন্থখানি লুপ্ত হয়, কিন্তু ভাগবতের এই রাস পঞ্চাধ্যায়টুকু থাকিয়া যায় তাহা হইলেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম ধরার বুকে থাকিয়া যাইবে। রাসলীলাই বিশ্ব জীবনের সকল সমস্যার একটি তত্ত্বঘন সমাধান। এই গ্রন্থখানি বহু প্রচারিত হউক ইহা আমরা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করি: বইখানি অবয়বে একটু বেশী বৃহৎ হইয়া গিয়াছে লেখকের পক্ষে উপায়ও বিশেষ ছিল না মনে হয়। এতো লেখকের ভক্ত-হৃদয় নিজেকে উৎসারিত করিয়া দিতে উৎসুক, তদুপরি লেখকের কবি-হৃদয়ও। তাই তাঁহাকে একটু বেশীই নিজেকে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তা লেখকের নিজস্ব গদ্য বা পদ্যও যেমন শ্রুতিসুখকর, উদ্ধৃতিগুলিও তো বটেই। তাই বইটির অবয়ব যদিও প্রথম ভীতি জন্মায়, তবু কৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন মানুষ সহজেই উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে মনে করি।—শ্রীপ্রতিভা রায়।

একটি ঝরা পাতা

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

অন্ধ মন ঘুমিয়ে ছিলো
একটি ঝরা পাতা—
জাগিয়ে দিল
ভরিয়ে দিল
অমিত সুখ দাতা!
ঘুম ঘুমুর শৈশবের
পরশ দিল মনে
চমকে জাগা মন
পেল অরূপ ধন
আজকে অকারণে।
শালশিরালের কোলে কোলে
একটি শিশু গাছ
কি অপরূপ রূপে
হায় গো চুপে চুপে
হারিয়ে যাওয়া শৈশবে মোর
ফিরিয়ে দিল আজ!
উঠলো ঘনিয়ার বাধা
বিস্মরণের গোপন কপাট খুলে
অবাক হয়ে ভাবি
মনের স্মৃতির চাবি
কে বা আমার এমন করে
রেখেছিলো ভুলে?
কেমন করে বলতে পারো
ভুলে ছিলেম আমি?
স্বপ্ন মেদুর রংয়ে বিভোর
আলো ছায়ার দিনগুলি মোর
মূল্য যাহার আমার কাছে
জীবন হতেও দামি!
এই কি তবে সত্য জীবনের
বিস্মরণের খেলা
নিত্য হাটের হট্টগোলে
মানুষ বুঝি নিজের ভোলে
যায় না জানা, যায় যে কেটে
জীবন নাটের বেলা!
আজ অবেলায় হাতছানি দেয়
কোন্ সে দামাল মেয়ে
সুদূর মাঠের বুকের পরে
পল্লীমায়ের আপন ঘরে
ফিরিয়ে পাওয়ার হারিয়ে পাওয়ার
আনন্দে গান গেয়ে!

হে রাজরাজেশ্বর

॥ শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ॥

বিশ্বজোড়া সভাস্থলে আসন তোমার পাতা,
ওগো সকল রাজার রাজা,
সকল পিতার পিতা।
ঊর্ধ্বে নীল গগনতলে
লক্ষ তারার মুকুট জ্বলে,
সুনীল সাগর দোলায় কালের
ঢেউএর মানিক গাঁথা।
বনবিতান মর্মরিয়া বাজে তোমার বাঁশী,
নগশিখর উদ্ভাসিয়া ঝরে তোমার হাসি।
বসন তোমার কৃষ্ণা রাতে,
দিকরাঙানো শুভ্রা প্রাতে,
শ্রাবণক্ষণে, ফাগুন বনে,
বজ্র, মধুর গাঁথা।

সাময়িকী

পণ্ডিত নেহরু ঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর ইহজগতে নাই। ২৭শে মে ১৯৬৪ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১) মৃত্যু এমন একটী প্রাণ হরণ করিয়া নিল, যাহার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ শত্রু মিত্র সকলেরই প্রাণটা একবার কাঁদিয়া উঠিবে। গত কয়মাস ধরিয়াই মৃত্যু তাঁহাকে কবলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু জওহরলালের প্রাণোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সহজে কাবু করিতে পারিতেছিল না। তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িলেও আবার সামলাইয়া লইতেছিলেন, ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীও এ সংবাদে কিছুটা সোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ সব শেষ হইয়া যাইবে, কে জানিত? মৃত্যুর কাছে সব প্রযোধন, সব বিজ্ঞান তুচ্ছ! জওহরলালের পর ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার কে হইবেন—এ প্রশ্ন কিছুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু এত শীঘ্র যে তাহার উত্তর দেওয়ার দরকার হইবে, তাহা জওহরলাল নিজেও বিশ্বাস করিতেন না।

জওহরলাল নাই—যে ফাঁকের সৃষ্টি হইল তাহা পূরণ করিবার ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষে দক্ষিণী বামী কাহারও আছে কিনা জানি না। সাধারণতঃ দেখা যায় এ ফাঁক সোজা পথে পূরণ হয় না—ক্ষতি বহন করিয়াই চলিতে হয়। তবে মৃত্যু যখন অপরিহার্যই তখন হয়ত বিশ্ববিধান ইহাকে কোন না কোন ভাবে পূরণ করাইয়া লয়। আমরা সমগ্রটুই দেখিতে পাই না বলিয়াই হায় হায় করিতে থাকি।

জওহরলাল কি ছিলেন, ভারতবর্ষের তিনি কতখানি উপকার করিয়াছেন, কতখানি ক্ষতি করিয়াছেন এ সব হিসাব নিকাশের পরেও নিঃসঙ্কোচে যে কথাটা বলিতে হইবে সেটা হইল 'এমন হয় না'। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন বলিতে হয় এমন হয় না—জওহরলালের সম্বন্ধেও তাহাই—এমন হয় না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটানা কর্মপ্রবাহ, জ্ঞানসাধনা, প্রীতির উৎস বহাইয়া একটা সার্থক জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই ধন্য তিনি। নিজ দেশ ও বিশ্ব-রাজনীতির আবর্তের মধ্যে তাঁহার আদর্শ, উদ্দেশ্য, সততা ও সত্যবাদিতা কখনও ধূলিসাৎ হয় নাই, ইহাই তাঁহাকে মহান করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম ও পরে প্রায় সতেরো বৎসর দেশের শাসনভার চালনার সংগ্রামে তিনি সব সময়ই যে নির্ভুল ছিলেন, এই দীর্ঘ সময়ে এত জটিলতার মধ্যে কোথাও যে তাঁহার ভুল হয় নাই, সে কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার সেবা বুদ্ধির কিংবা সততার কখনও অভাব হয় নাই—এইটাই সকলের অপেক্ষা বড় কথা, সকলের চেয়ে আনন্দের কথা, আশার কথা! বিদ্যাবুদ্ধি, সুযোগসুবিধা অনেকেরই থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ হইতে গেলে সব চাইতে দরকার সেবা-বুদ্ধি, সততা ও সত্যবাদিতার। জওহরলালের তাহা ছিল—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই তাহা ছিল। সেইজন্য অনেকে যে আশ্চর্য হয় যে হ্যারো আর কেম্ব্রিজে তৈরী এই মানুষটি কি করিয়া ভারতবর্ষের লোকের হৃদয় অধিকার করিল, সে কেবল এইজন্যই যে, জীবনকে তিনি তথা কথিত জোগের দৃষ্টিতে পরিচালনা করেন নাই, চাহিয়াছিলেন সত্য ন্যায় সততার পথে মানুষকে মানুষ হিসাবে দাঁড় করাইতে—দেশের ও বিশ্বের সকল মানুষকে, সকল দেশকে। এই সততা ও সেবা-বুদ্ধিই তাঁহাকে ভারতীয় করিয়া রাখিয়াছিল। এইজন্যই বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষা, বিজ্ঞান-বোধ ও শিল্প-চেতনা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সেবাই তিনি করিয়া গিয়াছেন—কল্যাণই তিনি করিয়া গিয়াছেন ভুল ভ্রান্তি যাহাই থাকুক না কেন। আর ভুল বাহির করিতে চাহিলে কাহার ভুল না পাওয়া যায়? আজ তিনি নাই—তাঁহার থাকার দ্বারা যাহাদের কাজের অসুবিধা হইতেছিল, তাহাদের সে অসুবিধা দূর হইল—আজ তাঁহারা আগাইয়া

আনিয়া দেশকে সত্য স্থায় ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করাইয়া দিন—সকলের নিকট এই আবেদন। জওহরলাল যাহা করিয়া গেলেন তাহা পরিমাপ করিতে দূরীর ব্যাপকতা প্রয়োজন, আমাদের তাহা নাই, তাই তিনি কি করিলেন না তাহাই আমরা দেখি, কি করিলেন তাহার নাগাল পাই না। শত শত বৎসরের পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাওয়াই তো সমগ্র দেশের সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাওয়া নয় কিংবা সব মানুষগুলির মানুষ হইয়া যাওয়া নয়। যে জাতির ব্যক্তি মানুষ নয়ে পাকটিও গৃহে সৃষ্টি করিতে নারাজ, জমি থাকিলেও যাহারা জনসাধারণের জন্য বুনিয়া একটা ফুল গাছ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি রাখে না, অথচ চায়ের দোকানে বসিয়া পরনিন্দা করিতে যাহাদের সময়ের বা শক্তির অভাব হয় না, সে জাতির গৃহে বসুন্ধরা পৌঁছাইয়া দেওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি শত শত বৎসরের পরাধীন একটা জাতিকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে বসাইয়া দেওয়াও কোন ক্ষুদ্র শক্তির কাজ নয়। তাই নেহরুর কাজের পরিমাপ করা আমাদের হ্রাস-দুষ্ট মনোবৃত্তিতে সম্ভব নয়। জওহরলাল তাঁহার দেশকে ভালবাসিয়াই যে কোন কাজ করিয়াছেন—নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যের মানুষ তিনি নন—এইখানেই তিনি অন্য হইয়া থাকিবেন। তিনি যে পথে চলিয়াছেন তাহার পরিমাপ করিবে ভাবী কাল। এখন তো অবকাশের সৃষ্টি হইল—নূতন পথে কাহারও বিচরণ করিবার যোগ্যতা থাকিলে তিনি আগাইয়া আসুন।

যাহা হউক, জওহরলাল নাই—জাতি রহিয়াছে, তাহাকে থাকিতেও হইবে। আমাদের জনসাধারণের যাহা প্রাথমিক কাজ সেদিনও ছিল, আজও আছে তাহা এই যে, ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অধিকতর যোগ্য হইতে হইবে, আমাদের কর্মকুণ্ঠা দূর করিতে হইবে, আমাদিগের চরিত্রে আরও নিষ্ঠানুবর্তিতা, আরও শৃঙ্খলা, আরও সঙ্ঘবদ্ধতা আনিতে হইবে, জাতির ছোটবড় প্রত্যেককে কিছু সৃষ্টি করিবার সংকল্প লইতে হইবে—বস্তু সৃষ্টি, কালচার সৃষ্টি। বিশ্বে ধনের অভাব নাই—অভাব বন্ধুর—অভাব কাল-চারের। সৃষ্টি করিতে না শিখিলে, কর্মকুণ্ঠা দূর করিতে না পারিলে, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে এতদিনে জওহর-লাল যদি আমাদের কিছু না করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আর তাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা হইবে না—এ কথা স্থির জানিতে হইবে।

জওহরলাল, হে মানব-দরদী, জাতি-দরদী, তুমি চলিয়া গিয়াছ—জাতিসত্তার ও বিশ্ব-প্রেমের যে শিখা জ্বালাইয়া গিয়াছ, আমরা তাহা অনির্বাণ রাখিব—এ সংকল্প লইবার ক্ষমতা আমাদের হউক, আশীর্বাদ কর।

একখানি পত্র ঃ বন্ধুবর অধ্যাপিকা মীরা রায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন, পত্রটি এইখানে প্রকাশ করিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

অনেকদিন আপনার নিকট পত্র দিতে পারি নাই, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ..

কিছুদিন যাবৎ 'যুগান্তর' কাগজে উদ্বাস্তুদের দুর্দশার কথা পড়িয়া পড়িয়া মন বড়ই খারাপ লাগিতেছে। আমি বা আমাদের ধরণের মানুষরা কি পন্থায়, কি করিয়া উদ্বাস্তুদের একটু relief দিতে পারি? আমি তো কিছু ভাবিয়া পাই না। আমাদের কলেজ হইতে প'চেত্তর টাকা, গোটা পঞ্চাশ বই ("বর্ণপরিচয়"। কেন না যে সব ঘুলুকে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হইতেছে সেখানে বাংলা পড়িবার সুযোগ বা বাংলা বই জোগাড় করার সুযোগ উহারা পাইবে কিনা সন্দেহ।) ৩৬টি মগ ও তিন বস্তা পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া ভারত সেবাশ্রমে স্বামী যোগানন্দের হাতে দিয়াছি। সেদিন কাগজে দেখিলাম প্রেসিডেন্সীর ছাত্রগণ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অর্থ বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই শোভাযাত্রা করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া street collection-এর পদ্ধতিটা মনে হয় যেন কার্যকরী হইবে। কিন্তু শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে সমাজের পরিচিত, বিশ্বাসভাজন, সম্মানিত, দায়িত্বশীল নাগরিক থাকিতে হইবে। প্রতি শহর, প্রতি গ্রামে গ্রামে স্থানীয় শিক্ষক অধ্যাপকগণ মিলিয়া মিছিল বাহির করিলে, দুয়ারে দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলে, অন্তত চক্ষুলজ্জায় লোকেরা যাহার কিছু না কিছু দিয়া পারিবে না, বিশেষত

ছাত্রদের অভিভাবকরা দিবেনই—শিক্ষক রিক্ত হাতে ফিরিয়া যাইবেন, ইহা ছাত্রদের লজ্জিত ও পীড়িত করিবে, তাহারা অভিভাবকদিগকে বন্ধমুষ্টি খুলিতে বাধ্য করিবে। তাছাড়া জনমত তৈরী হইবে, তাহা সক্রিয় হইয়া উঠিবে। মুখে মুখে একথা আশেপাশের জনপদে ছড়াইবে, যে gestureটি অনুকৃত হইবে। (অবশ্য হয় তো সবটি দুরাশা মাত্র। চারিদিকে যে নীতির নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য দেখিতে পাই তাহাতে খুব ভরসা হয় না।) লোকের মনে হইবে যে শিক্ষক-সমাজ পর্যন্ত যখন তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, there is something in it! লোকে কারণ খুঁজিবে বটে, কিন্তু এ সমস্যার যে নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে তাহা উপলব্ধি করে না। সরকারও জনসাধারণকে তেমন ভাবে অংশগ্রহণ জানান নাই ত্যাগ ও সেবার পথে আগাইয়া আসিতে যেমন জানাইয়াছেন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে। অথচ মাটি, পাথর, রক্তের চাহিতে প্রতিরক্ষা যেমন দরকার, অনাহার তৃষ্ণাকাতর শিশুকে বা লাঞ্ছিতা নারীকে প্রতিরক্ষণ দেওয়া তো তেমনি দরকার। শতগুণে বেশী দরকার। "মানা" প্রভৃতি transit camp-এ নিদারুণ জলাভাব, মাঘারাতি পর্যন্ত জলের কলের সামনে লিউ থাকে, প্রচণ্ড রৌদ্র সহিতে না পারিয়া জল-সংগ্রহকারীরা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শত শত শিশু অসহ্য গরম সহিতে না পারিয়া সকরুণ মৃত্যু বরণ করিতেছে। অথচ আমরা দিবা normal pursuits লইয়া ব্যস্ত আছি। আমোদ প্রমোদও চিরাভ্যস্ত ভাবেই উপভোগ করিতেছি। মুখের অন্ন বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে না!

বাছিয়া বাছিয়া এমন জায়গাতে উহাদের পাঠানো হইয়াছে যাহা একমাত্র সৈনিকদের bardihood শিকা দিবার পক্ষে উপযোগী; কোন্ পাপে ঐ কারবালা প্রান্তরে শিশুগুলিকে পাঠানো হইল বুঝি না। যোগানন্দ স্বামী আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, সে এমন গরম জায়গা তোমরা নিয়া টিঁকিতে পারিবে না। উহাদের সেবা করার পরিবর্তে নিজেরাই অসুস্থ হইয়া পরিবে। মানাতে কোন লোকালয় নাই। আমাদের একজন "মানা" হইতে কিছুদূরে অবস্থিত N.C.C. camp-এ টেন্টিং নিবার জন্যে গিয়াছিল, প্রথম দিনেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। টেন্টিং নেওয়া আর হয় নাই, অসুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য N. C. C. camp-গুলি মানা কুরুদ ইত্যাদি transit camp এর পরিবর্তে স্থাপন করা হয় না কেন? তাহাতে কাছাকাছি উদ্বাস্তুরাও রিলিফ পাইত, N. C. C.-র বালক বালিকাদেরও হাতে কলমে আর্ত্তত্রাণ ও সমাজ-সেবার অভিজ্ঞতা লাভ হইত। আজ বারবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথাই মনে পড়িতেছে। তিনি শিক্ষাকে জীবন-বিমুখ ছন্নছাড়া করিয়া তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না, দুঃস্থের দুঃখে সমবেদনা জাগ্রত হয় না, ও সে সমবেদনা সক্রিয় সেবা ও ত্যাগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে না, সে শিক্ষার কি দাম কে জানে। পিতৃমাতৃহীন অনাথ রেফিউজি শিশু পাঁচবৎসরের অনুকূল ফুটপাথে জীবন কাটাইত; একদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় লরী চাপা পড়িয়া তাহার জীবনান্ত হইল। এরকম কত অনুকূল আছে, আরো কত হইবে। যে সমাজ ঐ শিশুকে আশ্রয় দিতে পারিল না, adopt করিল না সে সমাজ না থাকিলে কি হয়: আচার্যদেব জীবিত থাকিলে তাঁহার দৃষ্টান্ত ও প্রেরণায় দলে দলে যুবক-সমাজ এই সমস্যার সমাধানে আগাইয়া আসিত, দলে দলে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া 'মানা' 'গেদে' 'পেট্রাপোল' 'হাসনাবাদে' ছুটিয়া যাইত। পুঁথিসর্বস্ব লেখাপড়া না হয় কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকিত। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন, নতুবা শিক্ষার আবার মূল্য কি।

ওখানে একটা টিউবওয়েল খুঁড়িতে না হয় হাজার টাকাই লাগিল! পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সহর হইতে যদি ১ হাজার করিয়া টাকা তোলা যায় তবে "মানার" জলকষ্ট অনায়াসে দূর হইতে পারে। সেই সঙ্গে টিউবওয়েল সংলগ্ন shade-এর ব্যবস্থাও করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক সহর হইতে ১০০০৲ বা ৫০০৲ টাকা তোলা—

এ কাজ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনে হয়? এ সমস্ত বিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।...

শ্রীমতী রায় আমাদের পরামর্শ চাহিয়াছেন। পরামর্শ দেওয়া সহজ নয়। সমস্যা জটিল! সরকারী প্রচেষ্টার আন্তরিকতার প্রশ্ন বাদই দিলাম—বেসরকারী প্রচেষ্টা যাহা হইতেছে তাহাও সমস্যার তুলনায় সামান্য। মানুষের দুঃখ দুর্দশা মৃত্যুর সামনে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়! তবু করিতেও কিছু হইবেই। মনে হয় বুদ্ধি বিবেচনাটাকেই এখানে বড় করিলে পথ পাওয়া যাইবে না—প্রাণ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে—সেই প্রাণের টানে সাধনের পথ খুঁজিয়া যাইবে। পথে পথে ঘুরিয়া অর্থ ও জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ যদি একটি ঘাঁটি অন্তত শিক্ষিত সমাজ করিতে নামে—তবে তাহা উত্তম দৃষ্টান্ত হইবে সন্দেহ নাই। কোনো ব্যক্তিই চিরদিন দেহে থাকিবেন না—আমরা পরবর্তীরেরা যদি আমাদের বুকের মধ্যে তাঁহাদের প্রেরণাকে ধরিয়া না রাখি তাহা হইলে সভ্যতার অর্থ কি হয়? যাহাদের করার কথা, টাকা ও লোকজন যাহারা এজন্য ঘাটাইতেছেন, তাহাদের যদি বিবেচনার ভুল হয়, প্রাণের দরদ না থাকে, এবং যে উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করার কথা, সেই উদ্দেশ্যেই সেই অর্থ ব্যয়িত না হয়—তাহার অধিকাংশ যদি পথেই খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেটা যে দুর্যোগ সে দুর্যোগ সকলের চাইতে বড়। আমরা আজ সেই দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়াছি। সেইজন্য আমরা অনেক কিছু করিতেছি বটে কিন্তু আয়োজন ও অর্থব্যয়ের অনুযায়ী কিছুই প্রায় হইতেছে না। উদ্বাস্তুদের ব্যাপারেও আমাদের এই চরিত্র-দোষের ফল ফলিতেছে। তাই উদ্দেশ্যের প্রতি যথার্থ সম্মান দিয়া পথকে যাহারা নির্দোষভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিবেন, এমন একদল যদি কাজ হাতে লেন, তাহা হইলেই তো জাতির তথা উদ্বাস্তুর বাঁচিবার পথ হয়। শিক্ষক-সমাজের নিকট হইতে আমরা এমনই কর্ম-পরিচালনা প্রত্যাশা করিতে পারি। তাই শ্রীমতী রায়ের মনে যে বাসনা উঁকি দিতেছে, তাহা লইয়া কেহ কেহ কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে চলার পথ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। একের সৎ ও নিষ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টান্তে অপরে শিখিবে—অপরেও সৎ ও নিষ্ঠাবান হইবে—ইহাই হইবে আমাদের পরম লাভ। বাঙ্গালা দেশের জলহাওয়ায় অন্যান্যের পক্ষে মধ্যপ্রদেশীয় অসহ্য উত্তাপ এই সকল উদ্বাস্তু শিশু বৃদ্ধ রোগীর মৃত্যু ঘটাইবে; ইহাদের পাঠাইবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল—সবই সত্য কথা। কিন্তু এই ঔচিত্যকে কার্যে পরিণত করিবে কে? সরকারী কর্মচারী তো মাহিনা লইয়া চাকুরী করে—তাহাদের সে তৎপরতা আনিতে তো জনসাধারণ তথা দরদী এক দল জনসাধারণের চাপ প্রয়োজন, সেই চাপ শ্রীমতী রায়ের দল সৃষ্টি করুন তাঁহাদের সততা ও নিষ্ঠাদ্বারা তবে বহু বড় কাজ হইবে। সর্বত্র যেখানে নানারকম সৌন্দর্য সততার অভাব, আত্মস্বার্থের ঐকান্তিক পুষ্টি, কর্মে ফাঁকি, সেখানে নিঃস্বার্থতার, সততার ও কর্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বল্প বা ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্বেশ্বরের কাছে, বিশ্বের ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিরাট শক্তি বহন করে। সেইখানে থাকে ভবিষ্যৎ সুস্থতার বীজ। তাই শ্রীমতী রায়, অধ্যাপনা বৃত্তি যাহাদের তাঁহাদের একত্র করিয়া তাঁহার চিন্তিত পথ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়া দিবেন—ইহাই আমরা আশা করিয়া থাকিব।

শ্রীহেমু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

কৃষ্ণকে কৃষ্ণির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, কৃষ্ণিহীন কৃষ্ণার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪।	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিতাগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাজয়ন্তী	৵০
৮।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	১০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১।০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৮।	অগণিত পত্রাবলী
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীযুতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির ভূমিকা	১৸০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৸০

শ্রীযুতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	৸৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	২৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৪৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৬৲

পুরুষোত্তম-মূর্তিমন্দিরে আলোচনা

নবনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

15 JUL 1964

"আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না যাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের টানে গোপীগণকে সহজ ও অনায়াসে (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রিয়ায় ও দ্রব্যে অদ্বৈত হইয়াই ভক্ত অতি দ্রুত দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান যুগ বর্ত্তমান ভজনের যুগ ইহাও তাঁহারই নির্দ্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প. বার্ষিক পাঁচ টাকা

Cover Printed by : Narayan Printing Works, 95, Narkeldanga North Road, Cal-11

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত
অদ্বৈত সমন্বয়।
সকল সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

CALCUTTA UNIVERSITY

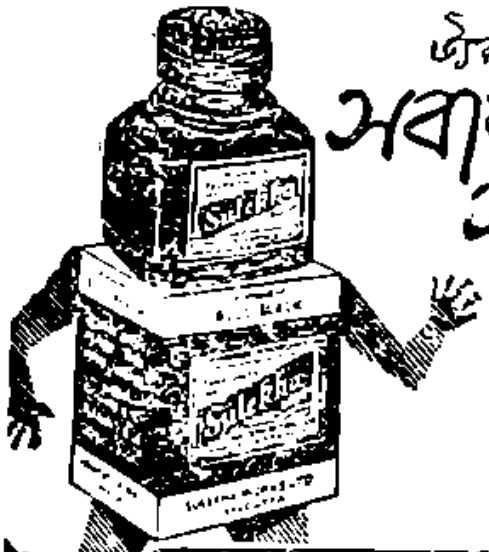

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয় তো বটেই কলমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডমল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' লিকিং ওয়াশ, 'পেনসল', স্ট্যাম্প পাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্বোয়াশ

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৫০ ও ৭০০ এম এল শাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৭০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতবাসীর নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর ইহা তাহাকে পথ দেখাইয়াছে। বর্তমান প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের যুগসন্ধিক্ষণে এই গীতা আমাদের কিভাবে পথ দেখাইতে পারে, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত গীতা-ভাষ্য তাহার খোঁজ দিবে। এই গীতাখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সর্ব সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

নরনারায়ণ আশ্রম

সূচীপত্র, আষাঢ়, ১৩৭১

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ১৩১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৮)
২। ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ... ১৪৪
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
৩। মুণ্ডকোপনিষৎ (অনুবাদ ভাষ্য সমেত) ১৫১
৪। ঈশ্বর দর্শন (কবিতা) ... ১৫৫
শ্রীবিমল চক্রবর্তী
৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৬২) ১৫৬
৬। সাময়িকী : নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষ ... ১৬৪

উজ্জ্বলভারত (মাসিক পত্র, ১৭শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। মনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট রাখবে।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬"×৮"।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে জীবনের একটি সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনীনগর
জি: ২৪ পরগণা

নরনারায়ণ আশ্রমে একটি চরকা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

উদ্বোধন

আষাঢ়, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩৮)

৩১. ৮. ৫৬।...পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়ন এনে দিয়েছেন। এই ওলোটপালটের কথায় ভাগবত ভর্তি। কয়েকটী শব্দ ভাগবতের খুব প্রিয়—সকৃৎ, সদ্য, অনায়াসেন (সুসুখম্ কর্ত্তুম্), অনায়াসেন···। এক কথায় ভাগবত ছোটর মূল্য স্বীকার করেছেন—ছোট সে কালেই হউক, দেশেই হউক, ধাতেই হউক—তবু তার একটা নিজস্ব মর্যাদা ও স্থান আছে...এটা পুরুষোত্তম-দর্শনে প্রথম মূল্য। বুদ্ধির কাছে খানির মূল্য—কত খানি? বহু বহু বছরের তপস্যা না হলে সে কি একটা তপস্যা? অসুখে ডাক্তার ওষুধ পথ্য...হৈ হৈ কাণ্ড···। ভাগবত এর উল্টো ··· দেবদ্রোহী বিশ্বদ্রোহী হউক—ভাগবত সদ্য সদ্য মুক্ত করে।...বেদব্যাস জিজ্ঞেস করছেন এমন কোন শাস্ত্র আছে যাতে সদ্য সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধ হয়? সে শুধু অল্প—এই ভাগবতে—শুদ্ধমূর্তিঃ তৎক্ষণাৎ।·· সকৃৎ পরিশীলনম্··· হেলায় শ্রদ্ধায় রাশি···তারস্বরে কৃষ্ণনাম। তবে আমরা যে কতবার নাম করিতেছি? না, আমরা বুদ্ধি দিয়া করি—তাই আমাদের অনেকবার লাগিবে—প্রাণ দিয়া করিলে একবারেই হয়।...রাম নাম তিনবার করিতে বলিয়াছিলেন বশিষ্ঠের ছেলে দশরথকে—শুনে বশিষ্ঠ রেগে খুন···একবার রাম নাম করলেই হবে।...অন্তমপক্ষে ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। আমির ভাষায় কথা কইলে বেশী স্থান কাল আয়োজন—গীতায় তা নেই—তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ। গীতা দেবযানও নয় পিতৃযানও নয়—আলো আঁধার না মিশলে কৃষ্ণ হয় না।··· এ দুয়ের মাঝখান দিয়েই কৃষ্ণ এসেছেন—নরহরি। বুদ্ধি এ ছিদ্রের খবর রাখে না—এ ছিদ্র প্রাণের—তারা এর নাগাল পাবে না—এক মিনিটে এখানে যা না হয় ত এক লক্ষ বছরেও হয় না—হলে এক মিনিটেই হয়—ভালবাসলেই তা হয়।·· কলিকালকে বুদ্ধিমানেরা নিন্দিত করেছেন—কিন্তু বৈষ্ণব বলেছেন ধন্য কলি, ধন্য ধরা··· প্রাণ আছে বলে মেয়েরা বড়···। সত্যযুগে ভাগবত ধর্ম ছিল না...। বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধে প্রাণ যখন শুকিয়ে গেল, তখন সে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ এলেন।···ছোট বলে কিছু নেই...গাছের প্রাণ বিষ্ঠায়, প্রস্রাবে, পচা ফেলে পুষ্ট হয়।···জগৎ যে মিথ্যা হল তার কারণ নোংরা পরিষ্কার ভাল মন্দের মার্কামারা ব্যবস্থা হয়েছে—আসলে 'গুণ দোষদৃষ্টির্দোষঃ গুণস্তূভয়বর্জিতঃ'।...শুদ্ধাচারকেও কৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নি...বর্তমান যুগ মহাভাগবত যুগ একবার নাম করলে যে হয় না তার কারণ আমাদের বুদ্ধি পুরাণো—এ বুদ্ধিতে জগৎটা যান্ত্রিক, mechanism... কিন্তু এতটুকু জায়গায় একটা এতটুকু কাঁটা ফুটে মরে কেন?—কেননা দেহটা organism—জীবন্ত... হোমিওপ্যাথিকের এক ফোঁটায় যদি অসুখ সারে, ভাগবত ধর্মের একবার মাত্র নামে জীবনের রোগ সারবে না কেন মনের অসুখ সারবে না কেন?···এতখানি আর এতটুকু

হুইই যায়া···শিশুর ছোট্ট হাসি দিয়ে সে সকলের উপর কর্তৃত্ব করে কেমন করে?...কৃষ্ণ এইখানে দাঁড়িয়েই বললেন—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং—যা কিছু দিয়ে হোক, যত ক্ষুদ্র দিয়েই হোক তাঁর অর্চনা করা যায়। ফল—সে কেমন ফল? সামান্য নিমু ফল দিয়েও তাঁর সেবা চলে। ছোট যে পূর্ণ···এই কথাই নিত্যগোপাল বললেন তাঁর অল্পও পূর্ণ থাকো...। বিভূতি ঐশ্বর্য—আত্মা ভগবানের বিভূতি···বিভূতির কাছে অশ্বত্থ—প্রাণের কাছে কচু শাক, অচ্যুত শাক যাহা খাইলে বাড়ে কৃষ্ণ-অনুরাগ (চৈতন্য ভাগবত)—তাহারা সব শাক ভালবাসে।... মানুষকে তিনি স্বীকার করেছেন বলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণেরা অন্ধ।...কৃষ্ণের এই দর্শনকে পাঁচ হাজার বৎসর পরে শ্রীনিত্যগোপাল সমাজ-জীবনে দিতে এসেছেন—তাই তো বলি যেই কৃষ্ণগোপাল সেই গৌরগোপাল সেই নিত্যগোপাল। ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম পৃথক—ছোটকে যিনি মানেন তিনি পরব্রহ্ম···ধূলি আজ ব্রহ্ম..অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ...নর-নারায়ণ আশ্রম এই কথা কইবে... যত তোমরা এইখানে এসেছ।

১, ২, ১৯৫৬।···কোন এক বন্ধু গতকাল রেণুর কাছে বলেছিল একশত বৎসর পরে নিত্যগোপালকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে কি আপনারা পারবেন? আজ একজন বলেছেন, আপনাদের পত্রিকার একটা ট্যাগার্ট আছে।...রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে পাল্লাপাল্লির মনোবৃত্তি ঠিক নয়। রামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল এক বৃন্তে দুটি ফুল—রামকৃষ্ণদেব মানুষের সত্যতার এক স্তরের প্রয়োজন মিটিয়েছেন, পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন মেটাবেন শ্রীনিত্যগোপাল। নিত্যগোপালকে দিয়ে সমাজ-জীবনের প্রয়োজন কোথায় তা ফুটে উঠতে একটু সময় লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিত্যগোপাল কিছু সত্যি নিয়ে এসেছেন,—কে কি পেয়েছে না পেয়েছে তা জানিনা, আমি সত্যি একটা কথা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি—পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় করে একটা সরল সামগ্রিক জীবন-ধর্ম—যেটা বর্তমান যুগের প্রয়োজন।···রামকৃষ্ণদেব সমন্বয়কে বর্তমান কালে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেছেন, শ্রীনিত্যগোপাল আরও খানিকটা এগিয়ে দেবেন।... শ্রীরামকৃষ্ণকে ছোট বললে বা তাঁর অবতারত্বে সন্দেহ করলে ঠাকুর নিত্যগোপাল গর্জে উঠতেন···। তবু বলি শ্রীরামকৃষ্ণ বেঁচে নিতেন—এ কথামৃতেই আছে। আর নিত্যগোপাল যা পেয়েছেন তাই নিয়েছেন, গোলাপ গয়লানীকেও স্থান দিয়েছেন।···রামকৃষ্ণ বলতাম, নিত্যগোপাল কৃষ্ণ।···কেদারবাবু বলতেন বড়ঠাকুর, ছোট ঠাকুর।...তিনি ডেকে ছিলেন—অবিশ্বাস করতে সাহস পাই নি—তর্ক করি নি—নির্বোধ আমি—প্রাণ যা হৃদয় আমার সম্বল—তাই একটা নূতন দর্শন পেয়েছি—তাই মানুষকে ডাকবার সাহস রাখি...। হৃদয়-সাধনার প্রথম বলি নিজের বুদ্ধিকে ভগবানের কাছে বলি দেওয়া ···লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যিনি কৃষ্ণগোপাল তিনিই গৌরগোপাল, তিনিই নিত্যগোপাল।...নিত্যগোপাল চলে যাবে—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বন্দেমাতরম্ গান লিখে যে, 'বন্দেমাতরম্ চলে যাবে'। কি চলাই চলল ভারতের মুক্তিসাধনায়...। হৃদয় যার নেই সে কোনদিন ভগবান পায় না।···ভক্তিবাদ অর্থ ভালবাসার কথা।···গুরুর শরণাগত হয়ে গুরুর স্নেহ বুঝবে, মায়ের স্নেহ মায়ের শরণাগত হয়ে পাবে।...ছেলের দল গোল্লায় গেল—স্কুল কলেজের ও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।···অভিভাবকেরা পথ হারিয়েছে বলেই ছেলের দলের এই অবস্থা···এই ছেলের দলকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না? অতীত চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান চিন্তাধারা বা পথচলার সামঞ্জস্যই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। নরনারায়ণ আশ্রম এইখানে পথ দেখাতে চায়···। সংযম আনতেই হবে জীবনে। কিন্তু বর্ণাশ্রমে যে চিন্তা নিয়ে যে পথে সংযম আনত—আজ সে চিন্তায় সে পথে নয়। পাপ-বোধ থেকে যে সংযম তা আজকের কথা নয়।...যাতে তোমার প্রয়োজন সেই, যা তোমার অবস্থার সাথে খাপ খায় না—তোমার ব্যক্তিগতও বটে, সমষ্টিগতও বটে—তা ব্যবহার করো না—উদ্বাস্তু মেয়েরা লিপস্টীক মাখে—কোনো মানে হয়?...উচ্ছৃঙ্খলতা কি অবস্থায় এসেছে।···। কেদারবাবু অশ্বিনীবাবুকে

বলেছিলেন—আর এ্যাপোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি—আজ চাই একটু sympathy—এই সহানুভূতি আজ ফিরিয়ে আনতে হবে সমাজ-জীবনে, পরিবার-জীবনে—...। নিজের বুদ্ধির বিচার চালাতে গিয়ে সহানুভূতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।... রাখালদাদা পাল কাঁদছেন—নিত্যগোপালও কাঁদছেন—যে ভগবান ভক্তের দুঃখে কাঁদতে পারে না তেমন ভগবানে আজ প্রয়োজন কি?—সহানুভূতি চাই...।

২.৯.৪৬...। এরই আগে আলোচনা হচ্ছিল সুকুমার রায়ের ছায়াবাজী কবিতা—আজগুবি নয় আজগুবি নয়... ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গায়ে ব্যথা সত্যিই হয়ে গেছে সকলের।...যার সাথে যুদ্ধ করছে মানুষ সত্যিই তা মিথ্যা, বাস্তবিকতা তার সত্যিই নেই।...বাস্তব বস্তু তাই-ই যা তাঁর মধ্য দিয়ে আমার কাছে আসে—আমার বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি যা সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বস্তুকে দেখে তা বাস্তব বস্তু নয়।...বস্তুকে আমি তাঁর মধ্য দিয়ে দেখব—তিনি আমার মধ্য দিয়ে দেখেন—'আমার চোখে লও যে কিনে তোমার সূর্যোদয়'।...ভাগবত বলছেন, প্রাণবুদ্ধি-মনঃ-স্বস্তদারাপত্যাপ্তধনাদয়ঃ। যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়াস্তাসন্ তদতোঽন্তঃ বঃ পরঃ প্রিয়ঃ।—আর একজনের মারফত এই এতগুলি বস্তু আমার প্রিয়, আর একজনের সম্পর্কে এসে এরা আমার প্রাণ, আমার সঙ্গে সম্পর্ক এদের গৌণ, আমার বুদ্ধির সঙ্গেও আমার গৌণ সম্বন্ধ। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মুখ্য—এই মুখ্যকে গৌণ করলে কিংবা গৌণকে মুখ্য করলে সব ছায়া হয়ে যায়। আমার ভগবান আমার প্রিয়, সেই প্রিয় ভগবানের প্রকাশ আমার মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকুই এরা আমার। আমার স্ত্রী যখন আমার, তখন স্ত্রী ছায়া—ভগবানের মধ্য দিয়ে না গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যদি আমি কাউকে পেতে চাই, অমনি সে ছায়া হয়। আমি আমি নই—আমি ছায়া; কিসে আমি কায়া হব?—আমার জীবনে নিত্যগোপালের প্রকাশ যা, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা, তাই কায়া। ...নিত্যগোপাল শিষ্যদের বলেছেন, তোমরা আমারই বিকাশ ..এই যদি আমি জানি, তাহলেই আমি মুক্ত।... তুমি দেখ তোমার বুদ্ধির ভাষা কি? কার প্রকাশ তার মধ্যে?...ঐ একটা শ্লোক ভাগবত থেকে আমি শিখেছি। ধন কি আমার? ধন বিশ্বের। তা না করে যখন ধনকে আমার বুদ্ধিগত করতে চাই (ধন কেন, যা কিছুকেই), তখনই সে ছায়া হয়...ছায়ার পিছনে ছুটলে গায়ে তো ব্যথা হবেই, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেও গায়ে ব্যথা হবে।...কৃষ্ণকীর্তিতে কীর্তিমান হতে চেষ্টা কর, কীর্তি তোমার ছায়া হবে না, তোমাকে তোমাবে না।...অর্জুনকে বুদ্ধি দেখাচ্ছেন—দদামি তে বুদ্ধিযোগম্ তোমার বুদ্ধি তো ছায়া...তার মধ্যে একটু আলো আছে—সেই আলোর সাহায্যে খুঁজে দেখ তাঁকে...ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ঃ ভবতি...আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ঃ ভবতি...। নিত্যগোপাল, এই তত্ত্ব তোমার কা থেকে পেয়েছি, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।...কে আমি তা চিনে নেব তোমায় দেখে—আমি ছায়া, তুমি কায়া... তোমাকে সাজাব—তোমাকে সাজিয়ে আমার আমিত্বকে আমি চিনে নেব—ছায়ার পিছনে ছুটব না...।

৪.৯.৪৬...। উপনিষদের ঋষি বিশ্বকে ডেকে বলছেন শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ... আমরা অমৃতের পুত্র—আমরা অমৃত। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি জানি সেই মহান্ পুরুষকে আদিত্যের মত ঝক ঝক করছে অন্ধকারের ওপারে—দ্বৈতবুদ্ধির ওপারে জীবের মনঃকল্পিত শুভাশুভ আলো অন্ধকারের ওপারে—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। সূর্যের আলো না হলে কিছু দেখতা না—ভগবানের আলো আছে বলে আমি আমি—বিশ্বে সব কিছু তাঁর পিছনে পিছনে—তিনি নেই কি নেই, সূর্য নেই বিশ্ব নেই।...আমাকে যদি বাঁচতে হয় তাঁর পিছনে পিছনে বাঁচতে হবে। পরশু এই কথা অন্য ভাষায় বলেছিলাম প্রাণবুদ্ধিমনআত্ম...।

ক্রমশঃ

ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

শিক্ষকের স্থান সকল দেশেই খুবই উচ্চে। ভারতেও শিক্ষকের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে, যদিও তাঁহারা আশানুরূপ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম নন। কিন্তু যে মহান কার্যে শিক্ষকগণ নিযুক্ত, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে। শিক্ষকগণ দেশ গঠন করিতেছেন, কারণ তাঁহারাই দেশের ছেলে-মেয়েরূপ মালমসলাকে উপযুক্তভাবে গঠন ও রূপায়িত করিতেছেন। আর দেশের ছেলেমেয়েরাই উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া দেশ ও সমাজ পরিচালনা করিতেছেন। এই দিক হইতে শিক্ষকদের স্থান খুবই উচ্চে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ যুগে ভারতের শিক্ষকগণ উপযুক্ত মর্যাদালাভ মোটেই করিতে পারেন নাই। স্বাধীন ভারতে অবশ্য সরকার ও তথা মানব সমাজের দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে।

ভারতে প্রায় বার লক্ষ লোক শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বার লক্ষ শিক্ষক সকলেই শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন। ইহার কিছু অংশ মাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষাবৃত্তি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি শিক্ষণ-প্রাপ্ত হন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে উৎকর্ষতা দেখা দিবে বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌দের বিশ্বাস। এই কারণে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমাদের দেশ অল্প কিছুদিন হইল মাত্র স্বাধীনতা-লাভ করিয়াছে। শিক্ষার সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বাধীনতালাভের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারই করিয়াছেন। অতএব শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য দেশে শিক্ষণের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাদের পরাধীন দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই।

ভারতে শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই শুরু হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। ঐ সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণের তিনটি ধারা আমরা দেখিতে পাই। যথা—ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার পড়ো দ্বারা শিক্ষাদান রীতি শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষা।

ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার পড়ো

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান রীতি ভালভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিলেও, ঐ রীতি যে তখনই সৃষ্ট হইয়াছে এমন নহে। ভারতে বহু পূর্বকাল হইতেই এই রীতির প্রচলন আমরা দেখিতে পাই। শিক্ষক বিভিন্ন মানের ছাত্রদের পড়ান। অতঃপর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শিক্ষক উচ্চমানের একজন ছাত্রকে দিয়া নিম্নমানের ছাত্রদের পড়ানর ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ভারতের এইরূপ শিক্ষাদান রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাদ্রাজের প্রধান যাজক ডাঃ বেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মাদ্রাজের অন্তর্গত এগমোরে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সেনাসমূহের অনাথ শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রমে শিক্ষাদানের জন্য সর্দার-পড়ো দ্বারা শিক্ষাদান রীতির অনুসরণ করেন। ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার-পড়োর দ্বারা রীতিকে ইংরাজিতে 'Monitorial System'ও বলা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকে একটি পড়া-শুনায় অগ্রসর ছাত্র। সেই অগ্রসর ছাত্রগণ নিজ নিজ দলের ছাত্রদের শিক্ষাদান করিত এবং তাহারা পরে শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের অগ্রগতির হিসাব দিত। Dr. Bell এই শিক্ষাদান রীতি সম্বন্ধে একটি পুস্তক

লিখিয়াছিলেন, পুস্তকটির নাম হইল 'An experiment in Education made at the Male Asylum at Madras, suggesting a system by which a School or a family may teach itself under the superintendence of the master or the parent'.

Dr. Bell এর এই শিক্ষাদানরীতি পুরাতন ভারতীয় শিক্ষাদানরীতি হইলেও ইহা ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। ঐ সময় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। এদিকে শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিক্ষার চাহিদা বেশী। এই কারণে ইংলণ্ড Dr. Bell এর monitorial system গ্রহণ করিয়া অগ্রসর ছাত্রদের দ্বারা নিম্নমানের ছাত্রদের পড়াইয়া শিক্ষাদান সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। Dr. Bell এর এই monitorial system সামান্য পরিবর্তন করিয়া এই পদ্ধতিকে নানা নামে অভিহিত করা হয়। যথা—Lancastrian plan, Glasgow plan, pupil teacher system ইত্যাদি।

ডেনমার্কের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেইসব প্রতিষ্ঠানে Dr Bell এর বা Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন নূতনত্ব ছিল না।

বোম্বাইতে The Bombay Native School Book and School Society নামে একটি সংস্থা ছিল। ঐ সংস্থা একটি সমিতি স্থাপন করিয়া বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উহার সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করিতে বলেন। ঐ সমিতি ঐ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি দর্শাইয়া ঐ সব ত্রুটি অপসরণ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশের মধ্যে শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষক-শিক্ষণের প্রস্তাবও ছিল। শিক্ষণ-কেন্দ্র সমূহে Lancastrian পদ্ধতি শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা ছিল।

মাদ্রাজে সার টমাস মুনরোর নির্দেশক্রমে মাদ্রাজে ১৮২৬ সনে শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এই সব প্রতিষ্ঠানেও Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকদিগের শিক্ষণ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই সকল বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এই সময় কয়েকটি সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে এলফিনষ্টোন ইন্সটিটিউশন, পুনা সংস্কৃত স্কুল এবং সুরাট ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা, আগ্রা, নীমাট, বেনারস প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে এক সুপারিশ করে। ইংলণ্ডের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়। যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক হইতে চান, তাঁহাদের বাছাইয়ের পর তাঁহারা সাময়িক বৃত্তির বিনিময়ে কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইবেন। সেই শিক্ষকগণ ঐ শিক্ষার্থী শিক্ষককে অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান দান করিবেন এবং সেইজন্য ঐ শিক্ষকগণ কিছু ভাতাও পাইবেন। শিক্ষার্থী শিক্ষক কিছুদিন ঐভাবে কার্যকরী জ্ঞান লাভ করিবার পর শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে। নির্দিষ্টকাল ঐ শিক্ষ-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শিক্ষাদানের সার্টিফিকেট লাভ করিবেন এবং তখন তাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাহিনায় নিযুক্ত হইবেন।

কিন্তু ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ হয় না। ১৮৫৯ সনের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে দেখা যায় যে ১৮৫৯ সনের পরে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেই সমস্ত

বিদ্যালয়ের জন্য নূতন সরকারী সাহায্যদানের নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষণ গ্রহণের চাহিদা দৃষ্ট হয়—এবং ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬ নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এই সমস্ত নর্মাল স্কুলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিক্ষণ লাভ করিতেন। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচী বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পূর্বে Lancastrian পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা হইত। এই সময়ে ১৮৪৪ সনের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষকদিগকে শিক্ষানবিশী করিবার সুযোগ দেওয়া হইল মাত্র।

যদিও ১৮৪৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তবুও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ডেসপ্যাচের প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে কিছু হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের Indian Education Commission এর পূর্বে ভারতবর্ষে মোটে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছিল—একটি ছিল মাদ্রাজে, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে; অপরটি ছিল লাহোরে, উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ছিলেন ৮জন গ্রাজুয়েট; আই, এ পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ ৩জন, এবং ১৮ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। লাহোর কলেজে ৩০ জন ছাত্র ছিল এবং তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আই পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার পাশের উপর। যদিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য ছিল, তবুও তাঁহারা একই পাঠ্যসূচী পাঠ করিতেন। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত কোন পাঠশালা শিক্ষাদান করিবার বিদ্যালয় (practising schools) ছিল না। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে শিক্ষকগণ ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে কতটা শিক্ষা করিয়া আসিতেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে সাতটি পুরুষদের জন্য এবং দুটি মেয়েদের শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল। শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫৩৩ জন। মধ্য প্রদেশে পুরুষদের জন্য চারিটি এবং মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশে এই জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও ৪৬টি নূতন নর্মাল ইস্কুল খুলিবার জন্য ১৪৬,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ শিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা নিয়া মতদ্বৈধতা দেখা গিয়াছিল। যাহারা শিক্ষণের পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা মন্তব্য করেন যে ভাল শিক্ষিত এবং বিষয় সমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা পাইলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার কোনই প্রয়োজন নাই। এই মতবিরোধের ফলে নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছিল। মাদ্রাজে ঐ সময়ে ৩২টি ট্রেনিং ইস্কুল ছিল, এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৯২৭। পূর্বে বলা হইয়াছে সমগ্র ভারতে নর্মাল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি এবং তাহাদের শিক্ষার্থী শিক্ষকশিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৩, ৮৮৬ এবং ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষকের ব্যয় হইত প্রায় ৪ লাখ টাকা।

১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষকশিক্ষণের জন্য ১০৬টি নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হইলেও ঐ সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য মাত্র দুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। ঐখানেও শিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ততার দাবী করা হয় বলিয়া ঐদিকে প্রসারও বন্ধ করা যায়।

শিক্ষক-শিক্ষণ (১৮৮২-১৯৪৭) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন অবশ্য উপরোক্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। কমিশন বলেন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী করিতেই হইবে।

কমিশন বলেন যে নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, ভারতের সর্বস্থানে ইহার স্থাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিশন এই সূত্রে সুপারিশ করেন যে সরকারী ও বেসরকারী নর্মাল ইস্কুলগুলি এমন ভাবে স্থাপিত হইবে তাহাতে স্থানীয় প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য যে টাকা খরচ হইবে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ টাকা হইতে বায় হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেন যে প্রত্যেক মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষানীতি এবং পাঠদানে দক্ষতা লাভ করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারূপে গণ্য হইতে হইলে তাঁহাদিগকে এই সব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। কমিশনের প্রস্তাবে ইহাও দেখা যায় যে যদি কোন গ্রাজুয়েট নর্মাল ইস্কুল হইতে শিক্ষানীতিতে ও পাঠদানে পারদর্শিতা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত যথার্থভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশ অনুসারেই শিক্ষক-শিক্ষণের উপর এতটা গুরুত্ব দেখা যাইতেছে। সরকারী শিক্ষা সিদ্ধান্তও (১৯০৪) শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বি এ পাশ (গ্রাজুয়েট) এবং বি এ পাশ নন (আণ্ডার গ্রাজুয়েট) শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। পাঠ্যসূচী ও শিক্ষণের ধারা এই দুই দিক দিয়াই পার্থক্য থাকিবে বলিয়া কমিশন সুপারিশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ছয়টি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও পঞ্চাশটি শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইয়াছে মাদ্রাজ, লাহোর, রাজামুন্দ্রী, কার্শিয়াং, অমরনগর এবং এলাহাবাদ।

ইহার পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, যে সমস্ত প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নাই, সেই সব প্রদেশে অবিলম্বে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং উহাদের উন্নতির ধারা ঐ সিদ্ধান্তে উল্লেখিত আছে। (১) উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাতসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চতর শিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের উপযুক্ত কর্মচারী হইয়া উঠিতে পারেন। (২) সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, ঠিক ততটা গুরুত্বই আরোপ করা হইবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ দানের জন্য শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর।

(৩) বি. এ পাশদের (গ্রাজুয়েট) শিক্ষণকাল হইবে একবৎসর সময় এবং শিক্ষণ শেষে সাফল্য লাভ করিলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবেন। পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্দেশ থাকিবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, শিক্ষানীতির অন্তর্গত শিক্ষাদানের কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং চিত্রকলা শিক্ষা ব্যাপারেও তাঁহারা কিছুটা বাস্তব কুশলতা অর্জন করিবেন।

যাঁরা বি. এ পাশ নন, অর্থাৎ আণ্ডার গ্রাজুয়েট তাঁহাদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা অন্যরূপ হইবে। তাঁহারা দুই বৎসর কাল শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এমন জ্ঞান লাভ করিবেন যেন তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাতে পরিণত হতে পারেন।

(৪) শিক্ষাদানের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উহার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবহিত হইবেন এবং এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাঠদান শিক্ষার জন্য প্র্যাকটিসিং ইস্কুল যুক্ত থাকিবে।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণকাল শেষের পর যাহাতে যে সমস্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি শিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ও বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষকশিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রদান—লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তিনি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বেশী করিয়া স্থাপন করিবার জন্য সুপারিশ করেন. কারণ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা শতকরা হিসাবে খুব কম ছিল। লর্ড কার্জন এই প্রসঙ্গে বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষণকাল দুই বৎসরের কম কিছুতেই হইবে না। লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান হইতেছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণের সুপারিশ। তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই আসিয়া থাকে কৃষিজীবীদের পরিবার হইতে, অতএব গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে লর্ড কার্জন কৃষি শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকশিক্ষিকাদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ গ্রহণের সময় কৃষি-শিক্ষা গ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

এদিকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ফলে বেশী সংখ্যক শিক্ষকগণকে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইতে দেখা যায়, পক্ষান্তরে সরকারও আরও বেশী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে শিক্ষণের জন্য আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হয় যে যদি কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদানের উপযুক্ত সার্টিফিকেট (শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত) না থাকে, তবে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে দেওয়া হইবে না। অবশ্য এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত করিতে হইলে বহুসংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার প্রবর্তন করাও সম্ভবপর হইবে না। সে যাহাই হউক সরকারী সিদ্ধান্তের সুপারিশ অনুযায়ী খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ দেখা যায়। ফলে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩তে গিয়া দাঁড়ায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা ছিল মোট ৬।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্ত হইতে একটি সুদূর প্রসারী ফল দেখা গেল। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, (২) গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ভিন্ন পাঠ্যক্রম ও ভিন্ন শিক্ষাকাল গৃহীত হইল এবং (৩) প্রত্যেক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সহিত পাঠদান সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য প্র্যাকটিসিং স্কুল খোলা হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষণের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন বলেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ বিভাগ খুলিবার জন্য সুপারিশ করেন। এই কমিশন প্রত্যেকটি শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি Demonstration School বা পাঠ প্রদর্শনীর জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা সুপারিশ করেন। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলিতে শুধু শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাই পাঠদান অভ্যাস করিবেন না, শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও এই বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠদান করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষা দিবেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১,২৫৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐসব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণদানের জন্য ৬৯৫টি নর্মাল স্কুল ও গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক

শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়ন করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁহাদের মাঝে মাঝে ছুটিপাঠ ও শিক্ষা-মূলক সভার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা শিক্ষণ সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ভাল ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কাজে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইয়া আসেন।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের পর হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখিলেই ঐ সময়কার শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিব। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতেই ঐ যুগের শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারা যাইবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১৯৩১—১৯৪৭*

প্রতিষ্ঠান	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭	১৯৪০-৪১	১৯৪৬-৪৭
শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	২৩	২৩	২৫	৩৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা	১,৫৮২	১,৭৭৯	২,২১৮	২,৪২৩
নর্মাল স্কুল, গুরু ট্রেনিং স্কুল ইত্যাদি	৪২৫	৩৩৪	৩৭৬	৩৩৮
শিক্ষার্থী সংখ্যা	২১,৮২৩	১৯,১২৪	২২,৪৩৫	২৩,৭৫৪
মেয়েদের নর্মাল স্কুল	২০৯	২০৫	২৩৬	১৮৯
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬,৯৪৫	৭,০৮২	৮,৮৯৬	১০,১৯৩

উপরের সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রচুর ছিল। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল ৪,৭৮,১৯৩। এই সংখ্যার শতকরা ৪৩ জন ছিল শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮·৭, এবং ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার হার ছিল শতকরা ৫৮·৫।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের অপ্রাচুর্যের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই পরিকল্পনাকে সমিতির সভাপতির নাম অনুসারে সার্জেন্ট পরিকল্পনাও বলা হইয়া থাকে। কমিটি বলেন যে যত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে, সেই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যে সব শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ মৃত্যু এবং অবসরজনিত খালি হইয়াছে, সেইসব পদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষাদান করা নাকি চলে না। নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষা দান ত দূরের কথা ইহা খুবই নৈরাশ্যজনক কথা, অর্থাৎ শিক্ষণ দানের

* The development of Modern India Education by B. D- Srivastava হইতে গৃহীত।

জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সেই সময় বিশেষ অভাব ছিল। অতএব কমিটি সুপারিশ করেন যে যথাসম্ভব শীঘ্র নূতন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও নূতন শিক্ষণ বিদ্যালয় অচিরে স্থাপন করিতে হইবে।

সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষণ ব্যাপারে অন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। কমিটি বলেন যে স্কুল ফাইনেল কোর্স শেষ হইবার মুখে উপযুক্ত সংখ্যক কিশোরে কিশোরীকে শিক্ষাদানে কার্যের জন্য বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহাদিগকে তখনই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন ফি গ্রহণ করা হইবে না, পক্ষান্তরে গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষাক্রম হইবে বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক এবং ঐ শিক্ষার্থীরা যেসব জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ করিবে, তাহাদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ (Refreshers Course) এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে বিদেশে গিয়া গবেষণা ইত্যাদি করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

কমিটি প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি গাঁথিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের ঐ সামান্য বেতন দিলে চলিবে না। কমিটি ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বর্ধিত হারে বেতনের সুপারিশ করেন এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের পারদর্শিতাগত মানের বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

কমিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার পারদর্শিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব সুপারিশ করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) সরকারী বা বেসরকারী যে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ঢুকিবার জন্য সর্বনিম্ন পারদর্শিতা হইতেছে প্রবেশিকা বা অনুরূপ পরীক্ষায় পাশ। ১৬ বৎসরের নীচে কেহ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

(৩) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের স্তরের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই গ্রাজুয়েট হইবেন।

(৪) নার্সারি এবং শিশুবিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষাদান করিবেন তাঁহারা সকলেই হইবেন শিক্ষিকা। কমিটি এই মতও প্রকাশ করেন যে ৮ বৎসরের নীচে যেসব ছেলে মেয়ের বয়স, তাহারা শিক্ষক হইতে শিক্ষিকার শিক্ষাদান দ্বারা বেশী উপকৃত হইবে।

(৫) প্রাথমিক, নার্সারি, শিশু বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাগ্রহণ-কাল হইবে ২ বৎসর। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদিগের শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের শিক্ষণকাল হইবে ১ বৎসর, ১৮ মাস হইলেই ভাল।

(৬) প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের (নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয়সহ) শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট আছে, তাহার এক তৃতীয়াংশ থাকিবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানসংক্রান্ত বিষয়গুলি জানিবার ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে স্থানীয় সাহিত্য, ভূগোল ইতিহাস জানিতে হইবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধৃত ভাষ্য সমেত

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দক্ষ কন্যা সিদ্ধার সন্তানই বৈশ্বদেব—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও আর্দ্রবাকে বিশ্বদেবা বলা হয়; ইহাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মই বৈশ্বদেব কর্ম্ম] অবিধিনা হুতম্ [অশাস্ত্রী রূপে আহুত] [সেই দুঃ-সম্পাদিত ও অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম] আসপ্তমান্ [ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি সপ্ত অথবা পিণ্ডদান সম্বন্ধে সপ্তম পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ যজমান-পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র] হন্তি [সেই অসমাপ্ত ক্রিয়া অগ্নিহোত্রীর] লোকান্ [লোক সকল] বিনস্তি [বিনষ্ট করে; লাভ হয় শুধু শ্রম ও হায়রাণ]: কোনও যজমানের সাধ্য নাই যে এতবড় জটিল, বহুদিন-সাধ্য ব্যাপার যথাবিধি সম্পন্ন করে; অথচ অকরণ জন্য অপরাধ পদে পদে। ইহার বার্থতা এইখানেই। যাহা প্রত্যক্ষাবগম নয়, যাহা 'কর্ত্তুম্' সুস্থখম্' নয়, যাহা অবাধ নয়, যাহা সম্পন্ন করিতে সকল দিকে বিরাট ব্যয়, যাহা অনায়াস নয়, তাহা সমাজে দীর্ঘদিন চলে না। তাই চলেও নাই। আসিয়াছে সকল ধর্ম্ম নিংড়াইয়া 'ধর্ম্মাং'—সর্ব্বধর্ম্মোপেত সহজ ভাগবত ধর্ম্ম। 'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচেৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেৎ ন পতেদিহ'।

যাহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পৌর্ণ মাস রহিত, চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্মশূন্য, শরৎকালীন কর্ম্ম বর্জ্জিত, অতিথিপূজা বিরহিত, যথা সময়ে আহুতিশূন্য, বৈশ্বদেব কর্ম্মহীন, অবিধিপূর্ব্বক আহুত, সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যজমানের সপ্তলোক হিংসা করে, নষ্ট করিয়া দেয়। ১।২।৩

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥ ৪

যজ্ঞের ঘৃতাহুতি গ্রাসের জন্য অগ্নির এই সাতটী লেলায়মান জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী। ১।২।৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ। ৫

এতেষু [এই সপ্ত জিহ্বার ভেদে] যঃ [যে হোত্রী] চরতে [কর্ম্মানুষ্ঠান করেন] ভ্রাজমানেষু [দেদীপ্যমান] যথাকালং চ [যে কর্ম্মের যে কাল সেই কালে] আদদায়ন্ [আদদানাঃ—যজমানকে বহন করিয়া] আহুতাঃ [আহুতি সকল] তং [যজমানকে] নয়ন্তি [লইয়া যায়] এতা [যজমান দ্বারা সম্পাদিত এই সকল] সূর্য্যস্য [সূর্য্যের] রশ্ময়ঃ [রশ্মি হইয়া] (অর্থাৎ রশ্মিদ্বারে) যত্র [যে স্বর্গে] দেবানাং পতিঃ [দেবতার পতি ইন্দ্র] এক [এক] অধিবাসঃ [অধিষ্ঠিত আছেন—সর্ব্বানুপর্য্যাদি বসতি ইতি অধিবাস]

দেদীপ্যমান উক্ত অগ্নিজিহ্বাসমূহে যে অগ্নিহোত্রী যথাকালে কর্মানুষ্ঠান করেন, সেই আহুতিসমূহ তাহাকে বহন করিয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারে সেখানে লইয়া যায় যেখানে দেবতাদের পতি ইন্দ্র বাস করেন। ১।২।৫

এহেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্যা
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ। ৬

এহি এহি ইতি [আসুন আসুন বলিয়া] তং [সেই যজমানকে] আহুতয়ঃ [আহুতিসকল] সুবর্চসঃ [দীপ্তমান] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ [সূর্য্য রশ্মিদ্বারা] যজমানং বহন্তি [যজমানকে বহিয়া আনে] প্রিয়াং [অভীষ্ট] বাচং [স্তুতিবাক্য] অভিবদন্ত্যঃ [উচ্চারণ করিতে করিতে] অর্চয়ন্ত্যঃ [অর্চনা করিতে করিতে] (কি কি প্রিয় বাক্য তাহাই বলিতেছেন) এষঃ [ইহাই] বঃ [আপনাদের] পুণ্যঃ [শুভ অদৃষ্ট] সুকৃতঃ [সু-কৃত মার্গ] ব্রহ্মলোকঃ [স্বর্গ প্রকরণ বিচারে এই ব্রহ্ম লোক আপেক্ষিক স্বর্গ] যাহারা বাহ্যি, বিচ্ছিন্ন 'আমির' খোঁচায় জটিল কর্মবাহুল্যের ভিতর দিয়া অগ্নির অগ্রগতির কৃপা পাইবার জন্য 'আলোর' পথে যতদূর পারিল আহুতি দিয়া চলিলেন, তাহাদের এই কৃত সু অর্থাৎ শোভন হইলেও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অযোগ্য; ইহারা গতির কৃপায় আলোর সন্ধান তো পাইবেই, কিন্তু কোন্ আলো? ঘনীভূত আলোর মেঘের সূর্য্য-রশ্মিসমূহ ইহাকে আগাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু কতদিন তাহাদের এই বৃহৎ লোকে স্থিতি? আমিই তো আমার লোকের স্রষ্টা; বিচ্ছিন্ন আমি যত বড় আলোরই খোঁজ করুক, সে স্বর্গলোক ছাড়া আর কোন্ অক্ষর লোক পাইবে? বিচ্ছিন্ন অহং-এর কর্মবহুল আলোর সাধনায় যে ব্রহ্মলোক মিলে, তাহা স্বর্গই।

'আসুন, আসুন'—এইরূপ আহ্বান করিতে করিতে এবং ইহাই আপনাদের শুভ অদৃষ্ট, সুকৃত এবং স্বর্গরূপ প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ও অর্চনা করিতে করিতে দীপ্তিমান আহুতিসকল যজমানকে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে বহন করিয়া থাকে। ১।২।৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি। ৭

প্লবাঃ [ভেলা] হি [নিশ্চয়ই] এতাঃ [এই সব] অদৃঢ়াঃ [অস্থির] যজ্ঞরূপাঃ [যজ্ঞরূপ, যজ্ঞ সম্পাদক] অষ্টাদশোক্তম্ [অষ্টাদশ ষোড়শ ঋত্বিক যজমান ও তাহার স্ত্রী] যেষু [যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া] অবরং [যথার্থ, পুরুষোত্তমার্থ যাহা নয়] কর্ম [কর্ম] উক্তম্ [শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে] এতৎ [এই যজ্ঞকে] শ্রেয়ঃ [শ্রেয় মনে করিয়া] যে [যাহারা] অভিনন্দন্তি [অভিনন্দন করে] মূঢ়াঃ [ঘনমোহে আচ্ছন্ন, ইহ অমুত্রে নানা দর্শনদুষ্ট] জরামৃত্যুং [জরা এবং মৃত্যু] তে [তাহারা] পুনঃ এব [পুনরায়] যন্তি [কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গে থাকিয়া প্রাপ্ত হয়]। প্রাণ-স্পর্শহীন পরস্পরে ভিন্নদৃষ্টি-সম্পন্ন আঠারো জন মিলিয়া সংসার সাগর পার হইবার জন্য অর্থাৎ ইহার সম্যক্ তত্ত্বলাভের জন্য যে ভেলা সাজাইয়া ভাসাইল, তাহা সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে জটিল-কুটিল স্রোতগতির মাঝে, বিপুল আবর্তের ঘূর্ণিপাকে কতদিন টিকিবে? কতদূরে তাহাকে লইয়া যাইবে? আঠারো জন আঠারো না হইয়া যদি এক হইত, আর সামনে থাকিতেন পুরুষোত্তম পাওয়ার যোগ্য ঘনরূপে, তবে বটে ভেলা দৃঢ় হইত, সংসার পার দেখা যাইত। অপার-পার পুরুষোত্তম না পাওয়া পর্যন্ত যে প্রতি মানুষকে আসিতে হইবে, যাইতে হইবে, এ যাত্রার বিরাম নাই। যখন সকল ঘটনার বুক নিংড়াইয়া একটে পাইবে, সেইদিন হইবে পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠার মাঝে সর্ব প্রতিষ্ঠা, সেই দিন প্রবৃত্ত হইবে গোষ্ঠলীলা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরীতম্
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা। ভাগবত

আদ্য, সুলভ, সুদুর্লভ, সুসঙ্গ, গুরু কর্ণধার এবং আমাদ্বারা অনুকূল বায়ু সংযোগে প্রেরিত এই মনুষ্য দেহরূপ ভেলা পাইয়া যেজন ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইল না, সে আত্মঘাতী। আঠারো জনের আঠারো বুদ্ধির জোড়াতালি দেওয়া ভেলা ও গুরুকর্ণধার পুরুষোত্তম কৃপায় প্রেরিত দেহের সার্থকতা বর্ত্তমান মন্ত্রের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে।

অষ্টাদশ পুরুষদ্বারা নির্ব্বাহিত যজ্ঞরূপ এই ভেলা অদৃঢ়, যাহার মধ্যে অযজ্ঞ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহাকে যে সব মূঢ় শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দিত করে তাহারা (কিছুকাল স্বর্গ ভোগের পর) পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১।২।৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৮

(আরও) অবিদ্যায়াম্ [বেদের বুকের মাঝে যে মৈথুন অর্থ রহিয়াছে, তাহা না বুঝিয়া বেদের শুধু 'বিবোধ' অর্থ বুঝিয়া নেওয়াই অবিদ্যা; এখন অবিদ্যার অন্তরে (মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ [অবস্থিত] স্বয়ংধীরাঃ [যাহারা নিজেরা কাহারও কাছে মাথা না নোয়াইয়াই স্বয়ং, এমন তথাকথিত ধীরগণ] পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ [আমরা নিজেরাই যাহা কিছু জানিবার জানিয়াছি, কাহারও কাছে কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় নাই, এইরূপ মননকারীর দল] জঙ্ঘন্যমানাঃ [বহু অনর্থ দ্বারা বারম্বার পীড্যমান হইতে হইতে] পরিযন্তি [পরিভ্রমণ করে, বিভ্রান্ত হয়] অন্ধেন এব [সম্যক্-দর্শন-সক্ষম চক্ষু যাহার নাই, সেই অন্ধ; সম্যক্ দর্শনই চক্ষুর সদ্বৃত্তি; এমন এক অন্ধ দ্বারাই] নীয়মানাঃ [পরিচালিত] অন্ধাঃ যথা [অন্ধদের ন্যায়, — পরিত্যক্ত [illegible]]

পুরুষোত্তম কৃপাবায়ুর প্রেরণা না পাইয়া, শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধাররূপে হালে না রাখিয়া যে স্বয়ম্ভূ স্বয়ং পণ্ডিতের দল যাত্রা সুরু করিল, তাহারা হয় গর্ত্তে পড়িয়া সেখানেই ডুবিবে, যদি কোনও সাধু কোনও দিন আসিয়া সেই গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে এই আশায় থাকিবে, নয়ত বা কণ্টকক্ষত হইয়া রক্তা-রক্তি হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে, সব পথ তাহার চক্ষুর সামনে হইতে মুছিয়া যাইবে, পরিপূর্ণ অন্ধকার আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে।

ভ্রমমোহরূপ অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত মূঢ়েরা—'আমরাই ধীমান্ এবং আমরা সব কিছু জানিয়াছি'—এইরূপ মনন-কারীরা বহু অনর্থদ্বারা পীড়িত হইতে হইতে অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় (পথ হারাইয়া) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ১।২।৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে। ৯

(আরও) অবিদ্যায়াম্ [অবিদ্যার মধ্যে] বহুধা [ভ্রম-মোহের বহু স্তরে] বর্ত্তমানাঃ [অবস্থিত] বয়ং কৃতার্থাঃ ইতি [আমরা কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ; কর্ম্মে একটী সাময়িক তৃপ্তি আছে, রস আছে; কৃতার্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ এখানে রহিয়াছে। কিন্তু এই কৃতার্থতা যে তাহার অপরিজ্ঞির বিপ্লব-গতিকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে এ হুঁস তাহার নাই। Construction সাধারণতঃ মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয়, অন্য কিছু দিয়াই সেখানের নেশায় মশ্গুল করিয়া দেয়, নড়িবার-চড়িবার নামও আর মনে আসে না।] অভিমন্যন্তি [অভিমান করে] বালাঃ [বালকের দল]। যাহারা বালক, অল্প দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা পরিজ্ঞির ক্ষেত্রে পরিজ্ঞির পাওয়াকেই সবটুকু মনে করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছে। যৎ [যেহেতু] কর্ম্মিণঃ [অপরিজ্ঞির পুরুষোত্তমার্পণ বর্জ্জিত

কর্ম আচরণকারীর দল] ন প্রবেদয়ন্তি [কর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব জানে না] রাগাৎ [বন্ধে রাগবশতঃ কর্ম-ফলে রাগবশতঃ ; কর্ম যখন পুরুষোত্তমার্পিত তখন সেই কর্ম পুরুষোত্তম-কর্মই ; পুরুষোত্তম বিশ্বরূপ বলিয়া সেই কর্ম বিশ্ব-কর্ম, সেই কর্মে যে ফল মিলিবে, তাহাও বিশ্বের ভোগের জন্যই। তাই পুরুষোত্তম বলিতেছেন—'মৎ কর্ম পরমো ভব' ; ইহা মানিলেই কর্ম-রাগ এবং কর্মফল-রাগ থামিয়া যায়। 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়' —'হে ধনঞ্জয়, কর্মসঙ্গ, কর্মফলসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যোগস্থ হইয়া কর্ম কর'—চাই পুরুষোত্তম-যোগ, পুরুষোত্তম-যোগে যোগস্থ হইলে সর্ব-যোগ সহজ ভাবেই মিলিবে। নইলে কোটি জন্ম মাথা খুঁড়িয়াও তাহারও সঙ্গে যোগ টিকিবে না] তেন [কর্মে এবং কর্মফলে রাগ থাকার ফলে] আতুরাঃ [কর্ম-পথে চলিতে অক্ষম আতুরের দল ; যাহারা কর্মের কিছু করিয়া, এক টুকরা কিছু করিয়াই সেখানে তাহা ভোগ করিতে বসিয়া গেল, কর্ম পড়িয়া রহিল, গতি রুদ্ধ হইল ; এই সব আতুরের দল] ক্ষীণলোকাঃ [কর্ম ভোগ ফুরাইয়া গেলে] চ্যবন্তে [চ্যুত হয়, পুনরায় 'কেঁচে গণ্ডুষ' করে]

অবিদ্যান্ধো বহুধা অবস্থিত বালকের দল "আমরা কৃতার্থ"—এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু কর্মিগণ রাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, সেই জন্যই এই আতুরের দল কর্মফল ভোগাবসানে চ্যুত হয়। ১।২।৯

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

ইষ্টাপূর্তম্ [ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি শ্রৌত কর্ম ; পূর্তের অর্থ যাগী কূপ তড়াগাদি স্মার্ত কর্ম] মন্যমানাঃ বরিষ্ঠং [ইহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন এইরূপ মনে করিয়া] অন্যৎ [অন্য] শ্রেয়ঃ [শ্রেয়ঃ সাধন] ন বেদয়ন্তে [জানে না] প্রমূঢ়াঃ [এই বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকে টুকরা টুকরা করিয়া বিবাদের ক্ষেত্র গড়িয়া, তাহাদিগকে পুরুষোত্তমাধিকার হইতে কাড়িয়া আনিয়া এক একটী লইয়াই দিনরাত মত্ত এবং প্রমূঢ়] নাকস্য [স্বর্গের] পৃষ্ঠে [কিঞ্চিৎ আলো আধানো কর্মফল স্বরূপ ভোগক্ষেত্রে] সুকৃতে [শোভন কৃতের ফল স্বরূপ] অনুভূত্বা [আস্বাদন করিয়া] ইমং লোকম্ [মানুষ লোক] হীনতরং বা [ইহা হইতেও হীনতর তির্যক লোক নরকাদি লোক] বিশন্তি [কর্মের ভোগ শেষ হইয়া গেলে যাহার যে স্থান উপযোগী সে স্থানে প্রবেশ করে] কর্মের ক্ষেত্র পরিচ্ছিন্ন ; কিন্তু উহাতে গভীরতা আছে, রস আছে। সেইজন্য কর্মী নিজের মনের অনুকূল ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া তাহারই গভীরতার মধ্যে রসের খোঁজ করে, সেখানে ডুবিয়া যায় ; কিন্তু তাহার কর্মক্ষেত্রের বাহিরে যে অন্যান্য কর্ম ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহারাও যে তাহারই মত সেখানের রস আস্বাদন করিতেছে, এবং সব কর্ম ক্ষেত্রেরই মিলিয়া মিশিয়া এক শ্রীক্ষেত্র রচনা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, এই সকল কর্মকে পুরুষোত্তম-কর্মে গড়িয়া না তুলিলে যে কর্ম-সমন্বয় হইবে না, কর্ম সকল দিকের বিচারে ব্যর্থ হইবে—এতখানি ব্যাপক দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র বিচরণকারী কর্মীর নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্র, ভাবের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন ; কিন্তু রসের ক্ষেত্র গভীর। কর্মের রস অবিস্তীর্ণ হওয়ায়, উহা বদ্ধন আনিয়া দেয়, নিজের মধ্যে একটা কৃতার্থতার ভাব (self-complacency) আনিয়া দেয়, যদি না তাহা ভাবের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হয়। পুরুষোত্তম ভাব-বন্ধন রূপ।

সংসার-প্রবন্ধ বালকের দল ইষ্টাপূর্তকে প্রধান মনে করিয়া অন্য কোনও শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না, তাহারা ভোগায়তন স্বর্গ পৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করিয়া এই মনুষ্য লোকে বা আরও হীনলোকে প্রবেশ করে। ১।২।১০

ক্রমশঃ

ঈশ্বর দর্শন

॥ শ্রীবিমল চক্রবর্তী ॥

শিখিয়াছি জনকল্যাণের ব্রত শিশুকাল হ'তে ;
কত প্রাণে মিশায়েছি প্রাণ। কত কর্ম করিয়াছি
নবীন উৎসাহে। সহসা আসিয়া কোথা হ'তে,
মনের সকল সাধ মিশাইয়া দিল ধূলি সাথে।
জীবনের চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে হ'ল প্রবাহিত।
জানিলাম মিথ্যা মায়া, মিথ্যা এ সংসার ;
কুৎসিৎ সংসারে শুধু নিত্য হাহাকার,
অনিত্য সংসারে শুধু মায়ার বাঁধন।
শুনিনু বিবেকবাণী, মিথ্যাময় এ সংসারে
আত্মমোক্ষ কোথা ? দেখিনু নূতন পথ।
অন্ধকার গৃহকোণে নিভৃতে নীরবে
কাটে বসি ধ্যানে জপে সারারাত্রি দিন।
ছিঁড়িলাম সকল মায়ার পাশ।
যেই মাত্র কর্ণরন্ধ্রে পশিয়াছে শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনি,
ছুটিয়াছি দেবালয়ে আত্মমোক্ষ লাগি।
কাঁদিয়াছি কত 'মাগো' ! দেখা দে এ
অধম সন্তানে, মুক্তি দে মা তোর মায়া হ'তে।
কিন্তু একি ? দেবালয়ে দেবমূর্তি কোথা ?
আঁখি মেলি যেই আমি চাহি মূর্তি পানে
দেখি শুধু ব্যথাভরা মানবের প্রাণ।
অবজ্ঞাত, অজ্ঞ, মূঢ় মানবের আঁখি
চাহিয়া কাঁদিছে আমা প্রতি
ডাকিয়া বলিছে মোরে, ওরে মূঢ় প্রাণ !
আমাদের ছাড়ি, কোথা তুই খুঁজিস ঈশ্বর ?
আমাদের দীর্ণশ্বাস পড়ে যদি তোর পরে
ভাবিস কি মুক্তি পাবি হেথা ?
আমাদের দুঃখ কর দূর ; নহিলে মুক্তির পথ
আরো বহু দূর।
সহসা পড়িল মনে স্বামীজির কথা —
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"
ফিরে আসি দেবালয় হ'তে,
বুঝিলাম ধ্যানে জপে মুক্তি নাহি মিলে।
আত্ম মোক্ষ মিলে শুধু জীবের সেবায়।
তাই আমি নিয়েছি এ ব্রত
"ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি
ধরার মানুষ হউক ব্রহ্মমানুষ।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৪০)

ঠাকুর, বিশ্ব আজ প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন। তুমি আমি দুই সখা সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছি নবীন সৃষ্টির নবীন বেদ বুকে ধারণ করিয়া। শুধু জল, শুধু জল—দেশ কাল ডুবিয়া গিয়াছে। নবীন সৃষ্টির গোড়ায় তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—নর-নারায়ণ।…আমি বিশ্ব-নরের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তোমার জীবনে জীবন লাভ করিব, ধন্য হইব। সার্থক হইব।…গীতাপাঠের প্রথমে বেণু উহার কিছুটা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাখ্যা করিয়া যাই। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেমন করিয়া জড় ও অজড় সমন্বিত হইয়াছে, তাহা সোৎকর্ষে ধারণ লীলার আলোচনা করি। 'যদা যদা হি ধর্মস্য' শ্লোকটি আলোচনা করিয়া বলি যে ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন যুগের সকল ধর্মগ্লানি তাঁহার জীবনে reflected হয় এবং সেখানে তাহার একটি সমাধান জমিয়া উঠে। তাই তিনি কাল ও পুরুষের সমন্বয় ভগবান। ঐতিহাসিক ভগবানই পুরুষোত্তম। সকল ক্ষেত্রের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান দিবার মত পুরুষ বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কে আছেন? বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া দার্শনিকদের মহারাসলীলা সংগঠিত হইবে। তাঁহার জীবন ও দর্শন সামনে রাখিয়া সংসারে চলিতে হইবে, তবেই সংসার সত্য হইবে।…মুক্ত হইয়াও সে ঐ স্থানের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু ঐ স্থানের কাছে সে ধরা পড়িয়াছে। পুরুষোত্তম দর্শন ও জীবন তাহার এই আসক্তি কাটাইতে পারে নাই। আমি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখি নাই, রাখিব না। পাঠের মধ্যে 'ধরিয়া রাখা' ও 'ছাড়িয়া রাখা'র আলোচনা হয়। দুয়ার আমার খোলা থাকিবে। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। গুরুগিরি আমি করি নাই, করিতে পারিবও না। প্রাণের অনেক কথা পাঠের মধ্যে হয়। ১২ই অক্টোবর

রাধারাণী, তুমি ভিখারিণীর মত আমার জীবন-দুয়ারে আসিয়াছিলে। তোমাকে কোথায় রাখিব? কে তোমাকে স্থান দিবে? জাতিকুলশীল ছাড়া তুমি, কে তোমাকে ঘরে নিবে? তোমাকে নিলে যদি সাধের ঘর ভাঙিয়া যায়! সকলের সব আছে—জাতি আছে, কুল আছে, শীল আছে; তোমার কিছু নাই। তাই তুমি অনন্ত কাল ঘরের বাহিরেই থাকিবে, পথেই থাকিবে। তোমার ঘর নাই, ঘর হইবে না। তুমি ব্রাত্য, পতিতা। পতিতাদের, অভিযুক্তাদের মধ্যেই স্থান হইতে পারিত। কিন্তু তাহারাই কি তোমাকে নিবে? কোথায় আমি তোমার স্থান করিব? আমি যে তোমাকে লইয়া বিব্রত। আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও, তোমার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব। আজিকার প্রার্থনায় সুধাংশু ছিল। কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া কিছু অর্থ সকল করিবার কথা তাহাকে জোর দিয়া বলি। 'মোহমুদ্গর' পড়িতে বলি! সংসার কি বস্তু সে সম্বন্ধে বেহুঁস থাকিলে বিপদ অনিবার্য। 'সংসার সত্য' বলিয়া কি সংসারের যা-খুসী তাই করিতে হইবে? সংসার তো বিপদ; ইহাকে নির্বিকল্পরূপে গড়িয়া না তোলা পর্যন্ত কি ইহার সঙ্গে খোলা প্রাণে যুক্ত হওয়া চলে, না যুক্ত থাকাই উচিত? আত্মরক্ষার কথাও ভাবিতে হয়। সে দিন কেহ আসিবে না যখন পা ভাঙিয়া ঘরে পড়িয়া থাকিবে—ইহাও বাস্তব সত্য। যমুনাকে বলিয়াছি, সে শোনে না, কেহই শোনে না, মালতী শোনে নাই। 'ভবিষ্যৎ' বলিয়া যে একটা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলেও সে ভীষণ মূর্তিতে আসিতে পারে, ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখে?…তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিপ্লবী রূপ, কিছুই না করা অথচ সব কিছুর আদর্শ-স্থাপন করার কথা, বৃন্দাবন মথুরা ত্যাগের কথা, ব্যাধের বাণে নিজ মৃত্যুর

কথা আলোচনা হয়। আরতির সময় সুধা দুইটি গান করে।

১৩ই অক্টোবর

নিতাগোপাল,…কত বৎসর হইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। কেউ তো আর তাকে না, খোঁজে না, আদর করে না। 'রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?' আজ তোমাকে সকল কর্মে, সকল অঙ্গনে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছি। তুমি কি আমার জীবনে বিশ্বজীবন নিংড়াইয়া আবার জন্মিয়া উঠিবে না? সকল অঙ্গের নিংড়ানে রসঘন তুমি আমার। আমাকে সার্থক কর। তোমার চরণ চাহিয়া চলিব, তোমাকে বুকে লইয়া তোমারই পথে আমাকে সৃষ্টি করিতে করিতে চলিব—ইহাই আমার প্রতি ক্ষণের আহুতি, তোমার জয় হউক।…তাহাকে 'স্বরাজ' পত্রিকা হইতে 'মার্কস্‌বাদ ও মায়াবাদ মহাসমন্বয় তত্ত্ব' প্রবন্ধটী পড়িতে দেই। উহা সকালে রেণু পড়িয়া শুনাইয়াছিল। সকালে সে আনন্দবাজারও পড়িয়া শুনায়। পুরুষোত্তম-দর্শন ও জীবন বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপায়িত হইলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে কি না, এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়।…মুকুলকে অনেক কথা বলি। তাহার রাধারাণীকে এখন তিন ভাবে পাওয়া ছাড়া গতি নাই। প্রথমে ব্রজের রাধারাণীরূপে, দ্বিতীয় বিশ্বের সমস্ত মেয়ের ভিতরে (শুধু পাবনার নয়), তৃতীয়তঃ গোপার ভিতর। আজ কি বিশ্বরূপের মাঝে নিতাগোপালকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনও রূপে তাঁহাকে পাইব? ইহাই তো গীতার আত্মতত্ত্ব। আমার এখানে আসিয়া কেহ মনে শান্তি না পাইলে আমার খুব বেদনা বোধ হয়। আমি তো মুকুলের ওখানে সকল দেহপ্রাণ ছড়াইয়াই বিশ্রাম করি। আমার এখানে সে তাহা পারিবেনা কেন?

১৪ই অক্টোবর

ওগো প্রাণ, মহা প্রাণ, বিশ্ব প্রাণ, প্রাণ-বল্লভ, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার যখন নিদ্রিত, তখনও তুমি জাগ্রত। মনবুদ্ধি যেখানে ঘুমাইয়া পড়ে সকল সমস্যার সামনে, তখন তুমি জাগিয়া থাকিয়া তাহার সমাধান কর। তুমি আমার জীবনে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত কর। আমি প্রাণময় হইব, মনবুদ্ধি আমার প্রাণের ভাষার কথা কহিবে। প্রাণ, তুমিই পুরুষোত্তম-মহিমা, তোমায় আমি আমার সকল সত্তা দিয়া বরণ করি। প্রাণমূরতি শ্রীরাধা, তুমিই আমি। আমার নিজ, আমার পরম রূপ তুমি, আমার সার্থক সফল রূপ তুমি।…বৈকালে 'সহজ মানুষে'র শেষ অংশ পাঠ করে প্রতিভা, আমি ব্যাখ্যা করি। মানুষ যে স্বর্গ-নরক, দেবযান-পিতৃযান, মানুষ-দেহ, পশুপক্ষী-দেহ ঘুরিয়া মরমী পুরুষের জন্য মধুচক্র রচনা করিতেছে, বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে যে মধুই রহিয়াছে, আলকাতরার মধ্যেও যে গন্ধ দ্রব্য (scent) রহিয়াছে, বিশ্বের সব কিছু যে ইঙ্গিতে তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে এবং এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেই যে জীবন সার্থক হয়, জীবনের সব-কিছু দিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া পাইবার জন্য যে তদুপযোগী জীবন যাপন করার জন্য আমি প্রাণপণ করিলাম, তাহা আলোচনা হয়। শান্তশীল দাশ তাহার এক বন্ধুকে গ্রাহক করিয়া ৪টাকা মনিঅর্ডার করিয়াছেন।…

১৫ই অক্টোবর

ওগো ঠাকুর, তোমার সঙ্গে দেখা আমার পথে। সেই হইতেই 'পথ' আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। তুমি আমার পথের দেবতা। তোমাকে লইয়া পথেই বসিয়াছি, অনন্ত পথিকের সঙ্গে দেখা কি হইবে না যাহাদের মধ্যে বসিয়া তোমার কথা বলিতে ও শুনিতে পারি, জীবনে তোমাকে জাগাইয়া তুলিতে পারি? তোমাকে কি নির্বিকল্প আমার জীবন নিংড়াইয়া ঘন করিয়া আস্বাদন করিতে পারিব না? দেখা দেও, ঠাকুর, বিশ্বরঞ্জনরঞ্জন, প্রাণ আমার, সর্ব আমার। তোমাকে না পাইলে কেমন করিয়া দিনের পর দিন কাটাইব? দিন যে আমার যায়। এস, দেখা দেও, বিশ্বরূপ আমার।…ডাঃ পুণ্ডরীকাক্ষবাবু, সুষমা তাহাদের কন্যাদের সহ আসে।…ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হয়, যাহা ওখানে থাকিতে হয় নাই। বর্তমানে যুগ-পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় আছে, সেই ভাবে ভাবিবার যোগ্যতাও আছে। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হইলে সারা হিন্দুস্থান পাকিস্থান হইবে—ইহা তিনি বলেন। উচ্ছলতাবত এই বিপ্লব আনিবার কথা বলিয়া

যাইতেছে বলিলাম। স্বামী স্বরূপানন্দের চিঠি (এক কুমারীর কাছে লিখিত) প্রতিধ্বনিতে বাহির হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে, সমস্ত পুরুষই সন্তান—ইহা মেয়েরা মনে করিবে। দাদা-মা'র কথা, কুমিল্লার আরও ২ জনের কথা সেখানে উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মচর্যের এই রূপ কি প্রকৃতি সহ্য করিবেন? নারীর রমণীত্বকে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে শুধু 'মা' হইতে হইবে—ইহা কি সম্ভব? রমণীত্ব কি এতই mechanical যে উহাকে দাবাইয়া রাখা সম্ভবপর? আগের ব্রহ্মচর্য চলিবে না। সেই জন্যই রাধার কথা আমরা বলি—ইহা বলিলাম। যাইতে বলিয়াছি, তখন হেমন্ত দাশ উপস্থিত কালীপূজার রাত্রিতে বেওড়াতলা শ্মশানে ৺অশ্বিনীকুমারের তিরোভাব উপলক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য। যাইব বলিয়া দিলাম।···

১৬ই অক্টোবর

জাগো নর-নারায়ণ মহা সমাধিনিদ্রা হইতে বিশ্ব মথন করিয়া। রক্ত-পাবিত ধরার বড় প্রয়োজন তোমার জীবন ও দর্শন দিয়া, তুমিই 'সর্ববাদবিবাদ-প্রতিরূপশীল'—সর্ববাদের প্রতিপাদ্য বিষয় তুমি। আমার দেহের স্বামী তুমি, প্রাণের স্বামী, মন-বুদ্ধি অহঙ্কারের স্বামী তুমি; তুমি-আমি 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে' আছি। তুমি আমার আমি। তুমি আতপ, আমি ছায়া। তুমি-আমি এক, অদ্বৈত, এক-তনু। আমার দেহ বিশ্ব-দেহে পরিণত হয় কায়া-তোমাকে বুকে ধারণ করিয়া। তুমি আমি-বিশ্ব মথন করিয়া দিব্য রূপে গড়িয়া উঠ। ৭।টায় আমি ও রেণু ৪নং বাসে ডিপোতে নামিয়া, হাঁটিয়া পুল পার হইয়া আবার হাঁটিয়া বেহালা কারখানায় যাই!···সকালে মনোমোহন চক্রবর্তীর পুত্র কল্যাণ আসিয়াছিল সুশীল দত্তের পক্ষ হইতে শ্মশানে সভায় পৌরোহিত্য করিবার নিমন্ত্রণ জানাইতে। যাদবনবাবু আসিয়াছিল।···

১৭ই অক্টোবর

নীলকমল ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি

'আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালীনাম সার রে,
আমার দেহ কালী প্রাণ কালী মন কালী আমার রে।'

জগো বিশ্বরূপময়ী, সর্ব্বসংস্কারবর্জিতা, সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তা, অবধূতী, মুক্ত-কেশী মা আমার, তুমি মুক্ত জ্ঞানের কিরণ-কেশ এলাইয়া, ছড়াইয়া, দিগদিগন্ত আলো করিয়া এস উলঙ্গ বেশে দিগম্বরী সাজে, আমার দেহ-প্রাণ-মন তোমার জ্ঞানের আরক রসে লীলায় গড়িয়া উঠুক, আমার রাখিনাম 'কালীকুমার' সার্থক হউক তোমার বাতুল চরণস্পর্শে। বাবা নীলকমল, মা মুক্তকেশী-আমার, আমার পথে দাঁড়ানো সার্থক হউক তোমাদের আশীর্ব্বাদে। আমি কালীর সংসার গড়িয়া তুলিব। সকালে রেণু প্রুফ দেখে, বাজারে যায় ও আমার সামরিকী নকল করে।" উষাবিশী বেহালা চলিয়া যায় রিকসায় সেখানে কালীপূজায় যোগ-দানের জন্য। "পরে যোগেশ পাল গান অশ্বিনীকুমারের গান 'তুমি চক্রধর'। তাহার পর সুধেন দত্ত প্রার্থনা করেন। কল্যাণ চক্রবর্তীকে বলিবার জন্য আহ্বান করি। সে কিছু বলে। পরে আমি বলি—অতীতও বর্ত্তমান হয় শরণাগত ভক্তের কাছে। আমরা শরণাগত হইলে অতীত অশ্বিনীকুমারের জীবনকে বর্ত্তমানে আস্বাদন করিব। 'অল্পমা উৎসাহে যতন করিলে স্বরগ হইবে মরত ধাম' এই মহাব্রত লইয়াই তিনি চলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ছায়া, all-round। শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগত বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অশ্বিনীকুমারের গুরু। অশ্বিনীকুমার বরিশালকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আমরাও তাঁহাকে গড়িয়া তুলিব। এই ভাবে তাঁহার ঋণ আমরা শোধ করিব। তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই দীর্ঘ ৩২ বৎসর পথে দাঁড়াইয়া আছি। পাকিস্তানের যেমন বুদ্ধি, সে বাঁচিবে না। আবার আমরা বরিশালে যাইব। অশ্বিনীকুমারের বরিশাল ডুবিবে না। উষাস্তরা অশ্বিনীকুমারের জীবন অবলম্বনে গড়িয়া উঠুক।··

১৮ই অক্টোবর

ওগো, তোমার দেহ আমার হউক, আমার দেহ তোমার হউক, তোমার প্রাণ আমার হউক, আমার প্রাণ তোমার হউক, তোমার বিজ্ঞান আমার হউক, আমার বিজ্ঞান তোমার হউক, তোমার আনন্দ আমার হউক, আমার আনন্দ তোমার হউক। তুমি আমি দেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে এক অদ্বৈত হই। তোমার ভিতর

দিয়া আমি গড়িয়া উঠিব, আমার ভিতর দিয়া তুমি গড়িয়া উঠ। তোমার আমার এই পারস্পরিক গড়িয়া উঠার মধ্যে এই বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। আমার ভিতর দিয়া তুমি ধরার ধূলিকে স্পর্শ কর, তোমার ভাবে ও রসে জমাইয়া তোল। তুমিও ধন্য হও, আমিও ধন্য হই। সৃষ্ট এই জগৎকে ভদ্ভাবভাবিত করার জন্য কি তোমার আকুলি বিকুলি! যুগে যুগে তুমি এইজন্য আস। ধরাকে যে তোমার পাওয়া চাই-ই। না-পাওয়ার বেদনাই তো বেদ।···রেণু বিমলাকে আনিতে যায়···। 'অজোঽপি সন্' শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুক্রমণিকার যে অংশে, সেই অংশটী রেণু পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করি। ভগবান অবতীর্ণ হন মানুষের জন্ম-ভয় দূর করিতে, জন্মের সার্থক আস্বাদন দিতে। 'গর্ভে যখন যোগী তখন ভুঁয়ে পড়ে খোলার মাটি' গানের প্রতিবাদ হইতেছে ভগবানের জন্ম। বিকার তাঁহার জীবনে নির্বিকারত্বের সঙ্গে সমন্বিত। তাঁহার জন্ম-কর্ম নির্বিকার। এই ধরার বুকে থাকিয়া মানুষ নির্বিকার জীবন আস্বাদন করিবে, তাহারই কৌশল শিখাইতে ভগবান আসেন। বিমলা পাঠে উপস্থিত ছিল···। - প্রাণ খুলিয়া এখানে থাকিতে পারিতেছে না—প্রতিভার কাছে বলিল। আমি মানুষের অতীতকে যতখানি সম্মান দেই, তাহার অতীতকে বর্তমানের মধ্যে সার্থক করিবার কথা বলি, তেমন করিয়া কি কেহ বলে? অথচ—সেই অভিযোগই করে! আমার দুর্ভাগ্য! উষাঙ্গিনী তিনটার পর বেহালা হইতে ফিরিয়া আসে।···

১৯শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে কত যুগ পথে পথে কাঁদিলাম, পারিলাম না তো কিছু গড়িয়া তুলিতে। তোমার জীবনের ছাঁচে কাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারিলাম? উষাঙ্গিনী সেদিন বলিয়াছিল, অন্য সম্প্রদায়ে সাধনভজনের কথা আছে, কিন্তু এখানে জীবন বদলাইবার কথা। সাধন করিতে মানুষ চায়, কিন্তু তোমার জীবনের দিকে তাকাইয়া কে জীবন বদলাইবে, তোমাকে ধারণ করিবে? আমি জীবন বদলাইবার কথা বলি বলিয়াই না কেহ আমার কাছে আসে না? তোমাকে জীবনে পাইতে হইলে বা পাইলে জীবনের সব তত্ত্বগুলি—চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, কামতত্ত্ব—কোন্ ছন্দে কোন্ কৌশলে ভদ্ভাবভাবিত হইতে পারে, তাহাই তো গীতাভাষ্যের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছি। কে তাহা পড়িবে?···সে আমাদের দায়িত্ব কিছুটা বহন করিবার কথা বলে। আমি বলি, কয় যদি, তবে মাঝখান হইতে পলাইতে পারিবে না। একটার ভার নিবে, পরে সেটাকে আমার উপর ফেলিয়া গেলে আমার বড় দুঃখ হয়। এমনি করিয়া কত মানুষ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে।.. ডায়েরী লিখিবার কালেই চিদানন্দ আসিল।··· প্রাণ খুলিয়া দিলে তো আমি মানা করি না। করিতে চাও কর, সরিয়া পড়িও না। কাহারও জীবনের জন্য কিছু করিতে না পারিলে নিতে সাহস হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। উহা যে শোষণ, ভগবানও প্রতিদান না করিয়া দান গ্রহণ করেন না। আমার আছে সবল পুরুষোত্তম জীবন ও দর্শন। দেহের স্বামী ও আত্মার স্বামী এক হওয়া চাই। অক্রূর কৃষ্ণকে আনিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনী কুসুম পাঠ করে। মাখন বাবু আসেন।

২০শে অক্টোবর

তুমি 'শরণং সুহৃৎ', কুরুক্ষেত্রের রণের মধ্যে ডাক দিয়া গিয়াছ 'মামেকং শরণং ব্রজ', আবার বলিয়াছ 'বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ'। আমি তোমার বুদ্ধিরই শরণ অন্বেষণ করিতেছি। 'বুদ্ধির্ভবানী'। বিশ্বে কাহারও বুদ্ধি আজ হালে পানি পাইতেছে না। কাহার বুদ্ধির শরণ লইব তোমার ছাড়া? আমার বুদ্ধির গর্ব চূর্ণ হউক, তোমার বুদ্ধির জয়জয়কার হউক। তোমার বুদ্ধির মাঝেই আমি ডুবিয়া যাইব, নির্বাণ লাভ করিব। তোমার পথই আমার পথ। আমরা দুইজন 'চলতি ছাওয়ার পথী'। তোমার সঙ্গে রেখা আমার পথে, উপরে বিশাল আকাশ আর নীচে বিপুল সবুজ ধরণীর বুকে। নিরাট সৃষ্টির বুক চিরিয়া উড়িয়া চলিয়াছি তুমি আর আমি, ওগো আমার [illegible]

স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌সিওরেন্সে যায়। কালীঘাট আশ্রম হইতে ব্লাউজ ও উদ্বোধনীর চরকা ও কিছু বই লইয়া রিকসায় আসে। বৈকালে উদ্বোধনের ৪র্থ বর্ষ হইতে 'আমাদের নববর্ষের প্রণতি' ও 'লাঞ্ছল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' কুসুম পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করি। প্রতিভা কুসুম গোপা রেশন আনে ২৷৷টায় গিয়া। মালতী আসে ৪টায়।··· সকলের সব কৃত কর্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের কথাও শুনাইয়াছি। তাহারা অভিযোগ করে আমি তাহাদের কর্মের মূল্য দেই না। বৈকালে পাঠের সময় বলি—'কৃষ্ণে কর্মার্পণ করিতে হইলে যে-কোনও কর্মই অর্পণ করা যায় না। কৃষ্ণ হইতেছেন আদর্শ ও কর্মের সমন্বয়। যে কর্মে এই দুই দিকই রক্ষা থাকে, যে কর্মে আত্মকল্যাণ, বিশ্বকল্যাণ, যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয় তাহার কল্যাণ হয়, সেই কর্মই কৃষ্ণার্পিত কর্ম। ভগবান অর্জুনকে ভীষ্ম-দ্রোণকে বধ করিবার প্রেরণা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম-দ্রোণাদির কল্যাণ, অর্জুনের কল্যাণ, ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণের কথাও শুনাইতেছে। কর্মার্পণে কর্মবিশুদ্ধি কর্মপন্থার বিশুদ্ধি চাই। তাই কৌশলের কথা ভগবান বলিয়াছেন'।···

২১শে অক্টোবর

ওগো শ্রীরাধারাণী, জাতি-কুল-শীল ছাড়া, কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী, আমার জীবনের সারভূতা, পরাণপুতলী, তোমার আসন বিশ্বের বুকে তো আমি রচনা করিতে পারিলাম না। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যে বিপ্লব তুমি তোমার জীবন দিয়া আস্বাদন করিলে, সেই বিপ্লবই তো বর্তমান সমাজ-শরীরকে সুস্থ করিতে পারে। বর্তমান নরনারী সম্বন্ধের পরিপূর্ণ সার্থকতা, সফলতা তোমরা দুই জন। স্বাধীন নর ও স্বাধীন নারীর মহামিলনেই যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা, ইহাই না তোমরা দেখাইয়া গেলে? তোমাদের বরণ করিলে সমাজ বাঁচিত। কিন্তু আমি তো কিছু করিতে পারিলাম না। নর নারীকে শোষণ করিবে না, নারী নরকে শোষণ করিবে না—ইহাই না ব্রজতত্ত্ব? বর্তমান যুগ তো ইহারই প্রতিষ্ঠা চায়। তোমরাই সবের হইয়া।···আমি যে মানুষের ছোট ছোট খেলনার মত জিনিষগুলিকে আদর করি, মর্যাদা দেই, তাহা কাহাকে বুঝাইব? কিন্তু আদর করিলেই কি সব কিছু রক্ষা করা গিয়াছে? বলদবাদের কাজ আমার হয় নাই, তাহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, আমার ৮এ রাসবিহারী এভ্যেনিউ-তে আমার স্থান হয় নাই। বিশ্বেই তো বিশ্বেশ্বরের স্থান নাই, আমার কি আর দুঃখ। তবুও তো যুগে যুগে বিশ্বেশ্বর বিশ্বের মাঝে নিজের স্থান করিতে আসেন এবং বার বারই তিনি ব্যর্থ হন। শ্রীকৃষ্ণ মরিলেন ব্যাধের বাণে, রাম লক্ষ্মণ মরিলেন সরযূতে ঝাঁপ দিয়া। সংসার আমায় চায় না, তবুও আমি চাহিব। কি লাঞ্ছনা ভগবানের, তাঁহার অনুগত জনের। বৈকালে উদ্বোধন হইতে ৩য় বৎসরের মাঘ সংখ্যার 'আমাদের কথা'র কিছু পাঠ করে কুসুম। আমি ব্যাখ্যা করি।···সকালে প্রতিভা সামনের এক বাড়ী গিয়া পূজা সংখ্যা বিক্রয় করে। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। গ্রাহক হইতে পারে। পাড়ার প্রতি ঘরে ঘরে আমাদের কথা শুনাইতে হইবে।

২২শে অক্টোবর

স্বামিন্, তুমি তোমারই বিশ্বে অপরিচিত, অনাদৃত, অবহেলিত ও অভিযুক্ত। অথচ তুমি বিশ্বকে, বিশ্বের প্রতিটী কণাকে আদর করিয়া চলিয়াছ। গৌরব দান করিয়া চলিয়াছ। আজ বুঝিতেছি তোমার 'ময়ি তে ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ' বাক্যের সার্থকতা কোথায়? তোমার বুকে সবাই আছে, তাহাদের বুকে তুমি নাই, তোমাকে বাদ দিয়া তোমাকে দূরে রাখিয়াই তোমার সংসারে তাহারা সংসারী হইতে চাহিতেছে। কি দৈব বিড়ম্বনা! তোমার সংসারে তুমিই নাই! এখন তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার লালসা লইয়াই তো পাগলের মত চলিয়াছি। কেন আমার জীবন-দুয়ারে তুমি এলে? তোমার বিশ্বে তুমি প্রতিষ্ঠিত হইলেই না এই বিশ্ব দিয়া বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে? তোমার বিশ্ব তোমার হউক—আমি যেন তাহা দেখিতে পারি। আমি প্রাণপণ করিব।···৩।৷টার পর উদ্বোধন হইতে 'আমাদের কথা' (মাঘ ১৩৫৯) কিছুটা পাঠ করে কুসুম। 'Face nature'···'Fly not'—ইহাই পাঠ্য লইল। প্রতিভার উদ্বোধন পথে যাওয়ার আগেই

পালাইয়া যাওয়া। সামনের দিকে আগাইতে হইবে। Reality lies ahead। প্রকৃতির সব বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া পিছনে সরিয়া যাওয়ার কথাই আমরা শুনিয়াছি। ব্রহ্ম আছেন উজান পথে, সামনের দিকে নয়—ইহাই আমরা শিখিয়াছি। কিন্তু ব্রহ্ম যেমন অতীতে পিছনে, তেমনি ভবিষ্যতে, সামনে। তিনি সর্ব্বভূতগুহাশয়ও বটেন, কেবল আত্মাই নন। আত্মার পথ উজানের পথ, আর সর্ব্বভূতের পথ প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলার পথ। দুই পথের সমন্বয় যাহাতে তিনিই পুরুষোত্তম। প্রকৃতির আদিতে তিনি, মধ্যে তিনি সত্যরূপে, অন্তে তিনি। পুরুষও অনাদি অনন্ত, প্রকৃতিও অনাদি অনন্ত। অতীতেও অনন্ত, ভবিষ্যতেও অনন্ত। যাহার অতীত আছে তাহার ভবিষ্যৎ থাকিতে বাধ্য, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ আপেক্ষিক। প্রকৃতির মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষকে প্রকৃতি-জয়, প্রকৃতি-পরিপাক বা প্রকৃতিময় প্রকৃতিবল্লভ হইতে হইবে। 'জগতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম'। তাই পুরুষোত্তম প্রকৃতির চরণতলে নিজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পুরুষোত্তম-মুক্ত। প্রকৃতি-ভয়ে ভীত পুরুষ বদ্ধ। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। অগ্রহায়ণ মাসের জন্য ধীরেন মজুমদারের 'মহাভারতে সত্যের আদর্শ'-এর উপর আলোচনা অবলম্বনে 'সত্যের দুই দিক' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি।

২৩শে অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি 'সহজ' হইয়াছ বলিয়া কেহ তোমাকে চিনিল না বলিয়া দুঃখ করিয়াছ—গতকল্য পাঠে তোমার মুখে তাহা শুনিলাম। চলিয়া যাইবার পরে তোমাকে চিনিবে, বলিয়াছ। আজও কি সেদিন আসিল না? তুমি ঐশ্বর্য দেখাইয়াছ, ভক্তদের মধ্যে তোমার ভাব-সমাধিরা একটা আলোড়নও সৃষ্টি করিয়াছিলে। কিন্তু তাহা তো কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। উহা সাময়িক একটা প্লাবন আনিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা তো টেঁকে নাই। কেননা, জীবন তো বদলায় নাই, প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই। জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছে, নীচের বদ্ধ জল বদ্ধই রহিল। ঐশ্বর্য ম্যাজিক-এর মত কাজ করে। ম্যাজিক-এর জোর দ্বারা যেমন দৈনন্দিন জীবন চলে না, ঐশ্বর্য-দর্শন দ্বারাও তেমনি মূলা প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। তবে তোমার স্পর্শে আমাদের জীবনের বদল হইবে? দুপুরে চরকা কাটা হয় ১টা হইতে ৩টা। রেণুর স্ত্রী সুধা আসে। সেও কাটে। সে প্রথমে আমার কাপড়ের জন্য সুতা কাটিয়া দিবে। বাড়ীতে চরকা নিয়া যাইবে, আবার পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পরে রেণু প্রতিজ্ঞা প্রথমে নীহারের বাবার বাসায়, পরে রাধাগোবিন্দ নাথের বাসায় যায়। প্রতিজ্ঞা সন্ধ্যার পূর্বে পাশের দুই বাড়ীতে যায়। এই ভাবে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। তবে আমি একটু জুড়াইতাম। চাহিয়াছিলাম বিশ্বময় ঠাকুরের দর্শন ও জীবন ছড়াইয়া দিতে।...য় শুচিবাই-এর জন্য তাহার পুত্র-কন্যাদের কাছে বিড়ম্বিত হইতেছে।... static হইলে যে বর্ত্তমান যুগে চলিবে না—ইহা রেণু তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। রাত্রিতে ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়।

২৪শে অক্টোবর

ঠাকুর, আমাকে বিধেয়াত্মা করিয়া দাও, নইলে কি করিয়া প্রসাদম্ অধিগচ্ছামি? বিধেয় পদের অর্থ 'বিনীত' 'বচনে স্থিত'। আমি বিনীত হইব, বচনে স্থিত হইব। বিনীত, বচনে স্থিত হইলেই তোমার আমার হইবে মাঝে বহল—তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। তোমার অপরিচ্ছিন্ন জীবন আমার হউক, আমার পরিচ্ছিন্ন জীবন তোমার হউক। দুই-ই তো উপাধি আমরা সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত, সর্বোপাধিসমন্বিত হইব সকালে রেণুকে এই বিনীত, বচনে স্থিত হইতে বলি 'মন্মূর্লং গুরোর্বাক্যম্'—এ না হইলে বহনাবকাশ আসি সব সংগঠন বানচাল করিয়া দিবে। আমি তো সকলে সব দৃষ্টিকোণ যথাযথ মর্যাদা দিয়া নির্দেশ দেই। আমি কাহারও মন-বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া যায় না? কেবল কথা কাটার বাধায় আমি জর্জরিত। বিনীত না হইলে বুদ্ধি দুই প্রান্তের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন অসম্ভব। ইহা ঠিক parallelogram of forces। নৌকার মুখ (গলই) থাকে মাঝখানের দিকে আর তীর হইতে জল টানে

হইতেছে। তাহার ফলে নৌকা ঠিক মধ্যপথে অর্থাৎ তীর ঘেঁসিয়া চলে। বুদ্ধির দুই প্রান্তের সমান মূল্য দিলেই তবে মধ্য পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে।···সকালে হরিগোপাল-বাবু আসেন, সাহিত্য একটি মেয়ের কথা বলেন,···। ৩।০টার পর 'উজ্জ্বলভারতে'র তাড়াগড়া পাঠ হয়। রেণু পড়ে। প্রতিভা সুহৃদ সাদার্ণ মার্কেটে যায়। সন্ধ্যায় হরিদাসী অম্বা রেণা ও দেবু তাহাদের গাড়িতে আসে। কিছু পরেই বাবু ও প্রতিভার ভাগিনেয়ীর কন্যা আসে। তাহার পরেই শঙ্করী হরি গোবিন্দ ও গোবিন্দর মেয়ে আসে।···কিছু পরেই আসেন সতোন কর ও মাখনবাবু। সকলকেই মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হয়। পাঠ হয় সকলকে নিয়া, প্রতিভা পড়ে।···সকালে 'অহো বকীয়ং' শ্লোকটী ও 'আততোষ' পদের ব্যাখ্যা করি রেণুর কাছে, পরে প্রতিভার কাছে। ভগবান ছুঁতা খোঁজেন কৃপা করিবার জন্য। পুতনা ধাই-মা-র দুধ খাওয়ানো কর্মের অনুকরণ করিল বলিয়া ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করিল। নাম মাত্র সেবা পাইয়া কণী একমাত্র পুরুষোত্তমই হন। কাহারও নাম মাত্র সেবারও তো আমি অবমাননা করি নাই। -র ণ তাই স্বীকার করি, স্বীকার করিব। অথচ জড়াইয়া পড়িব না। তবেই না পথ সহজ হইবে। রেণুকে বলি —যে যাহা আমার তোমার বা কাহারও সম্বন্ধে মনে করে, তাহা মানিয়া লইয়া জীবন দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহা তুমি কি না। তর্কের পথে প্রতিষ্ঠা মেলে না। ইহার চরিত্রহীনের সাবিত্রী।

২৫শে অক্টোবর

ওগো স্বয়ম্ভসুন্দর, যেদিন তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি এই বিশ্বকে, বিশ্বের প্রতিটী জীবকে, প্রতিটি ধূলি-কণাকে স্বয়াট্ করিয়া দিয়াছ organism-এর সহজ বিধানে। স্বয়াট্ জীব তাহার বিচ্ছিন্নতার মোহে তোমাকে, তোমার বিশ্বের অপরাপর সত্তাকে অস্বীকার করিয়া, পিছাতে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর তুমি যুগে যুগে আসিতেছ এই lost-children-দের কুড়াইয়া সংহত করিতে, মুক্ত বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে। কোন্ বেদনায় তুমি তোমার এই 'বেদনা' আমায় পাইয়া বসিয়াছে। আমিও তোমার সঙ্গে, তোমার এই বিশ্ব-কুড়ানোর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, ওগো আমার নিত্যসঙ্গী নিতাগোপাল। তোমার বিশ্ব তোমার পায়ের কাছে মুগ্ধ শিশুর মত বিশ্রাম লাভ করিবে, নিশ্চিন্ত হইবে দেখিবার জন্যই আমার প্রাণ আজ পাগল।···ভদ্রলোকের নাম সুরেন্দ্রনাথ সরকার। তাহার মেয়ে হৈমকে লইয়া তিনি বিপন্ন। হৈমকে তাহার স্বামী প্রহার করে ভীষণ ভাবে—আমরা কিছু করিতে পারি কি না, মনস্তাপের দিক হইতে প্রথমতঃ একটা আশ্রয় দিতে পারি কিনা—হৈমর পিতা তাহাই সর্বাগ্রে চান।··· হৈম অপমানিত হইয়া স্বামিগৃহে থাকে, ইহা তাহার পিতা চান না। এমন একটি মানসিক ট্রেণিং প্রয়োজন, এমন একটি stand নেওয়া প্রয়োজন, যাহার ফলে হৈমর আবেষ্টন অনুকূল হইতে পারে, আর নয়তো বাহির হইয়া পড়িতে পারে। দুইয়ের জন্যই মানসিক সাধনা ও যোগ্যতা চাই। কথা হওয়া দরকার। আগে রেণুর সঙ্গে কথা হউক, পরে আমার সঙ্গে হইবে। আমি যতদূর পারি করিব। ৪।টার পাঠ আরম্ভ হয়। পাঠে আজ নূতন লোক ২।৩ জন— অনন্ত শীল, তাহার জানাশুনা পতিতপাবন সরকার, দেবুর কাকা, দেবু, ২।৩টী নূতন মহিলা, মহিম হালদার ষ্ট্রীটের বড় ও মেজ বৌ শেষের দিকে উপস্থিত ছিল। তখনও আগে ১১।০টার পর।···৭।০টার পর ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। মাখনবাবু আসেন।

২৬শে অক্টোবর

ওগো জগন্নাথ, জগদ্ধাত্রী তোমারই পরাশক্তি, আমি জগদ্ধাত্রীর সন্তান। তুমি কোনও ব্যক্তি বিশেষের একান্ত নাথ নও, তুমি প্রতি পরিবারের, প্রতি সমাজের, প্রতি জাতির, প্রতি সম্প্রদায়ের নাথ। তুমি 'যাচক' বলিয়াই নাথ। তুমি জগৎকে যাচ্ঞা কর বলিয়াই জগন্নাথ। কে তোমার মত এমন করিয়া জগৎকে যাচ্ঞা করিবে? আমি তুমি-ময় হইব, জগন্নাথ-জীবন যাপন করিব, সর্ব-সাম্প্রদায়িক হইব, বিশ্ব-নাগরিক হইব। সেই বল দাও, বুদ্ধি দাও। তোমার জগতে যেন তোমার প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে পারি। রেণু সকালে বাজারে যায়।

গোপা সকালে ফুল তুলিয়া আনে···। বেলু ১২টার পর বাহির হইয়া বাসন্তী বাইসিং-এ যায়।...আশুবাবু সহ উজনভারত নিয়া আসে। আশুবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। আশুবাবুর প্রাণটী ভাল। যে ভাবে দুইটী পাগলের ভার লইয়াছেন, তাহা কেহ করে না। আমাদের দর্শনের কথাও হইল।...

২৭শে অক্টোবর

ওগো নিতাগোপাল,···তুমি কারা 'সর্বতঃ পাণিপাদ', আমি তোমার ছায়া 'সর্বতঃপাণিপাদ' 'সর্বতোঽক্ষি-শিরোমুখ' হইব। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখ তোমার ছায়া করিয়া। ছায়ার মত তোমাকে জড়াইয়া থাকিব। এমন করিয়া অদ্বৈত হইয়া কবে তোমাকে পাইব? আলো যে আমার ঘুচিল না।···বিভা সরকার আসে।··· সে বলে এখানের আবহাওয়া তাহার ভাল লাগে। তাহাকে আমি চোখের জলে আমাদের সহযোগিতা করিতে বলি, নারী হইয়া নারীর দুর্দশা মোচন করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে বলি। তাহার সুযোগ আছে সে করিলে করিতে পারে।···আমি সুতা কাটি। সন্ধ্যার পর আশু ঘোষ (উষারিণীর মাতুল, আমার গুরুভ্রাতা) আসেন। তিনি মহানির্বাণ মঠের একজন ট্রাষ্টী। তিনি মঠে একটি আলোচনা-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চান, যাহারা ঠাকুরের শিষ্য-প্রশিষ্য, ঠাকুরের প্রতি কিছুমাত্র অনুরক্ত তাহাদের লইয়া; মঠে গিয়া মানুষ যদি শান্তি না পায়, তবে মঠ কিসের জন্য? ইহাও তিনি বলেন। এই বুদ্ধি যদি ভক্তদের মনে ঠাকুর জাগাইয়া দেন তবেই সকল সম্ভব হয়। দাশরথি দাদাও নাকি এজন্য আগ্রহান্বিত।... উষারিণী বলিতেছিল, ঠাকুরের জীবনী পাঠ করিলে মনে হয় ভগবানকে পাওয়া কতো সহজ। সত্যই তো, ভগবানকে পাওয়ার মত এমন সহজ পাওয়া আর কি আছে? আমরাই বুঝি যারা সহজকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছি। মা ছেলেকে সহজভাবেই ভালবাসেন। তাহার কাছে শুধু 'আমি তোমার ছেলে' বলিয়া দাঁড়াইলেই তো মাকে পাওয়া হয়। মাকে তো মানুষ পাইয়াই আছে, যেমন আলো-বাতাসকে মানুষ পাইয়াই আছে। বুদ্ধির প্যাঁচেই সব পাওয়া না-পাওয়াতে পরিণত হইয়াছে। বুদ্ধিই আপনাকে পর করিয়াছে।...

২৮শে অক্টোবর

ওগো সহজ ঠাকুর, তোমার সহজ আদরের মাকে আমি ভুলিলাম কৈ? তুমি সহজ প্রেমে ধরিতে চাহিয়াছ, আমি ধরা দেই নাই, ধরা পড়ি নাই। তবুও কি তুমি ছাড়িয়াছ? আলো বাতাসের চেয়েও তুমি সহজ। তোমাকে পাইতে ঘুরে যাইতে হয় না। তুমি এই স্থানে এই মুহূর্তে আছ। আমার চিত্ত বিকল্প বিচার বিতর্ক তুলিয়া স্বতঃসিদ্ধ পাওয়া ধনকে 'পর' করিয়া রাখিয়াছে, তোমার আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। আমার সকল বিকল্প, সকল বিচার বিতর্ক তোমার স্নেহ আদর সোহাগের সামনে স্তম্ভিত হউক, নিরুদ্ধ হউক; আমি তোমার সহজ নির্বিকল্প প্রেমের পরশে সহজ হইব, নির্বিকল্প হইব। তোমার আদর আমার জীবনে জয়যুক্ত হউক।...৮টার পর খোকন (প্রশান্তকুমার বসু) নোটরে আসে। অনেকক্ষণ থাকে। সে বৃন্দাবনে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে। তাহার নিকট বৃন্দাবনের কথা শুনিলাম। বৃন্দাবন, বৃন্দাবন, আমার প্রাণের বৃন্দাবন, আমি তোমাকেই বিশ্বময় আস্বাদন করিতে চাই বাস্তবিকরূপে, বাস্তব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের ভাষায়। আমার জীবনে এস ব্রজধাম।···খোকন মড়া মানুষের চক্ষু তুলিয়া লইয়া অন্ধের চক্ষু দিয়াছে। বিজ্ঞানে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কাটায়। তাই ভক্তিতে প্রায়শ্চিত্ত কাটে, ঠাকুর বলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বয়ই ভক্তি।···

২৯শে অক্টোবর

সাময়িকী

নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষ—নেহরু-হীন ভারতবর্ষের একমাস অতিবাহিত হইল। এই এক মাসে নিজেদের কি রকম পরিচয় আমরা দিয়াছি? বলিতে পারা যায় ভারতবর্ষ নেহরুর মুখ রক্ষা করিয়াছে। কংগ্রেস সর্বসম্মত নেতা স্থির করিয়া দেশকে, বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। নেতা স্থির করিতে সে এতটুকুও জল ঘোলা করে নাই একথাও বলিতে পারা যায়। ঘরে বাইরে সকলেই সতর্ক হইয়াছিল। শত্রুরা ভারতবর্ষ বিপদে পড়িল মনে করিয়া আরাম বোধ করিতেছিল—মিত্ররা শঙ্কায় প্রহর গণিতেছিল। কিন্তু প্রখর বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব ও সর্বোপরি অত্যন্ত সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর যাবস্থাপনায় সমস্যা যে ভাবে সমাধানপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে শত্রুর দল নিরাশ হইয়াছে, মিত্রের দল পরম সোয়াস্তি লাভ করিয়াছে। জওহরলাল আর তাঁহার পথ-প্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে যাহা দিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাহার ফল। ইহার পর পরই পাঞ্জাব সরকারের ঘটনাতেও এই ফলেরই আর একটি ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। শ্রীরাম কিষণকে মোনীত করার ঘটনাও উচ্চতর স্তরের যে মানসিক স্থৈর্য প্রকাশ করিতেছে—জওহরলাল-উত্তর ভারতবর্ষের ভাগ্যলক্ষ্মী ইহাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। একদিকে কামরাজ আর একদিকে শ্রীলালবাহাদুর—জনসাধারণের এই দুইজন প্রতিনিধিকে যে আমরা পাইলাম, আমাদের স্বর্গত যে আজ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারিল না, ইহা কেন সম্ভব হইল? ঐ মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল আমাদের যাহা দিয়া গিয়াছিলেন তাহারই জন্য ইহা সম্ভব হইল। তাঁহারা কি দিয়া গিয়াছিলেন? তাঁহারা দিয়া গিয়াছিলেন যে, রাজনীতিটাও ভারতবর্ষের কাছে ঘৃণ্য নৈতিকতার লীলাভূমি নয়—ভারতবর্ষ নিজে মানুষ হইয়া অন্যকে মানুষ করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া মানুষের মত বাঁচিতে চায়—'on earth one family'। তাহাদের এই আদর্শের মধ্যে কোন প্রতারণা ছিল না—মুখে এক কথা, মনে আর এক কথাও ছিল না—মহাত্মাজী জওহরলালজীর এই সাধনাই ভারতবর্ষকে আজও দাঁড় করাইয়া রাখিল, ভবিষ্যতেও রাখিবে। হইতে পারে ভারতবর্ষের এই মানুষ হওয়ার আদর্শকে রূপ দিবার ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছিল, পড়িয়াছে তাহারা অনেকেই মানুষ নহে—তাহারা যে ভাবে চলিয়াছে বা চলিতেছে তাহাতে দেশকে দশকে তথা নিজেকে প্রতারণাই করিতেছে; তথাপি একথাও সত্য যে, গান্ধী-জওহরলালের আদর্শের মধ্যে প্রতারণা ছিল না এবং সেই না-থাকারই আত্মিক ফল নেহরু-প্রয়াণে সকলের মিলিয়া মিশিয়া আনন্দপূর্ণ সম্মতিতে কেন্দ্রের নেতা নির্বাচন ও পাঞ্জাবের কায়রণের দুর্নীতির উদ্ঘাটনের পর কামরাজ-লালবাহাদুরের সমধর্মী রামকিষণের নির্বাচন-পরিণতি। চারিদিকের নৈরাশ্যের মধ্যে এই যে সুস্থতাটুকু পাওয়া গেল—ইহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা জনসাধারণ সুস্থ হইতে চেষ্টা করিব—গান্ধীজী-জওহরলালজীর আদর্শ কামরাজ-লাল-বাহাদুর-রামকিষণের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইবে—ইহাই জাতির নিকট বিধাতা পুরুষের আহ্বান। এ আহ্বানে যেন আমরা সাড়া দেই।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার সন্ধান পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাজয়ন্তী	৵০
৮।	উদ্ধবভারত (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১৷০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	মুণ্ডকোপনিষৎ	
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা	
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ	
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ	
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী	
৮।	অপ্রকাশিত পত্রাবলী	
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ	

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির ঊষাকথা	১।০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৴০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৷৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

"আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না পাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই সে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো, শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের টানে গোপীগণকে সহজ ও অঞ্জসা (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রিয়ায় ও দ্রব্যে অদ্বৈত হইয়াই ভক্ত অতি দ্রুত দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান যুগ বর্ত্তমান ভজনের যুগ, ইহাও তাঁহারই নির্দ্দেশ।"

—*শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র*

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৮৮৬, ১৩৭৩, সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ.

ওদের নিরস্ত করুন

জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ
বিপর্যস্ত নৈতিক মূল্যবোধ,
অসুস্থ রুচি ও
বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।
জাতির সুস্থ
নৈতিক জীবনে এই বিকৃতিকে
সংক্রামিত হতে
না দেবার দায়িত্ব
প্রতিটি
সচেতন নাগরিকের
উপর ন্যস্ত।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER/64

অবাধ-আরাম-আনাগোনা

এক পায়ে, তার আরামিন পায়ের উপর। সারাদিনের ছুটি যখন
মিললো, তারপরের প্রথম সুযোগে পরে এক জোড়া বাটার চটি—পা
পায়ের পরম শান্তি। ছাওয়া খেলানো নকশা, মিনিমিনি
চেহারা, একবার খুলেই অনুভব।

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষসাধনায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের তো বটেই ক্রমবর্ধমান গুণমানের বদৌলতে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' মিলিং ওয়াশ, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ফাউন্টেন পেনের কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩০০ ও ৭০০ এম এল শিশিতে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PRO/SW - 12

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
দুর্গাবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প

লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর ত্যাগ, সাধনা ও আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি, প্রত্যেক নাগরিকের সুদৃঢ় সংকল্প ও কঠোর কর্মপ্রচেষ্টায় সেই স্বাধীনতা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

পনেরোই আগস্ট

আমাদের

স্বাধীনতা দিবস

এই পবিত্র দিনে আমাদের সংকল্প হোক——

"জাতীয় ঐক্য বজায় রাখব"

"কলকারখানায় আরো বেশি উৎপাদন করব"

"সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করব"

আর

"জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য করব আত্মোৎসর্গ"

সকলের দৃঢ় সংকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই গ'ড়ে উঠবে নতুন ভারত, সেই সঙ্গে গ'ড়ে উঠবে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য সুসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র ক র্তৃ ক প্র চা রি ত
W. B. (P) Adv. D...../64

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতবাসীর নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর ইহা তাহাকে পথ দেখাইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের যুগসন্ধিক্ষণে এই গীতা আমাদের কিভাবে পথ দেখাইতে পারে, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত গীতা-ভাষ্য তাহার খোঁজ দিবে। এই গীতাখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সর্ব সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

নরনারায়ণ আশ্রম

সূচীপত্র, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৭১

১। প্রার্থনাকালীন ভাবণ ... ১৬৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৯)

২। ভাগবতের ঠাকুর ... ১৬৮
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৩। সংস্কৃতির ত্রিধারা ... ১৭২
শ্রীকপিভূষণ বিশ্বাস

৪। অন্বেষা (কবিতা) ... ১৭৪
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য

৫। কি ছিলাম—কি হয়েছি—কি হবো—
কি হতে চলেছি ... ১৭৫
অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

৬। বিনোবার দুষ্কৃতাং ... ১৮০
শ্রীদুর্গামোহন সেন

৭। মুণ্ডকোপনিষৎ (অবধূত ভাষ্য সমেত) ১৮১

৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪২) ১৮৫

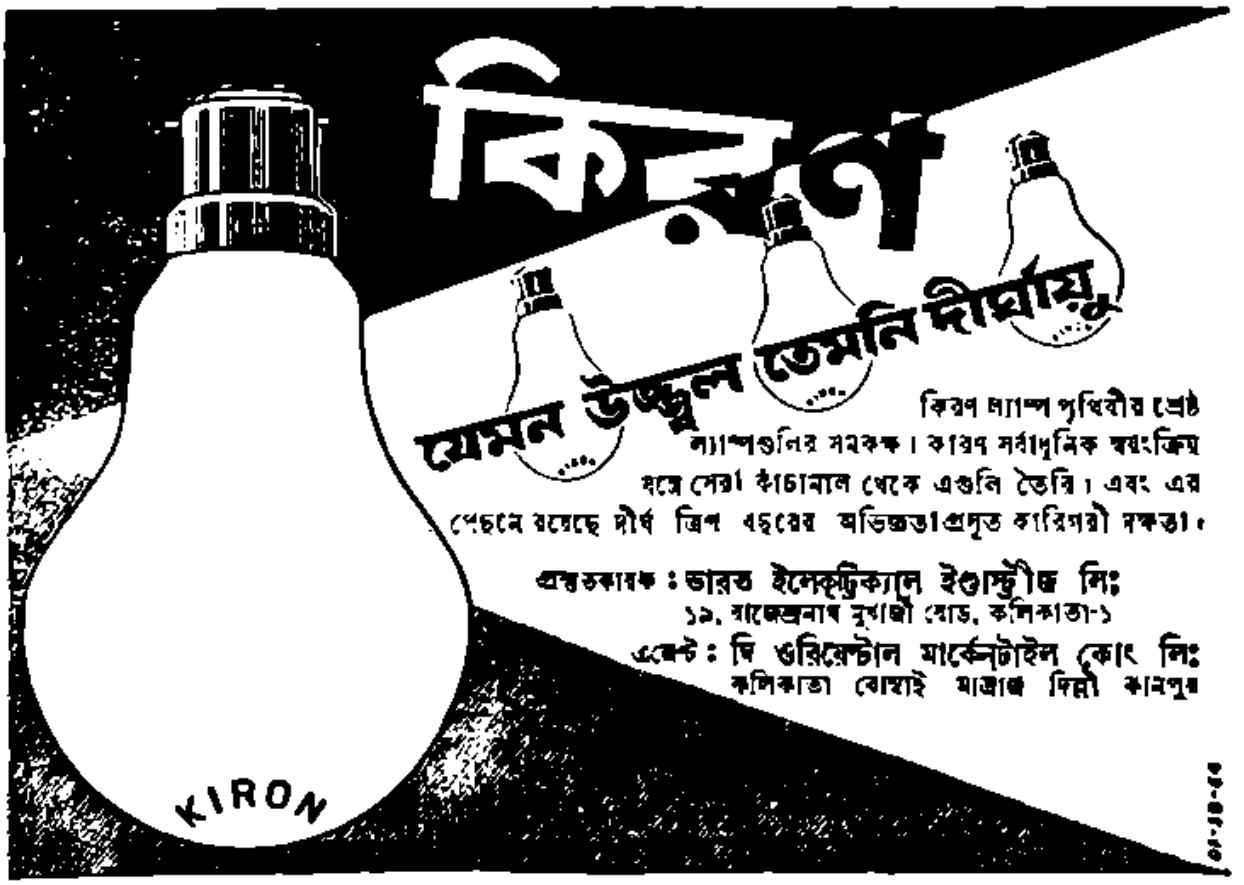

উদ্বোধন

শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ৭ম ৮ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩৯)

……মানুষ স্বভাবতই তাঁকে ভালবাসে।...বাচ্চার দুধ খুঁজে খুঁজে এখানে ওখানে চুঁ দিচ্ছে—মানুষও এখানে ওখানে কৃষ্ণকে খুঁজছে—কৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সহজ —আমি যে সেই বীর্যে জন্মেছি—স্বরূপতঃ আমি সিংহ— God created man after his own image। সেই কৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে চুঁ দিচ্ছে। সূর্যের আলোতে দেখ, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ— তোমার চেহারা তাঁরই চেহারা—চৈতন্যচরিতামৃত... যেদিন তাঁর থেকে মুখ ফেরাল সেইদিন মায়া তার গলায় দড়ি বাঁধল।...তুমি তাঁরই সন্তান—ঐ যে তোমার মুখের ভিতর তাঁর চেহারা দেখছি···তাঁকে জীবন থেকে সরিয়ে দাও, তুমি নাই—বিম্ব আছে বলেই প্রতিবিম্ব—মূল আছে বলে গাছের ছায়া।...তিনি আছেন বলে আমার ছায়া আছে।...নিজেকে চিনতে শেখো, অমৃতের পুত্র বলে চিনতে শেখো। আমাদের আলো পিছনে, তাই সামনে আলোর দিকে মুখ দিয়ে দাঁড়াও...স্ত্রীর জীবনে নিজের কামুকতার ছবি ফেলে স্ত্রীকে দেখছ, স্ত্রীকে পাবে কি করে?...অহংকারের যে জাল তুমি বুনেছ, তারই নাম ভয়—তার ওপারে তিনি।···নিত্যগোপালের প্রকাশের পিছনে পিছনে বিশ্ব প্রকাশিত হবে—বর্তমান সমাজ ধ্বংসের শেষ মুখে গিয়ে পৌঁছেছে—নূতন সমাজের জন্ম হবে—নিত্যগোপাল তার জন্মদাতা পিতা ···।

৪-৯-৫৬।···রোজ সকালে যে প্রার্থনা করা হয় তার ভিতরে একটী পুরুষ সম্বন্ধে বোঝাই পাওয়া হয়—খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিদ নাই চোখে, গোরা অভোর নয়নে কাঁদে···তিনি বাংলাদেশেরই একজন পুরুষ—বেদনার মূর্ত বিগ্রহ।...শুধু গান গেয়েই চলেছি—তাঁর জীবনের কিছু কি জীবনকে স্পর্শ করেছে? ঐ রকম বেদনা না হলে 'আমি' কাটে না।.. কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়··· একখানা ছবি আছে।...এ কী বাইরের?...যাকে অন্তরে পাচ্ছি তাকেই বাইরে পাওয়ার জন্য ঐ পাগলামী।... কেন নিদ নাই, কেন সোয়াস্তি নাই, প্রাণ কেন কাঁদে?··· মোটা ভালভাত আমার ঘরেও ছিল—তবু কি যেন চাই! ওটা জীবনের চাহিদা।...এখানে আমরা বেশ আছি, আশ্রমে অতিথিরকারী হচ্ছে—এই কি জীবন? এতেই কি নিশ্চিন্ত থাকব?···জীবনে বেদনা চাই।...একদিন অন্ধকারে কাঁদ দিয়াছিলাম—ঐ স্ত্রী বসে আছেন সাক্ষা বেদনে—আমার জীবনকে পেতে হবে—আমার জীবন ব্যেপে আছেন তিনি—ব্রহ্মের এক নাম আঙ্গিরস... ভগবানকেও এমনি করেই পেতে হয়...আমার তো তা না হলে চলবে না—সমস্ত কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান মন্থন করে নিত্যগোপালকে পেতে হবে···মানুষকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম—সমস্ত মানুষকে নিয়েই কি টানা-টানিই না করলাম। সমস্ত মানুষকে কোন কিছু বিচার বিবেচনা না করে ঘরে তুলে নিয়েছি।···ঐ প্রিয়নাথ সেন, স্বজাতি নয়, বাড়ুই—অথচ আমার আশ্রমে তিনি এমন ভাবে থেকেছেন যে কারো বোঝবার সাধ্য ছিল না ···এমনি প্রত্যেকের সম্বন্ধে।···আমি তো কোনদিন

কাউকে বাইরে রাখি নি।...আজ দেহ ক্লান্ত,...আজ ঘটনার জটিলতা মাথায় লাগে।...নিতাগোপাল, তোমায় নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতাম—কি জানি কেন তুমি ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত মানুষের মধ্যে...ভাবলাম বিশ্বটাকে একটা ঠেলা দিয়ে যাব—তাও পারি নি—আমার ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য কে বসে থাকবে?...নিতাগোপাল, তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়...তোমার স্নেহে, তোমার জ্ঞানে, তোমার আনন্দে যদি আমার পরাজয় হয়, তবে সেই তো আমার জয়।... দুধের থেকে মাখন তুলে আনার মত মানুষের দেহ-মন-প্রাণ মন্থন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম তোমাকে... তুমি সাক্ষী···দেহ-প্রাণ-স্নেহ-অর্থ সব দিয়ে আমি সকলকে অকৈতবভাবেই চেয়েছি।··আমার জাত নেই, কুল নেই, কিছু নেই···মানুষের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম তবু যদি মানুষকে পাই...আমার জীবনের প্রণাম তোমায়··আর কথা কাটাকাটি সহ্য হয় না—চাই স্নেহ। শেষ কটা দিন একটু স্নেহে কাটিয়ে দিতে চাই।·· ঠাকুর, তোমার দর্শন হইল, হইল তোমার বিশ্ব...আমি কি করব, তোমার প্রচার তুমি করো।.. ঐ রামপ্রসাদের গান—সংসারে পাটিয়ে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।···ঠাকুর, লোহাপেটা তুমি আমায় করেছ—আজও তো তোমায় চাই—আজও আবার আশ্রম করি, আজও এদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা মিটাবার চেষ্টা করি।...আমার প্রণাম তোমায়, তোমার আমার নমস্কার, নমস্কার।...ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ—এই প্রার্থনা শুধু ছিল। মানুষ নিজেকে নিজে চিনুক—তার অন্তরের ব্রহ্মবস্তুকে সে চিনুক—এই দেখতে চেয়েছিলাম···।

৮-৯-৫৬।···উষাঙ্গিনী দেবীকে কি চোখে আমি দেখেছি সেটা তোমাদের বলে রাখা ভাল।···১৩১০ সনের ১৮ই অগ্রহায়ণ ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়—ওঁর তখন ১২ বৎসর বয়স, আমার ১৯। দীক্ষা হয় আমার দুই বৎসর পরে ১৩১২ সনের ১২ই অগ্রহায়ণ।···ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ জজকোর্টের ট্রান্সলেটার ছিলেন, ওঁর বাড়ী ছিল শ্রীনগরের কাছে ছুরপাড়া গ্রামে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি এই ধারণা চুকিয়ে দিয়েছিলেন যে কামিনী ব্রহ্ম, কাঞ্চন ব্রহ্ম। সংসারের কোন বস্তুকেই ব্রহ্মবুদ্ধি ছাড়া দেখলে তার সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক হয় না।···কালীপ্রসন্নবাবু ছিলেন পরম সাধক।···কামিনী-কাঞ্চন বর্জন—এ রকম আলোচনা তাঁর ভাল লাগত না, তাই রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠে তিনি যেতেন না।···তিনি যে কত বড় মুক্ত পুরুষ ছিলেন!...আমার জীবনে তাঁর প্রভাব খুব বেশী।···যতখানি পেয়েছি ব্রহ্মসূত্রের—ব্রহ্মদৃষ্টি উৎকর্ষাৎ মনকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি···সব কিছুকে বড় চোখে দেখো। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলেই ছাইও কত গাছের খাদ্য, তোমার অন্ন চালতাল গাছের অন্ন ছাই মলমূত্র। পত্নী শব্দের অর্থ দিচ্ছেন পানিনি—পত্যুঃ ন যজ্ঞ সংযোগে—আত্মদানের সহায়কারিনী; নিজেকে আমি ভগবানের কাছে বিলিয়ে দেব তাতেই সহায় হবেন পত্নী। পত্নীত বন্ধনের কারণ নয়।...সারদাদেবীর মহিলা শিষ্য ২৪।২ শানগর রোডের আশ্রমে উষাঙ্গিনীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি সন্ন্যাসী তবে আপনার স্ত্রী সঙ্গে কেন? আমি বলেছিলাম স্ত্রী সঙ্গে থেকে প্রমাণ করবে যে স্ত্রী হয়েই তাঁরা মালা-ঝোলা কেড়ে নেন না। আর আমি প্রমাণ করবো স্ত্রী থাকলেই পুরুষ বিপথে পড়ে না। উষাঙ্গিনী আমার বন্ধনের কারণ হয় নি। যেখানে একজন আর একজনকে বাঁধতে পারে সেখানে পরস্পরকে ত্যাগ করা ভাল।·· উষাঙ্গিনী তার নিজস্ব যে সমস্ত যোগ্যতার জন্য পূজা পাবেন তার কয়টি বলি। কোনদিন কারো নিন্দা করেন নি, কোনদিন ওর পরশ্রী-কাতরতা দেখিনি, কোনদিন নিজের সন্তানের সঙ্গে পরের সন্তানকে পৃথক করতে দেখিনি, যখন বৃন্দাবনে গেলাম নিশ্চল করে রেখে গিয়েছিলাম, কিন্তু এতটুকু বাধা দেন নি, নিজের সমস্ত অলঙ্কার নিঃসঙ্কোচে দান করেছেন—অথচ অলঙ্কার সম্বন্ধে সাধারণতঃ নারীর একটা দুর্বলতা আছে। অনেকের অনেক দোষের কথা জানেন, কিন্তু কখনও ওর পেট থেকে তা বেরোয় না, সংসারে এই ভাবে যদি পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পারে তবে সংসারে নরনারী মুক্ত হয়।···বন্ধনে যোগায় জীবনের

রস, মুক্তি যোগায় তার। যার মন গোবিন্দে গেছে, তার বন্ধনেই বা কি এসে যায়, মুক্তিতেই বা কি এসে যায়।···পরিচ্ছিন্নের সঙ্গে পরিচ্ছিন্নের মিলন কোনদিন হয় না—বিশ্বরূপ নর নারীর মিলন সত্যকার মিলন·· আমার সমস্ত চিঠি—ওঁনার কাছে লেখা...রাস্তায় চলো লক্ষ ছেলের মা হবে···মায়ের কোন জাত নাই।· আমি আগে যাব না, উনি আগে যাবেন জানি না—আমি গেলে তোমরা ওঁকে শ্রদ্ধা করো···আজ তোমরা ছুটাছুটি করে যে যতটুকু পেয়েছ করেছ—এটা আমার ভাল লাগল···পূজা পাওয়ার যোগ্য উনি...নিত্যগোপাল মন্ত্রে ওঁকে দীক্ষা দেই—বৃন্দাবন থেকে এসে।...

৭-৯-৮৬—ওঁ নমো ভগবতে···ওঁ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন (ভাঃ-১১-) যে উদ্ধব, 'যৎ কর্ম্মভিঃ যৎ তপসা' ইনিয়ে 'সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তঃ লভতে অঞ্জসা'। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধামও যদি কখনও চায়—তবে চায় না তারা।—ব্যাপারটা কি? বিশ্বের সমস্ত সাধনার যা ফল তা ভজনে আসে, অনায়াসে আসে। 'কর্ত্তুম অকর্ত্তুম অন্যথম্' তাই অব্যয়—তা কখনও ফুরিয়ে যায় না। ঠেলা-ঠেলি গুঁতোগুতি করে সাধনার কথা ভাগবত বলে না—যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী এরা সব ঠেলাঠেলি করে করেন—এটা জীবন-সাধনা নয়। কৃষ্ণ বললেন আমি জীবন বল্লভ, আমার সঙ্গে একাত্ম হও অনন্ত ভাবে যুক্ত হও—আমার যা কিছু তা পাবে।···জীবন অন্তর্মুখী গতিতেও যায় বহির্মুখী গতিতেও যায়—যেমন রক্ত একবার সে ছড়িয়ে পড়ে আর একবার সে গুটিয়ে ব'সে lungs শুদ্ধ করে—বহির্গত থেকে নিয়ে নিয়ে heart সমস্ত রক্তটা ছড়িয়ে দেয়,···সাগরের সঙ্গে যদি নদী যুক্ত থাকে সে শুকিয়ে যায় না···আমি জীবন বল্লভ আমার সঙ্গে যুক্ত থাক, জীবন শুকিয়ে যাবে না···তোমার বুদ্ধি তোমার বুদ্ধি—সেটা তো আমার বুদ্ধি নয়···বাঁচতে হলে সকল বুদ্ধিকে মেলাতে হবে···কি করে হবে···আমার বুদ্ধি নিতে হবে···ভক্তিবাদে বিরাট সংযম, বিরাট তপস্যা—মায়ের তপস্যা—স্বভাবতই তার খেতে ইচ্ছে করে না—লোক আছে খাওয়া উচিত নয়—এ বড় ঠেলাঠেলি···তেমন হেডলেসনা জীবনে নেই। কৃষ্ণ বললেন তোমাকে সব হতে হবে···কৃষ্ণ বিশ্বের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর কাম সাধক।···ভক্তি পরম তপস্যা—দেহদান, প্রাণদান, মনদান ···শুধু বাহিরের ত্যাগ ত্যাগ নয়—বাহিরের ত্যাগ, ভিতরের ত্যাগ।···তপস্বী ক্লান্ত কেননা তার লোক আছে অথচ খাবে না এই ব্রত লইয়াছে।···তপস্বীরা কি দিয়েছে? ভক্তেরা অনেক দেশী দিয়েছেন। দিতে সংসারে হবেই।···বন্ধকে তুমি তোমার কাছে রাখবে? সমস্ত বিশ্ব পিছনে লাগবে—রাখতে তুমি পারবে না—গোবিন্দায় নমঃ বলে দিতে হবে—সেই দেওয়ায় সব কিছু অমৃত হয়ে ফিরে আসে···অমৃতের পুত্র—মৃত্যুর পুত্র তো নও—কিন্তু অহংকার থাকলে কিছু হবে না। তোমার কর্ম্মের লক্ষ্য থাকবে বিশ্বসেবা—অনন্তকাল সেবা ক'রব—আহুত মূর্ত্তি—সেবা করব—ভক্ত—ভজন—কর্ম্ম, জ্ঞান। ভজনা করতে গেলেই অদ্বৈত হতে হবে—তাঁর মত ক'রে ভজন করতে হয়—বাহ্যাপূর্ত্তেঃ প্রভুবতী হরেঃ—রাধিকা একলা—কি গভীর তপস্যা—রাধারাণী আনন্দ চাইছেন না—তাতে সেবা বাধা দেয়—। আনন্দ করে তারা, যারা নিষ্কর্ম্মা—বাড়ীতে জামাই এলে শাশুড়ীর আনন্দ করার অবসর না —বিল্বমঙ্গল চোখ তুলে ফেলেছিল নারীর রূপ আর দেখতে না বলে—সেদিন কৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন সেদিন কাঁদছে বিল্বমঙ্গল—হায়রে চোখ দুটো থাকলে আজ দেখতা তোমাকে—কৃষ্ণ এবার তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—রাধা পরিচয় দিয়ে দুধ খাওয়ান—রাখাল, আবার কি আ তোর প্রেমে আটকে পড়ব?···হাত ছাড়, হাত ছাড়—

"হস্তম্ উৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম!
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥

তবে—আবার বিল্বমঙ্গল চোখ পেলেন-ভক্তিবাদে একবার চোখ বোজে, আবার চো মেলে—দেহ যে অনন্ত—অনন্ত দেহ দিয়ে তাঁর সে করব—কর্ম্মীর দেহ, জ্ঞানীর দেহ·····" নিত্যগোপা কৃষ্ণ দর্শনের সমস্তটুকু কথা নিয়ে এসেছেন—আমার তা তাঁর চরণ আমার এ মস্তকে হৃদয়ে স্পর্শ দিয়েছিল—।

ক্রম

ভাগবতের ঠাকুর

(স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত)

ভাগবতের ঠাকুর ভগবান্। ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বের পরস্পর-বিরোধী সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গিয়েছে; ভাগবত তাইতো "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্," সুখবাদ ও দুঃখবাদ একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রেই পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিশ্বের মোহন মধুর ভগবৎসত্তা প্রমাণ করছে। ভগবান্ কেন কেবল সুখ দিয়ে বিশ্ব না গড়ে, দুঃখের অবতারণাও সেখানে করেছেন, এ প্রশ্নের মিমাংসা করতে গিয়ে বহু মতের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু ভাগবত ছাড়া কেউ এ পর্য্যন্ত সুমীমাংসা প্রদান করেন নি। ভগবান্ দুঃখ দিয়ে বিশ্ব, এবং সুখ দিয়ে বিশ্বের অতীত রাজ্য গড়েছেন। আর জীব দুঃখের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে সুখের রাজ্যের অনুসরণ করে—ইহাই হচ্ছে প্রচলিত যত শাস্ত্রের মত। এই মতে বিশ্বকে ব্যাখ্যা দেবার একটা প্রচেষ্টা চলছে বটে, কিন্তু এ ব্যাখ্যান এত ছেলেমানুষী, যে এতে ভগবানের দৌরাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। বিশ্বের জন্য বিশ্বের কোন মূল্য নেই, বিশ্বের মূল্য কেবল বিশ্বাতীত অপর কোন বিসদৃশ সত্তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য, এতে কি বিশ্ব-সৃষ্টির বাস্তবিকতা ব্যাখ্যা হয়? বিশ্বের নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই, বিশ্ব অনন্তকাল থেকে আত্মার প্রয়োজনেই লাগবে, এর চেয়ে বিশ্বের উপর গুরুতর অপমানের ভার আর কে চাপিয়েছে? বিশ্বসৃষ্টিতে যে বিশ্বনাথের কোন সার্থকতা আছে, তার কি কোন বাস্তব পরিচয় এতে মেলে? বিশ্ব-সৃষ্টিতে ভগবান ব্যর্থ। এত বড় Exploitation-এর ধারণা হৃদয়ে নিয়ে যে বিশ্বনাথ বিশ্ব রচনা করেন, তার পূজা, তার নাম-রূপ, জগৎ থেকে ধুয়ে মুছে যাওয়াই উচিৎ। আর গিয়েছেও তাই। যেদিন থেকে ভগবানকে সব শোষণকারীদের আদি পথপ্রদর্শকরূপে [illegible] সেদিন থেকে বিশ্ব ও বিশ্বনাথ দুইই জড়-জড়ি করে কালের আবর্তে ডুবে মরেছে। বিশ্বসৃষ্টি ভগবানের চাল (Policy), তার মূল তত্ত্ব (Creed) হচ্ছে গোলকসৃষ্টি। যে জিনিষটা সনাতন নয় বলে শাস্ত্রে, যুক্তিতে, ব্যবহারে প্রতিদিন বর্জন আওড়াচ্ছি, গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে তাতে শৃঙ্খলা রক্ষা করবার যতই চেষ্টা পাই না কেন, সে শৃঙ্খলা কি সেখানে রক্ষিত হয়? এ মতে বিশ্বকে কলকারখানার চেয়ে আর বেশী কিছু মনে করা যেতে পারে না; বিশ্বের যোগমায়া তত্ত্ব (organism) এ মতে টেকে না। সংসার যদি আত্ম-জ্ঞানের পাশাপাশি নাই রইল, তা যতই আত্মজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় বলে সেখান হউক না কেন, আত্মজ্ঞানী কিছুতেই সংসারকে আত্মজ্ঞানের অনুকূল করে কাজে লাগাতে পারে না। যার উপরে ব্রহ্মদৃষ্টি নেই তা দিয়ে কোন ব্রহ্ম চলবে? যে সংসার অব্রহ্ম, সে সংসার কখনও সাধককে ব্রহ্মে পৌঁছাতে পারে না। অব্রহ্ম যদি ব্রহ্ম হবে, এর যুক্তি প্রদর্শন করবার সামর্থ্য কারও আছে কিনা জানি না। যে যা নয়, সে তা হবে কি করে?

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"—শ্রীগীতা। বিশ্ব যখন নিতান্তই এই মতে অসৎ, তখন তা দিয়ে ভাব-সাধনা কল্পনায় আঁকা যেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবিকতার কোন সম্বন্ধ নেই। অসৎ দিয়ে ভাব-সাধনার উপদেশ করে করে আর্য্যস্থান সকল ভাবের অসত্তা এনে দিয়েছে। বিশ্বে আজ সকল ভাবের অভাব। আজ বিশ্ব ভাবহীন অর্থাৎ এর সত্তা আজ লুপ্ত, বিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোন অভিপ্রায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিশ্বে আজ স্বভাবের স্থান অভাব অধিকার করেছে, বিশ্বের সকল ক্রিয়া আজ স্তম্ভিত, নিজের মুণ্ড নিজে কেটে নিজের রক্তপানে উদ্যত; বিশ্বের আত্মা আজ ব্যাপিত্ব হারিয়ে খণ্ড, অভিখণ্ড-বিবরে লোলুপ। বিশ্বে আজ চলছে সংসার-লীলা। জন্মলীলা

আজ মুখের কথা; বিশ্বের সকল বিভূতি আত্ম-গোপনে ব্যস্ত, এখানে বিজ্ঞান-বিভূতিকে সড়িয়ে দিয়ে এনেছে—মহা অজ্ঞান; বিশ্ব আজ বুদ্ধিশূন্য কোন মীমাংসার জন্য এর দরদও নেই, আর মীমাংসা করবার উপযোগিতাও নেই; বিশ্বের জন্তু আজ ভীত, ত্রস্ত, কম্পিত, সর্ব্বদা "ত্রাহি" "ত্রাহি" রব। সর্ব্বত্র চলছে দলাদলি, কাটাকাটি, বিশ্বলীলা আজ ধ্বংসের পথে; এ রাজ্যে রাম-রাজা আজ কল্পনা, সকল খেলার নায়ক শ্রীভগবান্ আজ যেন খেলা হতে দূরে সরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন; আর সব খেলোয়ার কক্ষচ্যুত হয়ে নিজেরা ঠোকাঠুকি করে মরছে। এই যে তাদের ব্যর্থতা, একি বিশ্বের অনাত্মাকে শক্ত করে ধরলে অনন্তকালেও দূর করতে পারবে? আর সেই বা কোন জল্লাদ ভগবান যে জীবকে দুঃখ দিয়ে, জীবের মাথায় ভাঙ্গর মেরে জীবকে নিজের পথে আনতে চায়? সর্ব্বশক্তি ধরের পক্ষে এ লীলা বড়ই হাস্যোদ্দীপক। কোন অন্ধ পিতা—তার ১ বছরের খোকাকে শক্তি দিয়ে শাসন করতে চায়? আর সেই বা কেমন ভগবান্, যে জীবকে পরীক্ষা করবার জন্য কেবল দুঃখই দিচ্ছেন? তিনি পরীক্ষা গ্রহন করলে পাশ করবার সামর্থ্যই বা কোন সাধক রাখে? আর যিনি সব জানেন, তার পরীক্ষার দরকারই বা কোথায়?

ভাগবত তাই ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন:—

অন্তঃ পুরুষরূপেণ যো বহিঃ।
সমবেতোষ ভূতানাং ভগবান আত্মমায়য়া॥

"যিনি আত্মমায়া প্রভাবে ভূতসমূহের অন্তরে পুরুষরূপে ও বাইরে কালরূপে থেকে সমস্ত বিধান করছেন, তিনিই ভাগবতের ঠাকুর ভগবান্। কেবল বাইর দিক দিয়ে খুজলে যাকে পাওয়া যায়, তিনি ভগবান্ নন; আবার কেবল ভিতরে খুজলে যাকে পাওয়া যায়, তিনিও ভগবান্ নন্। ভগবান্ কেবল সুখের নন্, ভগবান্ কেবল দুঃখেরও নন্। আত্মার বাস্তিবেকী প্রমাণ হচ্ছে দুঃখের পথে; এই পথে প্রকৃতি পুরুষকে খুজে খুজে পুরুষের নাগাল না পেয়ে মজ্জিত হন। আত্মার অস্তিত্ব মনে প্রাণে হয় সুখের পথে; এই পথে আত্মা প্রকৃতির পথে প্রকৃতিকে খুঁজে খুঁজে প্রকৃতির মাঝে ঝাঁপ দেন।

মরি কার রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে কাল গৌর হল।

কারে ধরবে বলে ঝাঁপ দিলে, পেলে না নদে' উঠেছে।

পুরুষের পিছু পিছু প্রকৃতির ছোটান হচ্ছে দুঃখবাদ। এখানেই শ্রীভগবান অন্তরে পুরুষ রূপে। প্রকৃতির পিছু পিছু যখন পুরুষ চলেন্, তখনই লীলা বা সুখবাদ; এখানে ভগবান্ কালরূপে বাইরে। ভগবান একাধারে "বিষামৃতে একত্র মিলন।" যারা কেবল অন্তরে চোখ মুদে ভগবানকে পেতে চান তারাও ভগবানকে পাবেন না, আর যারা কেবল চোখ খুলে বাইরে ভগবানকে চান, তারাও ভগবানকে পাবেন না। অন্তরে পেতে পথ হচ্ছে Spiritualisation of matterএর পথ; বাইরের পথ হচ্ছে Materialisation of spiritএর পথ। কোন একটি ধারায় বিশ্ব-তত্ত্ব বোঝা যায় না কেমন করে জড় চেতন হয় এ তত্ত্ব যেমন জড়বাদীরা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেমন করে চেতনই বা জড় হয়, এ তত্ত্ব চৈতন্যবাদী বা বিবর্ত্তবাদীরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না বিশ্ব সৃষ্টিকে কেবল জড়ের বিকাশ বা কেবল চৈতন্যের বিকাশ বল্লে, সৃষ্টি ভগবানের গীতাপুথী ব্যাপারে পরিণত হয় ভাগবতের ভগবানকে তাই জড়ের দিক ও চৈতন্যের দিক দু'দিক দিয়েই ধরা যায়। বিশ্ব একটা চক্রব্যূহ; কেবল ঢুকতে জানলেও চলবে না, আবার এর ভিতর না ঢুকে কেবল বাইরে বাইরে থাকলেও চলবে না। অভিমন্যু চক্রব্যূহের অন্তরে ঢুকতে জানতেন, বাইরে বের হতে পারতেন না, তাই ত তার পক্ষে মৃত্যু অনিবার্য্য। এ বিশ্ব-রাধাচক্রের অন্তরে ধ্যানের পথে ঢুকে যারা বাইরে আসবার রাস্তা আর খুজে পান না, তারাও একরূপ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপ দেন। বাহিরেও মরণ যদি সেখানে পুরুষের প্রকাশ না থাকে, অন্তরেও মরণ যদি সেখানে প্রকৃতির কোন স্পর্শ না থাকে অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতি পুরুষের গন্ধ সহ্য করতে পারে না পুরুষও প্রকৃতির ছায়া মাড়ান না, সেখানে উভয়ই মরণধর্ম্ম কেউ অমর, অমর নন।

ভগবান দুঃখ দেন, সুখকে আরও ঘন করে পাবার জন্য—ভাগবত এ মতবাদ স্বীকার করেন না। ভগবান দুঃখ দেন দুঃখকেও আস্বাদন করবার জন্য। সুখও অনন্ত, দুঃখও অনন্ত; এই দুই অনন্তকে যিনি সমন্বয় করেন, তিনিই বিশ্বাতীত একত্র মিলন শ্রীভগবান্। দুঃখের সাধনায় যে আত্মা, সুখের সাধনায়ও সেই একই আত্মা। যিনি যতখানি আত্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে গিয়েছেন, তার অনন্ত দুঃখকে আস্বাদন করেই এগিয়েছেন। দুঃখের আস্বাদন যার জীবনে যত কম, তিনি ততখানি আত্মজ্ঞান হতে দূরে। শিব, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, যীশু, হজরত, রাধা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, হরিশ্চন্দ্র, নল প্রভৃতি কি দুঃখই না জীবনে আস্বাদন করেছিলেন? জীবন কেবল সুখেরও নয়, কেবল দুঃখেরও নয়, সুখে দুঃখে মাখামাখি। কতক অংশ সুখের, কতক অংশ দুঃখের, এত বাস্তব কথা নয়। সুখের অন্তরে দুঃখ, দুঃখের অন্তরে সুখ। সুখ দুঃখে আধা-আধি সম্বন্ধ। মহাপুরুষ বলতে আমরা বুঝি, যিনি হাসেন না, কাঁদেন না, কোন কিছুতে বিচলিত হন্ না। মহাপুরুষত্বের এই বাপকাঠি নিয়ে মাপলে শিব ভগবান হওয়া ত দূরের, ঘোর স্বৈর ছাড়া আর কিছুই নয়। শিব যদি জ্ঞানী, শিব যদি যোগী, তবে স্ত্রীর তত্ত্বত্যাগে অত অস্থিরতা কেন? আবার সেই অস্থিরতাকে বা এত করে পুরাণাদিতে বর্ণন কেন? শিব বড় কেন জান? তিনি কাঁদতেও জানতেন, হাসতেও জানতেন, তাই তার হাসি কান্না দুইই গৌরবের। আমরা নির্বিকার হতে গিয়ে যতই কান্নার গলা টিপে হাসির ফোয়ারা ছোটাতে যাই, ততই হাসির বিকার হাসি ও কান্না, দুইকে কেড়ে নিয়ে অবসন্নতার মাঝে ডুবিয়ে দেয়। সংসারীর কান্না ও শিবের কান্নার পার্থক্য ছিল, তাই অত ব্যাকুলতার পর আবার তিনি সমাধিস্থ হতে পেরেছিলেন। হাসিতেও সমাধি, কান্নায় ও সমাধি, তাই তিনি মহাসমাধির মূর্ত্ত-বিগ্রহ। নির্বিকার, নির্ভুল হতে গিয়ে ভীষণ বিকার দেশকে উৎসন্ন করছে। কান্নার পথে কাঁটা দিয়ে হাসির পথে ব্রহ্মকে খুঁজতে গিয়ে বড়র সাক্ষাৎ হয়নি, যা কিছু ছোট, যা কিছু সঙ্কীর্ণতা, যা কিছু আধার প্রিয়তা, সব আমাদের গ্রাস করেছে। কান্নার পথেও যে পরিপূর্ণ ভগবান্, এ কথা কান্নার সময় না ভনিয়ে, তখন হাসাবার ব্যবস্থা করা আত্মার উপর ভীষণ জুলুম; এই জুলুমের ফলে বর্ত্তমান জগত বিমর্ষ, উদ্যোৎসাহ, নির্বীর্য, আত্মেন্দ্রিয়-পরায়ণ, ক্লীব। ভগবান ছোট দুঃখ দেন, অনন্ত দুঃখের অধিকারী করার জন্য। দুঃখকে আমরা যতখানি ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল বিবেচনা করি, ততখানি প্রতিকূল ত নয়ই, বরং ভগবানকে সুখময় অপেক্ষা দুঃখময় বলেই যেন মনে হয়। সুখের পথ তামসিকতার পথ, যদি দুঃখ সুখের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করে। দুঃখকে জীবনে বরণ না করে কে কবে বড় হয়েছেন? দুঃখকে যেদিন থেকে ঘৃণা করতে শিখেছি এবং দুঃখকে অনাত্ম-কাবের বিকাশ বলে অনাত্মাকেও অবজ্ঞা করতে সাহসী হয়েছি, সেদিন দেশ ডুবেছে, ধর্ম ধারণ করবার সামর্থ্য হারিয়েছে। দুঃখ না দিয়ে সর্বনাশ না করে কি কোন ভগবান এ পর্য্যন্ত কাকেও কৃপা করেছেন? পাওয়ার যদি শেষ থাকত, দুঃখের অবসান হত বটে। কিন্তু "যত পাই তোমায় তত আরো চাহি, যত জানি তত জানি না,"—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং,"—ইহাই হচ্ছে যে রাজ্যের শাস্ত্র, সে রাজ্যে না পাওয়ার দুঃখে যে সর্বদার জন্য সাধককে চোখের জল ফেলতে হবে, এও কি বুঝতে খুব কঠিন? সুখ কোথায়? অনন্ত সুখকে কি পাওয়া যায়? না পাওয়াই যখন জ্ঞানের স্বরূপ, যিনি অধরচাঁদ হয়েই চিরদিন রইলেন, তার সম্বন্ধে সুখের কল্পনা বা পাওয়ার কল্পনা বাতুলতা। অন্তরের দিকেই খোঁজ, আর বাইরেই খোঁজ, কিছুতেই পাবে না, অথচ পাবার জন্য জীবকে খুন হয়ে মরতেও হবে। যেখানে "পেয়ে যাওয়া" আছে, সেখানে ভগবানের নাম-গন্ধও নেই। ভগবানকে কেউ পায় নি, ভগবানকে ভাল-বেসে ফেলতে পারেনি, অথচ এই পাবার পথে, ভালবাসার পথে কি-যেন-কি এক টানে বিহ্বল হয়ে সাধক ছুটছে। যেখানে "পাওয়া" সেখানেই মৃত্যু। "না-পাওয়া"র ভিতর যে "পাওয়া", তাই ভাগবত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান অশেষ; কিছুরই শেষ তাতে নেই। পাওয়ারও শেষ নেই। তিনি শেষ-শায়ী; শেষের উপর তার শয্যা। যার

শেষ আছে, তা ফুরিয়ে যায়। "শেষ আছে"—স্বীকার করলে সৃষ্টির কোন প্রাণময় ও জ্ঞানময় ব্যাখ্যা হয় না। "নেতি নেতি—" মন্ত্রের তাৎপর্য্যও ইহা। "ইতি" শব্দের অর্থ "শেষ"; "নেতি", কিছুরই শেষ নাই। উপনিষদ বলছেন, "শেষ নাই", "শেষ নাই", কিছুরই শেষ নাই। দুঃখও যখন অশেষ, শেষ-নাস্তী শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি। জড়কে, অনাত্মাকে, দুঃখকে শেষ ক'রে চেতন, আত্মা ও সুখের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই আমরা প্রকৃত পক্ষে বীভৎস, মিথ্যা, জড় অনাত্মা দুঃখের উপাসনা কচ্ছি। ভগবানই আছে, জড় নেই, অনাত্মা নেই দুঃখও নেই। যা কিছু অনাত্মা, তা তাকে পাবারই একটি ধারা, আবার আত্মা, তা তাকেই পাবার আর একটী ধারা। একটী অন্বয় ধারা, অপরটী ব্যতিরেক ধারা। ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বেদব্যাস লিখছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতো অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ।"

কেবল ব্যতিরেকী ভাবের সাধনায় আজ সব গিয়েছে। সমাজ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সমাজ, জাতি ব্যতিরেকে সত্য, অহিংসা এবং সত্য, অহিংসা ব্যতিরেকে জাতিকে ধরতে গিয়ে ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি সব হারিয়েছে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সমাজ এবং ধর্ম্মের অন্বয়ে সমাজ - ইহাই না ধর্ম্ম ও সমাজের বাস্তবিক সম্বন্ধ! যখন ধর্ম্মের পিছনে সমাজ ছোটে তখন ধর্ম্ম হয় সমাজের অধম, তখনই আসে সমাজে বিপ্লব, যার ভিতর দিয়ে তামসিকতা (Rigidity) চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়; আবার তখন সমাজের সেবায় ধর্ম্ম লেগে যায়, তখনই সমাজে আসে শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম তখনই যাত্র সমাজের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। ঝড় না এলে যেমন বায়ু শোধন হয় না, তেমনি ব্যতিরেকী ভাব না থাকলেও সমাজ-শোধন হত না। ব্যতিরেকী ভাব হচ্ছে আত্মার বিপ্লবময় কালী-তত্ত্ব, অন্বয়ী ভাব হচ্ছে আত্মার গঠনময় কমলা-তত্ত্ব. কালী-কমলার সমন্বয়ে ভাগবতের ঠাকুরটী বাংলা দেশকে কৃতার্থ কচ্ছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবটীকে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ একটী শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সে শব্দটী হচ্ছে "পরকীয়।" পরকীয় প্রেম সুখও নয়, দুঃখও নয়; জড়ও নয়, চেতনও নয়; আত্মাও নয়, অনাত্মাও নয়:

"পরকীয় বিনু নহে রসের উল্লাস।"—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহর্ষি বেদব্যাস সকল নিগমকল্পতরুর ফল এই ভাগবত গ্রন্থে পরকীয় সাধনার যে দার্শনিক সূত্রগুলি উদ্ঘাটন করেছেন, যার আস্বাদনে বাঙ্গলা দেশ একদিন মাতোয়ারা হয়েছিল, যে কল্পতরুর রসময় ও ভাবময় ফল এ কাল পর্য্যন্তও জগৎ আস্বাদন করতে পারেনি। আজ নিগূঢ় ভজনই বাংলা দেশকে সমগ্র জগতের বুকে দাঁড়িয়ে প্রচার করতে হবে। পরকীয় শ্রীভগবত্তত্ত্বই মনে হয় বাঙ্গালার প্রাণনাথ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণ-তত্ত্বের প্রচার করবার দায়িত্ব গৌরাচাঁদের সাধের বাঙ্গলার উপর শ্রীগৌর ন্যস্ত করেছেন। আজ এই গৌরন্যাসকে কালীগৌরের চরণতলে সার্থক করবার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আশা আছে, সাহস আছে, তিনিই এ পথের পথিক হয়ে সকলকে "মামেকং শরণং ব্রজ"—বুলি শোনাতে শোনাতে জগতকে ব্রজের পথের পথিক করবেন। বন্দেমাতরম্।

সংস্কৃতির ত্রি-ধারা

॥ ফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

সংস্কৃতির ত্রি-মুখী বিকাশ। ব্যক্তিক, দলীয় এবং সামাজিক। এই বিকাশ-ধারা, এই উদ্ভাসনের প্রবাহ ব্যক্তি থেকে শ্রেণীতে, শ্রেণী থেকে সমগ্র সমাজে ক্রমসঞ্চরণশীল। সংস্কৃতি স্থিতিশীল হ'লে, ধাপে ধাপে এই প্রগতি সম্ভব হোত না। ব্যক্তি বিশেষের সংস্কৃতি, শ্রেণী সংস্কৃতিকে ক'রে প্রভাবিত। এবং দলের প্রভাব ব্যক্তির সমষ্টি সেই সমগ্র সমাজের পর্যায়ক্রমে রূপান্তর ঘটায়।

তা' হ'লে সাংস্কৃতিক পরিণতির ধাপও তিনটি। ব্যক্তি-উন্মেষের দুয়ার খুলে, শ্রেণী-উদ্ভাসনের পথ হ'য়ে, সে পরিণামের ধারা গিয়েছে সমগ্র সমাজ বিকাশের দিকে। এই প্রবাহের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চার চলেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে। নগণ্যতম গ্রাম-ধারার মধ্যেও আছে এই উদ্ভাসনের সংকেত। সেই গ্রাম কেন্দ্রের উৎসের অনুসন্ধান ক'রে চলেছেন জীবাণুতত্ত্ববিদ কৃষিতত্ত্ববিদ।

এই ভাবে বহু গবেষণার পর নৃতত্ত্ববিদ এসে পৌঁছেছেন মানবিক ব্যক্তি সত্তার সেই মন ও মেজাজের ক্ষুরণের জগতে। টি-এস-ইলিয়ট তাঁর নোটস্ টু-ওয়ার্ডস্ দি ডেফিনেশন অব্ কালচারে এই কথাটারি প্রতিধ্বনি করেছেন। বলেছেন যে, Culture is applied to the manipulation of lower organisms to the work of bacteriologist on the agriculturalist. এই হ'লো আদিমতম পর্যায় থেকে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক ধাপ। আর এর শেষ পর্যায় হ'লো মানুষের মেজাজ এবং মনের উর্ধ্বায়ন। যাকে ইলিয়ট improvement of the human mind and spirit বলে অভিহিত করেছেন।

সংস্কৃতির প্রবাহ অখণ্ড। তার প্রবাহের স্তরগুলো সেই অখণ্ডতায় বিধৃত। কাজেই সংস্কৃতিকে বুঝতে হ'লে, তাকে দেখতে হবে তার সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষণ থেকে। যেখানে ব্যক্তি, দল আর সমাজ ওতপ্রোতঃ হ'য়ে আছে। ব্যক্তি-বিকাশের ধারাটি তখনই বুদ্ধি-গ্রাহ্যরূপে বোধগম্য হবে, যখন দল বা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যাচাই করে দেখা যাবে। কেননা ব্যক্তি-জীবনের এই সাংস্কৃতিক উন্মেষের ধারাটি দল শ্রেণী বা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। মানবিক সংস্কার, পরিবেশ এবং রুচি-মার্জিত আত্ম-সচেতনতা থেকেই আসে conscious aim to achieve culture. মনুষ্য-চরিত্রগত সাধারণ ধারণা কিংবা নৃতাত্ত্বিক ধারণা থেকেও এই আত্মিক-চেতনার ক্রমোন্নতিকে অনুসরণ করা যায়।

সংস্কৃতির ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। অতি আদিম যুগেও মনুষ্য চরিত্রে আচরণগত একটা সংস্কৃতি ছিল। তবে তখনকার রুচি ছিল স্থূল, প্রকাশ ভঙ্গীও ছিল অবশ্য রুক্ষ। ই. বি. টাইলর তাকে আদিম-সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছেন। সেটা কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, তাকে সমষ্টিগত অভিব্যক্তিই বলা চলে। অধুনাতন সমাজে অবশ্য ত্রি-বিধ পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি কথাটার তাৎপর্য বিচার্য। কেন না, নৃতত্ত্ব সমাজ তত্ত্বেরই অনুসারী। সংস্কৃতিবান মানুষ—শিক্ষিত এবং নৈর্ব্যক্তিক এই প্রথম দু'টি অর্থেই কথাটা গ্রহনীয়।

সমাজ ব্যতিরেকে মানুষ যখন সম্ভব নয়, তেমনি মানবিক উর্ধ্বায়নেই সমাজের উর্ধ্বগতি। ম্যাথু অর্নল্ড অবশ্য তাঁর "কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কি" গ্রন্থে ব্যক্তিক বিকাশকেই মানবিক লক্ষ্যের চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। সেটা কিন্তু এক তরফা কথা। শ্রেণী-পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বায়ন ঘটে। পরে তা' আরও নৈর্ব্যক্তিক হ'য়ে সমাজের উন্মেষ সাধন করে।

আত্মিক বিকাশের ধারা সমাজ-অভিমুখীন। অবশ্য ব্যক্তি উন্মেষের উদ্যম থেকে তাঁর তরঙ্গ এসে পৌঁছায়

সমষ্টি-প্রত্যয়ের পরিধিতে। সেই পরিধি ক্রমশ ছড়িয়ে গিয়ে পৌঁছায় সমাজ-পরিধিতে। ব্যক্তিগত-রুচি থেকে ঘটে স্বভাবগত আচরণের পরিশুদ্ধি। যাকে বলে refinement of manners সেই আচরণ-শুদ্ধি থেকেই আসে নাগরিক শালীনতা, যা পরিণামে রূপান্তরিত হয় বৃহৎ অর্থে সভ্য-ভব্যতায়।

এখন প্রথম বিবেচ্য সামাজিক ভিত্তির কথা। ব্যক্তিই সমাজ শ্রেণীর সেরা প্রতিনিধি। এই ব্যক্তি-চরিত্রে থাকে অতীত ঐতিহ্যের সীলমোহর। আর সংস্কৃতি সেই অতীত ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সমাক পরিচিতি। তা যদি হবে, তবে পণ্ডিত মনীষী ব্যক্তিরাই তো সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। সে প্রতিনিধিত্বটাই হ'লো চিন্তা-দর্শনের মাধ্যমে। এখানে চিন্তা-দর্শনের প্রসঙ্গে মনে আসে ব্যক্তি-মনীষার কথা। সেই ব্যক্তি-মনীষা আজ প্রকাশ করে আর্ট-শিল্প-সাহিত্যে। এসংবিধ গুণাবলীই সংস্কৃতির অন্তর্গত।

কর্মগত এই সংস্কৃতিক লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা কিন্তু না ব্যক্তি, না সমাজের পক্ষে সম্ভব। আর এই সমাচরণ শিক্ষা, বুদ্ধি এবং শিল্পচেতনাহীনতা মানুষকে নিয়ে যায় যান্ত্রিকতার দিকে। সুসম স্বভাব বা চৈতন্য-বোধের অভিব্যক্তি ছাড়া আর্ট pedantry মাত্র। বৌদ্ধিক শক্তি অন্য কোন মানবিক গুণান্বিত হলে, তাকে ধার-ভাবিত বলে কল্পনা করা যেতে পারে, তাকে শিল্পকৃতির মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে না।

আর্ট এই বৌদ্ধিক পটভূমি ছাড়া অবাস্তবিকা মাত্র। তা হ'লে নিছক ব্যক্তিক পরিণতির মাধ্যমে কোন মানুষের চূড়ান্ত বিকাশ যেমন সম্ভবে না, তার মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব ঘটেছে ধরে নিতেই হবে। কেন না wholly cultural individual is a phantasm pattern of the society.

কথাটা একটু বিচার করে দেখতে হবে। সাধারণ অর্থে আমরা কোন একটা বিষয়ে কেউ পারংগম হলেই, তাকে আমরা সংস্কৃতিবান বলে ধরে নেই। কিন্তু সংস্কৃতির কোন একটা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান থাকলেই যে তিনি সংস্কৃতিবান, এ কথা সত্য নয়। শিল্প-সাহিত্যে অবদান আছে এমন মানুষের জীবনের গভীরে সংস্কৃতির ছাপ কতটা স্পষ্ট তাই বিচার্য। কেন না এমনও দেখা গেছে যে, কোন একজন মানুষের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান আছে, অথচ তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতিবান নন।

এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি বা শ্রেণী-সংস্কৃতি কথাটা অর্থহীন। অথচ পরিপ্রেক্ষণ হীন হয়ে তা অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন হতেও পারে। কেন না ব্যক্তি, শ্রেণী বা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনই সত্যের স্বীকৃতি পেতে পারে না। তা হ'লে ব্যক্তিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে perfection বলতে আমরা ত্রি-বিধ অবস্থা এবং ব্যবস্থার সমাক সমন্বয়কে বুঝবো। ধর্ম তখনই সার্থক নামা, যখন একদল ধর্মযাজক কি করছে, তা জেনে সেই মতবাদকে লোকে কেবল অনুসরণ করছে, তা'ও নয়; কিন্তু কি করা হ'চ্ছে তা জেনেই যখন একদল পূজারী তাকে শিরোধার্য করে নেয়, তখনই তার সার্থকতা।

এই কারণে দেখা যায় যে, আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কাজ তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবেই বিজড়িত। সজ্ঞানে সচেতন হয়েই তারা যে, এই সব করে, তা'ও নয়। অথচ লেয়ার্ড বলেছেন যে, বীপ বিশেষে দেখা গেছে যে, কোন কোন শিল্প-কাজে আদি-বাসীরা বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেছে। তাই বলে যে, তারা প্রত্যেকেই সংস্কৃতিবান উন্নতরুচির মানুষ, সে কথা ঠিক নয়।

উন্নত পর্যায়ের সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত উপস্থিত হয়, সেখানে অবশ্য বিশেষে এবং অনেক ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক প্রতিভা সক্রিয় হয়ে উঠে। ঘর্ষণের মধ্যেও চলে সৃষ্টির পালা। টি-এস-ইলিয়ট এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন, This friction is, at some stage and in some situation highly creative. এমন কি লিখিত আইনগত বন্ধের মধ্যেও আছে একটা ধর্ম ও রাজনীতিগত আশ্চর্য জটিলতা। এই কারণে

সংস্কৃতির পৃথকীকরণের অর্থই হলো সংস্কৃতির বিশেষীকরণ। অর্থাৎ cultural specialisation. অথচ এই সংস্কৃতির সর্বজনীন সমন্বয় যেমন কষ্টকর বা সময় সাপেক্ষ, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে।

অথচ বিশুদ্ধ সংস্কৃতি বলতে ঠিক কোন বস্তু নেই। ধর্ম ছাড়া সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তি নেই। আবার ধর্ম-নিরপেক্ষ উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতিও যে নেই, এমন নয়। আবার সংস্কৃতি যে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জীবনানুভূতির প্রতিবন্ধক, এ কথাও সত্য বলে প্রমাণিত হ'য়েছে।

অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃতির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে মানুষের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ক্রিয়াকলাপ এবং তার অনুরাগ প্রবণতাগুলো। আবার আমাদের জীবন-ধর্মেরও, তা একটা অভিন্ন অংশ। এই আপাতঃ বিরোধের সূত্রে সোঁড়ামি আর সন্ন্যাস-বিরোধী মনোভাবে এবং জীবন বৈরাগ্যের যেন সমন্বয় ঘটেছে এক আশ্চর্য উপায়ে মানবিক উপলব্ধিতে।

সংস্কৃতিকে বলা হয়েছে সমন্বয়ের অগ্রগতির সুচিহ্নিত ইতিহাস। কেননা বহু বিচিত্র উপাদানেই সংস্কৃতির সৃষ্টি। আদিম জ্ঞান এবং প্রচেষ্টার সামান্যতম নৈপুণ্য থেকে সুরু করে জগৎতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও জীবন-তথ্য পর্যন্ত—যার উপর সমাজ গড়ে উঠেছে—সংস্কৃতির অন্তর্গত। টি-এস-ইলিয়টের ভাষায় বলতে গেলে—This culture is composed of various elements. It runs from rudimentary skill and knowledge up to the interpretation of the universe and of man by which the community lives.

এখানেই ধর্ম-সংস্কৃতির যেন নাড়ীর যোগ। ধর্ম এবং তার সমাজকরণই যেন সংস্কৃতির মূর্ত স্বরূপ। কারণ culture is the incarnation of its religion এটাই যেন জীবন-তাৎপর্যের একটা অর্থ সঙ্গতি এনে দেয়, সংস্কৃতির একটা কাঠামোকে আমাদের ভাবনার সামনে এনে দাঁড় করায়; এবং অগণিত জন-সাধারণকে জীবনের হতাশা আর বিরক্তির হাত থেকে রক্ষা করে। কাজেই এহেন মানব-ভাবনার ত্রি-বিধ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে এবং সম্ভোগেই সংস্কৃতির স্বীকৃতি বা সার্থকতা।

অন্বেষা

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য।

এমন ক'রে মধুর সুরে
কে ডাকে মোর প্রাণ,
তাবে আমার অবাক্ এ মন
নিশিদিন যান।
খোঁজে তারে মুগ্ধ আঁখি,
ব্যাকুল অধর কেঁপে ডাকি'
অন্ত চলে চলিবে
হয় যে ধাবমান।

জানিনে হায় সফল হবে
কবে আমার ব্রত,
জীবন-বেলা ভিড়বে তাঁরি
তীরে অনাহত।
চিত্ত আমার আসীবে যাঁর
নিত্য রসিক সুর-সভার।
সেই অরূপের দৃষ্টি ধারায়
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।

কি ছিলাম--কি হয়েছি—কি হবো—কি হতে চলেছি !!

অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ মঠে বঙ্কিমবাবু দেখিয়েছেন যা কি ছিলেন—কি হয়েছেন—একথা আপনাদের সকলেই জানেন। আজ একবার introspection করে আমাদের নিজেদের দিকে দেখলে হয়ত অনেকেই ভাববেন আমরা কি ছিলাম আর কি হয়েছি। সামাজিক ভাবে দেখলে আমাদের সমাজ-জীবনের গতি ও পরিণতি কোন পথে প্রবাহিত হচ্ছে তাই বা'টার উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের অবতারণা করবো। আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু স্বাধীনতার নামে যে কী স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের জনসাধারণকে বিশেষ যুবক সমাজকে পেয়ে বসেছে একথা দেশের পথে ঘাটে সর্বত্র যে চোখ খুলে চলে তার চোখের সামনে অতি বীভৎস ভাবেই প্রকট হয়। অবশ্য সকলের চোখে হয়ত এটা পড়ে না—অনেকেই এটাকে প্রগতিমূলক বেগে এর স্রোতে গা ঢেলে দেওয়াটাই সমীচিন বলে ভাবেন হয়ত। নিরমানুবর্তিতার অভাব বলে অনেকেই হয়ত এটাকে একটা passing phase বলে মনে করেন, কিন্তু এর মূল যে কোথায় এবং অপ্রতিহত ভাবে এর প্রসার যে দেশের যুব সমাজের হাড়ে ঘুণ ধরাচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের কয়জন অবহিত? অবশ্য অনেকেই বলবেন অবহিত হয়েই বা আমরা করবো কি—এ যে কালের হাওয়া—এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে? কোথায় সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় —"হরে মুরারে" !!

আমাদের যারা নেতা—আশ্চর্য্য তাঁদের গঠন কুশলতা —শিব গড়তে বাঁদর গড়ার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাসের আর কোথায় পাওয়া যাবে? পৃথিবীর ইতিহাস যারা পর্যালোচনা করেছেন—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের উত্থান পতনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত—তাঁরা জানেন যে কোন দেশের ছাত্র যুবক সমাজকে এইরূপ ভাবে উদভ্রান্ত করার কোনো হদিস্ কোথাও পাওয়া যায় কি? হিটলার এক কালে জার্মানীর তরুণদের জন্য যাত্রার পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মুসোলিনীও ইতালীর যুবসমাজকে এ পথে চালিত করেছিলেন— দেশ গড়বার ও দেশের জনসাধারণকে প্রগতির পথে এগিয়ে দেবার কাজে তাঁদের দান অপরিসীম। যদিও পরবর্তী যুগে এ সব ফ্যাসিস্ট নেতাদের পরিণতি অতি ভয়াবহ কিন্তু দেশের জনসাধারণকে তাঁহারা আমাদের দেশের মতন ছাত্র ও জনসাধারণকে এভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে পাঠিয়ে দেন নি। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে সাদামাঠা কথায় বলা চলে যে ভোটের জোরে গদিয়ান একদল। অপর দল যা বলেরা যাঁদের বিরোধী দল বলা হয়—তাঁরা গদি না পেয়ে ক্ষুব্ধ এবং পরবর্তী সংগ্রামে যাতে গদি লাভ হয় তার জন্য সচেষ্ট। এঁদের বক্তব্যের সারাংশ—যাঁরা গদি পেয়েছেন তাঁরা কোনো কাজের নয়, কাজেই "আরি ছোড়ো গদি ছোড়ো"। সেই পরিত্যক্ত গদিতে এঁরা যদি বসতে পারেন তাহলে ভেল্কি দেখিয়ে দেবেন—দেশে ভাত কাপড়ের দুঃখ থাকবে না—সর্বত্রই দুধ ও মধুর স্রোত বইবে। ভাল মন্দের কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমরা শুধু দেখবো যে এই দোটানায় পড়ে আমাদের জন-সাধারণের সামাজিক জীবন কী ভাবে গড়ে উঠছে—আমরা সভ্যতার পথে, শালীনতার পথে, শুভ্রজীবন যাপনে কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের ছাত্র সমাজ যুবক-যুবতী কৃষ্ণ তাদের চোখের সামনে কি দেখছে ও কি ভাবে নিজেদের বাস্তব জীবন ও স্বপ্ন জীবনের সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টায় কতদূর কার্য্যকরী হতে পারছে।

যত মত তত পথ এতো আমরা সকলেই জানি। আবার এও জানা কথা যে নানা মুনির নানা মত। আমাদের সমাজ জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নানা মুনির অবস্থান—এঁদের নিজেদের মতের তথা পথের ঐক্যের

হদিস্ সব সময়ে পাওয়া যায় না। বিরোধী দলেরও অবস্থা তথৈব—কাজেই দেশময় অরাজকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত! এরই মধ্যে আমার স্থির মস্তিষ্ক জ্ঞানীগুণী মুনি যে নেই তা বলা যায় না—কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর অরাজকতার গোলমালে কারো কানে পৌঁছায় না। আমাদের যুগ কাগজের যুগ—পুরাকালের প্রস্তর যুগ লৌহ যুগ, তার যুগ ইত্যাদি বিগত; আধুনিক যুগকে খবরের কাগজের যুগ বলা হয়। প্রচারের ব্যাপারে খবরের কাগজের মত অস্ত্র আর নাই। উহাই আধুনিক জয়ঢাক। যে যত জোর ঢাক বাজাতে পারবে তারই তত প্রচার ও প্রসার। জনমত গঠনে খবরের কাগজের অবদান অপরিসীম। এবং আমাদের দেশে জনমত গঠন যত না হোক হুজুগ লাগাবার দিক দিয়ে খবরের কাগজ—অবশ্য সব কাগজ নয়—যে কত বড় শক্তি ধরে তা সকলের জানা আছে। যে সব খবর ফলাও করে না ছাপাই যুক্তিযুক্ত সেই সব খবর হরদম বড় ছাপিয়ে দু'পয়সা লুটে নিতে এঁরা সব সময়েই দড়—তাতে আখেরে ভাল হোক বা না হোক সেদিকে বিচার করার প্রয়োজন নেই। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় cheap popularity তার জন্যই সকলে ব্যস্ত—নেতা, মহানেতা দল মত নির্বিশেষে সকলেই। আমাদের সরকার ও সরকারী উচ্চতম কর্ণধারগণও এর থেকে বাদ যান না। একটি উদাহরণ দেব—ভারতের প্রধানমন্ত্রী এলেন কলিকাতায় বৈদ্যুতিক রেল চালু করতে—বিশেষ অতিথি রূপের জন্য সরকারী তাবে কড়া পুলিশ পাহারা সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ—এদের ভেতর চোদ্দো যুবক ও বালকই বেশী—সব রকম বিধিনিষেধ অমান্য করে পণ্ডিতজীকে দেখবার আগ্রহে ও তাঁর সঙ্গে করমর্দনের জন্য নিজস্ব শৃঙ্খলা ভেঙে এগিয়ে গেলো—ফলে কিছু হতাহত হল রেলের ইঞ্জিনের চাকায় ও পুলিশী ধাক্কায়। এর জন্য দায়ী পুলিশ অবশ্যই নয়—যদিও জনসাধারণ বলবে লাঠি না চালালে এতটা হ'ত না। নিজেরা নিজস্ব শৃঙ্খলা ভেঙে যে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনলো তার জন্য দায়ী ও নিজেরাই। যাহোক দুর্ঘটনার ফলে অনেককেই হাসপাতালে যেতে হল, কেউ কেউ পরপারেও চলে গেলেন। মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়া ফল ও ফুল লইয়া হাসপাতালে গেলেন ঐ সব আইন ভঙ্গকারী বিশৃঙ্খলা সৃজনকারী দুর্বৃত্তদের সহানুভূতি দেখাবার জন্য। কোথায় গেল শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তি বিধান করা, উপরন্তু তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন, ফলমূল বিতরণ। রাজ্যপাল মহোদয়ার সহিত করমর্দন!! এই সব আইন-ভঙ্গকারী উচ্ছৃঙ্খল যুবক-বৃন্দ সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে গেলে মহলে কি বলে যাওয়া নেবে? "দেখলি—লাট সাহেব এসে দেখা করে গেল, ফল মূল দিয়ে গেল—এই Bravado তারা নিশ্চয় করতে পারে—নিয়ম পালনকারী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যুবক চুপ করে থাকবে—ভাববে এ কেমন বিচার—যে অন্যায় করল তারই জয় জয়কার। কোথায় গেল ডিসিপ্লিন, কোথায় গেল ভবিষ্যৎ জাত গড়ার সোপান? সরকার সম্ভবত humanism-এর দিক দিয়াই আহতদের প্রতি করুণা বর্ষণ করলেন—কিন্তু এর ফল কি হল? এই একই দৃষ্টান্তের পুনরুত্থানের পথ প্রশস্ত হল। আইনভঙ্গকারী বাহবা পেয়ে বিজয়ী বীরের ন্যায় গর্ব্ব অনুভব করল। দেশে অরাজকতার পথ রুদ্ধ না হয়ে প্রশস্ত করা হল। জনসাধারণ অনেকেই ভাবলেন যে সরকারের এই অহেতুক করুণা আর কিছুই নহে আগামী নির্ব্বাচনে যাতে সরকার পক্ষ তথা কংগ্রেস জনচিত্ত জয় করতে পারে তারই জন্য একটি সোপান অতিক্রম করা হল। এই cheap popularity আমাদের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। কিন্তু সে কথা কে ভাবে? যার বিশেষ করে ভাবা উচিত তিনিই—কার পরামর্শে জানা নেই—শিব গড়তে বানর গড়লেন।

এই রকম শত সহস্র উদাহরণ আজ আমাদের সম্মুখে—কিন্তু দুঃখের কথা কাকে বলবেন—কেইবা শুনবেন, আর শুনেই বা ফল কি হবে? যা হওয়ার তা হবেই। সংস্কৃতে একটি কথা আছে "বহ্নিস্তি বিনশ্যতি—" আমাদেরও অনুরূপ অবস্থা এসেছে বলে অনেকে হয়ত ভাবেন।

এই যে সেদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী সমূহ ধী অভিনব ধরণ এবং সরকার অনন্যোপায় হয়ে

দীর্ঘ ১৫ দিনের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করবার আদেশ দিলেন—এতে আর যাই হোক ডিসিপ্লিন্ রক্ষা হয় না। "আমাদের দাবী মান্‌তে হবে—" এই চীৎকার রোধ করবে কে? আবার দেখা গেল যে শিক্ষক মহাশয়রাও অনুরূপ ভাবে তাঁদের দাবী জানাবার জন্য এবং কার্যকরী করবার জন্য ঐ একই পন্থা অবলম্বন করলেন। দেশকে ভুতে না পেলে হয়ত এরূপ হয় না। কিন্তু এই অবস্থাতে সর্বত্রই—Trade unionismএর অগ্রযাত্রা সর্বত্রই—সব দেশেই—আমাদের দেশেও কেন ব্যতিক্রম হবে? দেশের যারা মাথা তাঁরাই যেখানে উদ্‌ভ্রান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত নহেন, সেখানে আর বলিবার কি আছে? শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও যে অনাচার ও বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাও জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। সরকার এক্ষেত্রেও কেবল হুমকীর পর হুমকী দিয়েই জনস্বার্থ রক্ষার পরিচয় দিচ্ছে। ব্যবসায়ীগণ অর্থ-গৃধ্নুতার নিজ নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর এবং সরকারী এই হুমকীকে কলা দেখিয়ে পরমানন্দে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের লোক হতবাক। সরকার তথা রাষ্ট্রীয় নেতারা যে সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন তা ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে। জনসাধারণ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়ে ভাবছেন একথা আজ অন্ধদেরও বলে দিতে হয় না। একজন লোক গান্ধীজির সেই উপমা মনে করে তৃপ্তি লাভ করছে 'We shall hear no wrong see no wrong & do no wrong—" তিন বানরের সেই ছবি মানচক্ষে ভেসে ওঠে। খাসে বেহাল—ঈশ্বরে বেহাল—এ বোধহয় পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই সম্ভব নয়। আমাদের দেশ সভ্য না অসভ্য এখন এটাই হয়ত বিচার্য। যাদের হাতে ক্ষমতা তাঁরা গর্বিতে আত্মাবে বসে আছেন কিনা জানি না—জনসাধারণের আত্মারাম যে খাঁচা ছাড়া হয়ে এল। সেটা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁদের লোপ পেয়েছে অথবা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়া তাঁদের কর্তব্য জ্ঞান লোপ পেয়েছে এবং এই জন্যই তাঁদের জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগ বিচ্ছিন্ন। ব্যবসায়ীদের মুনাফার লোভ যে ক্রমশঃ অক্টোপাশী হতে চলেছে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকার নিশ্চিন্ত। রাশিয়া চীন ও অন্যান্য সমস্ত দেশেই এই অতি লোভের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে এবং ঐ শাস্তি বিধান যথাযথ ভাবে হয় বলেই সেখানকার অতি লোভীরা লোভ সামলে চলেন। যদিও আমাদের নেহেরুজি স্বাধীনতার প্রাক্কালে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে অতি লোভী ব্যবসায়ীদের তিনি বা তাঁর রাষ্ট্র উপযুক্ত শাস্তি বিধানে পিছপাও হবেন না—এমন-কি প্রয়োজন বোধে রাস্তার লাম্পপোষ্টে তাদের লটকে দেওয়া হবে—যাতে সকলে দেখে শিক্ষা পায় যে অতি লোভের শাস্তির পরিণাম কি—তথাপি দুঃখের বিষয় দীর্ঘ ১৮।১৯ বৎসরের ভিতর সরকার একটিও অতি লোভীর সন্ধান পেলেন না যাদের অনুরূপ শাস্তি দিয়ে ব্যবসায়ীদের শিক্ষা দেওয়া যেত। অতএব ব্যবসায়ী সে বড় হোক বা ছোট হোক—লৌহ কারবারী হোক বা আলু পটলের দোকানদার হোক—সে যখন বুঝেছে তার মুনাফার মাত্রা বাড়াবার কোনো নিয়ম নেই—তখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উদ্ভাল উদ্দাম নৃত্য সুরু করেছে—জনসাধারণকে সবই মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে। সকল সভ্য দেশেই ক্রেতাদের সমিতি আছে, বিক্রেতা যখেচ্ছ দর বাড়াতে পারেন না—তা যৎ সামান্য হলেও। কিন্তু আমাদের সোণার দেশে বিক্রেতারই মরশুম ক্রেতাদের কিনবার ক্ষমতা থাক আর না থাক। জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ যথা—চাল ডাল তেল নুন তরি-তরকারী মাছ মাংস জামা-কাপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর আজ কোথায় উঠেছে! সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা আজ কি হয়েছে এ আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারি। সমাজের পাঁচ শতাধিক এম্, পি মহোদয়গণ তথা রাজ্য সমূহের বিধান সভার মাননীয় সদস্যগণ কি রঙের চশমা পড়ে থাকেন জানা নেই—তাঁরা কি সরকারকে শুধু পাল্লাভারী করতেই উদ্বুদ্ধ করেন—কতাকন কি হল সে বিষয়ে খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়—সেই অপ্রিয় সত্য কথা অবতারণা করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আর একটি

মাত্র নিবেদন উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ স্থগিত রাখব। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রের কথা। কাঞ্চন কৌলীন্যের যুগে শিক্ষার সে সম্মান আর নেই—জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাদর তথা সমাজে প্রসার ও প্রতিপত্তি আর দেখতে পাওয়া যায় না। হঠাৎ বড়লোক যেন তেন প্রকারেণ মোটর গাড়ি চড়নেওয়ালাই, ফিট্ ফাট্ ক্যাদান্ ও কেতা দুরস্ত ব্যক্তিদেরই আজকাল সমাজে আদর ও আপ্যায়ন। ছাত্রদের এইসব দেখে ও শুনে কি শিক্ষা হবে তা সহজেই অনুমেয়। যে শিক্ষক সমাজ একদিনে সকলের সম্মান আহরণ করত আজ তাঁরা অবহেলিত। সমাজের ধিক্কার আজ শিক্ষকদের ভূষণ হয়েছে। কাজেই ভাল লোক আর স্বেচ্ছায় ঐ পথে যায় না। দেশ গড়বার ভার, দেশের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলবার ভার আজ যাঁদের ওপর এসে পড়েছে তাঁদের অধিকাংশই ঐ কাজের অনুপযুক্ত—নিতান্ত অন্য কিছু জুটছে না কাজেই মাষ্টারি করতে হচ্ছে। যে কয়জন উপযুক্ত লোক এ পথে আছেন তাঁরাও নিরুপায় হয়েই আছেন। শিক্ষার মান মর্য্যাদা আজ ধূলায় অবলুণ্ঠিত। সরকার এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন—তার নমুনা—যে সামান্য মাহিনা প্রাথমিক শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন তাও সর্ত্ত ক্ষেত্রে যথা নিয়মে শিক্ষকদের হাতে পৌঁছয় না! ছোট বড় নানা কর্ত্তার খেয়ালের ওপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—এরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই। সমাজের যখন এই অবস্থা শিক্ষক মহাশয়রাও তখন আর করেন কি—ছাত্রদের তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে স্কুলে পড়া হবে না—বাড়ীতে এসে পাঠাভ্যাস করলে তবে পরীক্ষা করা হবে। ছাত্রদের পিতামাতাও আজ এই তাটি আবিষ্কার করেছেন এবং এই জন্যই আজকাল ৪।৫ বছরের শিশু থেকে ১৮।১৯ বছরের ছাত্রদেরও হয় গৃহশিক্ষক নয় কোচিং ক্লাসে যাওয়া চাই-ই। ২৫।৩০ বছর আগে নিয়ম ছিল না। আজকাল দেখা যায় যে গৃহ শিক্ষকও ব্রতে দিয়ে নোট-বই কেনাচ্ছেন! এই কোচিং-ক্লাসের ধামে এক একজন স্কুল-শিক্ষক ২০।২৫ জন ছাত্র পড়িয়ে কেন। সকাল বিকাল ও বিভিন্ন দিনে ভাগ করে নিজ ঘরে বসে দলের পর দল ছাত্র-ছাত্রী তালিম দিয়ে কোনো প্রকারে আহারাদি সমাধা করে স্কুলে আসেন এবং স্কুলে এসে ক্লাসে ঝিমাতে থাকেন। না ঝিমিয়ে যা না ঘুমিয়ে তিনি করবেনই বা কি? নিজের সব ক্ষমতা ও শক্তি ত বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে শেষ হয়ে গেছে—স্কুলে আসা ত শক্তি সঞ্চয় করবার মানসে। বোর্ডে অঙ্ক দিয়ে অথবা ছাত্রদের কিছু লিখতে দিয়ে যদি খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া যায় তা মন্দ কি? তা ছাড়া প্রকৃতি শুনবে কেন? সব জিনিষেরই মাত্রা আছে—অতএব বই হাতে নিয়ে পড়াতে পড়াতে বই হাত থেকে পড়ে যায়—ছাত্ররাও মাষ্টার মহাশয়ের অবস্থা বুঝে হাসাহাসি করে। এই সমাজের শিক্ষার ধারা—এবং এটা চালু প্রথা হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার ধারাই এই এ জোর গলায় বলা চলে। শিক্ষক মহাশয়দের বেতনাদি সরকারী ব্যবস্থাপনায় কিছু উন্নতি লাভ করেছে সত্য কিন্তু জীবন ধারণের মান যেভাবে বেড়ে চলেছে ও সমাজে নিজের মর্য্যাদা রাখবার জন্য যা প্রয়োজন তদনুযায়ী সে বেতন সামান্যই। কাজে কাজেই আয় বাড়াতে না পারলে সংসার অচল। এবং আয় বাড়াতে গিয়ে আসল কাজে ফাঁকি অবশ্যই দিতে হবেই না হলে নিরুপায়। এভাবে অনেক শিক্ষিকা ও শিক্ষক আয়ের দিক দিয়ে লাভবান হলেও—নৈতিক দিক দিয়ে অনেকের কাছেই হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। অবশ্য সব শিক্ষিকা বা শিক্ষক এ রকম নহেন। দেশে ভাল মন্দ সবই আছে কিন্তু মন্দের প্রাবল্যে ভাল অপদার্থিত হচ্ছে। কাঞ্চন কৌলীন্যের জয় জয়কার সর্ব্বত্রই। শতং সহস্রমিচ্ছন্তি-সহস্রম্লক্ষমীহতে—এই লোভের আর সীমা নেই। কোথায় আজ বুনো রামনাথ—যাঁর স্ত্রীর হাতের লাল সুতোই নদীয়ার ও নবদ্বীপের তথা বঙ্গদেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল! কিন্তু আজ আমরা কোন পথে চলেছি—একটার পর একটা আমাদের প্রয়োজন বাড়ছে। জামা-কাপড়-জুতো স্নো পাউডার সাবান ঘো এসেন্স সবই আমাদের অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের

পোষাক পরিচ্ছদের কত রকম বাহার। এদব জোগাতে কত বাবা-মা-ই না নাজেহাল হচ্ছে। সিনেমা ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে আজ লোপ্ত দিশেহারা। একেই ত অন্ন চিন্তা চমৎকারা তদুপরি কালের যা হাওয়া তাতে এক বিষময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাঁচা পয়সার প্রয়োজন আজ সকলেরই—বিশেষ যুবক-যুবতীদের এবং তার জন্য তারা না পারে এমন কাজ নেই। দেশের অরাজকতার ব্যাপকতার মূলে এও একটা বড় কারণ। যখন গম্ভীর ভারতের সেই সমাহিত মন—ধীর স্থির স্থিতধী মানী গুনীজন আজ অন্তর্লুপ্ত—সেই জায়গায় আমরা চারধারেই দেখি অসহিষ্ণু পরশ্রীকাতর লোভী বিকৃতচিত্ত প্রশ্নবিমুখ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সমষ্টির সমাবেশ। বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। কিন্তু আজকালকার বিদ্যা আর বিনয় দেয় বলে মনে হয় না। রাস্তায় চলতে ফিরতে বাসে ট্রামে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যে পরিচয় পাওয়া যায়—উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র সমাজেরও যে ব্যবহার চোখে পড়ে তাতে দুঃখ ও লজ্জায় মরমে মরতে হয়। ঘৃণার উদ্রেক হয় না, কারণ তারা আমাদের আপন জন—আমাদের একান্ত আপন, তাদের ঘৃণা করে দূরে রাখা যায় না। কিন্তু এ সমাজ-ব্যবস্থার কি পরিবর্ত্তন হবে না? হলেও, কবে হবে—সেই কথা ভাবি। কি করেই বা হবে সেটাও ভাবনায়। কি ছিলাম কি হয়েছি কি হবো বা হতে চলেছি সেই কথা বার বার মনে হয়।

"গীতা তাই তো দ্বন্দ্ব সমাসের শাস্ত্র, নরনারায়ণ সংবাদ, কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ, কর্ম্ম-নৈষ্কর্ম্মের সমন্বয় সংবাদ, চিৎ ও মৃৎ-এর সমন্বয় সংবাদ, যোগেশ্বর ধনুর্দ্ধরের সমন্বয় সংবাদ। শ্রীভগবান যাহা বলেন তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষণ ভাগবত নিজেই একাদশ স্কন্ধে বলিতেছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াঃ হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।"

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উজ্জলভারত সম্পাদিকা শ্রীবেণু মিত্র গুরুতর অসুস্থ হওয়াতে শ্রাবণ সংখ্যা সময়মত বাহির করা যায় নাই। শ্রাবণ সংখ্যা এই মাসে ভাদ্র সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া বাহির করা হইল। তিনি এখনও নিরাময় হইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া সামন্বিকী ছাড়াই এই সংখ্যা প্রকাশ করা হইল। উজ্জলভারতের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অপরাধ না নেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
উজ্জলভারত

বিনাশায় দুষ্কৃতাং

শ্রীদুর্গামোহন সেন

আজ ভারত জুড়িয়া রব উঠিয়াছে দুষ্কৃতদিগকে দমন কর। দেশ দেশ দেশ দেশ। আজ ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সামান্য সংখ্যক মাত্র মানুষ নিজেদের উদর স্ফীত করিতেছে। দেহের সহিত প্রাণের যোগরক্ষা করিতে যতটুকু খাদ্যের দরকার তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য অথবা অপ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ো কথা নহে—স্বাচ্ছন্দ্য বনজাত শাকান্ন জোটানও অসম্ভব করিয়া তোলা হইতেছে। চাউল বল, গম বল, ডাল বল, আর আলু বল, তেল বল আর মশলা বল সর্বত্র বিকট রূপ ব্যাদান করিয়া এই হাজার কুমীরের দল তাহাদের করাল দংষ্ট্রা প্রবেশ করাইতেছে। দেশের আপামর সাধারণ যেন নিষ্প্রাণ গভীর তিমিরে নয়নের নীরে পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে! রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকগণ আইনের পর আইন করিয়াও বলিতেছেন হা হতোস্মি। কৈ আইন দ্বারা দুষ্কৃতদিগকে ধরিতে আনিতে পারিলাম না। তাই বলি—"আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু" দেশবাসী জাগ্রত হও—সর্বশেষ কথা এখনও সেই-টাই—Vox populi vox Dei। লোক-মতই প্রধান মত। যে দিকে অধিক সেনাবল ভগবান সেই দিকেই। তাই বলি মানুষ জাগো।

ছিল বটে আগে
তপস্যার ফলে
কার্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত দেবতাগণ
এসব দৈত্য নহে তেমন!

আজ আমাদের মনে পড়ে একজন নেতার কথা—বরিশালের স্বরূপকুমার ঘোষ—স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ। তিনি বরিশালে একবার দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি একটী সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন—"ঐ যায়"। তিনি ছিলেন অহিংসা মন্ত্রের পূজারী। তাই তিনি শিখাইয়াছিলেন আমাদিগকে শুধু বলিতে "ঐ যায়" অর্থাৎ পরিচিত দুষ্কৃতকারিদিগের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে "ঐ যায়"। আমরা জানি রাষ্ট্র সরকারগুলি এই দুর্নীতি দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—তাহারা সাহস করিয়া একটি কাজ করুন—যাহারা এ যাবত দুষ্কৃতির জন্য আদালতে দণ্ডিত হইয়াছেন তাহাদের নামের তালিকা-গুলি স্থানীয় পত্রিকা সমূহকে প্রকাশ করিতে দিন। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—ঐ পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হউক—এবং জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হউক তাহারা তাহাদের সমক্ষে গিয়া বলুন "ঐ যায়"। সমাজ তাহাদিগকে চিনিয়া রাখুক—তাহাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করুন—এক কথায় তাহাদিগকে Boycott করুন। তাহা হইলেই অচিরাৎ ঐ দুষ্ট পথে অন্যায় অর্থ সঞ্চয়ের লোভ পরিত্যক্ত হইবে। আমার এ কথাগুলি ছেলে মনে হইতে পারে এবং উপহাসের যোগ্যও হইতে পারে। কিন্তু ইহাই সত্যকার দাওয়াই—। পত্রিকায় দেখিতেছি সাধু সমাজের সম্পাদক মহাশয় দুর্নীতি দমনে কার্যকরী উপায় অবলম্বনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতেছেন—আমরা বলি তাহারা দুষ্কৃতকারিদিগের নামের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেশময় বিলাইয়া দিউন এবং ইহাই আধ্যাত্মিক ঔষধ হিসাবে জনমত গঠন করিবে। আইনের ক্ষমতা যাহাদের হাতে আছে তাহারা দিনের পর দিন নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করুন। কিন্তু সেগুলি কার্যকরী করিবার উপায়ও দেখুন—শুধু আইনের বোঝা বাড়াইয়া দেশকে সুস্থ এবং সাবেস্তা করা যাইবে না। এক এক প্রদেশে ৩৬ হইতে ৫৬ জন মন্ত্রী আছেন। কিন্তু কেহই দেশের লোকের শ্রদ্ধার্জন করিতে পারিতেছেন না—মন্ত্রীগণ ঐ দুষ্কৃতকারিগণ হইতে পার্টিকণ্ড আদায় করিতে গিয়াই আপনাদের পবিত্রতা হারাইয়াছেন। কূটবুদ্ধি ব্যবসায়ীগণ জানে একথা ইংরেজ মন্ত্রী সার ওয়াল পোলের উক্তি—Every man has his price—প্রত্যেক মানুষের মূল্য আছে। তাই কোনও আইন কার্যকরী হয় না। অতএব আধ্যাত্মিক ও সর্ব সাধারণের গ্রহণযোগ্য পথ অবলম্বন কর—দেশ রক্ষা পাইবে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধৃত ভাষ্য সমেত

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা। ১১

যাহারা কর্তৃহীন বিধিমার্গে কর্মপ্রধান আলোর সাহায্যে পথ বহিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা ও ফল-প্রাপ্তির কথা পূর্বে বলিয়া এইবার কর্তৃহীনবিধিমার্গে জ্ঞান-প্রধান কর্মের সাহায্যে যাহারা অগ্রসর হইয়া চলিতে চান, তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। যে হি [কর্তৃহীন বিধিমার্গে জ্ঞানপ্রধান কর্ম অনুসরণকারী যে বানপ্রস্থ ও আশ্রম-সন্ন্যাসিগণই] তপঃ শ্রদ্ধে [তপস্যা এবং শ্রদ্ধা ; আশ্রম বিহিত কর্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা ; 'যৎ তপস্যদি তৎ কুরুষ মদর্পণম্'-এর মর্মার্থ অবগত না হইয়া 'করা-না করা-অন্যথা করা' যাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এমন পুরুষ-ব্যাপারতন্ত্র তপস্যা ও শ্রদ্ধার গতি কতদূর পৌঁছাইবে? ইহাদের শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধির ও পারের কিছু ধারণাই করিতে পারিবে না] উপবসন্তি [সেবা করেন] অরণ্যে [বনে ; জটিল-কুটিল সংসার হইতে দূরে, সরল জীবন পথের খোঁজ পাইবার যোগ্য স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া] শান্তাঃ [সংযতেন্দ্রিয়] বিদ্বাংসঃ [জ্ঞানপ্রধান কর্মযুক্ত গৃহস্থগণও] ভৈক্ষচর্যাং [ভিক্ষাবৃত্তি] চরন্তঃ [আচরণ পূর্বক] সূর্যদ্বারেণ [সূর্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ পথে] তে [তাহারা] বিরজাঃ [বিরজসঃ—ক্ষীণ পাপ-পুণ্য হইয়া] প্রয়ান্তি [প্রয়াণ করেন, প্রকৃষ্ট রূপে যান] যত্র [যে সত্যলোকাদিতে] অমৃতঃ [অমৃত] সঃ পুরুষঃ [সেই পুরুষ প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভ] অব্যয়াত্মা [যাহা সংসার স্থায়ী অব্যয় স্বভাব] অবিদ্যার সাধনায় যত প্রকার গতি সম্ভব, তাহা শ্রুতি সব আঁকিয়া দিলেন। এই মন্ত্রোক্ত বিরজঃ, অমৃত, অব্যয় প্রভৃতি শব্দ সব আপেক্ষিক। এই পথ যতই আলোময় হউক না কেন, উহার মধ্যে অন্ধকার লুকাইয়া আছেই, যাহার ফলে সমষ্টি বুদ্ধির স্তর আর অতিক্রম করা চলিল না, অব্যাকৃতের স্তর তো দূরের কথা। আলো-আঁধার যেখানে এক, সেই দেশই নিরপেক্ষ নিরুপাধি-সহজ সম্বন্ধের দেশ, তাহাই উপনিষদের 'পরপক্ষ'

সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান কর্মী গৃহিগণ এবং যে সকল বানপ্রস্থ এবং সংসারী ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্বক স্বাশ্রম বিহিত কর্মরূপ তপস্যা এবং হিরণ্যগর্ভ উপাসনা রূপ শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া উত্তরায়ণমার্গে সেখানেই গমন করেন যেখানে অমৃত অব্যয়াত্মা পুরুষ অবস্থিত আছেন। ১।২।১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ১২

পুরুষোত্তমমূলা সাধনায় প্রেরিত না হইয়া কর্তৃত্ব কর্মসাধনাই হউক বা জ্ঞানসাধনাই হউক, তাহা যার আলোর রাজ্যে যতদূরই যাওয়া সম্ভবপর হউক, তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য আঁধার যে তাহার বুকে লুকাইয়া রহিয়াছে, যাহা সে আজ আলোর দাঁধাঁয় ধরিতে পারিতেছে না ; এ আলো যে অধিকতর আলোর রাজ্যে

আর নিয়া যাইবে না, যে লোক আজ তাহার সামনে জ্ঞানসাধনার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে একদিন অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিবেই, অন্ধকার ছাড়া সামনে আর কিছু রহিবে না, পুরুষোত্তম ছাড়া আর কাহারও সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, একমাত্র পুরুষোত্তমই যে সর্ব্ব লোকের রহস্যবেত্তা এবং তাঁহার প্রেরণা, তাঁহার আকর্ষণই যে মানুষের কর্ত্তৃ-করণ-কার্য্যকের প্রাপিত করিয়া কর্ত্তৃতন্ত্রতা ভাসাইয়া পুরুষোত্তমতত্ত্বে দীক্ষিত করিয়া সব লোকের গুহ্যতম পারমার্থিকতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে পারেন, ইহা আজ পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।) পরীক্ষা [পরীক্ষা করিয়া, যাচাই করিয়া] কর্ম্মচিতান্ [কর্ম্মদ্বারা সৃষ্ট, উপচিত ; পুরুষোত্তমতত্ত্ববিচ্ছিন্ন কর্ম্ম যত লোক সৃষ্টি করিতেছে, সবই তো কেন্দ্র বুদ্ধির উপর গড়া, অনন্ত ব্যবধান তাহার পরতে পরতে, অন্ধকার তাহার ছেঁড়ে রন্ধ্রে ; অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম সব কিছু পুরুষোত্তম শক্তি হইলেও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির ফলে সব আজ তোমাকে বাধা দিতেছে। এ বাধা দেওয়াও তোমার বুদ্ধিকে শোধরাইয়া বৃত্তির দৃষ্টির দিকে প্রেরিত করা। তুমি তো আর অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের ব্যবধানের ভিতরকার এই ইঙ্গিত বুঝিবার কোন চেষ্টা পাও নাই। তোমার কৃত লোক আর কত বড় হইবে ? ব্যবধান যে দৃষ্টির গোড়ায়, তাহাতে আর কত আলো পাইবে ? সব লোকই তোমার কর্ম্মচিত। তোমার কর্ম্ম পুরুষোত্তমকর্ম্মে গড়িয়া উঠিলে এই লোকই লোকই থাকিবে, বদলাইবে শুধু ইহার ঢং, আসিবে তার মধ্যে সব কিছুর একটা অব্যবধান, অনিমিত্ত, স্বয়ং না-থেন একটা সত্তা বাস্তব রসঘন লোক ; তখন কাম কর্ম্ম সকলেই ইহার উপায়, পুষ্টি আনয়ন করিবে। এই ভাবে লোক পরীক্ষা করিয়া] ব্রাহ্মণঃ [ব্রাহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ঋজু সরল প্রাণবান পুরুষ] নির্ব্বেদম্ [নিশ্চিত বেদ, যাহা কল বিদ্যার নিঃশেষ হজম করিয়াই লাভ হয়, পুরুষোত্তমের আহ্বানে যাহার কাছে সকল 'বেদ' ভাসিয়া গিয়াছে, এমন বৈরাগ্যবান পুরুষের অবস্থাই নির্ব্বেদ বৈরাগ্য, পুরুষোত্তমজ্ঞান বর্জ্জিত বিষয়ে বিগত রাগ এবং পুরুষোত্তমার্পিত বস্তুতে বিশেষ রাগই বিরাগ] আয়াৎ [লাভ করিবেন] নাস্তি [নাই] অকৃতঃ [কোন কিছু 'কৃত' যাহার কাছে পৌঁছাইতে সক্ষম নয় ; অন্তর কৃতা কৃতাৎ' কোনও করার দাবী সেখানে পৌঁছায় না, তিনিই অকৃত। না করিয়াও তো তাঁহাকে পায় ; সকল কৃত ও অকৃত যেখানে ব্যর্থ, তিনিই অকৃত] কৃতেন [যাহা করা হইয়াছে তাহাদ্বারা ; পাওয়া যায় তাঁহাকে শুধু তাঁহার আহ্বানের মাঝে ডুবিয়া তাঁহার বাঁশীর গানে গানময় হইয়া গিয়া ; করা-না করা-অন্যথা করার ওপারের প্রাণের আহ্বানেই 'অকৃত' পুরুষ বিরাজ করেন। যাহার করা পুরুষোত্তমে অর্পিত, সেই করার মাঝে তিনি 'সুকৃত' হন্ ধরা দেন, রসরূপে আত্মপ্রকাশ করেন] (ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া) তৎ [পুরুষোত্তমপদ] বিজ্ঞানার্থম্ [সকল বিশেষ মাঝে ধরিয়া ফেলিয়া জানিবার জন্য] সঃ [সেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত পুরুষ] গুরুম্ অভিগচ্ছেৎ [শ্রীগুরুর শ্রীচরণ সকাশে উপস্থিত হইবেন, শরণ লইবেন] সমিৎপাণি [গুরু সেবার উপযুক্ত কাষ্ঠ প্রভৃতির ভার বহন করিয়া] (গুরুর লক্ষণ বলিতেছেন) শ্রোত্রিয়ং [বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন-জ্ঞান সম্পন্ন] ব্রহ্ম নিষ্ঠম্ [কেবল অন্বয় ব্রহ্মে যাহার নিশ্চিত স্থান, শুধু ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইলেই 'গুরু' হওয়ার যোগ্যতা থাকে না, যিনি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ নন্, তিনি শরণাগত শিষ্যের জটিল সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা যদি শাস্ত্রাদির সাহায্যে দিতে না পারেন, শিষ্যের যুক্তি তর্কের লালসার দিকটা তৃপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ বস্তু চাইলে চাই একটী পরিপূর্ণ জীবনের ছায়ায় নিজকে পরিপূর্ণ ভাবে বিলীন করিয়া দেওয়া। কর্ম্মীরও ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব, শুধু সম্ভব নয়, কর্ম্মেই ব্রহ্ম নিষ্ঠার পরিপূর্ণতা যে হেতু কর্ম্ম জ্ঞান পুরুষোত্তমার্পিত হইয়া দুই-ই পুরুষোত্তম-তন্ত্র, বস্তুতন্ত্র জ্ঞান কর্ত্তৃতন্ত্র হইলে তাহাও কর্ম্ম ; পক্ষান্তরে কর্ম্ম বস্তুতন্ত্র হইলে কর্ম্মই জ্ঞান। কর্ম্ম জ্ঞান বিরোধ পুরুষোত্তম জীবনে বিলুপ্ত। সেখানে কর্ম্ম যোগার রস, জ্ঞান যোগার ভাব।

ব্রাহ্মণ কর্ম্মচিত লোক পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদ লাভ করিবে ; কৃতদ্বারা অকৃত হয় না। তাহার বিজ্ঞানের জন্য সেই ব্রাহ্মণ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবে। ১।২।১২

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥১৩

তস্মৈ [সেই শিষ্যকে] সঃ [গুরু] বিদ্বান্ [ব্রহ্মজ্ঞ] উপসন্নায় [শরণাগতকে] সম্যক্ [যথাশাস্ত্র সমগ্র ভাবে] প্রশান্তচিত্তায় [শরণাগতি সাধনায় পুরুষোত্তমনিষ্ঠতা-প্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি লাভের ফলে বিনীত, সর্বদর্প বিবর্জিত শমান্বিতায় [সংযতেন্দ্রিয়] যেন [যে বিজ্ঞানদ্বারা, যে পরাবিদ্যা দ্বারা] অক্ষরং [সকল ক্ষরণের বুকে অক্ষরত্ব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া স্থিত অক্ষরকে] পুরুষং [সব দেহ-পুরকে পূর্ণ করিয়া পুরিশয় পূর্ণ] বেদ [জানা যায়] সত্যং [সব ক্ষরণকে, সব পুরকে 'সত্য' রূপে প্রতিষ্ঠা করাই যাহার ব্রত, তিনিই মূর্ত সত্য] প্রোবাচ [প্রবর্তয়ং বলিলেন অথবা 'প্রোবাচ'—এই অতীত কালের প্রয়োগ-দ্বারা শ্রুতি কি ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে গুরু-ভগবান্ যদি শিষ্যের প্রাণে শরণাগতির পূর্বে এই ব্রহ্ম বিদ্যার প্রেরণা না দিতেন, তাহা হইলে বর্তমানে তাহার শ্রীগুরু চরণে আসাই সম্ভব হইত না," একটা টান নিশ্চয়ই আসিয়াছে যাহার জন্যই তাহার জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছে। জিজ্ঞাসার জাগরণের জন্য জীবের কানে গুরু-শরণাগতির জন্য একটা টান পূর্বেই আসে। গুরু-উপসন্নতা-রূপ 'কৃতের' পশ্চাতেও একটী 'অকৃত' পুরুষের বাণী ছিল বলিয়াই কি গুরু-উপসন্নতা সফল হইল? বুঝি বা শ্রুতির ইহাই বলিবার ইচ্ছা।

শরণাগত, প্রশান্তচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মবিদ্যা সমগ্রভাবে যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন, যাহা দ্বারা সত্য, অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডক সমাপ্তম্।

দ্বিতীয় মুণ্ডক
প্রথম খণ্ড

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥১

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরাবিদ্যা বিষয়ক কর্মফল লক্ষণ সত্য প্রভৃতির আপেক্ষিকতা দেখানো হইয়াছে। এই মুণ্ডকে পরাবিদ্যার আশ্রয়ে পরমার্থ সত্যের লক্ষণ নির্ণীত হইবে। তৎ এতৎ সত্যম্ [পরাবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই অক্ষরই বাস্তব সত্য] । অবিদ্যার ক্ষেত্রের প্রাপ্তি সহজ হয় না, অব্যবহিত হয় না, প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মহাবিদ্যার ক্ষেত্রে পাওয়া হয় সহজ, অনিমিত্ত ও অপরোক্ষ, সেখানের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ (direct) ও সম (epual) এই সাক্ষাৎ প্রাপ্তিকথা শ্রুতি বলিতেছেন—যথা [যেরূপ] সুদীপ্তাৎ [সম্যক প্রজ্বলিত] পাবকাৎ [অগ্নি হইতে] বিস্ফুলিঙ্গাঃ [অগ্নিকণা সমূহ] সহস্রশঃ [হাজারে হাজারে] প্রভবন্তে [নির্গত হয়, ইহা অগ্নির অনায়াস সহজ ধর্ম] সরূপাঃ [অগ্নির সজাতীয়] তথা [ঠিক সেইরূপ] অক্ষরাৎ [অক্ষরাৎ [অক্ষর পুরুষ হইতে] বিবিধাঃ [স্বয়ং মর্যাদাযুক্ত ভেদ-অভেদ সমন্বিত, বিচিত্র বিচিত্র নামরূপ যুক্ত অনেক রকম] সৌম্য [হে সৌম্য] ভাবাঃ [জীব সমূহ; "মমৈবাংশঃ জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা। প্রতি জীব সনাতন; বৈচিত্র যুক্ত প্রতি জীব ভিন্ন এবং অভিন্ন দুইই। এই ভেদাভেদযুক্ত অনন্ত জীব-সৃষ্টিই রসিকশেখরের লীলা। 'ভাব' বহু বচনেই নিত্য, সনাতন; যেন না বহুর বাস্তবের ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তিনি। প্রত্যেক তাহারই রস-আস্বাদনের একটী দৃষ্টি-কোণ। ভাবক্ষেত্রে সব এক, রস ক্ষেত্রে তিনি বিচিত্র

বিচিত্র অনন্ত জীব (ভাব) ভাবসমূহ সবই পুরুষোত্তমের স্বরূপ, সমান রূপ বলিয়াই প্রতিজীব সারূপ্য-রূপ মুক্তির অধিকারী। সর্ব্ব জীব পুরুষোত্তমের সধর্ম্ম; "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"-গীতা] প্রলয়ান্তে [উদ্ভূত হয়; এ উদ্ভব শুধু উপাধিগত নয়, এই উদ্ভব পারমার্থিক; এই উদ্ভবও উপাধিগত হয় যদি এই উদ্ভবের মূল অক্ষরপুরুষোত্তমে একীভূত না হইয়া এই উদ্ভবের ধারা ধরিতে হয়; বস্তুতঃ হইলেই উদ্ভব হয় উপাধিগত; পুরুষোত্তম-বস্তুতত্ত্ব হইলে সব উপাধি বাস্তবিক, পারমার্থিকরূপে গণিয়া আত্মার সঙ্গে এক হয়] তত্র চ এব [এবং সেখানেই] অপিধীয়তে [লীন হয়; বস্তুতত্ত্ব সাধনায় পুরুষোত্তম আর প্রলয়ও থাকেন না, প্রলয়ও থাকেন না। সব প্রলয় প্রলয়ের গোড়ায় থাকে জীবের বুদ্ধি; তখন সবই ছায়াবাজী, সবই মায়া, সবই উপাধি। উপাধি-দেখাটাই উদ্ভূত হয় পুরুষোত্তমমূলে দাঁড়াইয়া হইতে না-দেখার অজ্ঞানতার ভিতর দিয়া; এই অদর্শই আনিয়া দেয় উপাধি-দর্শন, যাহার ফলে অদম্যাকৃদর্শন চায় এই উপাধি-রূপ খোসা ছাড়াইয়া নিজকে বাহির করিতে। উপাধি একবার জন্মিলে তাহাকে উৎখাত করা দুঃসাধ্য; উপাধি যে স্তরে উদ্ভূত হয়, সেই স্তরের উজান গতিতে প্রাপ্ত উপরের স্তর, ঐ পুরুষোত্তমস্তরেই উপাধি আর উপ-আধি থাকে না, উহা হয় রূপ। উপরের স্তরে ছাড়া উপাধি নিরসনের কোনও বিজ্ঞান নাই, নিজের বুদ্ধির মধ্যে থাকিয়া যতই উপাধিকে 'নেতি নেতি' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া প্রকৃত বস্তুকে পাইতে চাহিতেছ, ঐ নেতি নেতি দ্বারা তুমি যেখানে লক্ষ্য করিতেছ, তাহাও উপাধি। তোমার বুদ্ধিতে বাস্তব কিছুর জন্মাইওনা, লক্ষ্য করিও না; জন্মে শুধু উদ্ভবের উপাধি, প্রলয়ের উপাধি, স্থিতির উপাধি। অহং কেন্দ্রকে পুরুষোত্তম-কেন্দ্রে পরিণত কর, সব উপাধি নিরসন হইবে।

সর্ব্বাবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই অক্ষরই সত্য। যেরূপ সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ হে সৌম্য, অক্ষর হইতে জ্ঞেয়াদের যুক্ত নানাবিধ জীব উৎপন্ন এবং তাহাতেই বিলীন হয়।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২

'যাহার জন্ম নাই—' এমন অক্ষর পুরুষ হইতে এই জন্মশীল জগৎ উৎপন্ন হয় কি করিয়া—এই সংশয় যাহে উদ্ভব হয়, তাহারই নিরাকরণ করিতেছেন! দিব্যঃ [জ্যোতির্ময়, স্বয়ং জ্যোতিঃ ও ক্রীড়াময়, দিব্ ক্রীড়ায়াম্] হি [নিশ্চয়ই] অমূর্ত্তঃ [প্রতিমূর্ত্তিকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ করিয়া, প্রতি-এক পূর্ণ মূর্ত্তিকে অন্য মূর্ত্তির সঙ্গে অন্তরে বাহিরে এক, পূর্ণ করিয়া যিনি 'ন' রূপে উহার মধ্যে লুকাইয়া তিনিই; মূর্ত্তি অর্থ ঘন, কঠিনরূপতা; যেখানে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সব মূর্চ্ছনারূপে মূর্চ্ছিত, তাহাই মূর্ত্তি; পুরুষোত্তম এমনই একটী ক্রীড়াময় মূর্ত্তি] পুরুষঃ [পূর্ণ, সকল পুরে সকল পুরকে হজম করিয়া পুর—পুর স্বামীর ভেদ হজম করিয়াই যিনি পুরিশয়, পুরুষ, যিনি অগ্রগামী তিনিই পুরুষ—পুর—অগ্রগমনে। সব অগতিকে গতির প্রেরণায় যিনি অগ্রগামী করেন, তিনিই পুরুষ] সবাহ্যাভ্যন্তরঃ [সব কিছুর সঙ্গে যিনি সমভাবে বাহিরে ও অন্তরে পূর্ণভাবে বিরাজমান; অন্তরকে অন্তরে পূর্ণ করিয়া, বাহিরকে বাহিরে পূর্ণ করিয়া, অন্তরকে বাহিরে পূর্ণ করিয়া, বাহিরকে অন্তরে পূর্ণ করিয়া যিনি অন্তর-বাহিরের সঙ্গে সম অবস্থিত] হি [সেই হেতু] অজঃ [অবিদ্যা কর্ম্মের তাড়নায় জীবের দেহ ধারণই জন্মশব্দবাচ্য; কিন্তু যেখানে অবিদ্যা কাম কর্ম্ম তাড়না না করিয়া পুরুষোত্তম প্রেরণা জাগাইয়া দেয়, সেরূপ জন্মও কি অবিদ্যা জন্ম?

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

— ১৯৫২—

(৪১)

ওগো, তোমার বিশ্ব তোমারই মত স্বপ্রকাশ, এখানের প্রতিটী অণুও 'ষোল আনা'। তোমার রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ সবই অযাচিতভাবে জীবকে ঘিরিয়া আছে। সবই বুঝি তোমার বিশ্ব-জীবনে বন্দী। রূপের প্রবাহ, রসের ধারা, গন্ধের প্লাবন, স্পর্শের আকুলতা, শব্দের তরঙ্গ জীবকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে। তুমিই তো সব। এই বিশ্বের বুকে চলিতে গেলে 'মামেকং শরণং ব্রজ' ছাড়া গতি নাই। ঘরের সাধনা চলিতে পারে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া, অক্ষরের সাধনাও চলিতে পারে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া কিন্তু ক্ষরের বুকে, কুরুক্ষেত্রের বুকে অক্ষত ভাবে চলিতে গেলে চাই পুরুষোত্তম-আমির শরণাগত হওয়া। তোমার মাঝেই বিশ্ব সত্য। তোমার বিশ্বেই 'দারু ব্রহ্ম'; তুমিই দারু-ব্রহ্ম জগন্নাথ, নীলাচলচন্দ্র, পুরুষোত্তম।...

৩০শে অক্টোবর

নরনারায়ণ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসেশ্বরী, আত্মরিণী, স্নেহের পুতলী, হৃদয় বল্লভা শ্রীরাধা আমার সকল জীবন দিয়া আমি তোমাকে বরণ করিব, পরাশক্তি-ময়, তোমাকে ধারণ করিব, তোমার শ্রীচরণস্পর্শে এই ধরা ব্রজধামে গড়িয়া উঠিবে, ঘরে ঘরে তোমার গৌরবোজ্জ্বল-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইবে। তোমাকেই তো চাই, তুমিই আমার ধ্যানজ্ঞান, তপতপ, সাধন-ভজন, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি। তুমিই জ্ঞানানন্দ, আমার জীবন দিয়া জ্ঞানে দিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠুক। 'চম্পকবরণী রাধা আমার নিতাগোপাল দেছেছে বলিয়াই না আমি শ্রীনিতাগোপাল-জীবনে শ্রীরাধা-গোবিন্দকে পাইলাম বর্ত্তমান যুগের মত করিয়া। আমার শ্রীরাধা, আমার শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান শোষিত যুগের সকল সমস্যার সমাধান মূর্ত্তি। নমস্কার নমস্কার।...কুসুমকে আমাদের কথা কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করি। বিশ্বে সমস্ত ঘটনার একটি ভাগবতী ইঙ্গিত আছে। কেন তাহাকে হঠাৎ গোপালে নিয়া আসিতে হইল, কেন পাকিস্থান ছাড়িয়া লোক আসিতেছে, ইহার মধ্যে তাহার অগ্রসর হইবার আহ্বান আছে কি না খুঁজিতে বলি। ঝড়ের মত ছুটিতে হইলে ঝড়ের জীবনের সঙ্গে থাকা চাই। ক্ষুদ্র স্রোতের যদি সাগরে পৌঁছিতে হয় তবে নদীর শরণাগত হইতে হয়। একা চলিলে কোথায় সে হারাইয়া যাইবে ঠিক নাই। এ অবস্থা আমরা সৃষ্টি করি নাই। ইহা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা অতিমাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিলে আরও সাধনা হইতে পারে। আমি সকলকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, দ্বার আমার খোলা। বৈকালে জাগাগড়ার শেষটুকু পড়া হয়। আরতির পরে পাঠ হয়। প্রথমে ঠাকুরের জীবনী, পরে উপোপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ হয়। বিশিবের এক পোস্টকার্ড আসে।

৩১শে অক্টোবর

রাসযাত্রা—নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মতিথি।

ওগো রাসেশ্বরী শ্রীরাধা, রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের লীলাবর্ত্তের মধ্যে একদিন জনম লইয়াছিল নরনারায়ণ আশ্রম আমার বুক নিংড়াইয়া। বদরিকাশ্রম আজ লোকালয়ে। সেই ধারা বহন করিয়া আজও আগাইয়া চলিয়াছি। আমার বুকজরা বেদনা তোমরা লও। কত মানুষ ছিল, কত মানুষ চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আজ তোমাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতেছি। আমার জীবনে, আমার পরিবারে, আমার সমাজে, আমার জাতিতে, আমার বিশ্বে তোমাদের রাস-মণ্ডল গড়িয়া উঠুক; তোমাদের রাস-লীলার মাঝে সকল

জাতি এক অদ্বৈত হউক, সকল দার্শনিক এক অদ্বৈত হউক, তোমার 'সর্ববাদবিরোধপ্রতিরূপশীল' রূপ আজ ধরার বুকে সার্থক হউক। প্রতি অংশ পূর্ণ হউক, প্রতি পূর্ণ অংশ-সমূহ অঙ্গোঙ্গিভাবে যুক্ত হউক, তুমি সকলের গলায় গলা মিলাইয়া এক হও, অদ্বৈত কর; তোমার রাসলীলা সার্থক হউক।···রেণু রিপ্যাট্রিয়েশান সার্টিফিকেটের জন্য পার্ক সার্কাস যায়, আফিস গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি। বিরজার বাসা, মন্থর ওখানে হইয়া ১টার পর ফেরে। ৩.৩০ টার পর উদ্বোধন হইতে 'বোল আনার দেশ' প্রতিষ্ঠা পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করি। আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করি। বৈকালে আশু বোস আসিয়া জানাইয়া যান যে, আগামীকাল হইতে দাশরথী দাদা গীতা পাঠ আরম্ভ করিবেন। মাসে ২ রবিবার তিনি আসিবেন। খুব ভাল কথা। ঠাকুর যদি ইঁহাদের মধ্যে প্রেরণা জাগ্রত করেন বহির্জগতে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য, তবে কাজ হইবে। এতদিন প্রচারের উপরে ইঁহাদের কোনও দৃষ্টিই ছিল না। প্রাণের পথ ছাড়া অন্য কোন পথেই—মন বুদ্ধির পথে—ঠাকুরের প্রচার হইবে না। কি জানি, দাশরথী দাদা ঠাকুরের মতবাদ কি ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি একান্ত 'অদ্বৈতবাদ' আশ্রয়ে ঠাকুরের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবেন কি? একদিন 'নরনারায়ণ আশ্রমে' কত লোক আসিয়াছি, আজ কেহ নাই। আমি কিন্তু আগাইয়া আসিয়াছে। কোথাও যে আটকাইয়া যাই নাই, ইহা ঠাকুরের আশীর্বাদ। আটকাইয়া যাইবার মত অনেক কিছু ছিল। স্ত্রী পুত্র টাকাকড়ি, রাজনীতি, বাহিরের মেয়ে-পুরুষ কেহই তো আমাকে বাঁধিয়া রাখে নাই। ধরা পড়িয়াও আমি ধরা পড়ি নাই। ইহা ঠাকুরের মহিমা। সংসারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কেমন করিয়া সংসারের অতীত থাকিতে হয়, তাহা আমি আমার জীবনে আস্বাদন করিয়াছি। ৮টার পর মাখনবাবু আসেন। ··

১লা নভেম্বর

নরনারায়ণ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ওগো শ্রীরাধারাণী আমার, তুমিই শ্রীনিতাগোপালরূপে আমার ঘরা-ছোঁয়ার মাঝে প্রত্যক্ষ হইয়াছ। তোমাকে আমি পাইয়াছি শ্রীনিতাগোপালের জীবনের মধ্যে বাস্তবরূপে। বিশ্ব প্রকৃতির পরম সার্থকতা তুমি, তোমাকেই আমি সকল দেহপ্রাণ-মন দিয়া বরণ করি। আমি যেন তোমায় বিশ্বাস করি। তুমি ডাকিয়া শুনাইয়া গিয়াছ, 'মামেকং শরণং ব্রজ'। এই জড়ের মাঝে আমার শরণ লও, তুমি তোমার অহং-কেন্দ্রে এই জড়ে সামান্য দিতে পারিবে না। তুমি-আমি 'ছায়াতরোরিব ভ্রষ্টলোকে, আমাকে বিশ্বাস করিতে দাও; তুমি আমার সঙ্গী, প্রতি পদক্ষেপে তুমি আমার সঙ্গী। কেন আমি ভয় করিব? আমি কি আরও তোমাকে বিশ্বাস করিব না? আমায় বিশ্বাস দেও। প্রতিভা বাজারে যায়। মাখনবাবু সকালে আসেন। সকালে 'শ্রীকৃষ্ণের পরমতা' প্রবন্ধটি ঠিক করিয়া রেখে। রেণু পড়িয়া শুনায়।···৪-১৫-এর পর পাঠ সুরু হয়। 'প্রকৃতির অনন্তত্ব' বিষয়ক অধ্যায়টি গীতার অনুক্রমণিকা হইতে রেণু পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করি। 'গিরিধারী' নামের অর্থটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। আকাশের দেবতাকে টানিয়া আনা হইয়াছে জীবনের মধ্যে, কর্মের মধ্যে। একদিন 'কর্ম-করা'ই মানুষ ত্যাগ করিত, আজ বিশেষ ঢং-এর কর্ম করাকেই ছাড়িবার কথা হইতেছে। স্থূলবুদ্ধি মানুষ স্থূল কর্ম করা না-করা বোঝে। কিন্তু একটি technique আশ্রয় করিয়া পূর্বের রকমকে ছাড়িতে হইবে—ইহা বুঝিতে মানুষ গলদঘর্ম হইতেছে। এত দিনকার দার্শনিকগণ এই জগতের নানা রকমের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে কেহ গড়িয়া তুলিতে চান নাই, 'alter' করিতে চান নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই চাহিয়াছেন। এই বিশ্ব 'altered' হইলেই ইহা হয় ব্রজধাম। ওগো ব্রজধাম, তোমাকে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া আস্বাদন করিবার জন্যই তো আমার প্রাণ পাগল। কবে তোমাকে আমি পাইব এই সৃষ্টির বুকে। আজিকার পাঠে সন্তোষ কর আসিয়াছিলেন আরম্ভের ১৫ মিনিট পর। এই দর্শনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাহার এতটুকুও সন্দেহ নাই। এই আশ্রমের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব বহন করিবার কথা বলি। বিমল আসে ৮টার পর। হরিগোপালবাবুর বাড়ীর মেয়েরা পাঠে আসিয়াছিলেন। পাশের ডাক্তারবাবু ও অনন্ত আসে।

এই ভাবেই চলিব, দেখি তাঁহার কি ইচ্ছা। সব আজ দিশেহারা, কক্ষচ্যুত। মতবাদের সঙ্ঘাতে মানুষ আজ বিপন্ন। কোথায় যাইবে? কি সে আশ্রয় করিবে? ঠাকুর রক্ষা কর।

২রা নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শনের মধ্যে বর্তমান যুগের সকল সমস্যার সমাধানের মূল সূত্র আমি পাইয়াছি এবং তাহাকেই আমি আমার বুকের রক্ত দিয়া প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে আস্বাদন করিয়াছি। কিন্তু তাহা তো ছড়াইয়া দিতে পারিলাম না। ইহা কি আমার মনঃকল্পনা? যে বিশ্বে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল তোমার, তুমিই সেই বিশ্বে আজ অপরিচিত? কেমন করিয়া এই বিশ্ব বাঁচিবে? সব যে আজ অগোছাল হইয়া পড়িল? সব যে আজ রাধাচক্রের ভিতর ঘূর্ণায়মান হইয়া বেড়াইতেছে। কোথায় ইহার সমাধান? ওগো সমাধানমূর্তি? তুমি এসো আমার জীবনে। তোমার দর্শন বুকে লইয়া আমার এই যাত্রাকে তুমি অন্বয়যুক্ত কর। কোনও দিনই আমার প্রচেষ্টা তোমার আশীর্বাদে ব্যর্থ হয় নাই। তোমার জয় হউক। সকালে উজ্জলভারতের জন্য নীতাভাষ্য ঠিক করি। বেলু ১০টার পর পাকিস্তান হাই কমিশনারের আফিসে যাই, ফরম আনে; পি. সি. সেন, পি. কে. সেন, মুক্তালালবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে; সাবিত্রীবাবুর সঙ্গেও দেখা করে। বৈকালে ৩টার পর উজ্জলভারত হইতে গত বৎসরের 'শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধ পাঠ হয়, যেখানে বলা হইয়াছে রামকৃষ্ণ সমন্বয়ের পূর্ব পর্যায় দিয়া গিয়াছেন, আর নিত্যগোপাল দিয়াছেন সমন্বয়ের পর পর্যায়।" সন্ধ্যার পর ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্রের কিছুটা কুসুম পাঠ করে, আমি ব্যাখ্যা করি। যে-দর্শন ও যে-জীবনের সূত্র আমি পাইয়াছি, তাহার অনুধাবন করা খুবই কষ্টকর বুঝি। অথচ ইহা ছাড়া পথই বা কি? সাধনা আসিয়াছে মন-বুদ্ধি অহঙ্কার-প্রকৃতি বদলাইবার জন্য। আগে সংসার করা ও সংসার ছাড়ার মধ্যে মানুষ যে কোন একটাকে বাছিয়া লইয়া পারিত, একটা আত্মতৃপ্তি থাকিত, সত্যিকারে করা বা ছাড়া না-ই বা হোক। কিন্তু এখন যে technique-এর প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিশুকে 'পড়' বলিলে যেমন তেমন করিয়াও পড়িতে পারে, 'পড়িওনা' বলিলে না পড়িতে পারে। কিন্তু 'মনোযোগ দিয়া পড়' বলিলে তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। সাধনা রহিয়াছে অন্তরে—সব কিছুর মাঝে নিজের আনিবার পথে। বাইরের সাধনা আজ আসিয়াছে ভিতরে। মানুষ গভীর ভাবে কিছু নিতে চায় না। ছাড়িতে পারুক বা না পারুক, তবে 'ছাড়' বলিলে সে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু 'ছাড়া' যখন 'রাখার' ঢং হয় তখন মানুষ অন্ধকার দেখে। তাই মানুষ আমার কাছে আসে না। কত বড় সংযমী হইলে মানুষের মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে? কর্ম-ছাড়ার চেয়ে কর্মের মাত্রা ঠিক রাখা অনেক বেশী কষ্টকর। অথচ পথ ইহাই।

৩রা নভেম্বর

ওগো জগন্নাথ শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণগোচরীভূত প্রাণ-টান আমার, আমার জীবন রসের তুমি সাথি। তোমাকে এই চোখে দেখিয়াছি, তোমার কথা এই কানে শুনিয়াছি, তোমাকে এই দেহ দিয়া ছুঁইয়াছি। তুমি প্রমাণ করিয়াছ তুমি আমার ব্রহ্ম। তুমি আমার প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, অনুমানের ব্রহ্ম, উপমানের ব্রহ্ম, শব্দের ব্রহ্ম, ইতিহাসের ব্রহ্ম, ইতিকথার ব্রহ্ম। তোমার নিত্যসিদ্ধ রথ-যাত্রাকে আমি আমার জীবনে বরণ করিব, সেই রথযাত্রাকে আমার সকল দেহপ্রাণমন দিয়া আগাইয়া নিব—ইহাই আমার সারা জীবনের কামনা। তোমার নিত্যসিদ্ধ রথযাত্রাকে আমার সাধনা দিয়া এই ধরার ধূলিতে গড়িয়া তুলিব। কাল সন্ধ্যার পর পাঠ হইতেছিল ঈশ-উপনিষদের প্রথম মন্ত্র 'ঈশাবাস্যম্'। জগন্নাথ, জগন্নাথ। সকালে প্রার্থনার ঐ রথযাত্রার সাধনাকে বরণ করি। সকাল বেলা বড় বৌর একটি চিঠি সহ সেখানের একটী মজুর আসে।...আমার উপর উহাদের দৃষ্টি আছে। উহাদের কল্যাণ হউক, হারানো মর্যাদা আবার প্রতিষ্ঠিত হউক। সেবানন্দ আসে।...বেলু ৮৯০টার পর বাহির হইয়া কুসুমের পাসপোর্ট সাইজ ফটো লইয়া মার্কাস এভিনিউ-তে যাই, দরখাস্ত দিয়া বারোটার ফেরে। ২১০টার পর আমি ও প্রতিভা বাসে হরিদাসীর

ওখানে যাই।··· আজ যে যাহা দিতেছে ঠাকুরের সন্তোষের সেবায় লাগিতেছে। সন্ধ্যায় সুধা তাহার পুত্রকন্যাদের আসে, আরতির পর গান গায়।···

৪ঠা নভেম্বর

ওগো সর্ব সমন্বয়ের নবীন পথে অনাদি আদি পথিক, এ পথ এ পর্যন্ত কোনও ধরা-বাঁধা পথে পরিণত হয় নাই। এ পথের খোঁজ এখন বিশ্বের মানুষ করিতেছে বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও পথ আজিও বিশ্বের সামনে প্রকাশিত হয় নাই। তুমি আমি এই পথে আদি যাত্রী; আমরা এই পথ গড়িয়া তুলিব আমার বুকের রক্ত দিয়া, বুকের হাড় মাংস দিয়া। তখন সেই পথে কোটি কোটি মানুষ যাতায়াত করিবে, পথিকের কলধ্বনিতে পথ মুখরিত হইবে। পরিবার-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, জনপদ গড়িয়া উঠিবে। সেই দিনের আনন্দে আমি বিভোর। তোমাকে নমস্কার। ···২টার পর রেণু উমাকে তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া হাই-কমিশনারের আফিসে যায়, সার্টিফিকেট লইয়া বীরেনবাবুর আফিসে যায়, শেষে গোলাম মহম্মদ রোড হইয়া এখানে ফেরে। ফুটু সঙ্গে আসে। বৈকালে সুধুমের সঙ্গে কথা হয়। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় ওখানে সুবিধা হইলে সে দীর্ঘদিন আসিবে না।··· চাকুরিয়ার নকুলবাবু হঠাৎ আসেন, প্রাহকের ৪৲ টাকা দেন। আমার প্রাণ দিয়া সেবা তাহার খুব ভাল লাগে। ···কোলাকুলি করিয়া বিদায় দেই।

৫ই নভেম্বর

ঠাকুর, আমার কত দিকের এই স্নেহপ্রাণমন লইয়া তোমারই শরণ নিলাম। তোমার জগতের, তোমার মানুষের সেবার জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইলাম, কেহ তো সাড়া দিল না? আমার হৃদয় দিয়া তো কাহারও হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমি সাধনা সুধুমের ওখানে না ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত পড়িয়া থাকিতাম, কত দাবীই না আমি করিয়াছি, পায়খানা পরিষ্কার করাইয়াছি, একেই পড়িয়া রহিয়াছি। স্নেহ প্রতিদান সেদিন ছিল না, তাই, আমি তো কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। কাহাকেও কি আমার হৃদয়ের কথা বুঝাইতে পারিয়াছি? তুমি আমার শরণ, ওগো আমার মহানির্বাণ, আমি তোমার মাঝে ডুবিয়া যাইব। প্রার্থনার প্রচুর কাঁদি।···রেণু কলিকাতা যায়—৩৫টিনেন্টালে, রাইটার্স বিল্ডিং-এ, কুসুম প্রোভাইডেন্স-এ, রাত্রে ফিরে। ···সুধুমের সঙ্গে অনেক কথা হয়। মানুষ নিজের মনের মাত্র ½ ভাগ জানে, বাকী ½ ভাগ থাকে অবচেতন, অচেতন স্তরে। তাহা ধরাইয়া দিবার জন্যই প্রয়োজন হয় একজন অন্তর্দর্শী পুরুষের। আমি মানুষের ভার বহিতে চাহিয়াছিলাম, কেহ তাহা দেয় নাই। সেই জন্যই তো মানুষ আমাকে চায় না— মানুষ ভার বহিতে গিয়া তাহার সঙ্গে বিরোধ হইয়াছে। 'যোগক্ষেমম্ বহাম্যহম্' —ইহা সত্য; কিন্তু সর্ত হইবে 'অনন্য' হইতে হইবে। 'চিন্তয়ন্তঃ মাং উপাসতে' ও 'নিত্যাভিযুক্ত'। রেণু আমার নির্দেশমত চলে বলিয়া 'অভিযুক্ত'। ঠাকুর যে পথের খোঁজ দিয়াছেন, সেই পথে আমার নির্দেশমত চলিলে মানুষের প্রারব্ধ সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম ক্ষীণ হইত। আমি মানুষ নিয়া যে টানাটানি করিলাম, পিছু পিছু ঘুরিলাম, কে করিবে জানি না: কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া সেবা আমি করিয়াছি। যাহার কিছু কল্যাণ আমি করিতে পারিব না, তাহার কাছ হইতে সেবা গ্রহণ করা তো 'শোষণ'। আমি শোষণ করিতে পারিব না, তাহাতে মানুষ আমাকে যদি না নেয়, কি আর আমি করিব? মানুষ আমাকে ত্যাগ করিবে, আমি কাহাকেও ত্যাগ করিব না। বৈকালে মাথা ধরে। বহুদিন পর হরীন চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যার পর আসেন। তাহাকে মুড়ি খাইতে দেওয়া হয়। পুলিনও আসে।

৬ই নভেম্বর

ক্রমশঃ

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপনিষদের পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৯৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	২৲
৪।	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিতাগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১৷০
৬।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাজয়ন্তী	৵০
৮।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১৷০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	মুণ্ডকোপনিষৎ
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৮।	অপ্রকাশিত পত্রাবলী
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির ইতিকথা	১৷০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৷৵০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	৷৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৩৲

পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

"আগে ভগবানে অনুরাগ পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সবটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুঝিতে না চাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। ……দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ রাসের টানে গোপীগণকে সহজ ও অজস্র (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রিয়ায় ও দ্রব্যে অদ্বৈত হইয়াই ভক্ত অতি দ্রুত বিশ্বজ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্তমান ভজন'। বর্তমান যুগ বর্তমান ভজনের যুগ, ইহাও তাঁহারই নির্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প. বার্ষিক পাঁচ টাকা

Printed by Nagarjun Printing Works, 95 Naskaldanga North Road, Cal-11

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাপ্তাহিক সংখ্যা ২৮৮৬, ২৩৭২ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম এ সপ্তবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

ফেস্টিভ্যাল
অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য
আপনার রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে
ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট
খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

•

এছাড়া আপনার দীর্ঘমেয়াদী
রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে
আকর্ষণীয় সুদের সুবিধা আছে।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেডঃ অফিসঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

প্রত্যহ
তি ঘরের
য়োজনে

দীপ্তি হ্যারিকেন লণ্ঠন

দীপ্তি এনামেলের বাসন

ও

খাস জনতা কেরোসিন কুকার

প্রস্তুত কারক :—

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৬৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ই ইণ্ডিয়া পেইণ্ট
এণ্ড
কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

কাতা • আসানসোল • শিলিগুড়ি • মাদ্রাজ

-এর

আন্তরিকতাপূর্ণ সৌজন্যে

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

★

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল করে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ :—
কিনিবার সময়
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি,
পিলফার প্রুফ ক্যাপের
উপর **R.C.M.** মনোগ্রাম
ও প্রস্তুতকারক এম, এল, বসু এণ্ড কোং
দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ · লক্ষ্মীবিলাস হাউস · কলিকাতা-৯

সাদর শারদীয় সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা

ভোলানাথ পেপার হাউস প্রাঃ লিঃ

হেড অফিস—৩২এ, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলি-১

পেপার হাউস

ফোন—২২-১৫৩২ গ্রাম—বিদ্যাসেবা

পোঃ বঃ ১১৪

কলিকাতা ব্রাঞ্চ

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড ১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট

১৩৪।১৩৫, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

With Compliments

SOORAJMULL NAGARMULL

8, Dalhousie Square East
Calcutta-1

FOR YOUR REQUIREMENT OF

EXPANDED METAL

&

Steel Furniture of all Types

for Home and Office

PLEASE CONTACT

ACME MANUFACTURING CO.,

'JAIN HOUSE',

8/1, ESPLANADE EAST,

CALCUTTA-1.

Phone : 23-5594 (3 lines)

Gram : Nature Cure.

যে কোন রকমের গৃহাদি

নির্মাণে

বেঙ্গল বিল্ডার্স এণ্ড ট্রেডার্স

প্রাইভেট লিঃ

-এর

পরামর্শ লউন।

পি-১৩, মিশন রো এক্সটেনসান

কলিকাতা—১

ফোন : ২৩-৩৪১৮

বাংলার ও বস্ত্রশিল্পের লক্ষ্মী

বঙ্গলক্ষ্মী

মাতৃপূজায় ও নিত্য প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি — — — শাড়ী

অপরিহার্য্য

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস : ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
•• কলিকাতা ••

ভারত ও ভারতবাসীর
সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয় তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডমল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুয়ারিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ডুইং-এর কালি।

সুলেখা
ফাউন্টেন পেনের
কালি
ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে
এবং ০.., ০.., ১.., ১৫০ ও ৭০০ এর এম সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

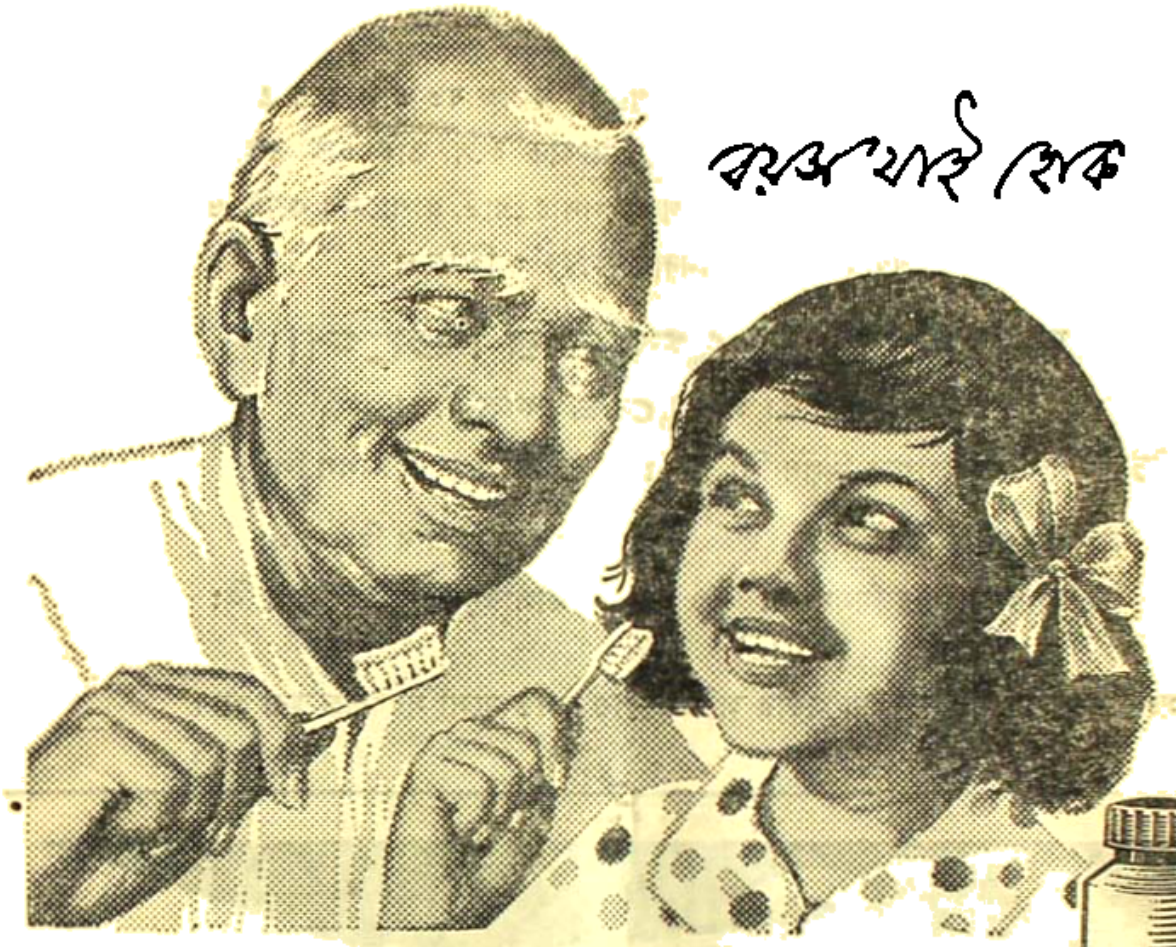

বয়স যাই হোক

নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।
নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে

নিম-এর তুলনা নেই।

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ কলিকাতা—২৯।

ফোন নম্বর : ৩৪-৮২৮৫

বর্তমান যুগ-সংস্কৃতি রক্ষার প্রধান উপকরণ কাগজ। কাগজ যত ভাল হবে ততই তা হবে টেকসই। কালের বুকে এই সংস্কৃতিকে এঁকে রাখতে হলে তাই চাই ভাল কাগজ।

সকল রকম দেশী ও বিলাতী ভাল কাগজ, পেপার বোর্ড, ছাপানোর কালি ও লিখবার সরঞ্জাম আমদানী-কারক ও বিক্রেতা

ভাকেশ্বরী পেপার ডিপো

৬৬।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ডিষ্ট্রীবিউটার—টিটাগড় পেপার মিলস লিঃ : বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ

স্টকিষ্ট- ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস লিঃ : সাপুর পেপার মিলস লিঃ

শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ : তালারপুর পেপার মিলস লিঃ

সহর ও মফঃস্বলের যাবতীয় অর্ডার অতি যত্নে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

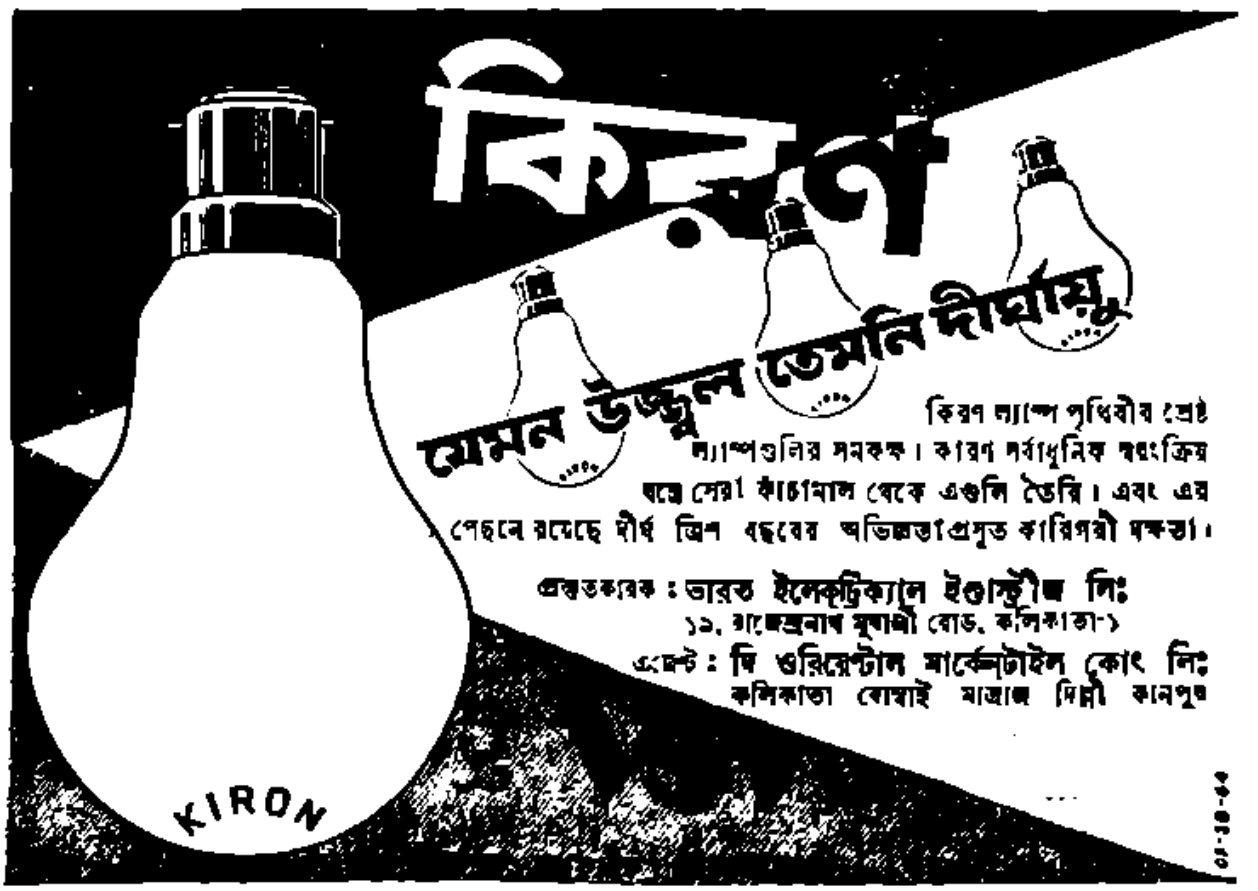

একজন মৃত্যুঞ্জয়

একজন রহস্যময়

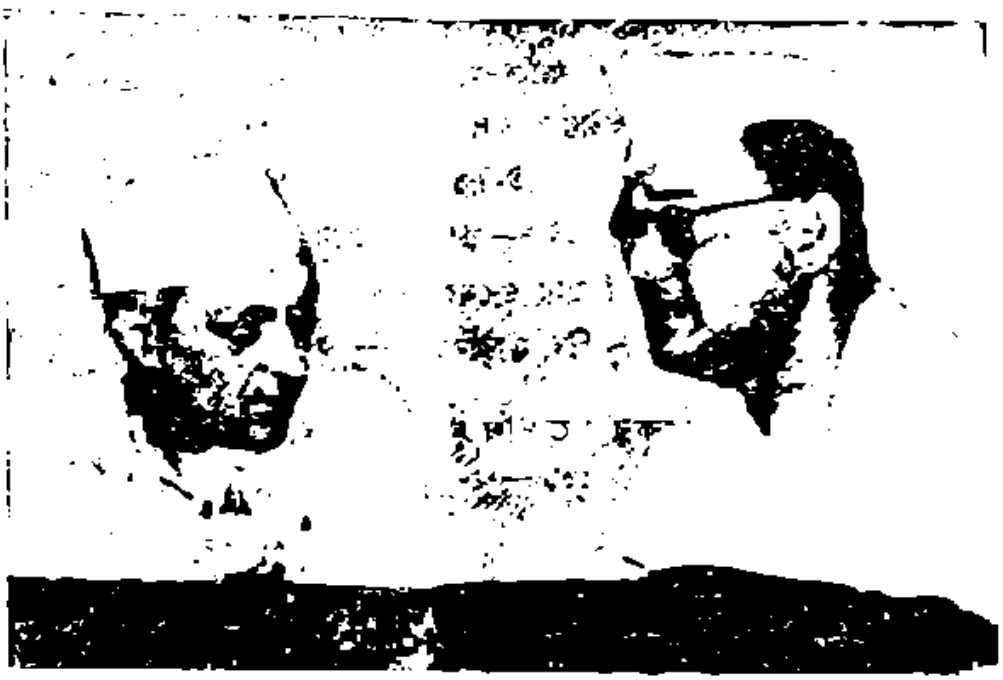

"রাজনীতির দিক থেকে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার মতই দেখেছি এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়েছি"

—সুভাষ চন্দ্র বসু

২৮শে মার্চ, ১৯৩৯

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা

সি, সি, কোম্পানী

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোং লিঃ—

৮।১, ডালহৌসী স্কোয়ার

কলিকাতা।

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ

টাইপরাইটার—ফাউণ্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত।

—ষ্টিল ফারনিচার।—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৫২৬১

we undertake

BLOCKMAKING
(COLOUR TRANSPARENCIES ALSO)
COLOUR PRINTING
AND DESIGNING

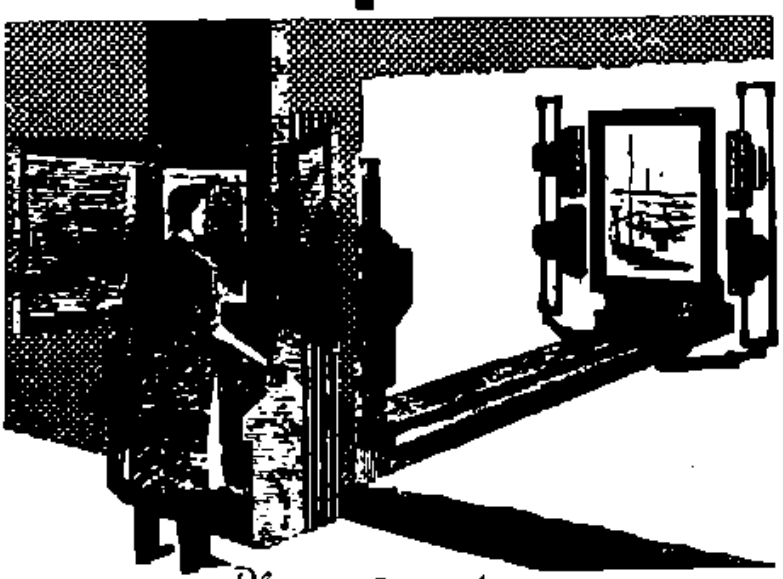

Please Contact:

Phone 34-1361

Standard Photo Engraving Company

1, RAMANATH MAJUMDER STREET, CALCUTTA-9

গান্ধী স্মারক নিধির বই

বাহির হইল

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

আমার সমাজতন্ত্র ১·০০

গান্ধীজী কি সমাজতন্ত্রী ছিলেন ? গান্ধীজীর নিজের লেখা এ বইয়ে প্রশ্নটির উত্তর পাবেন।

অনুবাদ : অজিত কুমার বসু

নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সংস্করণ) ৪·৫০

সত্যই ভগবান (২য় সংস্করণ) ৩·০০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই)
৫·৫০

বাংলা ভাষায় একখানি অনবদ্য গান্ধীজীবনী

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা), প্রকাশন বিভাগ,

১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

শারদোৎসবে

বৃহত্তম

বিভাগীয় বিপণি

কমলালয় ষ্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩

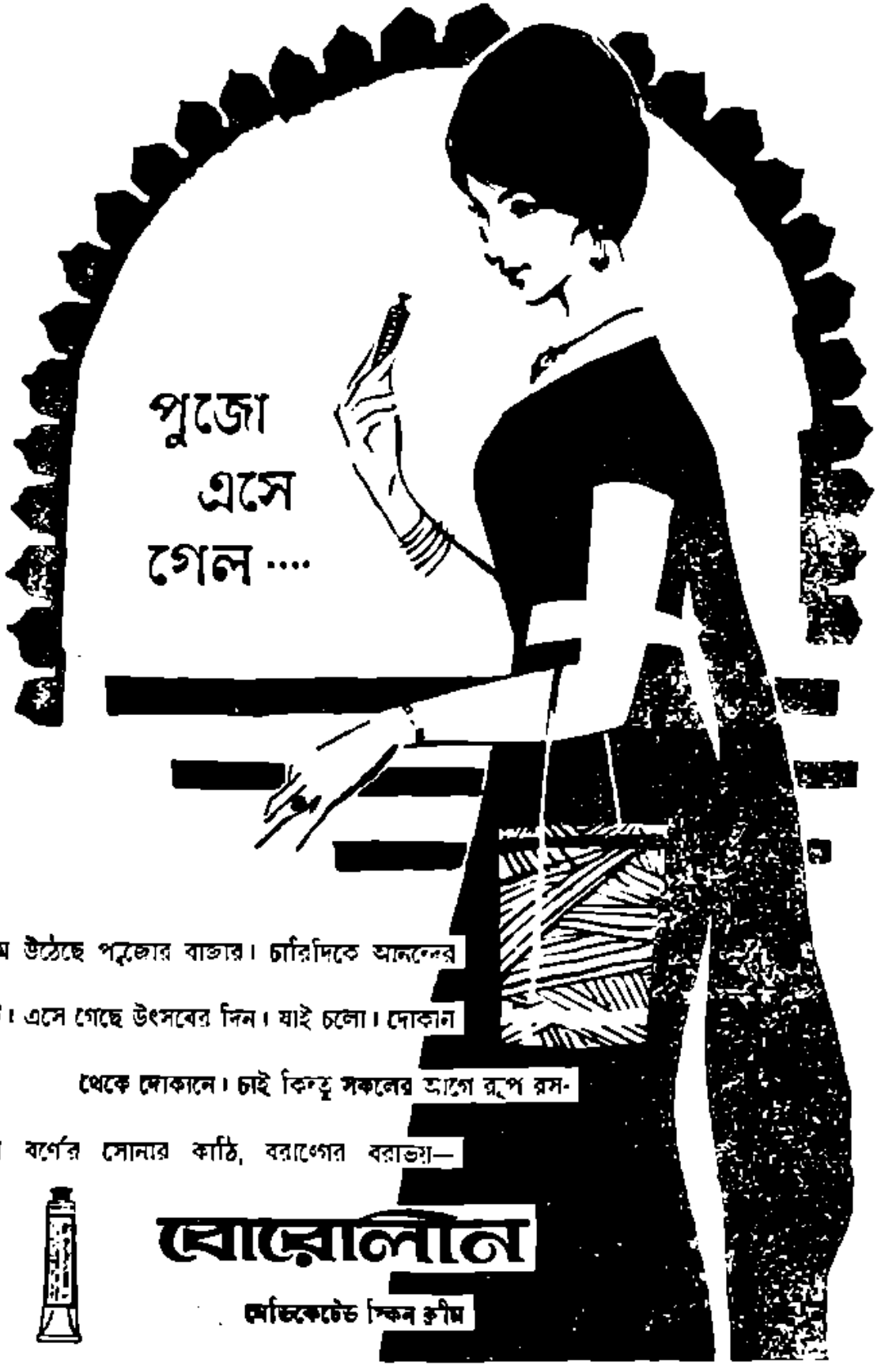

জমে উঠেছে পুজোর বাজার। চারিদিকে আনন্দের হাট। এসে গেছে উৎসবের দিন। যাই চলো। দোকান থেকে দোকানে। চাই কিন্তু সকলের আগে রূপ রস-গন্ধ বর্ণের সোনার কাঠি, বরাঙ্গের বরাভয়—

বোরোলীন

মেডিকেটেড স্কিন ক্রীম

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

জাতীয় উৎসব

এই দিনে আমাদের সংকল্প :—

* জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
* সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করব
* সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
* জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
Soul of India Speaks	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

মানুষের মত মানুষ	·৭৫
বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি

সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫
শিক্ষা (শ্রীরমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত)	৭·৫০
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	২·০০
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত)	১০·০০
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত)	৯·২৫
শিক্ষা বিজ্ঞান	·৫০
শিক্ষার ইতিহাস	৩·২৫

ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	১·৭৫

ব্যায়ামবীর নীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	১·২৫
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	১·২৫
সরল যোগ ব্যায়াম	১·২৫
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	১·৪০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	১·৪০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৩·০০

Student's Own Dictionary (of Words Phrases & Idioms) ··· 7·50

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১০·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (বহুচিত্র শোভিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী) ৩·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট, বালিগঞ্জ ॥

১। শ্রীশ্রীদুর্গা ... ১৮৯
শ্রীনিতাগোপাল

২। আগমনী ... ১৯০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৩। তবু সেই সিদ্ধান্ত নিলাম (কবিতা) ... ১৯৩
শ্রীবিহঙ্গম মিত্র

৪। মহাকবির যুগ ... ১৯৪
শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়

৫। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ... ১৯৭
শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত

৬। সাহিত্যে 'সাবলাইম' (Sublime) ... ২০০
শ্রীনবীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

৭। কস্তুরী (একাঙ্কিকা) ... ২০৩
শ্রীনমুখ রায়

৮। উজ্জয়ন্তীরত ... ২০৬
শ্রীবুদ্ধদেব বসু

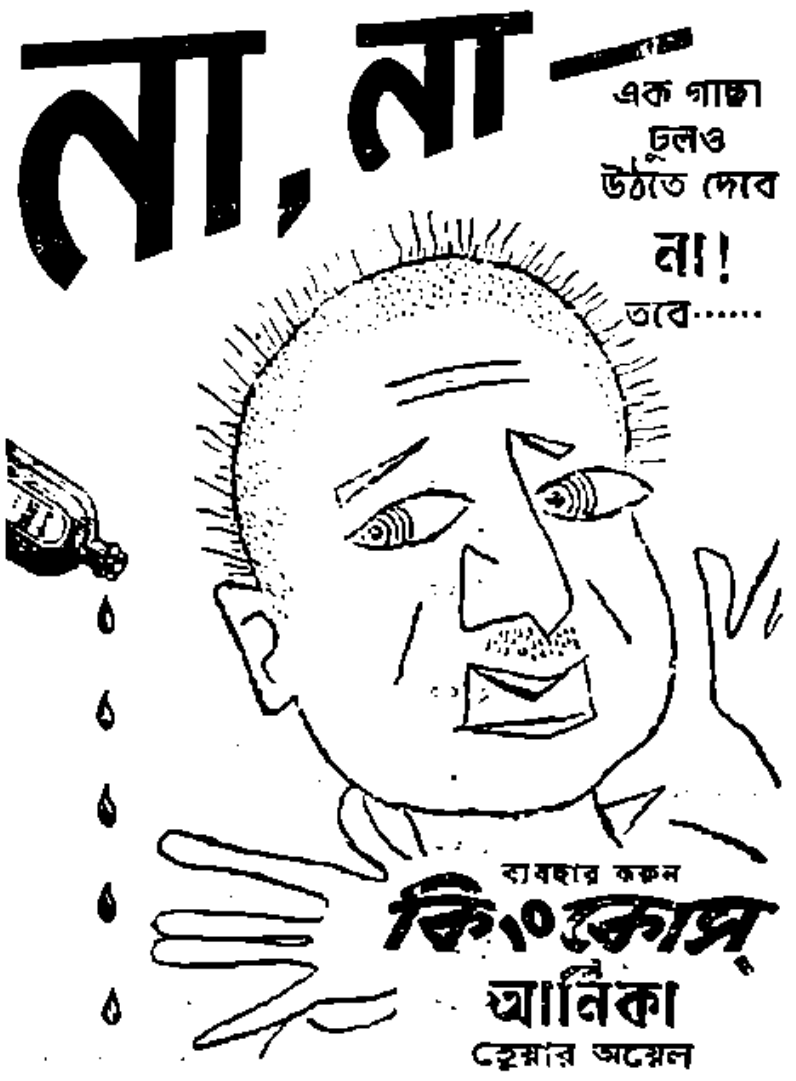

প্রস্তুতকারক : কিং এণ্ড কোং কলিকাতা-৭
একমাত্র পরিবেশক
আর, ডি, এম এণ্ড কোং ২১৭নং বিধান সরণী কলিকাতা-৬

৯। ব্রাউনিং ... ২০৭
জনাব রেজাউল করীম
১০। সমন্বয় (কবিতা) ... ২১০
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
১১। সব নিয়ে এ জীবন (কবিতা) ... ২১০
শ্রীশান্তশীল দাশ
১২। প্রার্থনাকালীন ভাবন ... ২১১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩৯)
১৩। অপরের সঙ্গে কি ভাবে মেলা যায় ... ২১৪
শ্রীদেবাশীষ পাল
১৪। শিক্ষায় সৃজনাত্মক শিল্প ... ২১৭
শ্রীপ্রভাত রঞ্জন গোস্বামী
১৫। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় ... ২২০
শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত
১৬। মুণ্ডকোপনিষৎ (অনুবাদ ভাষ্য সমেত) ২২৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
১৭। সমন্বয়ের আদর্শ ও আদর্শ সমন্বয় ... ২২৮
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
১৮। হৃষিকেশে (কবিতা) ... ২৩১
শ্রীবেণু মজোপাধ্যায়
১৯। পুস্তক পরিচয় ... ২৩১
২০। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪২) ২৩৪
২১। সন্ধ্যাচারী সমাজ ... ২৩৯
শ্রীনলিনী কিশোর গুহ

মণি বাগচি প্রণীত

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক ৩·০০
[রামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী]
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী ৩·০০
লোকমাতা নিবেদিতা ২·৫০
জননায়ক জওহরলাল ৪·০০
অরুণ বিশ্বাস প্রণীত
বাংলার বাঘ আশুতোষ ২·০০

॥ উপন্যাস ॥

মমিতা চক্রবর্তী ॥ ইন্দ্রনীলা ২·০০
নগেন দত্ত । অচেনা আকাশ ৩·০০
নারায়ণ চৌধুরী ॥ মোহ থেকে মুক্তি ২·০০
ধীরেন মুখোপাধ্যায় ॥ মুক্তিস্নান ২·৫০

শিক্ষা ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রবর্তক
অগ্রগণ্য নাট্যকার
মন্মথ রায়ের নাট্য গ্রন্থাবলী
একাঙ্কিকা (২১টি) ৫৲ ।· ছোটদের একাঙ্কিকা (১২টি) ২৲
নব একাঙ্ক (১০টি) ৩৲ ॥ মহাহাতি লাখ টাকা ১·২৫
কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া (একত্রে) ৩৲
কোটিপতি, নিরুদ্দেশ, বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী,
রূপকথা (একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ, বন্দিতা, দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
বর্ষঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম, আজবদেশ (একত্রে) ৪৲
জীবননাই নাটক ২৲ ॥ মহাকালরাতী ২·৫০ । অশোক ২৲
মহাশ্বেতা ২·৫০ ॥ সাবিত্রী ২৲ । খনা ২৲ ॥ চাঁদসদাগর ২৲
স্বর্ণকীট ও অন্যান্য ২৲ ॥ কাজল রেখা ·৭৫ অমৃত অতীত ১৲ ॥ বন্যা ২·৫০ ॥
গুরুদাস চাটার্জি এণ্ড সন্স
২০৩১।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদুর্গা

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

শ্রীদুর্গা দীনতারিণী পরমা জননী,
আনন্দময়ী অভয়া পরমা শিবানী।

মহাজ্যোতির্ময়ী তিনি চৈতন্যদায়িনী,
শিবানন্দ প্রদায়িনী শিবস্বরূপিণী,
মুক্তকেশী মনোরমা, কভু তিনি ঘনশ্যামা,
আদ্যাময়ী অনুপমা অনন্তরূপিণী,
সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতারিণী।

হিমালয়ে হেমাঙ্গিনী গৌরী গিরিবালা,
ভক্তের হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী চপলা,
কমলাসনে কমলা, পুরুষোত্তমে বিমলা,
পরাভক্তি সুনির্ম্মলা মানসরঞ্জিনী!

মেনকা-মনোদকাশে উমা আবরিণী,
মেনকার মনোরমা অন্তঃশোভিনী,
কভু বালা ভগবতী, কমলিনী ক্রীড়াবতী,
বেদময়ী বেদবতী তিনি ওঁকারিণী,
মহাকাবময়ী শ্যামা, শ্রীকৃষ্ণতারিণী।

(তাঁর) সুচারু কটিতে শোভে সুবিচিত্র বস্ত্র,
শ্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র,
দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
তিনি দিব্য কিরীটিনী সুমনী মালিনী,
নিত্যজ্ঞান সরোবরে দিব্য সরোজিনী!
দক্ষিণ শ্রীপদ তাঁর ধর্ম্ম সিংহোপরে,
দিয়েছেন বামপদ অধর্ম্ম অসুরে,

কত তাঁহার করুণা, অধর্ম্মে ঘৃণা করে না,
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিণী,
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী।

মায়াভুজঙ্গিনী তাঁর শ্রীকর অধীনে,
বদ্ধ করিবারে নারে তাহা ভক্তজনে,
বিষম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদ্গীরণ,
মহাদেবী দুর্গা নিজে সে বিষহারিণী,
সে বিষে মরিলে তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী!

ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম তিনি সত্য সনাতনী
করুণাময়ী শ্রীকালী পরমকল্যাণী,
হয়ে মনসা রূপসী, বিতরেন সুধারাশি,
(তিনি) অজ্ঞান-বিষহারিণী সুধা স্বরূপিণী,
নিরুপমা নিত্যময়ী নিত্য নিরঞ্জনী।

গৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাঁদ,
গোপিনী হরিণী-ধরা প্রেমময় ফাঁদ,
তিনি পরমা সুন্দরী, শিবচন্দ্রে সুধাধুরী,
তিনি পরা শান্তি সুধা ভুবনমোহিনী।

ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
কবে বা তাঁর কৃপাতে রত রব মতি তাঁতে,
স্বদেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী?
আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী
(বা চরণ সুখানি)!

[* ন্যূনাধিক সপ্তর বৎসর পূর্বে লিখিত।]

আগমনী

॥ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
সে যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাইল।
মা' হয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আমার তাবি গিরি কি দোষ অভয়ার
বুঝি শিবদোষে মেয়ে পাষাণী হইল॥

মেনকার হৃদয়-মন আলো করা পরাণ-পুতুলী গৌরী একদিন বছরের শেষে শরতের প্রারম্ভে স্বপনের মাঝে মা মেনকাকে দেখা দিয়ে লুকিয়ে গেলেন; মেনকা কেঁদে আকুল। ওগো গিরিরাজ, "আমার" উমাকে এনে দিতেই হবে। আমি বিশ্বজননী উমাকে চিনি না, সে ত আমার স্বপনের জিনিষ। বিশ্ব-জননী স্বপনের ভিতর দিয়ে আমাকে মা হবার জন্য প্রেরণা দিয়ে গিয়েছে। আজ আমি মা, উমা আমার মেয়ে। বিশ্বের স্বপ্নকে আজ আমার জাগ্রতের সকল রসের পরিপুষ্টিরূপে গড়ে তুলতে চাই। আমি উমাকে খাওয়াব, সাজাব, নাচাব, তবে বুঝি সে আমার মেয়ে, আমি তার মা'। উমা আমার নয়ন পুতুলী। আমি তাকে পুতুল করেই হৃদয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখব। তোমরা অখণ্ডের উপাসকবৃন্দ, আমায় পৌত্তলিক বলতে হয় বলবে, আমি সত্য সত্যই জেনেছি, বুঝেছি, আস্বাদন করেইত উমা আমার সচ্চিদানন্দ পুতুল। অখণ্ড উমা, আজ আমার কন্যা উমা। আমি তাকে আমার সকল অঙ্গের রস নিংড়িয়ে আরতি করব, আমি তাকে আমার সকল আত্মা দিয়ে স্নান করাব, আমার হৃদয়ে সকল আলো জেলে তাকে জগতে প্রকাশ করব, আমার সকল হৃদয়ের মধু দিয়ে তাকে খাওয়াব। উমা ত আমার সকল প্রবোধের বাইরের জিনিষ। আমি সেই অভিমানিনী উমাকে চাই যে—

উমা কেঁদে করে অভিমান
নাহি খায় ক্ষীর ননী-সর॥

যে হাসে না, খেলে না, অভিমান করে না, এমন পাষাণ দিয়ে আমার কি প্রয়োজন? আমার দেহ আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, সকল ইন্দ্রিয়ের বাসনা কামনা আছে, খাওয়ানোর পরানোর সুযোগ আছে, আমার উমার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পাষাণে বসে থাকলে চলবে কেন? সে যে আমার "সর্ব্বাণি সর্ব্বম্"—All in all, আমি তাকে সকল দিয়ে সকল বলেই পেয়েছি; সে যে আমার স-কলা। আমি তেমন বিহ্বলা উমাকে চাই, যে আকাশের চাঁদ ধরতে না পেরে আরসির মাঝের নিজ প্রতিবিম্বকেই চাঁদ মনে ক'রে তাকে ধরবার জন্য কেঁদে আকুল, ধরতে না পেরে আছাড় খায়, ধুলায় গড়াগড়ি দেয়। সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বব্যাপী উমাকে পাবার লালসা আমার চিরতরে কেটে গিয়েছে। ওগো পাষাণরাজ, তুমি নিষ্ঠুর Rational philosophy আমায় শুনিও না, তুমি আমার আহ্লাদিনী, বিহ্বলা, আমোদিনী, পাগল ছেলেমানুষ উমাকে এনে দেও, আমার সকল খেলার সার্থকতা তাকে নিয়ে খেলি। সে যেন আমার কানে কানে তার আগমনীর রসায়ণ-বারতা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল, সে যেন আমার কোলে উঠে আমার মধুর তাড়না-লাঞ্ছনার বিষয় হবার জন্য কতই না বিহ্বলতা রেখিয়ে গেল। ওগো পাষাণ, তুমি তোমার অখণ্ডত্বের, সর্ব্বব্যাপিত্বের পাষাণ-তত্ত্ব-কথা জলাঞ্জলী দিয়ে একবার আমার কন্যা উমার আগমনকে বাস্তবতায় পরিণত কর। আমি পঁচাগলা জগতের বুকে, পঁচাগলা দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে একবার তাকে জড়িয়ে ধরব, এই পঁচাগলা শরীর দিয়ে তার চাঁদমুখে একবার চুমো খাব, আমার ভোলা ক্ষীর-ননী-সর তাকে মুখে তুলে দেব, তাকে কোলে ক'রে একবার কোলকে

সার্থক করব। যে ব্রহ্ম জগতের বাইরে, জগতের দীন দুঃখীর সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই, জগতের হাসি কান্নায় যে ব্রহ্ম উদাসীন, তেমন ব্রহ্ম দিয়ে আমার পোষাবে না। আমি চাই, সকল অঙ্গে জলসিয়ে যাচ্ছে যার রূপের আভা সকল নয়নে নাচছে যার বিলাস, সকল চরণে চড়িয়ে পড়ছে যার চাঞ্চল্য, সকল দেহে ছুটাছুটি করছে যার যৌবন, এমন ব্রহ্মকে; সেও শুধু আমার জন্যে নয়, সে যে আমার পরিবারের জন্য, আমার সমাজের জন্য, আমার বিশ্বের জন্য। যা একার জন্য, তাই অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়; যা প্রত্যেকের অথচ পরিবারের, সমাজের ও বিশ্বের, তাই ত পুতুল। আমি পুতুল উমাকে চাই, সে যে আমার হৃদয়-পুতুলী; পরিবার-পুতুলী, সমাজ-পুতুলী জাতির পুতুলী। এমন পুতুল না ক'রে কোন কড়ির পুতুল পাষাণের মত হয়ে রইব? আমি পৌত্তলিক হবার কলঙ্ক বরণ করেই গিরিরাজ-মহিষী, উমার মা'।

যৌবন

প্রলয় পয়োধি জলে সৃষ্টি নিমগ্ন; বিশ্বের কোন সাড়া-শব্দ নেই। সব ঘুমন্ত, সব অবসন্ন, সবে মাত্র নূতন সৃষ্টির তাজা প্রেরণা নিয়ে ব্রহ্মা জেগে উঠেছেন। সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি প্রথমে সব তত্ত্বগুলিকে পূর্ব্বের অনুকরণে করে ব্যষ্টিভাবে সৃষ্টি করলেন, কিন্তু, সেগুলি তো বিশ্বতোই এক, সমষ্টিগত হ'তে পাচ্ছে না। পুরোণো সৃষ্টির পুরোণো কুসংস্কার ও কুসংস্কার এসে নূতন সৃষ্টির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এই মধুকৈটভ ভয়ে ভীত হয়ে ব্রহ্মা মায়ের শরণ নিলেন। মা' বিষ্ণুর নেত্রকে আশ্রয় করে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তাই মাকে জাগাবার জন্য ব্রহ্মা সকল প্রাণ দিয়ে কতই না নিজে ঘুমাবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ কচ্ছেন। ব্রহ্মার নিদ্রায় মা বিষ্ণুকে ছেড়ে দিলেন, বিষ্ণু জাগ্রত হলেন, ব্রহ্মা সংস্কার-বর্জ্জিত হলেন, বিষ্ণুর উরুতে মধুকৈটভ বিনষ্ট হল। মধুকৈটভের মেদ প্রলয় পয়োবিজল ভেদ ক'রে নূতন মেদিনীতে গড়ে উঠল।

... ...

ভারতে আজ সব রকমের প্রলয়; অন্নের প্রলয়, বস্ত্রের প্রলয়, জীবন-যৌবনের প্রলয়, শিক্ষা-সভ্যতার প্রলয়, জ্ঞানের প্রলয়, স্নেহের প্রলয়, ধর্ম্মের প্রলয়। ঢাকার জন্মাষ্টমীর রাত্রায় দস্যুর ছুরিকাঘাতে নিহত পুত্রকে পিতা নিজ পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে রাজি নয়, পাছে দস্যুর দল পিতাকেও আক্রমণ করে, স্ত্রীকে দস্যুর হাতে ফেলে কর্ত্তা-আধ্যাধারী পুরুষের দল পালায়, এ যে পরিপূর্ণ প্রলয়ের অবস্থা! ভারতের সব ভেঙ্গে চুড়ে যাচ্ছে; গৃহ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব। এই প্রলয় সাগরের মধ্যেও আবার উজ্জ্বল ভারত সৃষ্টির বিলাসবাসনা ভারতের অন্তরকে অকলোদয়ের মত রঙ্গিন আভায় আলো কচ্ছে। ভারতের অন্তর ব্রহ্মারই মত বিপন্ন। একদিকে নবীন লালসা, কিন্তু সে লালসাকে কার্য্যে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন যে আদর্শ ও কর্ম্ম তালিকার, তার ব্রহ্মার সামনে এখনও ফোটেনি। ব্রহ্মা ভগবানের নাভি কমলে অর্থাৎ সৃষ্টির শুভ কমল চক্রে স্থিত থেকেও সেই চক্রের খোঁজ রাখে না। ভারতের অন্তর যতই না কেন আদর্শ ও কর্ম্ম তালিকার জন্য মাথা কুটে মরুক না কেন, সে কিছুতেই তার সাক্ষাৎকার পাবে না, যে পর্য্যন্ত না তার অন্তর আত্ম-নিবেদনের জন্য প্রস্তুত হবে। ভারতময় এসে পড়েছে যে জড়তা, অবসন্নতা, দুর্ব্বা, তাকে যে পর্য্যন্ত না নাড়াচাড়া দিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে যুগল বলে দেখব সে পর্য্যন্ত কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না। পুরুষ যে নিদ্রিত জাগছে যে তার নয়নে ঘুম। ঘুমই ত মায়া, মহামায়া যোগমায়া। এই ঘুমকেই জাগাতে হবে, এই ঘুমকে জাগাতে হবে, এই ঘুমকেই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ঘুম ভাঙে না; ঘুম শুধু জাগরণের ভিতর কার্য্যোপযোগী হয় ঘুম না থাকলেও সৃষ্টির সামর্থ্য থাকে না। ঘুমই সৃষ্টি বীর্য্য, সামর্থ্য। এই ঘুমের কাছে, এই মরণের কাছে এই নিজে যাওয়ার কাছে মাথা নোয়াতে চাই নে বলে না আমরা ঘুমের বিষময় ফল সর্ব্বব্যাপী দুঃখনের বিষয় হয়ে পড়েছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যে জাগতে হয়, ঘুমের ভিতরেই আছে যে বিশ্বের তত্ত্ব, এ রহস্য না জানলে সৃষ্টি ফুটবে কি করে? যে ঘুমের ভিতর দিয়ে কালকা সৃষ্টির দুর্গন্ধ ও দুঃখ ছুটে এসে আজ আমাকে বিব্র

করতে পারে, সে কি একটা ঘুম না একটা প্রলয়? এমন ঘুম জীবনে আনা চাই, যাতে অতীত অতীত থেকে যায়, শুধু বর্তমান সৃষ্টির ভিতর আসতে পারে তাদের মেয়ে। এই নিদ্রাই যোগনিদ্রা। "কাল" দিয়ে "আজ" চলে না; আবার "কাল" না হলেও কি "আজ" চলে? তাই কাল ও আজের ভিতরের যে সম্বন্ধ থাকলে "কালে"র নূতন রূপে "আজ" হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্বন্ধই যোগনিদ্রার শক্তির মারফতে মিলবে। নিতুই নূতনের মূলে যারা রক্ষক ও ঐ যোগমায়া পৌর্ণমাসী। কে নিতুই নূতনের কামধেনুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? ঐ উমা গো, ঐ উমা গো। উমা ছাড়া কেউ পুরাতন দিয়ে নূতন গড়তে পারে না। ব্রহ্মা এই যোগমায়া উমার শরণ নিয়েই তবে Inertiaকে কাজে লাগাতে পারলেন। যখন সৃষ্টির "ঘুম" স্রষ্টাকে ছেড়ে দেবে, সৃষ্টির নিদ্রা যখন স্রষ্টার মধ্যে লয় হয়ে যুগল হয়ে যাবে, তখনই স্রষ্টা, আদর্শ ও কর্ম-তালিকাকে জীবনে অনুভব করতে সক্ষম হবেন।

* * *

আমরা আজ গৌরবহীন, আদর্শহীন। কোন কর্ম-তালিকাই আমাদের সামনে আজ নেই; শুধু অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরছি কেন? আমরা ঘুমাতে জানি না। তাই জাগতেও জানি না। আমাদের ঘুম শুধু মনে, তাই ঘুম আমাদের ছাড়ে না। ঘুম যদি জীবন দিয়ে সকল বেঁচে-থাকা, সকল মরে যাওয়া দিয়ে পেতে পারতাম, একবার যদি যোগনিদ্রার অভয় কোলের সাক্ষাৎ পেতাম, এমন করে ঘুমের ঘোরে ভারতের সব হত না। আমরা চোখে ঘুমাই, কেউ ত আত্মায় ঘুমাই না, তাই আমাদের এ দুর্দশা। চণ্ডীর বিষ্ণু জাগতে পারলেন, কেননা তাঁর নিদ্রা যোগনিদ্রা। আজ যদি ভারত বিষ্ণুময় হয়, তবে ঘুমের কৃপায় আবার সে মধুকৈটভ নাশ করতে পারে। আমি যদি একবার সকল দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ঘুমাতে পারি, ঐ অসুর জেগে জেগে ক্লান্ত হয়ে যাবে। ঐ ঘুমকেই বেদান্ত বলেন সমাধি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেন ভগবানে আত্মনিবেদন। সকলেই ঘুমাতে চায়; কের মত ঘুমাতে চায় কয়জন? না-জাগবার জন্য ঘুমাতে চায়, এমন লোক কি কেউ আছে? যে না-জাগবার জন্য ঘুমাতে পারে, সেই আদি-স্রষ্টা ব্রহ্মা, তাই তার হৃদয়ে প্রেরণা আসে নূতন সৃষ্টির, দৈহিক ঘুম এনে দেয় দৈহিক সাহস, বল, বীর্য, কর্মকুশলতা; মন-প্রাণ-আত্মার ঘুমের ভিতর দিয়ে বয়ে আসবে আত্মিক সৌন্দর্য, আত্মিক ভাবে বিশ্বকে মীমাংসা করবার আত্মিক সামর্থ্য। নিদ্রাক্লান্ত ভারতকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত করবার জন্য এসেছে ঐ অসহযোগ। সৃষ্টি হবে, ঘুমন্ত মা' জেগেছেন। ওগো যোগনিদ্রা, মা আমার, তবে তোমার স্পর্শে আমাদের সকল ছোটনিদ্রা ব্রহ্মনিদ্রায় পরিণত হবে? আর ত এমন হালকা ঘুম ঘুমাবার ক্লান্তি বইতে পারি না? মা, আমি একবার সাধ মিটিয়ে তোমার কোলে ঘুমাব। আমার দেহ-মন-প্রাণ অনেকদিন ঘুমায়নি, বিশ্রী রকমের, জাগরণের ক্লান্তি তাকে বীর্যহীন করে দিয়েছে। তাই ত জননী কবে তোমার নিদ্রাকুন্তলিলে স্নান ক'রে আমরা সকল না-ঘুমাবার অবসন্নতা ধুয়ে মুছে ফেলব? আমি যে অনেক-কিছু ভুলে যেতে চাই। কবে তোমার হাতে আমার সংস্কারগুলি মরবে? আমার জীবত্বের সংস্কার, আমার মনুষ্যত্বের সংস্কার, আমার ভদ্রলোক ব'লে জন্মেছি এই সংস্কার, আমার সাধুত্বের অসাধুত্বের বাঁধা সংস্কার, আমার পুরুষত্বের ভোক্তৃ-সংস্কার কবে তোমার মাঝে ঘুমিয়ে পড়বে? সব তোমার মাঝে একবার নিঝুম হয়ে বিশ্রাম লাভ করুক। তোমার কোলই আমার আশ্রম, আমার চির বিশ্রামস্থল। কবে ঐ আশ্রমে আমার সব আশ্রমবাসী হবে? এমন রাত্রি আমার জীবনে এনে দাও, যেন দেহ থেকে আত্মা পর্যন্ত' সব তার মাঝে আত্মসমর্পণ ক'রে ঘুমের মাঝে ঢলে পড়ে। মা, মা, সত্যই আমি ঘুম চাই, পরিপূর্ণ ঘুম চাই, তোমার কোলে দুধ খেতে খেতে ঘুম চাই, তোমার আঁচল বদনে বদ্ধ হয়ে আমি ঘুম চাই, আমি যে আর জাগরণের বাজে বিচরণ করতে পারছিনে, আঁখি ঢুলু ঢুলু, চলিতে চরণ টলে, সব ব্যাপারে অরুচি, শরীর মন সব ঝিম ঝিম করছে। কত যুগ যুগ বয়ে গেল, ওগো যোগনিদ্রা, একবারও তোমার যোগে তোমার কোলে ঘুমাতে দিলে না? তাই, আজ

ওগো বিশ্বের সকল নিদ্রার ঘনীভূত মূরতি গৌরী আমার, আমি এই সন্ধিক্ষণে সব তোমাকে দিয়ে ঘুমের মাঝে ঘুমাতে চাই। তোমার নিদ্রাকে যোগনিদ্রা ব'লে আস্বাদন করাই তোমার বোধন, নচেৎ কে তোমাকে জাগাবে? আর তোমার ঘুমই বা কি? যে ঘুমে সৃষ্টি হয় না, ব্রহ্মার "স্বাহা"র মাঝে হোম সেই নিদ্রাকেই যোগনিদ্রায় পরিণত করে। ভক্তের হোমে, সন্তানের হোমে, নিদ্রারূপিনী মা, যোগনিদ্রা রূপিণী হন। ওগো, তোমার অংশরূপিণী ভারতের মেয়েরা কবে আমাদের কাছে যোগনিদ্রা হবেন? তারা যে আজ ভারতনেত্র কৃতাঞ্জলি। তারা যে চোখে ধূলি দিয়ে পুরুষদের ভোলাচ্ছে। কবে মেয়েরা আমাদের জীবনে ঘুনকে বাস্তব করবার পথ দেখিয়ে দেবে? কবে ভারতের নারী যোগনিদ্রার মাঝে, তপস্যার মাঝে, বিলাস ব্যসন বর্জনের ক্ষেত্রে মহাকালী মূর্তিতে পুরুষের সৃষ্টি ক্ষমতা এনে দেবে? তাই মা, আজ মধুকৈটভ ভয়ে ভীত হয়ে তোমাকেই ডাকছি। মা, চোখের ঘুম আত্মার ঘুমে সর্ব্বগ্রাসী হোক্। আজ চোখ ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু সংস্কারগুলো সবই ত যেমনি তেমনিই রইল। তাই ত মা, সব সংস্কারে আমার ঘুম এনে দাও, আমি একটীবার ঘুমাব; মা, মা, আমায় ঘুমাতে দেও। আমি যখন অসাড়ে ঘুমাব, তখনই বিশ্বের সার তোমার বোধন হবে। আমি তোমার কোলে ঘুমাই, ঘুমন্ত আমাকে দিয়ে যেভাবে যা-ইচ্ছা তুমি কর। মা, তোর পায় পড়ি, আমি আর না ঘুমিয়ে থাকতে পাচ্ছিনে, সকল প্রাণ আজ ঘুমাতে চায় কিন্তু ঘুমাতে পাচ্ছি কৈ? ওগো যোগনিদ্রা, ভারতের তোমার ভিতরে চিরতরে ঘুমাতে চায়; তুমিই ভারতের জাগ্রত দেবতা, ভারত চির যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকুক ভারতবর্ষ আজ তোমার বোধনের সাধনায় মরণ-ভিখারী বন্দে মাতরম্।

তবু সেই সিদ্ধান্ত নিলেম

॥ বিহঙ্গম মিত্র ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী! সে বাঙালীর রেঁনেসাঁস কাল—
ঈশ্বর চরিত্র দীপ্তি, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ
মাইকেলী কাব্য সুধা, বঙ্কিমের সাহিত্য প্রসাদ
বুদ্ধিজীবি বাঙালীর বৌদ্রোজ্জ্বল সে এক সকাল!

সেই প্রভাতের বার্ত্তা কোন এক বুদ্ধিজীবি ঘরে
সদ্যোপ্রিয় বলিষ্ঠ কিশোরে কোন প্রশ্নে করিল উন্মনা!
পাঠ্যে যার নাই সমাধান, জানী শুধু বাড়ায় বঞ্চনা
প্রশ্নাকুল সে কিশোর ব্যর্থ ফেরে যায় হতে যারে!

তার পর সে প্রশ্নের অভাবিত মিলেছে উত্তর
বিশ্বাহীন ভাবোন্মাদ পূজারীর প্রদীপ্ত পরশে
কিশোর দুর্ব্বার প্রাণ প্রচার করেছে দেশে দেশে
জগৎ নিয়েছে মেনে—বুঝেছে কি সে প্রশ্ন উত্তর?

অধ্যাত্ম আবেগহীন—তবু সেই সিদ্ধান্ত নিলেম—
"জীব শিব ভিন্ন নয়,—ঈশ্বরের পূজা—জীবপ্রেম!"

১৩৩৩ সনে বরিশাল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক উদ্ধারণ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

মহাকবির যুগ

নিখিলরঞ্জন রায়

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা তর্ক করে লয়ে তারিখ সাল।" তর্ক শুধু সন তারিখ নিয়ে নয়, গোটা মানুষটাকে নিয়েই। চারশ' বছর আগে মহাকবি সেক্সপীয়রের আবির্ভাব। তাঁর নাটক আর সনেটগুলি—মানুষ যত ভাষায় কথা বলে—তার সবগুলিতেই অনুদিত হয়ে বিশ্ববাসীর রসতৃষ্ণা মেটাচ্ছে। এক বাইবেল ছাড়া এত বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার গৌরব একমাত্র সেক্সপীয়রেরই প্রাপ্য। এ-হেন ব্যক্তি সেক্সপীয়র,—আসলে মানুষটি কি রকমের ছিলেন? সেক্সপীয়রের নামে প্রচলিত নাটকগুলি সত্যি তাঁরই লেখা কিনা? মাঝে মাঝে এরকম তর্কের ঝড়ে সাহিত্য-পরিমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেক্সপীয়রের চতুঃশতবার্ষিক উৎসবের প্রাক্কালেও এতিহ্য বিতর্ক ইংলণ্ডে বেশ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। মার্লোর লেখাগুলিই ভ্রম প্রমাদে সেক্সপীয়রের নামে চালু হয়ে গেছে। সেক্সপীয়র নামে একজন থিয়েটারের নট ছিল বটে, কিন্তু কালজয়ী অমর নাটকরাজির রচয়িতা সে হতেই পারে না। এই অনন্য প্রতিভা কি এই নগণ্য পেশাদার মানুষের সম্ভব? কোন একটা পুরাণ কবর খুঁড়ে এক অত্যুৎসাহী গবেষক সেক্সপীয়র যে সেক্সপীয়র নয় তা' প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ওদিকে রব উঠল যে সেক্সপীয়র নাটক আসলে বেকন লেখা। এই সব প্রশ্ন, বিতর্ক ও সংশয়ের ধূম্রজাল কাটিয়ে সেক্সপীয়র কিন্তু সেক্সপীয়রই থেকে যাচ্ছেন। সেক্সপীয়র নামের গৌরব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেক্সপীয়র অমর করেছেন ইংলণ্ডকে, ইংলণ্ড সৃষ্টি করেছে সেক্সপীয়রকে, যেন একে অপরের অনুপূরক। ইংরাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দু'টি অপরিহার্য উপাদান: পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ ও সেক্সপীয়র। যে কোন ইংরাজ গৃহস্থের ঘরেই এ দুটি জিনিসের সন্ধান মিলবে। স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই আবশ্যিক ভাবে পড়তে হবে অন্ততঃ একখানা সেক্সপীয়রের নাটক।

মনীষী কার্লাইল (Carlyle) যথার্থই বলেছেন:

"Indian empire or no Indian empire, we want Shakespeare: him we will not let willingly die."

অপ্রসন্ন সাম্রাজ্য ছুটে যায়, সিংহাসন টুটে যায়, কিন্তু অমর হয়ে বেঁচে থাকে ভাবের সাম্রাজ্য, সাহিত্যের সাম্রাজ্য। বেঁচে থাকে কবি, বেঁচে থাকে শিল্পী—মনোমানসে তাঁদের অক্ষয় অধিষ্ঠান। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে বেন জনসনের উক্তি: He was not of an age but for all time!"

লণ্ডন থেকে খুব বেশী দূরের পথ নয়। শিল্প-নগরী বারমিংহাম হতে মোটর পথে মাত্র বিশ মাইল দূরে সেই বিখ্যাত সেক্সপীয়র তীর্থ—শান্ত, নিস্তরঙ্গ, মন্থর গতি এভন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রাটফোর্ড। চারশ' বছর ধরে এই নগণ্য পল্লীটি জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের স্মৃতি বহন করে অমরত্ব লাভ করেছে। আজ সেই এভন নদীর তীরে নবনির্মিত সেক্সপীয়র থিয়েটার আর চারশ' বছরের পুরাণো সেক্সপীয়রের বাসগৃহ, গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র সারা দুনিয়ার মানুষের সশ্রদ্ধ কৌতূহল উদ্রিক্ত করছে। স্বচ্ছ এভন নদীর জলে রাজহংসের নিরুদ্বেগ সঞ্চরণ মনে করিয়ে দেয় সেক্সপীয়রের সমকালীন বেন জনসনের উক্তি:

Sweet swan of Avon! What a
sight it were
To see thee in our waters yet appear,

সেক্সপীয়র তীর্থ স্ট্রাটফোর্ড পল্লীতে মহাকবির সমাধি-স্থান দেখতে আসে দেশ-দেশান্তর হতে অনুরাগীর দল। মহাকবির সমাধির নিকটেই কবি-প্রিয়া অ্যান হেথ্‌ওয়ে ও

ছোট্ট কন্যা সুসানের চিত্রবিশ্রাম স্থল। সেই সুপ্রাচীন গ্রামার স্কুল, যেখানে প্রতি সকালে বালক পড়ুয়া ঘোর অনিচ্ছায় শঙ্কুক গতিতে ধীরে ধীরে পা চালিয়ে যেত—দেখতে পাওয়া যাবে।

আর দেখতে পাওয়া যাবে স্থানীয় গীর্জায় রক্ষিত একটি মহামূল্য দলিল যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেক্সপীয়রের ব্যাপটাইজমেন্ট ও বিবাহের দিন তারিখ, ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল সেক্সপীয়রের ব্যাপটাইজমেন্টের তারিখ। মৃত্যুর তারিখ ২৩এ এপ্রিল ১৬১৬। মোটামুটি সচ্ছল এক পরিবারে সেক্সপীয়রের জন্ম হয়। গ্রামা গ্রামার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, এবং আঠার বৎসর বয়সে আট বৎসরের বড় অ্যান হেথওয়ের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সেক্সপীয়রের শৈশব ও বাল্যকাল সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য খুব বেশী নাই। অনুমানের ভিত্তিতে নানা কাহিনী অবশ্য প্রচলিত আছে। 'চাবা' 'স্ট্র্যাটফোর্ডের ভাঁড়', 'গেমো ছোকরা' ইত্যাদি যে সব মিষ্টি সুচরু আখ্যা তাঁর উপর আরোপ করা হয় তা বেশীর ভাগই অহেতুক। স্থানীয় ভূম্বাধিকারী স্যার টমাস লীর মৃগোদ্যানে থেকে হরিণ-চুরির দায়ে সেক্সপীয়র ধরা পড়েন এবং নিগৃহীত হন—এ কাহিনীর পিছনেও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। "Merry Wives of Windsor" নাটকে হরিণ চুরির যে দৃশ্য আছে তা থেকেই এ কাহিনীর উদ্ভব।

স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডন গেলেন সেক্সপীয়র ভাগ্যের অন্বেষণে, কেমন গিয়েছিলেন হ্যানস্ ক্রীশ্চিয়ান এণ্ডারসন ওডেন্সা ছেড়ে রাজধানী কোপেনহেগেনে। ঠিক কোন সময়ে সেক্সপীয়র লণ্ডনে এসেছিলেন তা জানা যায় না। ১৫৯২ সনে একজন জনপ্রিয় অভিনেতা রবার্ট গ্রীনের একখানা চিঠিতে সেক্সপীয়রের উপর তীব্র নিন্দাসূচক আক্রমণ থেকে তাঁর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রবার্ট গ্রীন তার বন্ধু ও সহকর্মিদের সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়ে অশেষ দুর্দশায় পড়েছিলেন। গভীর আক্ষেপে তিনজন বন্ধুর নিকট লিখেছিলেন :

"Yea trust them not, for there is an upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a Player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum, is in his conceit the only Shake-scene in a country!

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সেক্সপীয়র লণ্ডনের সমাজে নাট্যকাররূপে কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি Lord Pembroke's Company-র সদস্য হিসাবে যান কয়েক নাটক রচনা করেছেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বিখ্যাত Globe Theatre যার মঞ্চে অভিনীত হয় সেক্সপীয়রের অমর বিয়োগান্ত নাটকাবলী—'জুলিয়াস সীজার', 'হ্যামলেট' 'ওথেলো' 'কিং লিয়ার' ম্যাকবেথ, এন্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি। 'কমেডি অব এরর্স', 'টেমিং অব দি শ্রু' 'মারচেণ্ট অব ভেনিস', 'এজ ইউ লাইক ইট', 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' ইত্যাদি কমেডি গুলির রচনাকাল ১৫৮৪ হতে ১৫৯৯, আর পূর্বোক্ত ট্রাজেডি গুলি রচনার সময় ১৫৯৫ হতে ১৬০৮। কমেডি রচনা ছেড়ে ট্রাজেডি রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ অনুমিত হয় গর্ড দাম্পত্য এবং আর্ল অব এসেক্সের সঙ্গে সেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা। বিশেষ করে আর্ল অব এসেক্সের শোচনীয় পরিণতি সেক্সপীয়রের মনের উপর এক গভীর দুঃখের ছায়াপাত করেছিল রাণী এলিজাবেথের প্রণয়ী আর্ল অব্ এসেক্সের শিরশ্ছেদ হয়েছিল রাণীর নির্দেশেই। সাহিত্য-খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে এল আর্থিক সচ্ছলতা। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ডে ক্রয় করলেন একর' সাত একর পরিমিত এক বিস্তীর্ণ সম্পত্তি। সঙ্গে সঙ্গে একখানা বাড়িও কিনে নিলেন লণ্ডন থেকে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরলেন। নিবিড় শান্তি নিকেতন স্ট্র্যাটফোর্ডেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩এ এপ্রিল। সে দিনটি ছিল পঞ্চাশ 'সেণ্ট জর্জ ডে'। স্থানীয় ভূম্বাধিকারী হিসাবে স্ট্র্যাটফোর্ডে গীর্জার সমাধি ভূমিতে শেষ শয্যা রচিত হল মহাকবি সেক্সপীয়রের। স্বরচিত কবিতার পঙক্তি উৎকীর্ণ হল সমাধি

করবে।

"Good friend, for Jesus sake forbeare
To digg the dust inclosed here.
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that moves my bones!"

শেক্সপীয়র যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন ইংলণ্ডে তখন রাণী প্রথমা এলিজাবেথের যুগ। এই যুগটি ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক বিশেষ চিহ্নিত যুগ। এ যুগের মহত্তম ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন বার্লো, স্পেনসার, শেক্সপীয়র (প্রথম পর্যায়ে), এবং ফ্রান্সিস বেকন। এলিজাবেথের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের প্রথম অংশকে বলা যেতে পারে প্রস্তুতির যুগ। এ যুগেই সংসাধিত হয়েছিল ইংলণ্ডের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এ-যুগেই ইংলণ্ড মহাদেশীয় (continental) প্রভাব-মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতীয় সত্তা অর্জন করল। তারপরি ইংলণ্ড এক সুসংহত জাতিরূপেই আত্মপ্রকাশের পথ অনুসরণ করে চলেছে। ঐতিহাসিকের মতে এ যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষগুলির চরিত্রের ও শক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল ক্লান্তিহীন প্রযত্নশীলতা, অসাধারণ কর্মকুশলতা এবং প্রজ্ঞা। সে সময়টাও ছিল এমনই কঠিন ও নিষ্করুণ যে, অলস কর্মবিমুখতা আর ভাব-বিলাসের আদৌ কোন অবকাশ ছিল না। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সেই একই অবস্থার প্রার্থনা। যেন শীতের তুষার বিগলিত হয়ে বন্যা মৃত্তিকার অন্তরের প্রাণরসকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল, এবং তাতেই সম্ভব হয়েছিল এলিজাবেথীয় যুগ-বসন্তের সগৌরব আবির্ভাব। কাব্যে উপমার যত চল ইতিহাসে তত নয়। কাজেই উপমার জের খুব বেশী না টানাটা ভাল। তবু একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এলিজাবেথীয় যুগস্রষ্টাগণের মত উনিশ শতকের বাংলাদেশের নবপথিকৃৎ গণও দেখিয়েছিলেন অপূর্ব কর্মকুশলতা, প্রযত্নশীলতা এবং উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। চালাকি দ্বারা যে মহৎ কার্য সাধিত হয় না এই ইতিহাসসিদ্ধ সত্য প্রকট হয়েছিল উভয় ক্ষেত্রে।

চারশ' বছরের ব্যবধানে শেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তা কমল বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পায় নি। মহাকবির মৃত্যুর ১৩২ বৎসর পর তাঁহার স্যামুয়েল জনসন লিখলেন:

"He has long outlived his century, the term commonly fixed as the test of literary merit. Shakespeare is the poet of Nature; the poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life. His characters are the general progeny of common humanity, such as the world will always supply. In the writings of other poets a character is too often an individual, in those of Shakespeare it is commonly a species."

ডঃ স্যামুয়েল জনসনের কথাগুলি সর্বাংশে ঠিক। শেক্সপীয়র কেবল এক বিশেষ যুগের কবি নন। তিনি চিরকালের কবি। তাঁর কাব্যের আকৃতি বিশ্বজনীন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি ভাষা, বেশ ভূষা, আচার আচরণ এবং সর্বোপরি দেশ কালের মুদ্রণ মুছিয়ে বিশ্বজনীনত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। রাজা রাণী, রাজকুমার রাজকুমারী, বীর, বীরাঙ্গনা, প্রেমিক প্রেমিকা, ভাঁড়, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি সব চরিত্রই যেন আমাদের চিরপরিচিত মানুষ—যাদের আমরা সদাসর্বদা দেখি বা জানি।

শেক্সপীয়র মানবিকতার উদ্গাতা। মানব-ধর্মই তাঁর কাব্য ও নাটকের প্রধান উপজীব্য। জগতের অমর কবিবৃন্দের মতই শেক্সপীয়রের কাব্য-প্রবাহের উৎস হচ্ছে সেই চিরন্তনী ত্রি-শক্তি—পরমার্থ, প্রকৃতি এবং মানুষ। শতাব্দী-সমুদ্রের উপর দিয়ে বৈদিক ঋষি, হোমার, দান্তে, হাফিজ, কালিদাস, শেক্সপীয়র এবং রবীন্দ্রনাথ হাতে হাত মিলিয়েছেন।

সাহিত্যের সেয়ার-মার্কেটে কবি ও সাহিত্যিক জনপ্রিয়তা নিত্য পরিবর্তনশীল। সাহিত্যিকের খ্যাতির তেজী-মন্দা বহু কবির ভাগ্যেই অনিবার্য। শেক্সপীয়র এর একক ব্যতিক্রম। তিনি চিরকালের কবি।

তিনি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
তাঁহার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

ভারতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার

শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত

গত এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার বেশ দ্রুত। "এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্ত্রী শিক্ষা ভারতবাসীর নিকট আতঙ্কজনক ছিল"—নটরাজন এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নানা বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিতে হইয়াছে—সুতরাং ইহা শুধু শিক্ষা বিস্তারই নহে—ইহাকে সামাজিক বিপ্লব বলা যায়। অর্থ-নৈতিক বাধা সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রের সাধারণ বাধা—কিন্তু এ ক্ষেত্রে পর্দ্দা প্রথা—অল্প বয়সে বিবাহ—স্ত্রী শিক্ষিকার অভাব প্রভৃতি অনুরূপ অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরে উপরোক্ত বাধাগুলি প্রায় অপসারিত হইয়াছে এবং আজ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি প্রচুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং বর্ত্তমানে উহা সাধারণ শিক্ষার মতই অর্থনৈতিক বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হইয়া অগ্রসর হইতেছে।

বিখ্যাত এডমস রিপোর্টে (১৮৩৮) বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সামাজিক প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু তাহা মাত্র পুরুষদের জন্য। স্ত্রী জাতিকে কোন প্রকার শিক্ষা দিবার কথাই চিন্তা করা হইত না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রটেষ্টাণ্ট মিশন ৮৬টি বোর্ডিং স্কুলে ও ২৮৪টি দিবা বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২,২৭৪ ও ৮,৯১০ জন বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য বেথুন কর্ত্তৃক বিখ্যাত বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। উহা অনুরূপ অনেক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা যোগায়। ১৯০১-১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেয়েদের জন্য ১২টি কলেজ ৪৮৭ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫,৮২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও ঐগুলিতে মোট ৫,৫১,৪৭০ জন বালিকা শিক্ষারত ছিল। ১৯০২ হইতে ১৯১৭ এই ১৫ বৎসরে স্ত্রীশিক্ষা অধিকতর প্রসারের প্রবণতা দেখা যায়—এবং সমাজে শিক্ষিতা মহিলার চাহিদা বৃদ্ধি হয়—এমন কি গৃহিনী হিসাবেও তাহাদের চাহিদা বাড়ে। এই সময়ে শিক্ষা বিভাগও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বেশী উদ্যোগ প্রদর্শন করিতে থাকেন—নূতন নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। স্কুল পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইতে থাকেন এবং বালিকাদিগকে গৃহ হইতে স্কুলে আনয়নের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরীকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তোলা হয়—এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাদেশিক কমিটীগুলিতে মহিলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইতে থাকে। ১৯০ খৃষ্টাব্দে আনি বেসান্ত বারানসীতে হিন্দুমতাদর্শ অনুযায়ী বালিকাদিকে শিক্ষা দিবার জন্য বালিকা বিদ্যালয় খোলে ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মহিলাদিগকে ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ বৎসরেই পৃথক মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার অধীনে ১২টি কলা বিষয়ক কলেজ ৪ বৃত্তিমূলক কলেজ ও ১৮৭টি মাধ্যমিক স্কুল থাকে—ঐগুলি সবগুলিই মহিলাদের জন্য। তৎপরবর্ত্তী ৩০ বৎসর মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি খুবই দ্রুত ছিল। তাহা নিম্নের ছক হইতে সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে :—

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার

বিদ্যালয়ের প্রকার	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২	১৯৪১-৪২	১৯৪৬-৪৭
প্রাঃ বিদ্যালয়	১০,৩৭,১৩১	১৯,৪৪,০৭৩	৩১,২৩,৬৪৩	২৭,১৫,২৫৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,২৪, ৯৫৪	১,৯৬,১৭০	৪,১০,৩৩৩	৪,৫২,৫৬৩
কলাবিষয়ক কলেজ	১,২০১	২,৬৮৫	১১,১৭৮	১৬,২৮৪
বৃত্তিমূলক কলেজ	২৬৬	৫২১	১,৭২৫	২,৪৬৬
বৃত্তিমূলক স্কুল	১২,৫৭০	১৭,৫৬৮	৪০,৮৬৯	৩৮,৩৭৫

১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের হিসেবনীতে সমগ্র ভারতের পরিবর্ত্তে পাকিস্তানের অংশ ও দেশীয় রাজ্যের অংশের হিসাব বাদ দিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। ইহার সহিত এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে ইতিমধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চস্তরে সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তন হওয়ায় ঐ দুই স্তরে পৃথক মহিলাদের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত বিদ্যালয়-সংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষাও মহিলাদের শিক্ষার বিস্তার অনেক বেশী ছিল।

এই সময়ে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নহে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলাদের জাগরণ অনুভূত হয়। ডাঃ আনি বেসান্ত কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মহিলাদের এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের জাতীয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৬টি প্রদেশে উহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে দলে দলে মহিলা যোগদান করেন যাহাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ মহিলাগণ পাণ্ডিত্যে ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। মেয়েদের বাল্য শুধু পার্হস্থ্য জীবনের প্রস্তুতি কাল ও বালিকা বয়সে পার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়া শুধু গৃহ কোণে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করাই মেয়েদের বিধিলিপি এই চিন্তা হইতে এদেশীয় মহিলা সমাজ আজ মুক্ত হইয়াছেন বলা চলে।

বর্ত্তমানে অবস্থার আরও উন্নতি ঘটিতেছে: ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালকগণের শতকরা ৫০ ও বালিকাদের শতকরা ২৪ বিদ্যালয়ে যাইত। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে উহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬১ ও ৩০। মাধ্যমিক স্তরেও বিদ্যালয়গামী বালিকার শতকরা হার ৪ হইতে ৮ দাঁড়াইয়াছে। *

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের একটি প্রধান বাধা হিসাবে ঐ শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাজনিত ত্রুটি গণ্য হইবার যোগ্য। নানা কারণে পুরুষগণের দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক অসুবিধা ঠিকমত দূর করা সম্ভব হয় না। অনেক সময়ে অনেক ভুল ও অবিবেচনা প্রসূত ব্যবস্থা উহার বিস্তারের বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইয়াছে। উহাতে চেয়ারম্যান ও ২৩ জন প্রতিনিধি আছেন। প্রতি রাজ্যের একজন করিয়া প্রতিনিধি ১ জন কেন্দ্রীয় যুঃ শিক্ষা সংস্থার প্রতিনিধি, দুইজন পার্লামেন্টের প্রতিনিধি, দুইজন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণের প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় শাসনাধীন আইন সমূহের ১ জন প্রতিনিধি এবং সমাজসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও শ্রম বিভাগের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি উহাতে আছেন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্য্যকাল ২ বৎসর। বর্ত্তমানে প্রতি রাজ্যে একজন করিয়া মহিলা সহ-শিক্ষা-অধিকর্ত্তা ও প্রতি জেলায় একজন সহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শিকা নিয়োগ ও মহিলা পরিদর্শিকার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বালিকার সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ ও তাহার মধ্যে ৪৫ লক্ষের বেশী বালিকা সহশিক্ষামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিল। ঐ বৎসর ৭৯৯টি শহরে বালিকাদের জন্যও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৪১-৪২তে শতকরা ২৯৬ জন সহ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়ে পড়িত। ১৯৪৫-৪৬তে ঐ হার বৃদ্ধি পাইয়া ৪০·২ দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যতিত শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২,৮৬৩ হইতে ৩,৯১০ দাঁড়াইয়াছে ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৬,২৯১ হইতে ৭২,৩২৮ জন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বালিকাদের মাধ্যমিক পাঠক্রম বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা করা ও তাহাদের জন্য পৃথক পাঠক্রম নির্ধারণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি নিম্নলিখিত তালিকাটি হইতে ধারণা করা সহজ হইবে :—

* S. N. Mukherjee's Education in India—Today and Tomorrow হইতে গৃহীত।

* পরীক্ষা	১৯৪৯-৫০	১৯৫১-৫৬
মাধ্যমিক (I.A. & I.Sc.)	৮,২৫২	১২,৯২১
ডিগ্রী (B A. & B Sc.)	৪,৬২৪	৯,১৪৮
এম. এ. ও এম. এস. সি.	৬৪০	১,১৬৬
বৃত্তিমূলক ডিগ্রী পরীক্ষা	১,১৬৯	৩,৮২১

মেয়েদের বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তার পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। তবে এই বিষয়ে ভারতের একমাত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (S N. DT. Women's University) ও প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠ, আর্যাবর্ত্ত মহাবিদ্যালয়, বরোদা অনেক অবদান সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উহার ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স খোলা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ৭টি রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গামী মহিলাদের জন্য বৃত্তির ফেডারেশন খোলা হইয়াছে—ইহারা মহিলাদের শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ে স্বার্থ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

শিক্ষিত মহিলাগণ বর্ত্তমানে নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহা নিম্ন তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে—
(১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে)

বৃত্তি	সংখ্যা
স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিভাগে নিযুক্ত—	২,৭২,৪৮৩
মেডিকেল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংস্থায় নিযুক্ত—	৭৯,৬২৫
শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে ও গবেষণা বিভাগে নিযুক্ত—	১,১৮,৪৯১
ডাক বিভাগে—	২,০৪৭
টেলিগ্রাফ বিভাগে—	২,৬২৩
পুলিশ বিভাগে—	৪,১২৯
আইন ও ব্যবসায় বিভাগে—	৮,৯৪৯

বর্ত্তমানে সহশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইতেছে এবং মেয়েদের বৃত্তি নির্ব্বাচনেও সংস্কার মুক্তি ঘটিতেছে। অবশ্য মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষার কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার কথা বিবেচনা করা হইতেছে। মেয়েদে স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি বিচার করে তাদের পাঠক্রমে বি বৈশিষ্ট্য রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। শি বিভাগে মহিলাদের যোগ্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণি হইলেও বর্ত্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে যথেষ্ট সংখ্য মহিলার জন্য ব্যবস্থা নাই। এই সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বিশে ভাবে চিন্তা করা হইতেছে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে বর্ত্তমা মহিলাদের শিক্ষা ব্যাপারে ভারতবর্ষ বেশ সচেতন পরিচয় দিয়াছে এবং যদিও এই ব্যাপারে নানা অসু আজিও রহিয়াছে তথাপি ইহার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

---

* Ibid.

সাহিত্যে 'সাব্‌লাইম্‌' (Sublime)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ ; বিটি, ডি এস্‌ টি।

ইংরাজী সাহিত্যে 'সাব্‌লিমিটি' শব্দটা খুব বহল ভাবেই ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এই শব্দটির সম্পূর্ণ অনুরূপ প্রতিশব্দ বাংলা বা সংস্কৃত ভাষায় নেই। তবে সে জন্য বাংলা বা সংস্কৃত ভাষাকে দরিদ্র মনে করবার কারণ নেই। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য বিশেষ একটা ভাষায় একটা বিশিষ্ট শব্দের ব্যাপনা (denotation) বা দ্যোতনা (connotation) যে ভাবে সীমিত পরিমিত হয়, অন্য একটা ভাষায় অনুরূপ শব্দটির ব্যাপনা ও দ্যোতনার সীমা-রেখাটা যে সর্বতোভাবে তার সঙ্গে সমান হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

আরও একটু কথা আছে। আজ ইংরাজী ভাষাতেও সাব্‌লাইম (sublime) কথাটার ব্যঞ্জনা সকলের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

সাবলাইম ও সুন্দর

সাব্‌লাইম শব্দটার সঙ্গে সৌন্দর্য বা রম্য-বোধের একটা সম্পর্ক আছে। তা হলেও beauty এবং sublimity শব্দ দুটো এক পর্যায়ের শব্দ নয়। একটা ছোট্ট সুঠাম সুকুমার জিনিষের মধ্যে beauty থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে sublimity নাও থাকতে পারে। সাব্‌লিমিটির সঙ্গে একটা বিরাটত্ব, একটা মহত্ত্ব, একটা ভয় বা বিস্ময়ের ভাব থাকা চাই। ভীষণের সঙ্গে কান্তের সমন্বয় না হলে সাব্‌লিমিটির উদ্ভব হয় না।

সাব্‌লিমিটি ও "অদ্ভুত রস"

আগেই বলেছি সাব্‌লিমিটির হুবহু প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নেই। তবে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'অদ্ভুত রস' বলতে যা বোঝায় সাব্‌লিমিটির সঙ্গে তার খানিকটা মিল আছে।

সাহিত্য দর্পণের মতে অদ্ভুত রসের 'স্থায়িভাব' হচ্ছে বিস্ময়, অলৌকিক বস্তুই এর "আলম্বন বিভাব", এবং তারই গুণ গুলির মহিমাই হচ্ছে এর 'উদ্দীপন বিভাব"। স্তব্ধ বেদ রোমাঞ্চ গদ্‌গদ স্বর ব্যস্ততা চক্ষু বিস্ফারণ প্রভৃতি এর 'অনুভাব'। এর 'ব্যভিচারি ভাব' হচ্ছে বিতর্ক আবেগ জড়তা হর্ষ প্রভৃতি। (৩।২০৯)

Sublime শব্দটার সঙ্গে awe wonder এবং beauty-র ইঙ্গিত আছে তার অনেকখানি জিনিষই এই অদ্ভুত রসের মধ্যে নিহিত আছে। তবে Sublime বলতে ইংরাজীতে যতটা বোঝায়, নিছক অদ্ভুত রসের মধ্যে তার সবটুকু নেই। কখন কখনও শান্ত রৌদ্র বীর এমন কি করুণ রসেরও অধিকৃত কিছু অংশ সাব্‌লিমিটির সীমার মধ্যে এসে পড়ে। সাব্‌লিমিটির একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে সেটা তার ভীম-কান্ত গুণে আমাদের শুধু মুগ্ধ ও স্তব্ধই করে না, আমাদের খানিকটা পবিত্র এবং উন্নতও করে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে যে কোনও আবেগ (emotion) বা 'স্থায়িভাবে'র বস্তুই শিল্পগত কৌশলে যখন 'রসত্ব' প্রাপ্ত হয়, তখনই তার মধ্যে একটা ঊর্দ্ধ-মুখী-করণ বা পবিত্রী-করণের ব্যাপার থাকে। একটা 'ক্যাথারসিস' (Catharsis) জাতীয় ব্যাপার থাকে। সেই জন্যই 'অদ্ভুত-রস' ছাড়াও অন্যান্য রসের মধ্যেও এই সাব্‌লিমিটির লক্ষণ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

সাব্‌লাইম সম্বন্ধে রাস্কিনের মতবাদ

রাস্কিন তাঁর 'Moderu Painters' নামক গ্রন্থে লিখেছেন মৃত্যুকে সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সাব্‌লিমিটির একটা সম্পর্ক আছে। মানুষের বাঁচবার চিরন্তনী কামনার সঙ্গে সাব্‌লিমিটির আদর্শ জড়িয়ে আছে। মানুষের জীবনের চরমতম

ট্রাজিডির সঙ্গে তার প্রতিস্পর্দ্ধা আছে। সেই জন্যই, যে সব দুঃখ-দুর্ঘটনা অনিবার্য্য, তার মধ্যেই সাব্‌লিমিটির একটা সম্পর্ক আছে।

"Most dangers and powers over which we have little control, are in some degree sublime"

কিন্তু বার্কিণের মতে নিছক ভয়ের মধ্যেই বা বিস্ময়ের মধ্যেই সাব্‌লিমিটি নেই। ভয়ের পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে অথবা বিস্ময়ের জড়তার মধ্যে বিরাট জিনিসের সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় না। যখন আমরা ভয়ে সঙ্কুচিত হই, তখন ট্রাজিডির গুরুত্বটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু যখন সাহস করে আমরা তার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াই, তখনই উপলব্ধি করতে পারি ট্রাজিডির পরিমিতিটাকে।

"It is not while we shrink, but while we defy, that we receive or convey the highest conception of the fate." এই defy করবার মনোভাবই হচ্ছে sublime অনুভূতির ভিত্তি-ভূমি। মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই তার বীজ নিহিত আছে। ভীষণের সঙ্গে, দুর্জ্ঞেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি না হলে এর বিকাশ সম্ভব হয় না।

তাই বলে নিছক ভয় বা ট্রাজিডির মধ্যেই সাব্‌লাইম্ নেই। ভয়ের বৈকল্য বা পলায়নপরতার মধ্যে সাব্‌লিমিটি নেই। বিপদীত পক্ষে ভয়ের সীমার বাইরে নিরাপত্তার রাজ্যের মধ্যে গেলেই যে সাব্‌লিমিটি ফুস পায়, তাও নয়। অপরিমিত দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার, দুঃখ বরণ, সাহস ও তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইটেই চিত্তকে সমুন্নত করে তোলে। ছোট ছোট আনন্দ থেকে সেটা আমাদের উর্দ্ধলোকে তুলে ধরে। আমরা তাই তখন ভীষণকে বাস্তবভাবে দেখতে শিখি, ভীষণই তখন কাম্য হয়ে ওঠে।

বার্কের মতবাদ

সাধারণ সৌন্দর্য্য-পিপাসা মনকে সব সময় সাবলিমিটির সন্ধান দেয় না। Burke বলেছেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে কখন কখনও একটু ক্ষুদ্রতার (littleness) উপাদান নিহিত থাকে। তাই বার্কের মতে ক্ষুদ্রতার সম্পর্ক-হীন সৌন্দর্য্যটাই হচ্ছে সাব্‌লিমিটির উৎস।

বার্কিণের বিশ্লেষণ ; সাবলাইমের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত দিক।

বার্কিণ বলেন—যে কিছু জিনিস আমাদের সমুন্নত করে তোলে, তার মধ্যেই সাবলিমিটি আছে। "Sublimity is found wherever anything elevates the mind." যে মূল শব্দ "Sublimis" থেকে "সাবলাইম্" কথাটা এসেছে, তার অর্থও ঐ ব্যঞ্জনাই বহন করে। নিছক বিরাটত্বের মধ্যেই সাব্‌লিমিটি নেই। সেই বিরাটত্ব যখন আমাদের কাছে অসীমের বার্ত্তা নিয়ে আসে, অমৃতের ইশারা নিয়ে আসে, অন্যায় বা দুর্জ্ঞেয়কে অভিগম্য করে তোলে, সেই বিরাটত্বই সাব্‌লিমিটির উৎস। নিছক বস্তু কেন্দ্রিক সাব্‌লিমিটির মধ্যে অর্থাৎ Kant যাকে "Mathematical sublimity" বলেছেন, তার মধ্যে শিল্পগত সাবলাইমের সবটুকু নেই। সেটাকে অনুভব করবার জন্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চেতনা চাই। সেই জন্যই objective sublime এর চেয়ে subjective sublimeটাই শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে বড় কথা।

এই subjective sublimeটাই মানুষকে সমুন্নত করে তার চিত্তের বিস্তার সাধন করে। এই জন্যই কাণ্ট এই sublimeকে "dynamic sublime" বলেছেন এবং এই জাতীয় sublimeকেই বিশেষ ভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন

"The sublimity must be sought only in the mind of the judging subject and not in the object of nature."

এই subjective sublime এর জন্যই বোধ হয় বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগের চেয়ে সুউচ্চ পর্ব্বত বা সুগভীর সমুদ্র বেশী সাবলাইম বলে মনে হয়। কারণ ভূভাগটা

অযুক্ত নয়, মানুষ সহজেই তাকে জয় করতে পারে, কিন্তু পর্ব্বতের উচ্চতাকে বা সমুদ্রের গভীরতাকে সে সহজে জয় করতে পারে না।

সাব্‌লিমিটির রহস্য, সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি

sublimity জিনিসটা মনকে কি ভাবে সমুন্নত করে, কি ভাবে পবিত্র করে, তার সম্বন্ধে রাস্কিনের মতবাদটির আলোচনা আমরা ইতি পূর্ব্বেই করেছি। এই সম্বন্ধে Burke এর মতবাদ রাস্কিনের মতবাদের প্রায় অনুরূপ হলেও এই দুটি মতবাদের মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে। রাস্কিন বলেছেন বিরাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ধ্বংসের জন্যই সাব্‌লিমিটি-জনিত চিত্তের বিস্তার সম্ভব হয়। বার্ক আর একটু বেশী বলেছেন। তিনি বলেছেন বিরাটের মহিমা, বিরাটের মহিমাই প্রথমতঃ আমাদের অভিভূত করে এবং পরে সেটা নিজেই যেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিরাটকে উপলব্ধি করে বিরাটের সঙ্গে সমভাবে জন্যই আমরাও তার সঙ্গে কিছুটা একাত্ম হয়ে উঠি। কাজেই দেখা যাচ্ছে বার্কের মতে objective sublime এর গুরুত্বটা একটু বেশী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও তাঁর মতে objective sublimeটা তার বস্তুগত ভাবেই আমাদের মনে অসীমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

সাব্‌লাইম রচনার প্রকাশভঙ্গি

সাবলিমিটির প্রকাশ-ভঙ্গী কিরকম হবে? এটা বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না যে সাব্‌লাইম জিনিসটার সঙ্গে মহত্বের একটা সম্পর্ক আছে বলেই তার বর্ণনার মধ্যে রচনার কৃত্রিমতার স্থান নেই। উপমা রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার তার মধ্যে থাকতে পারে, হয়ত তাদের প্রয়োজনও আছে, কিন্তু সেগুলি অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হওয়া চাই; সেগুলি কবির স্বাভাবিক অনুভূতির প্রতিধ্বনি রূপে আপনিই ফুটে ওঠা চাই। Lessing বলেছেন "Sublimity is the echo of a great soul." এই echoটা থাকা চাই, অনুভব শব্দের পর শব্দ গেঁথে অথবা রং এর পর রং চাপিয়ে "চিত্র-কাব্যের" বাহাদুরি দিয়ে সাবলিমিটির সৃষ্টি করা যায় না।

কেউ কেউ বলেছেন মুক্তা-চটুল মিত্রাক্ষর ছন্দের চেয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দটা সাব্‌লাইম ভাবের পক্ষে বেশী উপযুক্ত। মিল্টনের "প্যারাডাইস লষ্ট" বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ" কাব্যের সাফল্য এই মতেরই সত্যতা প্রমাণ করে।

কিন্তু তাই বলে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণেই একটা রচনা সাব্‌লাইম্ হয়ে ওঠে। আর, এটাও বলা যায় না যে অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত কবিতা দিয়ে সাব্‌লাইমের সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের "কল্পনা" কাব্যের "দুঃসময়" "বর্ষামঙ্গল" "বর্ষশেষ" প্রভৃতি অন্ত্যানুপ্রাস-মুখরিত কবিতাগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সাব্‌লিমিটি আছে।

কেউ কেউ বলতে পারেন "কল্পনা" কাব্যের ঐ কবিতা গুলির মধ্যে (তথা মাইকেলের "মেঘনাদ বধ" কাব্যের মধ্যে) গুরু-গম্ভীর তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগটা সাব্‌লিমিটি সৃষ্টিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে তদ্ভব-শব্দ প্রধান রচনা নয় এমন বহু কাব্য-কবিতার মধ্যেও যথেষ্ট সাব্‌লিমিটির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথেরই "ক্ষণিকার" চলতি ভাষার ছন্দ-সুন্দর অনেক কবিতার মধ্যেই সাব্‌লাইম্ ভাবটি ফুটে উঠেছে।

কাজেই আমাদের মনে হয় সাবলিমিটির জন্য ভাষাটা তৎসম শব্দ প্রধান হবে অথবা তদ্ভব শব্দ-প্রধান হবে, কিংবা সেটা অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত হবে অথবা মিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত হবে, এটা বড় কথা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে তার জন্য একটা বিরাট বা মহান ভাবের সঙ্গে কবির হৃদয়ের তন্ময়তা থাকা চাই। এই ভাব-তন্ময়তা বা ভাব-নিষ্ঠা থাকলে উপযুক্ত ভাষা ও উপযুক্ত ছন্দ আপনিই এসে জুটবে।

কস্তুরী

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

। বৃদ্ধ ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক পুরাণো লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। কি আশ্চর্যই যে লাগে তখন। ঝড় হোক, জল হোক এই একটি কারণেই ঘাটে যেতে আমি কখনই ছাড়িনি। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি আজ তোমাকে দেখে।

। বৃদ্ধা ।

আমিও। শুনেছিলাম বটে কাশীবাস করছেন আপনি।

। বৃদ্ধ ।

আপনি! আমাকে কি তুমি 'আপনি' বলতে কখনো?

। বৃদ্ধা ।

না—তা—হ্যাঁ—আজ কতকাল পরে দেখা—কেমন বাধো বাধো ঠেকছে আমার। ঘাট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। একটি কথাও বললেন না পথে।···এটা কি ভাড়াটে বাড়ি, না আপনার?···আর কে আছে এখানে? কেমন আছো তুমি।

। বৃদ্ধ ।

এতক্ষণ পর বোধহয় ফিরে পেলাম তোমাকে। তুমি এখানে কবে এসেছো? কোথায় উঠেছো? তীর্থ করতে এসেছো। না বেড়াতে?···কেমন আছো জিজ্ঞেস করবো না আমি। দেখছি তুমি বেশ ভালোই আছো।

। বৃদ্ধা ।

আপনার স্ত্রী কোথায়? আছেন এখানে?

। বৃদ্ধ ।

খবর রেখেছি তুমি বিয়ে করনি। এত বড় একটা লম্বা জীবন বেশ একলা কাটিয়ে দিলে তুমি।

। বৃদ্ধা ।

বলুন না, আপনার নাতি নাতনীরা কোথায়? তাদের গলা পাচ্ছিনা কেন এখানে? একা পালিয়ে এসেছেন বুঝি?

। বৃদ্ধ ।

তুমি জানতে আমি কাশীবাস করছি?

। বৃদ্ধা ।

জানতাম তুমি কাশীবাস করছো। কিন্তু একল আছো জানতাম না।

। বৃদ্ধ ।

আমি এখানে আছি জেনেও তুমি এখানে এসে ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগছে আমার। চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে।

। বৃদ্ধা ।

চল্লিশ বছর আগের কোনো কথা তুললে আমি থাকবো না। চলে যাবো এখান থেকে।

। বৃদ্ধ ।

এসো, চা খাওয়া যাক।

। বৃদ্ধা ।

সন্ধ্যা না করে আমি চা খাইনা। বলুন না এখানে আর কে আছে?

। বৃদ্ধ ।

সবাই আছে।

। বৃদ্ধা ।

স্ত্রী?

। বৃদ্ধ ।

হুঁ—

। বৃদ্ধা ।

ছেলেমেয়েরা ?

। বৃদ্ধ ।

হুঁ—

। বৃদ্ধা ।

নাতি নাতনীরা ?

। বৃদ্ধ ।

হুঁ—

। বৃদ্ধা ।

কই তারা, কোথায় তারা ?

। বৃদ্ধ ।

তুমি তাদের দেখতে পাবে না। আমি দেখছি।

। বৃদ্ধা ।

সেকি ! সব বেঁচে আছে তো ?

। বৃদ্ধ ।

সাতচল্লিশ সালের সেই দাঙ্গা। উঃ কি সেই রাতটা। মারা যাবে ? মারা গেলে আমি বাঁচতাম। কেউ মারা যায়নি। সবাই বেঁচে আছে। আমাকে ঘিরে রয়েছে সবাই। দণ্ডে দণ্ডে মারছে আমায়।

। বৃদ্ধা ।

বুঝেছি। কাউকেই ভুলতে পারেন নি আপনি। লোকে কিন্তু এখানে আসে ভুলতে। বিশ্বেশ্বরের পায়ে সব দুঃখ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে এক মনে তাঁকে ডাকতে।

। বৃদ্ধ ।

হ্যাঁ হ্যাঁ তা বটে। কিন্তু আমার তো কেউ মরেনি যে ! দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাউকে বটে কিন্তু তারা রয়েছে—আছে। যেমন তুমি আছো।

। বৃদ্ধা ।

কি বিপদ ! কিন্তু আমাকে তো দেখতে পাচ্ছেন আপনি।

। বৃদ্ধ ।

তাদেরও দেখছি।···এসো গো এসো। আলাপ করিয়ে দি। আমার স্ত্রী বিমলা। ইনি কে চিনতে পাচ্ছো না বিমলা ? দেখনি কোনো দিন ?·· না-তা-হ্যাঁ দেখবার কথাও না। এ হলো আমাদের নিরু—নিরুপমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যার চিঠির তাড়া আমার বাক্সে পেয়ে—না না, যাচ্ছো কেন বিমলা, বোসো না। ওর বয়স এখন বাহাত্তর। তোমার ষাট। আমার বাহাত্তর। চলাচলি করবার বয়স আমাদের কারুরই নয়। বোসো বিমলা—বোসো।

। বৃদ্ধা ।

না না, আমিই যাচ্ছি।··· এমন করে ধরে রাখতে পারে কেউ, আমি ভাবতে পারিনি।

। বৃদ্ধ ।

না না, বিমলাই যখন চলে গেল, তুমি আর যাচ্ছো কেন ? ভেবনা বিমলা রাগ করে গেল। তোমাকে সরে নিয়ে ছিলও। বোধ হয় তোমার জন্যে চা-টা করতেই গেল। তা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালো বাসে।·· না না, তোমাকে খুব সরে নিয়েছিলো ও। তোমার সব চিঠিগুলো কেড়ে নিয়েছিল আমার বাক্স থেকে।··· না, না, পোড়ায়নি। খুব যত্ন করে রাখতো নিজের বাক্সে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো।...কি মজা হতো জানো ? আমি যখন ট্যুরে বাইরে যেতাম, তোমার চিঠির লাইনগুলোই লিখে পাঠাতো আমাকে। পড়তাম আমি ওর চিঠি—মনে পড়তো তোমাকে। সারা জীবন এই কাণ্ডটি করেছে—সারাটি জীবন ভুলতে দেয়নি ও তোমাকে।

। বৃদ্ধা ।

আপনার বোধ হয় ডাক্তার আসবার সময় হলো। এবার আমি উঠি।

। বৃদ্ধ ।

ডাক্তার ! ডাক্তার কেন ?

। বৃদ্ধা ।

তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। চিকিৎসা হচ্ছে না কিছু ?

। বৃদ্ধ ।

না না, আর তো আমার কোনো অসুখ নেই। হয়েছিলো বটে, কিন্তু কাশী এসেই সেরে গেছে।···

তোমাকে নিয়ে চল্লিশ বছর আগে কাশী এসে যে আমার অসুখ হয়েছিল—সেই যে তুমি—ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটে—

। বৃদ্ধা ।

চল্লিশ বছর আগেকার কথা আপনি তুলবেন না। তুললেই কিন্তু আমি চলে যাবো।

। বৃদ্ধ ।

বেশ তুলবো না। কিন্তু তিরিশ বছর আগে—তখন কড়টা অনেক খেমে গেছে। তখন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতে সেই দুপুর রাতে গিয়ে উঠেছিলাম তোমার বর্ধমানের কোয়ার্টারে। হোস্টেলের দারোয়ান আমাকে জাপটে ধরে চেঁচাচ্ছিলো চোর চোর বলে, তুমি এসে আমায় বাঁচালে।

। বৃদ্ধা ।

হাঁ। আপনি বাঁচলেন বটে, কিন্তু আমার চাকরিটি গেল। আচ্ছা আমি উঠি। কিছুদিন যখন এখানে আছি, আর দশাশ্বমেধ ঘাটও যখন আছে, আর বিকেলে যখন বেড়াতেও যান আপনি, ওখানে দেখা হয়তো আরও হবে।

। বৃদ্ধ ।

দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। শুধু একটি কথার জবাব দিয়ে যাও।

। বৃদ্ধা ।

বল।

। বৃদ্ধ ।

আমি কি এখনো বেঁচে আছি।

। বৃদ্ধা ।

আছো।

। বৃদ্ধ ।

আমার এই দেহটাই কি তার একমাত্র প্রমাণ ?

। বৃদ্ধা ।

না, দেহটা কোনো প্রমাণই নয়। যাদের দেহ নেই তারাও তো বেঁচে রয়েছে তোমার জীবনে।

। বৃদ্ধ ।

তবে কেন বলছো আমি বেঁচে আছি ?

। বৃদ্ধা ।

যাকে তুমি চেয়েছিলে তাকে তুমি পাওনি তাই।

। বৃদ্ধ ।

হয়তো তাই। সব কিছু পেলে মানুষ বাঁচে না, না পেলে মানুষ বাঁচে না, না পেলে তবে বাঁচে। পাওয়াটা সত্যিকার পাওয়া নয়, হারানোটাই পাওয়া। সারা জীবন তোমাকে যেমন পেয়েছি, এমন আর কিছু পাইনি, কাউকে পাইনি।... আর সে যে কি আনন্দ · সে যে কি আনন্দ...রামদীন ! রামদীন !

। রামদীন ।

হুজুর।

। বৃদ্ধ ।

আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নে। আজ এই রাতের ট্রেনেই আমরা যাচ্ছি হরিদ্বার। আমি এখানে মরতে বসেছি। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে রামদীন, চটপট সব গুছিয়ে নে।

। রামদীন ।

জী হুজুর।

। বৃদ্ধা ।

পালিয়ে গেলেন যে ! ওঁর কি কোনো অসুখ হয়েছে রামদীন ?

। রামদীন ।

হাঁ মা, মাথার অসুখ। এখন বরং অনেকটা ভালো

। বৃদ্ধা ।

তোমরা তবে আজই চলে যাচ্ছো ?

। রামদীন ।

না মা, সে ভাববেন না আপনি। দিনে রাতে যখন তখন কত জায়গায় এখন উনি যেতে চান। যান না কোথাও ; থাকবেন এখানেই। যাওয়ার জায়গা এখন ওঁর শুধু একটি।

। বৃদ্ধা ।

কোথায় ?

। রামদীন ।

দশাশ্বমেধ ঘাট। চল্লিশ বছর আগে ঐ ঘাটে কে যেন ওঁকে ছেড়ে গিয়েছিল। তারি খোজে গিয়ে বসেন এখন

ওখানে

। বৃদ্ধা ।

পাননি তাঁকে এতদিনেও ?

। রামদীন ।

রোজই তো এসে বলেন, পেলাম না। আজ প্রথম ঐ কথাটা শুনিনি ওঁর মুখে। আজ প্রথম একা ফেরেননি ঘরে। সঙ্গে এসেছে আর কেউ—আপনি। আপনি কি ওঁর কেউ হন মা ?

। বৃদ্ধা ।

না বাবা, তা যদি হতাম, তবে এমন করে এ ঘর থেকে পালিয়ে যেতেন কি উনি ? দশাশ্বমেধ ঘাটে তুমি ওঁকে নিয়ে যেও। সেখানে আর আমি কখনো যাব না—কখনো না।

। রামদীন ।

সেই আমি বুঝি কেউ হলে আপনি মা এমন করে ওঁকে ছেড়ে যেতে পাতেননা—যেমন গেলেন।

উজ্জ্বলভারত

॥ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

উজ্জ্বল এই ভারত মোদের
চির উজ্জ্বল রবে,
শুধু গৌরব দিবে, অনাগত
নব নব গৌরবে।
হোমের হবির গন্ধেতে ভরপুর।
সে দিন আসিবে, নাহি আর দেরী দূর।
বিশ্ব ভরিবে এবার পুণ্য
কাঙ্খিত সৌরভে।

২

মুনি ঋষি কবি, সুধী সাধুদের
তপস্যা দিয়ে গড়া,
এই যে ভারত—মহিমায় এর
ধন্য বসুন্ধরা।
পাইব আমরা ভগবানে আরো কাছে
ভক্তেরা তাই উন্মুখ হয়ে আছে,
পরাভক্তি ও ব্যাকুলতা বিনা
যায় না তো তাঁকে ধরা।

৩

চলে গেল কত শত যুগ ভ্রান্তি
জপ তপ ধ্যান প্রাণ।
স্রষ্টা এবং সৃষ্টির কই
কমিল না ব্যবধান ?
আসুক সুদিন, হোক তাঁর কৃপা হোক
আরও ঘনিষ্ঠ হোক তাঁর সাথে যোগ,
ভারতই প্রথম পাইবে যে সেই
অমৃতের সন্ধান।

ব্রাউনিং

॥ রেজাউল করীম ॥

শেলী একটি বিখ্যাত কবিতায় বলিয়াছেন আমাদের "গভীরতম ব্যথা হইতে আসে মধুরতম সঙ্গীত।" শেলীর নানা কবিতা তাঁর অন্তরের মর্মজালার বেদনা-বিধুর। শেলীর মতই রোমান্টিক যুগের প্রায় সকল কবির মধ্যে আছে একটা ব্যথা ও বেদনার সুর। ইংরাজি কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে আছে একটা করুণ "মেলান্‌কলি" ইংরাজি কবিদের মধ্যে দু'একজন কবি আছেন যাঁদের অন্তর্নিহিত সুর "মেলানকলি" নয়। আশাবাদী কবি ব্রাউনিং তাঁদের অন্তর্গত। তিনি চরম আশাবাদী। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। তিনি বিপুল সাহসের সহিত মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। আমরা বার্দ্ধক্য দেখে ভীত হইয়াপড়ি। কিন্তু ব্রাউনিং তাতে কোন ভয় পান না। বরং জোর গলায় বলেন বার্দ্ধক্য ত আশীর্বাদ। তাঁর একটি কবিতা লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইব তাঁর আশাবাদ কত উচ্চ স্তরের। দুঃখ ও ব্যর্থতা তাঁকে বিচলিত করে না। বরং দুঃখ ও ব্যর্থতার ভিতর হইতে তিনি আশার বাণী সংগ্রহ করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'রাবিবেন এজরা'—এই কবিতার মধ্যে ব্রাউনিং চরম আশাবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিয়াছেন। সংক্ষেপে কবিতার মর্ম এইরূপ—এই কবিতায় দেখি কবি ব্রাউনিং বৃদ্ধ রেবন এজরার মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—বার্দ্ধক্যের জন্য ভয় করিও না, বৃদ্ধ হইয়াছ তাতে কি হইয়াছে। বার্দ্ধক্যও বিধাতার আশীর্বাদ। যৌবন জীবনের চরম বিকাশ নহে। ব্রাউনিংয়ের মতে চরম বিকাশ হইতেছে বার্দ্ধক্য। বার্দ্ধক্য হইতেছে যৌবনের পরিণতি। শৈশব কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য লইয়া একটি পূর্ণ মানব সৃষ্টি। ঈশ্বর এই যে পূর্ণ মানব-সৃষ্টি করিয়াছেন বয়স ও বিকাশের তারতম্য অনুসারে তাকে দিয়েছেন বিভিন্ন অংশ। যৌবন একটা অংশ মাত্র। এই যৌবন অতিক্রান্ত হইলে মানুষকে দীর্ঘভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে বার্দ্ধক্য তার জন্য কি আশীর্বাদ সংরক্ষিত করিয়া রাখে তাহা দেখিবার জন্য।

মানব-জীবন একটা বিশাল সংগ্রাম-ভূমি। অহরহ মানুষকে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে। ফলশ্রুতি ও সাফল্য লাভের আশা না করিয়াই কাজ করিয়া যাইতে হইবে। প্রচেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টাই মানুষকে ঈশ্বর-সদৃশ (God-like) করিয়া তুলে। জীবনে কাজ করিতে গেলে কত শত হতাশার ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হইবে। মানুষ বার বার ব্যর্থ হইবে তার উদ্যম ব্যাহত হইবে। তবুও প্রত্যেক ব্যর্থতাকে অভিনন্দন জানাইতে হইবে। তাই যেন এজরার কণ্ঠ হইতে ব্রাউনিং বলিতেছেন—

> Then, welcome each rebuff
> That turns earth's smoothness rough,
> Each sting that bids nor sit nor stand
> but go !'

কবি বলিতেছেন যে সংগ্রাম হইতেছে একটি আধ্যাত্মিক গুণ। সেই জন্য সংগ্রামের পথে প্রতি বিপদকে প্রতি ব্যর্থতাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতে হইবে। যাহা কিছু জীবনকে কঠিন সংগ্রামে পরিণত করে তাহাকেই তিনি অভিনন্দন করিতে বলিতেছেন। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সে জন্য ব্রাউনিং এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অভিনন্দন করেন ইহাতে যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয় তার জন্য তিনি মোটেই দুঃখিত নন। জীবনের মূল্য নির্ভর করে তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার উপর। আমরা সাধারণ লো

ব্যর্থতার ভারে ভাঙিয়া পড়ি, মনে হয় বুঝি সব শেষ হইয়া গেল। আর আমাদের প্রথম উদ্যম একটু সফল হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি। ব্রাউনিং এসব ক্ষেত্রে কথা বলেন অন্য সুরে। তিনি বলেন যে চেষ্টা করেও যখন আমরা ব্যর্থ হই তখনই ত আমাদের প্রকৃত সার্থকতা। কারণ প্রচেষ্টার মধ্যে আছে জীবনের আসল সার্থকতা ও মূল্য। জীবনের মূল্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে প্রচেষ্টার উপর, আকাঙ্ক্ষার উপর। কেবল মাত্র পশু পক্ষীরাই উদর পূর্তি করিয়া খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু মানুষের ব্যাপার অন্যরূপ। একাকী সংগ্রাম করিয়া তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে তাকে অহরহ অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাতেই তার আনন্দ। তাই বলিয়া ব্রাউনিং মানুষের দৈহিক ও জৈবিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতে বলেন না। তার গুরুত্বকেও লঘু করিয়া দেখেন না। তিনি বলেন দৈহিক শক্তির তেজস্বিতা অনুভব করা খুব ভাল। কারণ তাহা হইলে শক্ত ও কর্মঠ দেহ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারিবে। এবং এই ভাবে বিধাতার perfect design পূর্ণ পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে পারিবে। আমাদের প্রতি বিধাতার অপার ভালবাসা এই ভাবে আমাদের মাধ্যমেই পরিস্ফুট করিবেন।

ব্রাউনিং আরও বলেন যে দৈহিক-জীবন নিশ্চয় ভাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় বস্তু হইতেছে আধ্যাত্মিক জীবন। দৈহিক জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের অধীনে রাখিতে হইবে। দৈহিক জীবন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পশুদেরও দৈহিক জীবন আছে। মানুষের সহিত পশুর পার্থক্য এই যে পশুর দৈহিক জীবনই একমাত্র বস্তু। ইহার অধিক পশুর আর কিছুই নাই। দৈহিক জীবন একটা সীমা ও গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মানুষের পক্ষে আরও কিছু দরকার। সেটা তার আধ্যাত্মিক জীবন। পার্থিব দৃষ্টিতে যা প্রাপ্তি ততটুকু পেলেই তার চলিবে না। যাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু যার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, এমন বস্তু তার চাওয়া কর্তব্য। প্রাপ্তির অপর প্রান্তে উপনীত হইবার জন্য তাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। আত্মা ও দেহ একই সঙ্গে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে অগ্রসর হইবে ইহাই ত আসল মানব-জীবন। নতুবা পশুর সহিত তার প্রভেদ কোথায়?

সুতরাং মানুষের প্রধান গৌরব এই যে সে সংগ্রাম করিবে, আশা করিবে, আকাঙ্ক্ষা করিবে। আর কবি বৃদ্ধ বয়সকে অভিনন্দন করেন। কারণ যুবক যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন সে বৃহত্তর ক্ষেত্র পাইবে, অধিকতর যোগ্যতা অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। তার এই বৃদ্ধ বয়সে এই বোধ জাগ্রত হইবে যে সে is getting a god হইতে চলিয়াছে। বার্ধক্যে উপনীত হইতে পারিলে তবেই মানুষ তার অতীত যৌবনের কার্যাবলী বিচার করিতে পারিবে। ইতিমধ্যে বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে তার বহু শিক্ষা হইবে। তখন সে নির্ভয়ে মৃত্যুর পরপারের দিকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। যুবক বয়সে তার নিকট যাহা অনিশ্চয় ছিল, যে সন্দেহ ছিল, এখন তা থাকিবে না। সে পাবে একটা নিশ্চয়তার ছাপ। এখন সে জীবনকে ঠিকভাবে বিচার করিবার অধিকার পাবে। এই প্রকার বিচার ক্ষমতার মূল্য এই যে অনাস্বাদিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হইবার জন্য অধিকতর আত্ম-বিশ্বাস সে ফিরে পাবে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—কি কি কাজ আমাদের করিতে হইবে ঠিক ভাবে তাহারই বিচার করা। মানুষের উচিত সব সময় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া। যৌবন তার উচ্চাভিলাষ-পূর্ণ উদ্যম ও প্রচেষ্টার দ্বারা বার্ধক্যের মুখোমুখী হইবার জন্য সাধনা করিবে। আর বার্ধক্য জীবনের পরপারে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া। এই জীবনেই মানুষকে এই সব কথা জানিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে—উচিত আর অনুচিত সৎ ও অসৎ সীমিত ও অসীম এ সবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি? বড় কি, ছোট কি! আপন কি, পর কি—এসবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা জানিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এই সব কথার মধ্যে এই সব বিচার করার মধ্যে শান্তি পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রত্যেক বিষয় সঠিক

বিচার করা কঠিন কাজ। কেহ বলিবেন ইহা ঠিক, কেহ বলিবেন উহা ঠিক, অথচ কোনটা বিশ্বাস করিতে হইবে, কোনটা আসলে ঠিক তাহা কেহই জানেনা। বিচারের মানদণ্ড কি!

ব্রাউনিং বলেন এসব বিচারের মানদণ্ড Aspiration and not achievement আকাঙ্ক্ষা—প্রাপ্তি নহে। যে সব কাজ করা হয়ে গেল তার উপর মানুষ যেন কোন রায় বা মন্তব্য না করে। বরং অস্পষ্ট আশা প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা, অসম্ভব কল্পনা, অনিশ্চয়তাপূর্ণ প্রচেষ্টা, যাহার জন্য সে কামনা করেছে কিন্তু যাহা এখনও পায় নি—এই সবই শ্রেষ্ঠত্বের আসল পরীক্ষা। ঈশ্বরের নিকট মানুষের যাহা potential তাহাই প্রকৃত মূল্যবান।

ঈশ্বর সবই সৃষ্টি করেন। আত্মা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আত্মাও অনন্ত। কেবলমাত্র মূর্খেরা বলে যেহেতু জীবন চলে যায় এবং সব কিছুরই পরিবর্তন হয়, কিছুই স্থায়ী নহে, অতএব যতদিন জীবিত থাক, ততদিন বর্ত্তমানকে উপভোগ কর। ফারসী কবি ওমর খাইয়ামের জীবন দর্শনের তিনি ঘোর বিরোধী। এই কবিতায় ব্রাউনিং ওমর খাইয়ামের জীবন-দর্শনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ওমর বলেন আজ যাহা নগদ পাওয়া যায় এখন তাহাই ভোগ কর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে লাভ কি! ব্রাউনিং কঠোর ভাবে এই নীতির বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি বলেন আজ যাহা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা আসলে কিছুই নহে। আগামী যুগে একটা বিরাট কিছু পাবার জন্য যে সাধনা তাহাই আসল বস্তু। তাঁর নিকট অতীত ও বর্ত্তমান বলিয়া কিছুই নাই। অতীতে যাহা ছিল ভবিষ্যতেও তাহা হইবে। পৃথিবীর বাহ্যিক আকারের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ঈশ্বর ও মানুষের আত্মার কোন পরিবর্ত্তন নাই। এসব চিরকাল ছিল, আছে ও থাকবে। ঈশ্বর বর্ত্তমানের কেন্দ্র-বিন্দুর উপর মানুষের আত্মাকে স্থাপন করিয়াছেন। কুম্ভকার যেমন তার চাকা ঘুরাইয়া বিভিন্ন পাত্র প্রস্তুত করে, ঈশ্বরও তেমনি সময়ের চাকার উপর মানুষকে ঘুরাইতে থাকেন এবং এই ভাবে তাকে আকার দেন। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করা মানুষের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। যাহা অন্যায় তিনি তাহা ঠিক করিয়াছেন যাহা ত্রুটিপূর্ণ তিনি তাহাকে সুন্দর ও সুঠাম করিয়াছেন। বার্দ্ধক্য অনুমোদন করে যৌবনকে। এবং মৃত্যু পূর্ণ করে সমগ্র জীবনকে। ব্রাউনিংয়ের সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রবাহিত আছে একটা জীবন্ত আশাবাদ। তিনি মানুষকে সকল অবস্থাতেই একটা দুঃসাহসিক ব্রত গ্রহণ করিয়া অবিরাম সংগ্রাম করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আজকের যুগে তাঁর এই বাণীর বিশেষ দরকার আছে।

সমন্বয়

(ঈশোপনিষদের—১১নং শ্লোকের ভাবানুবাদ)

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।
ঈশ-উপনিষৎ। ১১

অবিদ্যা ও বিদ্যা যিনি সমভাবে পরিজ্ঞাত হয়ে
জেনেছেন বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে
অন্তরে স্থির বোধি; আনন্দে বিস্ময়ে
দেখেছেন—আদিম এ প্রাণের উৎসারে
অনন্ত আলোক উৎস নিত্য ঝরে পড়ে,
বিদ্যা ও অবিদ্যা স্থিত সেই এক ঐক্যের অঙ্গনে
তিনি হৃত মহান শান্তিতে;
অবিদ্যা দ্বারা তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে
বিদ্যার নিদিধ্যাসনে
অমৃতে উত্তীর্ণ হন পরিপূর্ণ পূর্ণের প্রাপ্তিতে।

বিদ্যা অবিদ্যার ব্যাপ্ত নিখিল বিশ্বের
মর্মমূলে যিনি অভিসারী,
বিস্মিত আনন্দে যিনি বহু জীবনের
সম্মিলিত, শান্ত, স্থির—জীবন যে তাঁরই
সাধারণ হতে পারে। বাসনার পথে
আমাদের নিত্য মৃত্যু, মৃত্যুর সহস্র পর্যায়
অন্তহীন। অথচ এ মন অন্য স্থির কিছু চায়
যা পেলে সে সব পাবে—অমিত পরশে
বর্ণের গন্ধের সমাহার।
সে তখন পূর্ণতা—সেই সব পেয়েছির দেশে,
তখন সে মৃত্যুত্তীর্ণ স্থানে কাল পাত্র নির্বিশেষে।

সব নিয়ে এ জীবন

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

সে-জীবন কোনদিন আসবে কি জানি না, জানি না;
তবু সে-দিনের স্বপ্ন দেখে যাই, আর মনে মনে
সে-দিনের গান গাই : আলো-আঁধারের সে-জীবন,
যেখানে মানুষ খুশি সুখ-দুঃখ দু-ই ভোগ করে।

শুধুই আলোক নয়, পাশে পাশে থাকুক আঁধার,
হাসি ভরা মুখগুলি, মাঝে মাঝে কিছু আঁখিজল—
দু-ই থাক; হাসি-কান্না, আলো-আঁধারের দিনগুলি,
বিরূপ না হয় যেন মন কভু, খুশি দু-ই নিয়ে।

শুধু আলো, শুধু হাসি, শুধু গান—এ কোন্ জীবন!
নয় নয়, তার সাথে থাকুক বেদনা কিছু মিশে;
অমৃত অমৃত হবে, পাশে যদি গরল না থাকে?
কি করে সে-অমৃতের স্বাদ পেয়ে খুশি হবে মন!

শুধুই অজস্রধারে সুখ শান্তি—অলস জীবন;
এ এক জীবন শান্তি, অর্থহীন, চাই না, চাই না।
প্রেম চাই স্নেহ-ধারা, তার সাথে চাই যে বিশ্রাম,
প্রাচুর্য চাই না, চাই সব মিলে এ স্নিগ্ধ প্রসন্নতা।

সুখ-দুঃখ দু-ই থাক, থাক দু-ই আনন্দ-বেদনা,
বিরহ-মিলন নিয়ে দিনগুলি সার্থক সুন্দর
হোক, যেন কোন মতে না থাকে সে-জীবনের মাঝে
বিরূপতা—সব মিলে এ জীবন যেন ভালবাসি।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪০)

৮, ৯, ৫৬। গীতায় দৈবী সম্পদের মধ্যে প্রথম সম্পদ হল অভয়ম্—অভয় হওয়া ও অভয় দেওয়া। দুটোর কোনটাই সহজ নয়, একটি শ্লোকে আছে গো প্রদান বল, মহী প্রদান বল, অন্ন প্রদান বল কোনটাই শ্রেষ্ঠ নয়, সর্ব প্রদানের মধ্যে অভয় প্রদানই শ্রেষ্ঠ। অভী হওয়া ও অভয় দেওয়া কঠিন কথা। নিতাগোপাল আমাকে অভয় দিয়েছিলেন। "ভয় কি টেনে তুলব" নিতাগোপালের এই অভয় বাণী আমাকে প্রতি মুহূর্তে অভয় দিচ্ছে। নিতাগোপাল আমাকে দুমুঠো অন্নও দেননি পৃথিবীও দেননি দিয়েছেন "ভয় কি টেনে তুলবো" অভয় বাণী। দিয়েছেন পথ চলার এই পাথেয় কথা, বস্তুতঃ পথ চলেছি, একবারে ঐ ভরসায়। বিপদে ভয় খাইনি বরং হাসিমুখে পড়েছি। তিনি আমায় অভয় দিয়েছেন, আমি তো তাকে অভয় দেইনি—শিশু তো অভয় দিতে পারে, শিশু তো বলতে পারে, পুত্র তো বলতে পারে যখন আপনার যা নির্দেশ তা সরল মনে মেনে নেব···। যে অভয় দিল সে অভয় পেল··এক তরফা হয় না—সহনা অবস্তু···এক তরফা হলে কিছুতেই কিছু পাবে না···। যেই তুমি আত্মসমর্পণ করলে অমনি জীবত্বের বন্ধন কেটে গেল। উপনিষদ বললেন, অনন্ত আশীর্বাদ ছড়িয়ে রয়েছে. কে নিতে পারে? —শরণাগত যে সেই নিতে পারে···মনে মনে প্রতিবাদ করলেও আর কিছু পাওয়া গেল না।·· মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্···। বুদ্ধিমানরা কাউকে অভয় দেন না ··· প্রণাম করা অর্থই অভয় দেওয়া। নির্ভয় হও। ঘরে আমার যা আছেরে একথা মনে করতে পারলেই অভয়। সরল বিশ্বাস না হলে ভগবানের রাজ্যে আসতে মানা। ভূপের মত নীচ হও। যীশু বললেন Follow me I will show you the path। কৃষ্ণ বলেছেন আমি হাসে আছি শরণাগত হও, শুনতে চাও—শিখতে চাও, শেখো—অভয় হও অভয় পাও।···কথা কাটাকাটি ভাল লাগে না···। প্রার্থনা এখনও করি, মা, বোবা হয়ে জন্মেছিলাম আবার বোবা কর···মাটির দুর্গা পূজা করে দুর্গা পায় কৃষ্ণ পায়, আর আমার কথা শুনে বিপদ বরণ করতে সাহস পাওনা?···আড়াল করলেই সর্বনাশ, সেই আড়ালের অন্ধকারে সমস্ত অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে।

১০, ৯, ৫৬। উপনিষদের মন্ত্র "ন তদস্তি ন যন্নাহম্" —তা সেই আমি যেখানে নেই। বস্তু থাকলেই তো থাকে না—বস্তু আছে আমি তারমধ্যে নেই সেটা আমার কাছে থাকা না থাকা সমান। অনেক বস্তু তো আছে কিন্তু আমি তো সবের মধ্যে স্থান করে নেইনি; ভগবান আছেন কিন্তু আমার উপলব্ধি নেই, সেখানে ভগবান থাকা না থাকা আমার কাছে সমান। যা আমার উপলব্ধিতে নেই, তা নেই। হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ গুহায়াম্ অক্ষেত্রজ্ঞ ···ক্ষেত্রজ্ঞ নয় বলে গুহার মধ্যের সে টাকা তো তাদের কাজে লাগে না, উপরি উপরি বিচরণ করেও তো আনে না, লাভ করতে পারে না—কেন অনুভবের প্রত্যাহ্বা। থাকা সম্বন্ধে তার তো জ্ঞান নেই। পাওয়া জিনিস হারায় যদি সে কাজে না লাগে। জানলেও হয় না এর পরেও আর একটা স্তর—জানাকে জীবনে কাজে বোঝা। অহংহ পশ্যন্তি ব্রহ্ম পূরুষম্—কিন্তু জানে না বিজ্ঞের বুদ্ধি দেখতঃ···তাঁর ভিতরে প্রবেশ না করে কি করে তাঁর খবর জানবে?···তাঁকে দিয়ে তাঁকে জানতে হয়—একজনকে জানতে হলে তার বুকের মধ্যে ঢুকতে হবে· সেবার মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয়। কৃষ্ণ বললেন, একমা ভক্তির দ্বারা আমি গ্রাহ্য—ভক্তি হলেই তাঁর বুকের মধ্যে ঢোকা যায়। বস্তুকে পাওয়ার কৌশল হচ্ছে তার কা

খানি আমার করে দেখতে পাচ্ছি—হৃদয় দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করতে হয়···। যার মধ্যে আমি ঢুকতে পারলাম না তাকে আমার পাওয়া হল না, অন্তরে জীবনের মধ্যে ঢুকতে হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ বললেন মন্মনা হও, মদ্গত চেতসা আমাকে পাও। তন্ময় হও। নদী যখন সাগরে ঝাঁপ দেয় তখন সে তন্ময় হয়···। তুমি বিলেতে না গেলে বিলেতের কতটুকু কি জানবে···। বাইরে থেকে তুমি নিত্যগোপালের কি জানবে···। ঠাকুর, তোমার কিছুই তো বলতে পারলাম না, তবুও যা আকাশ পাতাল ছিটে ফোঁটা বলি তাই শুনে হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন এই শেষ কালচার যা স্বামিজী দিচ্ছেন···শোনা কথায় চিড়ে ভিজে না—অনুভূতি চাই।···অনুরোধ (নির্দেশ দিয়ে লাভ নেই) নিত্যগোপালের ভিতর প্রবেশ কর। আমি সবাইকে আমার বুকের মধ্যে দিয়ে রেখেছি···। নিজের সম্বন্ধে আর একটু বিনীত হও···নিজের ভিতরে শ্রদ্ধা জাগ্রত কর···নিজের বুকটাতে আকড়ে থেকো না···। আমি ঠিকই শুনেছি আপনি বলেননি, একথা না বলে বলতে শেখ, আপনি বলেছেন আমিই শুনিনি। নিজেকে কেবলই সমর্থন করা শ্রদ্ধার চিহ্ন নয়। ওতে কিছু হবে না। সাধনার জগতে চলার পথ আলাদা···নিজের শোনা বা বোঝার উপর জোর দিও না। কেউ একজন যদি আমাকে বলে, মশাই, এই রাস্তায় খান দোলা যাবে, আমি জানি যে সেই রাস্তাটি সোজা নয়, তবুও আমি বরং একটু ঘুরে যাব একজন যখন বলছেন। অপরের ভিতরে ঢুকতে হলে তৃণাদপি সুনীচ হতে হবে···যেখানে বিরোধ থাকে সেখানে হার মানলেই মিটে যায়···মদ্গত প্রাণ, সরল সহজ জীবন নিয়ে আস···। নিত্যগোপাল, তুমিত জান যে আমরা তোমারই বিকাশ—তুমি স্বয়ং প্রকাশ, তুমি স্বপ্রকাশ।···আমার বুদ্ধি তুমি লও, আমাকে বেশী বুঝতে দিও না। উপনিষৎ বলছেন শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—কলাগাছে বাণ নিক্ষেপ করলে যেমন সেটা তার ভেতর ঢুকে যায়, তুমিও তেমনি করে তার মধ্যে ঢুকে যাও—গোপীদের মত তন্ময়তা হৃদয়ঙ্গম হও···। নরনারায়ণ আশ্রম গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে এগেছে···। আশ্রমে আসিয়া কেন আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি সেটি বুঝিয়া এ যেন না হয় অপ্রয়োজন বোধ করা···। কেন আসিয়াছি সকাল সন্ধ্যায় এ প্রশ্ন করো···। এ সংসারে কেন আসিয়াছি, কে আমি এ প্রশ্ন আর জাগলোনা তার জীবন বিফলে গেল।··· মানুষ হও···

১১. ৯. ৫৬। কাল রাধাষ্টমী—এই দিন আমার জীবনের এক বিশেষ দিন—শ্রীরাধারাণী জীবনে এসেছিলেন। কোন দিন তাঁকে আমি চাইনি। তিনি আসার পর থেকে বিশ্ব সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে এক নূতন দৃষ্টি আমার খুলে গেছে। ভারতীয় সভ্যতা বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ সভ্যতা শ্রীরাধারাণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তিনি না এলে ভারত পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'ত না। তিনি পরাপ্রকৃতি। এই প্রকৃতির উপর শ্রদ্ধা করতে শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতি যে ভোগের জিনিস নয় সেও যে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারে শ্রীরাধা জীবনে তার প্রমাণ। রাধা বলতে যা কিছু মানুষের ভোগ্যবস্তু তাকেই বুঝায়—নারী, অন্ন, জনসাধারণ, বিষয় ইত্যাদি যা কিছু ভোগ্য। ভোগ্য বলে এই বিশ্বে কেউ নেই, ভোগ যদি করতে চাও ভজনা কর। রাধাকে ভজিয়া তিনি রাধাবল্লভ হয়েছিলেন, বৃন্দাবনে—যে লীলাস্থলিতে তিনি জন্মেছিলেন—সেখানে গড়াগড়ি দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্নেহ পেয়েছি প্রচুর—কাছাকাছি অনুভব করতাম।···বস্তুকে ভোগ করতে গেলে বস্তুর মেজাজ ক্ষেপে যায়—ভাতেরও মেজাজ আছে···। উপনিষৎ বলেন অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। অন্ন নিবেদন করে খাওয়া—এটা ফ্যাসান নয়। অনেকেই প্রসাদ খায়—শ্রীরাধাও প্রসাদ খেতেন। অন্নের কি হয় জানিনা কিন্তু কৃষ্ণকে পাওয়ার আনন্দে শ্রীরাধার সারা শরীর রোমাঞ্চ হতো। প্রসাদ হচ্ছে প্রসন্নতা···ভোগ্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করে ভগবানে সত্যি সত্যি দিলে বিষ অমৃত হয়ে যায়—যা খেয়ে আমাদের বিষক্রিয়া হয় শিবের তা হয় না। বিষক্রিয়াটা সব সময় বস্তুর ধর্ম নয়। উহা অনেকখানি মানসিকতার উপর নির্ভর করে···ওগো অন্ন, তুমি যাঁর আদি তোমাকে তাঁর কাছে নিবেদন করলাম···। ব্রাহ্মণদের তাই করার

কথা—অন্নজল দিয়ে প্রাণ, সমান অপান, উদান, ব্যান বায়ুতে যারা পঞ্চ ধারা নিয়েজন করা হয়...যাঁর অন্ন সেই গোবিন্দের কাছে অন্নকে যিনি নিয়ে যান তিনি অন্নের সেবা করেন। তুমি নিয়ে খেয়ে হজম করবে...ভোগ করতে যেওনা, জীবনের সব ঘটনাকে সেবা বুদ্ধিতে কর, চব্বিশ ঘণ্টা দেবার মধ্যে যান- রান্না করবার আগে উঠনকে প্রণাম করবার বিধি ছিল। ভক্তি দিয়ে রান্না করলে সে রান্নার ফল আলাদা হয়।...তিনি যজ্ঞেশ্বর—সমস্ত কর্ম দ্বারা তুমি যজ্ঞ কর।... ভাত নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের ভাত ভগবানে পৌঁছায় না। লক্ষ্মী এসে বিষ্ণুর রান্না করেন, দ্রৌপদীর রান্না ঋষিরা এসে খেতেন। অন্তরঙ্গ গোবিন্দের ভক্তের হাতে খেতে তাঁরা ভালবাসতেন।...প্রকৃতিকে লোকের দৃষ্টিতে দেখো না...। মায়ের ব্রহ্মরূপ দক্ষিণেশ্বরে, নারীর ব্রহ্মরূপ শ্রীযোগমায়া শ্রীনিতাগোপাল তা দেখাবেন। যেখানে নারী সেখানেই পূজনীয় দৃষ্টিতে দেখবে।... লোভী কখনও বস্তুর রসাস্বাদন করতে পারে না।...নিশীড়িতের ব্রহ্মময়ী রূপ শ্রীরাধা, শ্রীরাধা আমার পরাণ পুতলী—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আমার জীবনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে নিতাই বাবুর সঙ্গে একদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। একটা সিনে গাছপালার ভিতরে কয়েকটী মেয়ে নাচছিল, দেখেই আমার বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে গেল, আমি থাকতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। লোক জনেরা হৈ হৈ করে উঠল। নিতাইবাবু দারুণ লজ্জা পেয়ে আমাকে নিয়ে থিয়েটার থেকে বেড়িয়ে এলেন।...একটা গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে চিরদিন মেয়েদের দেখেছি, কোন ছোটো স্বার্থে নয়। মেয়েদের শ্রদ্ধা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।...পূজার দৃষ্টিতে দেখলাম, তবুতো রাধারাণী, তোমাকে বিশ্বের নারীতে পেলাম না। আমি তোমাকে ডাকি নাই, খুঁজি নাই, তুমি আপনি আসিয়াছ। কী আর তোমাকে দিব, তুমি আমার সব নাও—বৃন্দাবনে কুসুম সরোবরে যে রূপে তুমি প্রকাশিত হয়েছিলে সেইরূপে তুমি আমার দেখা দাও।... তোমাদের জেনে রাখা ভাল পূর্ব সর্বায় উচ্চলকারত রাধাষ্টমী দিনে প্রকাশিত হয়েছিল, আমার সন্ন্যাসও রাধাষ্টমীর দিন হয়েছিল।

১৩. ৯. ৪৬।...গানের ভিতর আছে—হরিসে লাগি রহরে ভাই, সনত সনত বনি যাই—লেগে থাক, সনতে সনতে হবে' যাবে। এই লেগে থাকাটা বাঁচবার একমাত্র পথ। সূর্য একটি দ্বিতিশীল জ্যোতিষ্ক—তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী, পৃথিবীকে ঘিরে চন্দ্র। একটা নজর যদি না থাকে বাঁচবে কি করে? এক জায়গায় লেগে থাকতেই হবে—নইলে ঘটনার টানে, কর্মের টানে কোথায় চলে যাবে তার ঠিকানা থাকবে না। একমাত্র বাঁচবার পথ অচলা ভক্তি। মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন, তিনি আমাকে আলিঙ্গন না করে পদাহত করুন, দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুন—তবু তিনিই আমার পরম ইষ্ট।...সেই ছেলেই তবু বাঁচে যার ঘরে খুঁটি আছে। ঘরে আমার মা আছে যে।...যার ঘর নেই, যার মা নেই, নির্ভর করবার, পথ দেখাবার কেউ নেই, নিজের বুদ্ধিই যার একমাত্র সম্বল—তার বাঁচবার উপায় কোথায়?...শিশুর একটি ঘর আছে, ঘরে মা আছে—কে তাকে নেবে! গুরু আছে যার, নজর আছে যার, তাকে যম নেবে কেমন করে?...মায়া সুন্দরের রূপ ধরেও আসে, শয়তান বিবেকের রূপ ধরে নিজের বুদ্ধির রূপ ধরে আসে—তুমি তো তাকে চিনতে পারবে না। একমাত্র করণা গুরু-বল ভারতবর্ষ centrefugal ও centrepetal এই দুই টানকে সামাল দেবার জন্য একমাত্র পথ বলেছেন—গুরুপদাশ্রয়।...লোহা চুম্বকের সঙ্গে লেগে যায়...। যে ইচ্ছা তিনি করুন, আমি আছি—তিনি রাখবেন কি না কথা কইবেন কিনা, কাছে ডাকবেন কি না...তবু তাঁর ব্যবস্থা সবই মঙ্গলময়।...লেগে থাও, বাঁচবে।... নিতাগোপাল, লেগে থাকব, তোমার চরণে সকল দেহ মনপ্রাণ দিয়ে লেগে থাকব, তার পরের কথা তুমি জান

কৃষ্ণ

"অপরের সঙ্গে কি ভাবে মেশা যায়"

॥ শ্রীদেবাশীষ পাল, এম্ এস্ সি (মনোবিদ্যা) ॥

কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য সমস্ত জীবজগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। তাহাদের মধ্যে সামাজিকতা অন্যতম। অবশ্য এখানে আমরা বলব না যে অন্যান্য প্রাণী সকল অসামাজিক, কি তাহাদের মধ্যে সামাজিকতা গুণের একেবারেই অভাব; কেবলমাত্র তারতম্যের প্রভেদ। আবার এই মানুষের মধ্যেই অন্যান্য গুণ সকলের মত সামাজিকতারও ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রচুর আছে। কি ভাবে আরও বেশী সামাজিক হওয়া অথবা অপরের সঙ্গে ভালভাবে মেশা যায় তাহারই আলোচনা করিব।

সমস্ত জীবনভোর আমাদের অন্যান্যদের সঙ্গে বাস করিতে হইবে। সবাই চেষ্টা করে অপরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতে, কিন্তু পারে না। অপরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা একটি মস্ত বড় আর্ট। এবং দেখা গেছে চেষ্টা করিলে বর্ত্তমানের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা সম্ভব।

অনেককে বলতে শোনা যায় যে অপরের প্রতি ব্যবহারের ব্যাপারে তাহারা গুরুত্ব প্রকাশ করে না। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে এটা তাহাদের না পারার একটি প্রকাশ মাত্র (Rationalization) অতএব এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সবাই কম বা বেশী সামাজিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কি ভাবে অথবা উপায়ে বেশী সামাজিক হওয়া যায়। প্রথমেই দেখিতে হইবে যে আমরা কতটা বন্ধুভাবাপন্ন। ইহার সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা আছে।

১। আমি কি সাধারণতঃ বন্ধু হইতে চাই?

২। আমার কি সত্যিকারের কিছু বন্ধু আছে?

৩। আমাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া চিনিয়াও কি তাহারা আমার বন্ধু আছে?

৪। তাহারা কি সত্যিই জানে আমি কি রকমের লোক?

৫। আমি কি তাহাদের বিশ্বাস করি অথবা বিশ্বাস করিতে পারি?

৬। তাহারা কি আমাকে বিশ্বাস করে?

৭। বিপদের সময় তাহারা কি আমাকে সাহায্য করে?

৮। ভালভাবে জীবন যাপন করিতে তাহারা কি আমাকে অনুপ্রাণিত করে?

৯। তাহারা কি আমাকে আমার "Morale" গঠন করিতে সাহায্য করে?

১০। আমি কি তাহাদের আমার সমপর্য্যায় বলিয়া মনে করি?

১১। তাহাদের সঙ্গে আমার কি খুব কমই মনোমালিন্য হয়?

১২। না বলিয়া আমার প্রতি তাহাদের সমালোচনা মানিয়া লইতে পারি?

১৩। তাহাদের অনুরোধ কি আমি রাখিবার চেষ্টা করি?

১৪। তাহাদের প্রয়োজনীয় কি মাঝে মাঝে আমাকে ধার দেয়?

১৫। তাহারা কি "Snobbish" (বড় লোক দেখা ব্যক্তি) হইতে অস্বীকার করে?

১৬। তাহাদের আঘাতদায়ক মন্তব্যকে কি আমি এড়িয়ে চলি?

১৭। আমি কি বন্ধু ও সাধারণ পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারি?

১৮। আমি কি বন্ধু বাতিরেকে অসুখী হই?

১৯। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মধ্যে কি আমি তফাৎ বুঝিতে পারি?

২০। সমলিঙ্গীয় সহিত যত সহজে বন্ধুত্ব করিতে

পারি, বিপরীত লিঙ্গীর সহিত কি অত সহজে বন্ধুত্ব করিতে পারি ?

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যদি ১৯ অথবা ২০টাকে আমরা হাঁ বলিতে পারি, তবে বলিতে হইবে যে আমার অনেক বন্ধু আছে এবং আমার মধ্যে ঐ গুণটী অত্যন্ত বেশী রূপে আছে।

যদি ১৬ হইতে ১৮ প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অপর লোকে আমার সঙ্গ পাইতে ইচ্ছা করে। আমি নিঃস্বার্থ এবং সহৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি।

যদি ১২ হইতে ১৫টী প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমি মোটামুটিভাবে বন্ধুভাবাপন্ন। আমি মানুষ ভালবাসি, কিন্তু তাহারা না হইলেও আমার চলে। আমার চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমি আরও বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারি, এবং তা যদি পারি তাহা হইলে আমার জীবন আরও সুখের হইবে।

যদি ১১টা অথবা তাহার কম প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উপরোক্ত গুণটি একেবারেই কম এবং যদি আমি না পরিবর্ত্তিত হইতে পারি তাহা হইলে আমি জীবনকে সুখ ভাবে উপভোগ করিতে পারিব না এবং দুঃসময় হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এখন দেখিতে হইবে যে আমার নম্বর যদি ১৫ অথবা তাহার নীচে হয় তাহা হইলে কি ভাবে আমার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। অপরের সঙ্গে ভালভাবে মিশিতে গেলে নিম্নোক্তগুলি স্মরণ করিতে হইবে।

১। আমরা প্রত্যেকেই সামাজিক এবং সকলেই চাই যে অপরাপর লোকেদের কাছে আমি খুব প্রিয় হই।

২। আমি যেমন আমাকে আর পাঁচজনের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি সকলেই সে রকম করে। কাউকে যেন যে কোনো রকমেই হউক নীচু করবার চেষ্টা না করি।

৩। নিজের সম্বন্ধে আমার যেন অন্তর্দৃষ্টি (insight) থাকে। আমি প্রকৃতই কি এবং কতদূর আমার ক্ষমতা ইত্যাদি।

৪। আমার থেকে যারা যে কোনো বয়সেই বা তাহাদের প্রকৃত সম্মান দিবে এবং আমার থেকে যারা ছোট তাহাদের স্নেহ সহানুভূতি এবং তাহাদের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

৫। চট্ করে রেগে না গিয়ে এবং যদি আমাকে কেউ কিছু বলে বা আমাকে বিরক্ত করে তার প্রতি ক্রোধ না করে সে যেন বলেছে এবং তার পেছনে কি কারণ আছে জানতে চেষ্টা করতে হবে।

৬। আমি যেমন আমার কথায় মাঝে অপরে ব বললে অসন্তুষ্ট হই অপরেও ঠিক সেই রকম অসন্তুষ্ট হয়।

৭। নিজেকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা

(ক) আমরা আমি যে প্রথম দর্শন লোককে প্রভাবিত করে, এবং সেইজন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ প্রাণোচ্ছাল হইতে হইবে। সুদর্শন কিংবা দা পোষাকের কথা বলা হইতেছে না। পোষাক ইত্য সুরুচি সম্পন্ন হবে, এবং পোষাক ব্যবহার করার স সঙ্গে নিজের দৈহিক চেহারা, যেমন উচ্চতা, ওজন ইত্য লক্ষ্য করিতে হইবে।

(খ) সুন্দর এবং পরিষ্কার ভাবে কথা বলিতে হই প্রথম বাক্যালাপের মধ্যে যেন অপরের ব্যক্তিত্বকে স্বী করা হয়। বাক্যালাপ যেন সময়োপযোগী হয়।

কথোপকথনে একাধিক লোকের অংশ গ্রহণ অ প্রয়োজন এবং অপরে অথবা অপরাপর লোকে যদি না বলে তাহা হইলে আমাকেই কথা বলিতে হই আলোচনাগুলি বর্ত্তমান সমস্যা কিংবা বর্ত্তমান ঘটনা হইলেই ভাল হয়। প্রথমে কথা বলা নিজের ব্যক্তি অবমান করা এ ধারণা একেবারেই ভুল। নিজে বেশী কথা না বলিয়া অপরকে কথা বলার সুযোগ দিতে হই সমস্যা অথবা সমস্যা সমাধানের উপায়ের মধ্যে যেন থাকে এবং উহার মধ্যে যেন আবেগ বা ক্রো মাত্রা বেশী না থাকে। অপরাপর ব্যক্তির যুক্তি মন বিচার করিতে হইবে। নিজের যুক্তি সর্বাপেক্ষা বড় মনোভাব যেন না থাকে।

উপরোক্ত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে যে অনা

হওয়া যায় তাহা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগারে পরীক্ষিত। তবে এখানে একথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে কেউ যদি মনে করে যে ঐ নিয়মগুলি মুখস্থ করিব এবং দু'এক-দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হব, তাহা হইলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও খারাপ হইবে। নিয়মগুলি নিয়মিতভাবে চর্চা করিতে হইবে এবং ইহা অবশ্যই সত্য যে তাহার দ্বারা অপর ব্যক্তির সঙ্গে ভালভাবে মেশা এবং জনপ্রিয় হওয়া সহজতর হইবে।

একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেই আমি রচনাটি শেষ করিব।

আমি কতখানি জনপ্রিয় এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর অভীক্ষণ আছে।

১। আমি কি ভাল মেজাজের লোক, খুব বেশী ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে যাই না?

২। আমি কি সাধারণতঃ লোককে উত্তেজিত করিতে পারি?

৩। আমি কি অপরাপর লোকের কার্য্যাবলীতে উৎসাহ প্রকাশ করি যদিও তাহারা আমার ধারণা এবং ইচ্ছা সম্বন্ধে উৎসাহিত নয়?

৪। আমি অন্যান্যদের দোষগুলি বুঝিতে এবং সহ্য করিতে পারি?

৫। অপরাপর লোকের কাছে যাইতে এবং নিজেও মাঝে মাঝে তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতে ইচ্ছা করে?

৬। আমি কি খেলাধূলায় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি?

৭। আমি কি আমার বিভাগের লোকদের এবং মাঝে মাঝে crowd ইত্যাদির নেতা হইতে পছন্দ করি?

আমি কি নতুন কোনো লোকের সঙ্গে চেনা হইলে প্রথমে কথা বলিতে পছন্দ করি?

৯। অন্যান্যদের আনন্দদায়ক কি আমার নিজেরও আনন্দদায়ক হয়?

১০। চমকপ্রদ কার্য্য এবং খেলাধূলায় কি আমি ভাল সাহায্যকারী নই?

১১। অন্যান্যদের মুখ এবং নাম মনে রাখা কি আমার সহজ বলিয়া মনে হয়?

১২। আমি কি খুব কম সময় অহেতুক চিন্তা করি?

১৩। নিজের অযৌক্তিক ইচ্ছা সম্বন্ধে লজ্জা না এবং আমি কি অন্যান্যদের সঙ্গে খুব সহজেই মিশিতে পারি?

১৪। আমি কি বন্ধুদের জন্মতারিখ এবং বিশেষ অনুষ্ঠান মনে করিবার চেষ্টা করি?

১৫। সাধারণতঃ আমার কথাবার্ত্তা কি হাল্কা এবং আনন্দদায়ক হয়?

১৬। আমি কি কোথাও যাইবার সময় নিজেকে আকর্ষিক করিবার প্রয়াস করি।

১৭। খুব সাধারণ ব্যাপারেই কি আমার বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় না?

১৮। সাম্প্রতিক ভাল ভাল সিনেমা, বই এবং খেলাধূলার ঘটনাবলীতে কি আমার আগ্রহ আছে?

১৯। ধৈর্য্য ধরিয়া উপযুক্ত পাইলে তবে মিশিব এই মনোভাব অপেক্ষা নতুন লোকের সঙ্গে (যে আমার সঙ্গে মিশিতে পছন্দ করে) মিশিতে চাই?

উপরোক্ত ১৯টি প্রশ্নের মধ্যে যদি ১৮টি অথবা ১৯টির উত্তর হ্যাঁ হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় খুবই জনপ্রিয় এবং সাবধান থাকিতে হইবে যাহাতে সমতা রক্ষা করিতে পারি।

যদি ১৩ থেকে ১৭টির প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে জনপ্রিয়। আরও জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যদি ৯ থেকে ১২টি প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার মধ্যে জনপ্রিয়তা কমই আছে। জনপ্রিয় হইবার জন্য নিয়ম মানিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—যে দুইটি সমীক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা John E. Crawford এবং Luther E. Woodword। এখানে শুধু বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে।

শিক্ষায় সৃজনাত্মক শিল্প

॥ শ্রীপ্রভাত রঞ্জন গোস্বামী ॥

বিদ্যালয়ে যে সব হাতের কাজ শেখানো হয় সেগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়। উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক। এই উভয় প্রকার শিল্প স্পষ্ট কোনো সীমা রেখা দ্বারা ভাগ করা নয়। প্রধানতঃ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই রকম ভাগ করা হ'য়ে থাকে। যদি অটোরণ তৈরী করতে শিশুরা—এই উদ্দেশ্য থাকে, এবং সেই অটোরণগুলি আপাততঃ বিদ্যালয়ের অভাব মেটাবে এই লক্ষ্য থাকে, তা'হলে একে উৎপাদনাত্মক শিল্প বলা যাবে। আবার শিশুরা মাটি দিয়ে যা খুশী তাই গড়ছে, আপাততঃ ব্যবহারে লাগবে এমন উদ্দেশ্য সামনে নেই, তা'হলে একে বলা যাবে সৃজনাত্মক শিল্প।

কিন্তু যে কোনো শিল্পই যদি ভাল হয় তা'হলে সাধারণের তা পছন্দ হয়, ফলে তার চাহিদা সৃষ্টি হ'য়ে যায়। তখন ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে উৎপাদন করার প্রেরণা আসে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প এমনি করেই উৎপাদনাত্মক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

সৃজনাত্মক শিল্পের এই উৎপাদনাত্মক শিল্পের মধ্যে আরও কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে মনে করা হয়। উৎপাদনাত্মক শিল্পের লক্ষ্যই হ'ল অধিক উৎপাদন করা। কারণ তার দ্বারা চাহিদা মেটানোর তাগিদ থাকে। চাহিদা যখন অপরের তখন, অপরের প্রয়োজন ও রুচি মতই উৎপাদন করতে হয়। তা ছাড়াও কত কম খরচে কত ভাল ও কত বেশী উৎপাদন করা যায়—এই তাগিদই বেশী থাকে।

সৃজনাত্মক শিল্পের বেলায় ঠিক উল্টো মনোভাব কাজ করে। শিল্পী আপন অন্তরের প্রেরণায় সৃষ্টি করে। ফলে ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে খরচ, সময়, অপরের চাহিদা মাফিক দ্রব্যের মান, গড়ন, দাম এই সব নির্ধারণের প্রেরণা থাকে না, শিল্পী খেয়াল খুশী মাফিক সৃষ্টি করে এবং নিজের কল্পনাকে পরিপূর্ণ রূপদান করতে সচেষ্ট থাকে। উৎপাদনাত্মক শিল্পে তৃপ্তি নির্ভর করে অর্থাগমের উপর, সৃজনাত্মক শিল্পে তৃপ্তি সৃজনেই এবং অপরের প্রশংসায়।

আবার দেখা যায়, শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে যা নির্মাণ করেছে তা জনসাধারণের রুচিকে উন্নত করেছে। নিত্য নূতন চাহিদাও সৃষ্টি করছে। যেমন ফুলদানী কার্পেট, কাপড় ইত্যাদির নক্সা, ফুলদানী, দোয়াতদানী চেয়ার টেবিল জলের কুঁজো ইত্যাদির গড়ন—এ সব ক্ষেত্রে শিল্পীই নিত্য নূতন সৃষ্টি করে নূতন নূতন চাহিদাও সৃষ্টি করে। কাজেই উভয় প্রকার শিল্পই পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

মনস্তত্ত্ব ও সৃজনেচ্ছা

মনস্তত্ত্ব নামে যে আধুনিক শাস্ত্র শিক্ষাক্ষেত্রে এত ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে তাতে সৃজনেচ্ছাকে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলা হ'য়েছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের সকল কর্মের মূলে আছে লিবিডোপ্রবাহ। আমরা সাদা বাংলায় তার যাই নাম দিইনা কেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইতর প্রাণী থেকে সুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই সৃষ্টি করার আকাঙ্খা বর্তমান। কেউ সে বিষয়ে সচেতন, কেউ অচেতন।

মানুষের বেলায় এই আকাঙ্খা বিচিত্র রূপ নেয়। মানুষ সৃষ্টি করতে চায় কেন—এর জবাব পাওয়া শক্ত। আমাদের এ পৃথিবী বড় নিষ্করুণ। মানুষ এখানে জন্মায়, বর্দ্ধিত হয় অবশেষে একদিনে অস্তিমলোকে যাত্রা করে। কাল সবই হরণ করে। এই যে মানুষের জীবনে বিরাট প্রবাহ, প্রবাহ হিসাবে অস্তিত্ব থাকলেই ব্যক্তিগত সকল পরিচয় বিলুপ্ত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এমন কিছু করে

যা এই প্রবাহকে বৈশিষ্ট্য দান করে। সকল মানুষেরই কামনা—সে যেন মৃত্যুর পর স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায়। স্মৃতিতে অক্ষয় হ'য়ে থাকার বাসনাতেই মানুষ সৃষ্টি করে চলে।

ছোট শিশুটি থেকে আরম্ভ ক'রে শতবর্ষ বৃদ্ধের মনে একই প্রক্রিয়া কাজ করে চলে। ছোট শিশুরা, কিশোর ও যুবকরা হয়ত পরলোক চিন্তা করেন না—কিন্তু সৃজন করার ইচ্ছায় সকলেরই মন উদ্বেল হ'য়ে থাকে। এই পৃথিবী তো অনেক সুন্দরই আছে, কিন্তু আরও একটু সুন্দর করে দিয়ে যেতে চায় সবাই।

"ধরণীর তলে গগনের ছায়
সাগরের জলে অরুণা চায়
আর একটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব "

যদিও কবির ভাষায় কবির মনের ইচ্ছে এতে প্রকাশিত, কিন্তু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই পৃথিবীতে আর একটু রঙের বাহার লাগিয়ে যাবার ইচ্ছে সকলেরই। ছোট্ট শিশুটি বার বার কেঁদে জানায় সে আছে, বালক বালিকারা কত কল্পনার জাল বুনে চলেছে—কি করে তাদের কীর্তির কথা সবাই জানতে পারে, তাই জগতের নৌকা জলে ভাসাবার আগে—

"লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ী কোন্ গ্রাম
মোটা মোটা ক'রে বড় অক্ষরে
যতনে লাইন টানি।'

যারা কিশোর কিশোরী তাদের তো কথাই নেই,—'

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা
মোদের মাঝে সঞ্চরে।'

উৎসাহে টগ্‌বগ্ তরুণ—সে কখনো বা 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা' লড়তে চায় আবার কখনো বা 'পথিক গভীর গভীর রাত্রিনী' হ'তে চায়। মানুষ যত পরিণামের দিকে চলতে থাকে ততই বেঁচে থাকা রেখে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে ওঠে।

এই যে মানুষের কিছু না কিছু করার ইচ্ছে, কিছু না কিছু হওয়ার ইচ্ছে এ শুধু নিছক কর্মহীন কল্পনা বিলাস নয়। শুধু বসে বসে মুখে যারা সৌধ নির্মাণ করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না। বরং পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, বেঁচে থাকা, টিকে থাকা, সমাজে পরিচিত হওয়ার, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এক চিরন্তন প্রতিযোগিতা—সর্বক্ষণ, সর্বত্র। এ প্রতিযোগিতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে। এ প্রতিযোগিতা কখনও সচেতন ভাবে, কখনও অচেতন ভাবে। এই যে সৃষ্টি করার এষণা একে পরিপুষ্ট ক'রে রূপদান করেছে আরও কতকগুলি উপাদান। মানুষের প্রতিভা তার মধ্যে অন্যতম। তা ছাড়া কল্পনা শক্তি, অনুকরণ ক্ষমতা, দৈহিক সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, তৃপ্তি, তৃপ্তিজনিত আনন্দ, সমাজ স্বীকৃতি এসব নানা উপাদান তো আছেই।

মানুষ প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কাজ করে। কাজ করা মানেই কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন। এই অভিজ্ঞতা মনের দুয়ারে দু রকম রূপে এসে হাজির হয়—হয় সুখকর অথবা বেদনাদায়ক। যে কাজে সফলতা আছে, সমাজ স্বীকৃতি আছে, আবেগের পরিতৃপ্তি আছে সেই কাজের সুখকর অভিজ্ঞতা আমাদের পরবর্তী কাজে নিয়োজিত হবার অনুপ্রেরণা যোগায়। যাতে তা নেই তা আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে বর্জনের চেষ্টা করে থাকি।

মানুষের কর্মধারা বড় বিচিত্র। মস্তিষ্কের সৃজন শক্তি ও হাতের কর্মক্ষমতা অসীম। এই দুটির সমন্বয়ে মানুষ পৃথিবীতে এত বিপুল পরিমাণ সৃষ্টি করেছে যা ভাবলে অবাক হতে হয়। একই জিনিস কত অসংখ্য আকারে নিত্য নূতন সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নাই।

আমাদের কাজ বিদ্যালয় সীমায়। বিদ্যালয়ে যাদের আনাগোনা তারা সবাই শিশু, কিশোর, কিশোরী। এদের সঙ্গে বয়স্কদের অনেক তফাত। বয়স্করা হয়ত বুদ্ধির লড়াইএ নিত্য নূতন সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পায়, কেউ রাজনীতি, কেউ সাহিত্য, কেউ গণিত, কেউ রসায়ন কেউ বা ঈশ্বর চিন্তা করেন। শিশুরা

কিন্তু তা চাইনা। পৃথিবীর সাথে পরিচয় এদের সবে সুরু হয়েছে। এদের দেহের ছোট ছোট পেশীগুলি, ছোট ছোট আঙুলগুলি কিছু করার জন্য উদগ্রীব; "Their muscles cry for exercise." এদের কাছে নিছক বুদ্ধির চর্চা শাস্তি বিশেষ।

এই কথাটি মনে রাখতে পারলে বিদ্যালয়ে সৃজনাত্মক কাজকর্ম রাখার প্রয়োজনীয়তা কি—তা বোঝা যাবে।

শিশুর কাজকর্ম আচার ব্যবহার লক্ষ্য করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। খুব ছোট অবস্থার কথা ছোটার পর বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত শিশু মনে করে, যা চাওয়া যায় তাই তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। যা ইচ্ছা করা যায় তাই হওয়া যায়। শিশু হয়ত বলে "রসগোল্লা খাব।" কিন্তু রসগোল্লা যে বাড়ীতে থাকে না, দোকানে থাকে, অথবা নাও পাওয়া যেতে পারে—এত সব কথা সে বোঝে না। যা আকাঙ্ক্ষা তার সংগে সংগে পরিতৃপ্তি চাই। এর সংগে না পাওয়ার ক্ষোভ জনিত যে প্রতিক্রিয়া—তা হ'ল ধ্বংস করে ফেলা। তাই হামেশা যার বলতে শোনা যায়—'ভুই মরে যা' 'তুমি মর' ইত্যাদি।

এর পরবর্তী স্তরে শিশু খানিকটা অভিযোজিত (adjusted) হয়। বাস্তব পরিস্থিতি ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য করতে শেখে। তার ছোট দেহটির জন্য যেমন নানা উপকরণ চায়, তেমনি ছোট ছোট আঙুল নানা কাজ করে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

এর পরবর্তী পর্য্যায়ে অনুকরণের ঝোঁক যায়ে। তিন চার বছর থেকে বেশ কয়েক বছর পর্য্যন্ত তা থাকে। চোখের সামনে যা দেখে, যা ভাল লাগে তাই করতে চায়। কল্পনা থাকে অত্যন্ত প্রবল। যা কিছু আঁকে যা কিছু গড়ে তাকে নিজে যা ভেবেছে তাই হয়েছে বলে মনে করে নেয়। একটা গোল এঁকে হয়ত তখুনি বলে রসগোল্লা। দু'দিন পর হয়ত বলে মানুষের মাথা। একটা কাদার ডেলা বানিয়ে বলে হয়ত গাড়ী। এই সময় চোখে যা দেখে তার থেকে মনে যা ভাবে তার প্রাধান্য বেশী।

এর পরের স্তর হ'ল—চোখে যা দেখে তেমনি গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টা। সাধারণতঃ ৮-৯ বছর থেকে প্রাক্ কৈশোর পর্য্যন্ত এই মানসিকতা বজায় থাকে। এখন কল্পনা অতটা প্রবল থাকে না। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও বাইরের প্রকৃতির দিকে নজর পড়ে। তাই দেখা যায় এই বয়সের ছেলে মেয়েদের সৃষ্টির পিছনে কাহিনী থাকে কম। তারপর আসে কৈশোর। এ যুগকে বলা হয় রোমান্সের যুগ। এতকাল যা করেছে—তাকে ছেলে মানুষী বলে মনে হয়। দৈহিক সামর্থ্য সম্বন্ধে বেশ আস্থা এসে যায়, আর কাজকর্মের মধ্যে পরিকল্পনা, যুক্তি, উচ্চ আদর্শ, কঠোর শ্রমশীলতা ও ভাবাবেগ প্রবল হয়।

শিক্ষককে বিদ্যালয়ে বয়সানুযায়ী কাজ পরিচালনা করতে হ'তে পারে। শিশুর বয়স ও তার চাহিদা সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত থাকা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, সৃজনাত্মক শিল্পের মধ্য দিয়ে কল্পনা মুক্ত হয়, আগ্রহ ধরা পড়ে, শিশুর রুচি ও মনোভাব ধরা পড়ে, ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। কাজেই বিদ্যালয়ে কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়

॥ অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত ॥

যুগন্ধর মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব এসে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাবলোকটিতে নতুন এক রসসঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই সেই যুগের বাংলা কাব্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু। তাঁর আবেগ-গভীর ভক্তিময় ব্যক্তিত্ব সমস্ত বাঙালী-মনকে যেন মুগ্ধ ক'রে দিয়ে বাঙালী-মননের ধারাটিকেই অন্য একটি খাতে বইতে দিয়েছিলেন,—যে-ধারায় তাঁরই ভাবজীবনের সুগভীর প্রভাব সমস্ত ভারতের মনগুলিকে বাংলার দিকে টেনে এনেছিল। তাঁরই ভাবসমুদ্রের অতল তলে অবগাহন ক'রে গ'ড়ে উঠলো নতুন বৈষ্ণব দর্শনের মহাকাব্য শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীচৈতন্য দেব তাঁর ভাবগভীর ভগবদ্-উপলব্ধি ও দিব্যোন্মাদী ভাবসাধনার দ্বারা বাঙালীর রসোপলব্ধিকে ভাগ্রত ক'রে যে-অপরূপ জীবন বোধ সঞ্চার করেছিলেন, তাঁরই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত হলো অভিনব চরিত সাহিত্য। মানবরস সাহিত্য-চেতনার মূলসূত্র হচ্ছিল বলেই চৈতন্যদেবের জীবনী-সাহিত্য গ'ড়ে উঠলো; এবং এই মানবজীবনবোধ তীব্রতর হওয়ার ফলেই রসচাঞ্চল্যময় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্ভব, এ-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই মহাপুরুষের দিব্য আবির্ভাব বাঙালীর আত্মস্বরূপ আবিষ্কারে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি সাহায্য করেছে মানবরস সমৃদ্ধ সাহিত্য-রচনার ভাবলোক সৃষ্টি করতে। ভক্তি ও প্রেমের সমন্বয় ঘটেছে শ্রীচৈতন্যদেবে; এবং এই সমন্বয়ের দ্বারাই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবলোক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

তাঁর সাধনার জীবন যেন বাঙালীর নতুন অধ্যাত্ম-বোধের সংগোপন রসচৈতন্যকেও জাগ্রত ক'রে দিয়েছিল। তাই সম্ভব হয়েছিল এমনি অপরূপ পদাবলী সাহিত্যের গীতিলোক সৃষ্টির; সম্ভব হয়েছিল সাধনা ও সংগীতের একই সংগমের অবগাহন করবার। চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর ভাব-চেতনার সেদিন নব-জন্মান্তর ঘটলো। কিন্তু তা হ'লেও বাঙালী চিত্তের ভাবলোকে 'বামালী' প্রভৃতি অবলম্বনে একটি আবেগের মনোভাবের যে-বীজ ছিল, তা দূর হ'তে অনেক সময় লেগেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রাধাকৃষ্ণ লীলার যে একটি গ্রামীণ দিক ছিল, তা' বামালী প্রভৃতি জনসংগীতকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে ছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের দর্শনমূলক জ্ঞানচর্চার প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর এই গ্রামীণ দিকটি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরাও মানবীয় ভাবের প্রেম-প্রীতিকে অন্তরের একমাত্র মূলধন ক'রে আধ্যাত্মিক ভাবের কাব্যরূপায়ণ দিয়েছেন; এই ধরণের ভাবলোক-সৃষ্টিতে পরকীয় রসতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিরা তো একমাত্র মানুষকেই তাঁদের উপাস্য ক'রে নিয়ে কাব্যসাধনার জীবন-ভাবনায় অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাই যে-সুর দ্বিজ চণ্ডীদাসের কাব্য বীণায় বেজে উঠেছিল—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—তাই এসে ভারত চন্দ্রের ছন্দে ছন্দবেশিনী দেবতার মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয়েছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবলোকে এই মানব-চেতনাই আবরণ নিয়ে একটি অপরূপ গীতিরস রক্ষিত হ'য়ে আছে।

মধ্যযুগে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভাবলোককে একটি সুগভীর মানবতাবোধ অত্যন্ত প্রকট ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বলেই রাজনৈতিক এবং সমাজ নৈতিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাংস্কৃতিক জীবন-বিকাশের একটি ছায়া এসে পড়েছিল। দুই জাতির মধ্যে প্রাথমিক ধর্মান্ধতার উগ্রতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল, এবং

হিন্দুরা রাজকর্মের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন। কাব্যরচনার ভাবলোকে সেদিন যে-সংস্কৃতির বীজ উপ্ত হয়েছিল, এবং সে-বীজের গর্ভকোষ থেকে যে-বনস্পতির উদ্ভব ঘটেছিল, তার ছায়ায় বসে মুসলমান শাসকবর্গ হিন্দু কবির রচিত রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালী গান যেমন একান্ত মনে শুনেছিলেন, তেমনি তাদের বিভিন্ন উপাধিতেও ভূষিত করেছিলেন। এইজন্যই হিন্দুকবি বিজয়গুপ্তের ছন্দবাণীতে ধ্বনিত হয়,—'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।'

আমাদের এ-ধারণা একেবারেই অমূলক হবে না যে, মুসলমান কবিরা হিন্দুধর্ম ও পূজা পার্বণের সঙ্গে মিশে-যাওয়া লৌকিক দেবতার কাহিনী সমূহকে নিজেদের ধর্মীয় নিষেধাত্মক দিকগুলোকে মনে করেই গ্রহণ করেন; এক গোরক্ষ বিজয় নিয়ে কেউ কেউ লিখেছেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে লৌকিক দিকই বেশি। এই জন্যই তখনকার বাংলা সাহিত্যের যুগধর্মকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা সামাজিক কাহিনীকে তাঁদের কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য ক'রে স্বধর্মী মনের পরিচয় দিয়েছেন। রোমান্স-রসসিক্ত উপাদানের সঙ্গে মানবিক আবেদন মিশিয়ে দেওয়াই তাঁদের বিশিষ্ট কাব্যধর্ম। হিন্দুসংস্কৃতির দেবতা-কেন্দ্রিক কাহিনীকে পরিহার ক'রে অনেক মুসলমান কবি যে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন, সে কেবল হয়েছে তাঁদের গীতি-প্রবণতার জন্য। রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে তাঁদের কবি-হৃদয়ের বিরহ-মিলনের হাসিঅশ্রুময় অনুভূতিকেই মুক্ত করে দিয়েছেন মাত্র। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে হৃদয়-অনুভবের যে গীতিময়তা আছে, তাকেই তাঁরা কবি-মানসের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তা'ছাড়া যুগধর্মকেও তারা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তবু এই দিয়েই এই যুগের কাব্যভাবনালোকে একটি সংস্কৃতি-সমন্বয়ের উজ্জ্বল দিগন্তকে তাঁরা সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

যে-বৈষ্ণব সাধনার ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত চলে আসছিল, সেই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ঘূর্ণন পথ দিয়ে সহজিয়া সাধন-প্রণালী-সম্বলিত দেহকেন্দ্রিক সাধনার স্রোত বইতে আরম্ভ করলো। বাঙালীর মর্মমূলে অনার্য যুগের যে-দেহতান্ত্রিকতার সুর তার গোপন অস্তিত্বকে লালন ক'রে আসছিল, এবং যার প্রকাশ ঘটেছিল চর্যার যুগে, নাথধর্মে এবং বৌদ্ধ মহাযানের বিভিন্ন মিশ্রিতরূপে—পলাশীর যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার সংকটলগ্নে তারই প্রকাশ ঘটলো যেন আবার। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শেষাংশের ভাবভূমিতে আদিম ভাবনার যেন সূত্রপাত ঘটলো এই ভাবে; এবং এই পথের ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করেই যেন উদ্ভূত হ'লো আদিরসাশ্রিত তর্জা, কবি আখড়াই প্রভৃতি গানগুলি। উচ্চতর সাহিত্য চর্যার ভাবলোকটি ধীরে ধীরে জন-মানবের সামনে ম্লান হ'য়ে যেতে লাগলো। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে একদিকে বাঙালীর সমাজ-জীবন, অন্যদিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিকাশ মানতার মূলদেশে আঘাত করলো। বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সমাজ-জীবনের অধিবাসীরা এক বিষবাষ্পবাহী বিকৃত পরিবেশে নিষ্কপায়তার বেদনা বুকে নিয়ে দিন যাপন করতে লাগলো। বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আদর্শ পরবর্তী যুগের ধারা প্রবাহে যেমন নাথধর্মে দেখা দিয়েছিল, তেমনি এবার এই যুগে নতুন করে দেখা দিল বৈষ্ণব সহজিয়া বাউল সংগীতের রসধারায়। ভারতচন্দ্রের পরে নতুন এক রাষ্ট্রীয় ঝড়ের ঝাপটায় বাংলার ইতিহাস তখন প্রাচীন ঐতিহ্যমূলী সক্রিয় প্রেরণা দিতে পারেনি বলে সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ভিন্নতর রূপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভাবভূমি সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান উপকরণ জুগিয়েছে ভাগবত সাহিত্যের রসধারা। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' থেকে যে রসপ্রবাহ ভাগবতাচার্য রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী' পর্যন্ত যে গতি পথটিকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল, তার রসধারা উনিশ শতকের মাটিকেও সিক্ত করেছে দেখতে পাই। বঙ্কিম চন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র', নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্য প্রভৃতি সে ধারারই ফলশ্রুতি।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যের ভাবলোকে প্রেমই যে কেন্দ্রীয় ভাববস্তু; চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রেমের মধ্য দিয়েই যেন জীবনের মূল কথা

উচ্চারিত হয়েছে। মনসা মঙ্গলে বেহুলা লখীন্দরের মধ্যে একটি প্রেমের বন্ধন আছে, যেমন আছে চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি খুল্লনার মধ্যে। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় তো প্রেমই মূল উপজীব্য। এই প্রেমই সেখানে জীবনরস সঞ্চার করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবিক প্রেমাকুলতার আবরণে আধ্যাত্মিক সাধনার শুচিশ্রী পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনাও প্রেমের সাধনা। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের যে হলাদিনী শক্তি, সেও এক উচ্চতর প্রেমাভিভূতি। এই প্রেমের মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মরস ও জীবন রসের একটি উজ্জ্বল সমন্বিত রূপকে প্রত্যক্ষ করি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে।

পুরাণকে অনুসরণ করেই মনে হয় এই যুগের সাহিত্যে নারী-প্রকৃতিরও দুটি রূপ এসেছে। বিভিন্ন পুরাণে দেখতে পাই রাধার প্রেমিকারূপ, এবং কল্যাণী কমলারূপে। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যেও যমুনাতীরে কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা অভিসারিণী রাধাকে আমরা যেমন দেখি, তেমনি দেখি বাৎসল্যরসসিক্তা মাতৃরূপ। মঙ্গল কাব্যে অন্নদার শুভঙ্করী রূপকেও প্রত্যক্ষ করি।

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে দেখতে পাই বিপুল প্রতিভাধর কবি ভারতচন্দ্রকে। তাঁর মধ্যেই যেন যুগ-ধর্মের সঙ্গে আধুনিকত্বের বীজ ছিল। কবি মুকুন্দরাম মানব-চরিত্রকে দেখেছিলেন বাস্তব রসের সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণে, আর ভারতচন্দ্র সেই মধ্যযুগের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে মানব-চরিত্রকে দেখেছেন জীবনের প্রতি এক অসন্তোষকে লালন করে। জীবনের পথে বহু দিক দিয়ে দুঃসহ আঘাত পেয়ে যন্ত্রণাদিষ্ট হৃদয়ে তিনি যেন জীবনকে এক ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁর চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে কোনো জীবন-প্রত্যয়ের সুর নেই। সেই সন্ধিযুগের ভাঙনের মূলে ভোগবিলাসের উজ্জ্বল দীপ্তি নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল। জীবনের কঠোর ও বহুবিচিত্র রূপকে রাজসভার নাগরবৃত্তির মধ্যে থেকে কবির পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না, হয়তো দেখার জন্য তিনি উন্মুখও ছিলেন না। সেই জন্যই জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যের জীবনরসকে সুতীব্র ব্যঙ্গরসে পরিণতি দিয়েছে। ভক্তির কোনো ইংগিত তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। একবার মাত্র কবি দেবীর অন্নদাত্রী-রূপা মূর্তির মধ্যে সেই সমকালীন অন্তঃসারশূন্য দারিদ্র-লাঞ্ছিত বাঙালীর আবাঞ্ছিত দেবসাক্ষাৎকার অন্নদায়িনী মূর্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন। সামাজিক পরিবেশ খুঁজতে গিয়ে তাঁর জীবনরস নাগরীগণের পতিনিন্দায় পৌঁছে একটু অশ্লীল হ'য়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু সেই সামাজিক অবক্ষয়ের দিনে এই রসিকতার দ্বারা অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কাছে সে-যুগে হয়তো কটুস্বাদ দিতে পারেনি। এই জন্য দেবতারাও রসিকতা ভোগ করতেই যেন ভারত চন্দ্রের কাব্য জগতে নেমে এসেছেন। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের জবানীতে ভোগবাহুল্যের ছবি এঁকে যেমন ভোগের কবি, মঙ্গল কাব্যের ধর্মীয় কাহিনীর আবেষ্টনীতে ভারতচন্দ্র তেমনি ভোগের কবি। ভোগরাগের রাগিকতা ছড়িয়ে তিনি সম্ভোগ-চিত্রের পট আঁকতেই যেন নিজের যুগচ্ছন্দ প্রতিভাকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে সামগ্রিক রূপের চেয়ে রেখাচিত্রের প্রাধান্য বেশি; কারণ জীবনকে ব্যঙ্গ করতে গেলে পরিপূর্ণ রূপ তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গনিপুণ আবেগহীন ভাষার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। আবেগ শুধু তাঁর নায়িকার রূপবর্ণনার সময়টিতে। দৈবী-শক্তির প্রতি তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস যে শিথিল হ'য়ে গিয়েছে ভারতচন্দ্রই তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে সেই স্বাক্ষর চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। মর্ত্যপ্রীতিময় কামনা-প্রকাশই তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্য; নতুন যুগের মানবতাবোধের সুরও তিনি শুনিয়েছেন। তাই ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের ভূমিকা রচনার কবি বলে আমরা অভিহিত করতে পারি; এবং তিনি তাঁর কবিকর্ম সমাধা করেছেন বাংলা সাহিত্যের একটি সন্ধিস্তরে দাঁড়িয়ে। সেই যুগের শেষ ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসাধনার প্রান্তসীমায় এসে শেষ হয়েছে। মধুসূদন, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনারও তাঁর কাব্য-উৎসবের আনন্দচ্ছটা এসে পড়েছে। আধুনিক যুগের প্রভাত তারকার আলোক-ইংগিত ভারতচন্দ্রের কাব্যগগনের ললাট সীমায় রেখা দিয়েছে যুগান্তের রূপচ্ছটা নিয়ে।

পরবর্তী যুগে বাংলা ছন্দে যে-রূপবৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তারও প্রাথমিক স্রষ্টা কবি ভারতচন্দ্র। সেই পয়ার ত্রিপদীর একঘেঁয়েমোর দিনগুলিতে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্পর্শ দিয়ে সংস্কৃত ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কৃতিকে বাংলা ছন্দের ভাবরাজ্যে মোহনীয় ক'রে তুললেন। ভারতচন্দ্র তাই মধ্যযুগের সাহিত্যালোকে প্রথম শ্রেণীর কারিগর।

এই মানবরসেরই ছায়া পড়েছে অষ্টাদশ শতকের শাক্ত সংগীতগুলিতে। আগমনী, বিজয়ার গানগুলিতে যে-মাতৃহৃদয়ের বেদনা নির্ঝর ধারার মতো উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে, সেইগুলিতে তৎকালীন সমাজ-চেতনার সঙ্গে যে-ভক্তিবাদ এসে মিশেছে তা' একটি নতুন ভাবলোককে পুষ্ট করে তুলেছে। সেই ভাবলোকে যেমন সংসারের মাতৃহৃদয়ের অপরূপ বাৎসল্য-রসের সুধা সঞ্চয়, তেমনি বাস্তব-জীবনের সমস্ত দুঃখবেদনাও সংগীত-লোকে এক মাতৃনির্ভরতার একটি শুচিশ্রী গড়ে তুলেছে। কবিসাধক রামপ্রসাদ যখন বলেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
দুখে দুখে জনম গেল, আর কত দুখ দাও দেখি তাই।
আগে পিছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা
বাজার মিলাই।

তখন যে তাঁর ভক্তিসমৃদ্ধ হৃদয়লোকের সমস্ত কথা রাষ্ট্রীয় সংকটের বিপর্যয়কর নৈরাজ্যবাদের মধ্যেই গুমরে উঠেছে, এ অস্বীকার করার উপায় নেই। অধ্যাত্মলোকের পথচারী হ'য়েও অন্তরের গানের অধ্যাত্মব্যঞ্জনা দিয়ে রামপ্রসাদ যে সেদিনকার বাঙালীর দৈন্যপীড়িত জীবনের সমাজ-সচেতন পীড়নের সে-কথা মেনে নিতেই হ'বে। একদিকে অন্তরে ভক্তির আবেগ, অন্যদিকে গৃহচারী-জীবনের উদাসীন পদচারণার সমাজ-বেদনাকে বুকে বহন ক'রে অপূর্ব উদ্বেলতাবে ভক্তিমূলক শক্তির চর্যার প্রকাশ করার মধ্যেই মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে দণ্ডায়মান কবিসাধক রামপ্রসাদের পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত হয়েছে। এই ভাবেই সমাজ-চেতনার দিক সাহিত্যালোকে ক্রমপ্রসারী হ'য়ে উঠেছে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে উনিশ শতকে এই সমাজ-সচেতনতাই সাহিত্যের গঠন কর্মে নতুন প্রেরণা দান করেছে। যুগসন্ধির-সংকটময় পথের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়ে নবযুগের ঊষালোকিত রাজপথে নতুন সৌধরচনার উপাদান জুগিয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাবলোক এমনিভাবে নবযুগের দ্বারোদ্ঘাটনের মঙ্গল কর্মটি সমাধা ক'রে গিয়েছে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ঐরূপ জন্ম তো লীলা। সকলের সব প্রাকৃত জন্মকে দিব্য জন্মে গড়িয়া তুলিয়া সেই জন্মের মাঝে নিজকে "ন"-রূপে লুকাইয়া রাখিয়া জন্মের স্বয়ংমূলা রস-আস্বাদন দানের জন্য সদা জাগ্রত; "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"—"বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতঃ"—"মদ্ভাব"-পদের ভাব-পদের অর্থ 'জন্ম'—পুরুষোত্তম জন্মে জন্ম গ্রহণই জীবের দিব্য জন্ম। 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন) অপ্রাণঃ [জীবের সর্ব্ব প্রাণ চেষ্টাকে, সব প্রাণ চঞ্চল ক্রিয়া শক্তিকে অব্যাহত রাখিয়া, তাহাদের উপর 'নিগ্রহ' না চালাইয়া তাহার ভিতর "ন"-রূপে লুকাইয়া যিনি সকল প্রাণ চেষ্টাকে পুরুষোত্তমমুখী করিতেছেন, তিনিই প্রাণবন্ধন অপ্রাণ] অমনাঃ [মনের যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তির পূর্ণত্ব বিধান করিয়া, পূর্ণকাম—আত্মকামরূপে যিনি সকল মননের ভিতর "ন" রূপে নিজকে মুছিয়া ফেলিয়াছেন; পুরুষোত্তম জন্মের যেপে সব অমর, প্রাণ মন সব পুরুষোত্তমাংশ নাতন] হি [বলিয়াই] শুভ্রো [নির্ম্মল, ঝক ঝকে; যে পুরুষোত্তম অগ্নির মাঝে এতদিনের শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ-উপাধি ও মনঃ-উপাধি হজম হইয়া গিয়া দিব্যত্ব লাভ করিয়াছে, লীলাক্ষেত্র রচনা করিয়াছে তিনিই শুভ্র; যা-কিছু হজম না হইবে, তাহাই মলিনতার সৃষ্টি করিবে, কেননা নষ্ট তো আর প্রাণ মন অনন্ত কালেও হইবে না, থাকিবে শুধু নিগৃহীত হইয়া ভিতরে ভিতরে বুকভরা বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া খুব গোপনে লুকায়িত অবস্থায়, অনুকূল দেশকাল সংযোগে পুনঃ ক্রিয়াশীল হইবার সুযোগের জন্য।] হি [অতএব] অক্ষরাৎ [কূটস্থ অক্ষর হইতে; যদি অক্ষর অর্থে ক্ষরের নিষেধ করাই হইয়া থাকে, তবে কিছুতেই সে অক্ষর হইতে ক্ষরের কোনও বাস্তব পারমার্থিক জন্ম দু'দণ্ডের তরেও সমন্বিত হইবে না। এমন অক্ষরের সৃষ্টি তখন বাস্তবিক 'উপাধি' অধ্যাস মাত্র। কিন্তু উপনিষদে যে সব দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সহজ অর্থ ধরিলে কি স্পষ্টই দেখা যায় না যে, উপনিষদ্ অক্ষর হইতেই সৃষ্টির জন্মগাথা বাচ্যার্থেই স্বীকার করিতেছেন। এ সৃষ্টি যদি অক্ষরাদ্ভুত, পূর্ণ, অনন্ত তবে অক্ষরের অর্থ কি দাঁড়াইবে? যাহার ক্ষরণ নাই, তাহার ক্ষরণ কি ভাবে সমন্বিত হইবে? ইহারই মীমাংসার জন্য অক্ষরের অর্থ সম্প্রসারিত করিবার জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"—তোমরা যদি অক্ষরকে static ধরিয়া লও, তাবের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ঐরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও নাই। কেন না ঐ পথ শুধুই বিশ্লেষণাত্মক, ব্যতিরেক, বিয়োগ পথ, নেতি নেতি মূলক। ওপথে সংশ্লেষণ, অন্বয় সংযোগ সিদ্ধ হয় না। "নেতি নেতি"-মূলক অক্ষর শুধুই negative। অক্ষরের এই negative অর্থের উপর দাঁড়াইয়া ইহাকে flexible করিয়া সৃষ্টির জন্য হইবার উপযোগী গড়িয়া তুলিবার জন্য বলিতেছেন—অক্ষরাৎ [অক্ষর হইতে] পরতঃ [অক্ষরের পর পরমাত্মা হইতে; 'অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'—গীতা; এই পরমাত্মা অক্ষরের অনধীন স্বভাব হইতে পর উত্তমপুরুষ, অত পরমাত্মা।

উত্তম পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥

গীতা ১৫।১৭

কূটস্থ অক্ষর [static হইতে] অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা; ইনি অক্ষর স্বভাব থাকিয়াও ক্ষরিত হইলেন, অক্ষরের "নিছক অর্থ" করণ নাই যাহার—পরিত্যাগ করিয়া ক্ষর-অক্ষর সমন্বয় করিয়া লোকত্রয়ে আবিষ্ট হইয়া লোকত্রয় বিশেষ ভাবে ভরণ করিতেছেন, তিনি অব্যয়, ঈশ্বর। এখানে যদি কূটস্থ অক্ষর হইতে অনেকদূর নমনীয়তা (flexibility) বেশী পরিমাণে প্রকট হইয়াছে, তথাপি 'ঈশ্বর' থাকার জন্য একটা পৃথক অস্তিত্ব রাখিয়া জগতের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিতেছেন, জগতীয় বিশ্বের মাঝে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহারই পুত্ররূপে না জন্মিলে যে ক্ষরণ ধর্ম্মের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, তাই পুরুষোত্তম রূপই। পরতঃ [অক্ষরের পর পরমাত্মা হইতেও] পরঃ [এই 'পর' পুরুষই পুরুষোত্তম; গীতায় এই পরবর্ত্তী স্তর স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রথম পুরুষ ক্ষর সর্ব্বভূত; দ্বিতীয় পুরুষ কূটস্থ অক্ষর, তৃতীয় পুরুষ উত্তমপুরুষ পরমাত্মা, চতুর্থ পুরুষ পুরুষোত্তম, যেখানে সকলের সব অহংমূর্ত্ত।

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

ব্রহ্ম-পরমাত্মা ভগবান, গীতায় গুহ্য-গুহ্যতর-গুহ্যতম ভেদে চারিটী পৃথক পৃথক স্তর, অথচ ইহারা অক্ষরেরই আস্বাদনের স্তর ভেদমাত্র। অক্ষরকে ভিত্তি না করিয়া পরমাত্মা ভগবান্ কিছু দাঁড়াইবেন না। তাই উপনিষদ সর্ব্বসাধারণ 'অক্ষর' শব্দ দ্বারাই এই স্তর-ভেদের আখ্যাত করিয়াছেন। অক্ষরের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দিবার জন্য এখানে বলা হইয়াছে—'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'—বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অক্ষর ব্রহ্মকে বলিয়াছেন—পুরুষোত্তমের 'তনুজা', পরমাত্মা পুরুষোত্তমের অংশ বৈভব। ফল কথা দাঁড়াইতেছে যে, কর্তৃতন্ত্র হইয়া বিশ্ব আলোচনা করিলে বিশ্ব জড় ছাড়া আর কিছু নয়, কাজেই জড়াতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি? কেননা, বিশ্বের কোন বস্তুই তো নিছক জড় বা নিছক চৈতন্য নয়, জড়-চৈতন্য মাখামাখি; কিন্তু জড় চৈতন্যের এই সম্মিলন তো ব্যাখ্যা হয় না যখন জড়-চৈতন্য সম্পূর্ণ বিপরীত; তাই এই সম্মিলনের (যাহা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতেছি অথচ যুক্তিতে মেলেনা) ব্যাখ্যার জন্য একটী অনাদি অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে ad hoc hypothesis রূপে মানিয়া জড়-চৈতন্যের একটা গোঁজামিল ব্যাখ্যা করিয়াছে; গোঁজামিল তো আর মিলন নয়। তাই শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে যতদিন অজ্ঞানতা থাকিবে ততদিন গোঁজামিল দিতেই হইবে, যখন জ্ঞান আসিবে তখন গোঁজামিল আর থাকিবে না, ফুটিয়া উঠিবে জড় চৈতন্যের বৈপরীত্য দর্শন বা বিবেক। আমাদের বক্তব্য যে, এই সমস্ত আলোচনাই কর্তৃতন্ত্র; কর্তৃতন্ত্র বলিয়াই জড়-চৈতন্য ভেদ পাকা হইয়াছে; একবার ঐ ভেদ পাকা হইলে পর বিবর্ত্ত বাদীদের যুক্তি অকাট্য; কিন্তু গোঁজামিল তো তোমরাই ad hoc hypothesis মানিয়া দিয়াছ। জড়-চৈতন্য ভেদের আর এক স্তর পিছনে পুরুষোত্তম তত্ত্বের স্তরে চল, দেখিবে জড়-চৈতন্য এক; চৈতন্য জড়েরই ঘন, সমস্ত জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোনও চৈতন্য নাই। কর্তৃতন্ত্র চৈতন্য জড়েরই এক সূক্ষ্মতম বিকাশ। তোমার যাহা কূটস্থ ব্রহ্ম, উহা পুরুষোত্তমের তুলনায় অব্যাকৃত অক্ষর প্রকৃতির স্তরই বটে। এই হিসাবে অক্ষর-অর্থে অব্যাকৃত ধরিয়া পরতঃ অক্ষরাৎ [অব্যাকৃত পর অক্ষর হইতে পরঃ [অক্ষর পুরুষোত্তম]—এই অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হয়।

যেহেতু তিনি সর্ব্ব মূর্ত্তি বর্জ্জিত ও সর্ব্ব মূর্ত্তি সমন্বিত পুরুষ অন্তর-বাহির পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান, সেই জন্য তিনি অজ; অপ্রাণ, অমন বলিয়া তিনি শুদ্ধ, সেই জন্যই কূটস্থ অক্ষর হইতে পর পরমাত্মা, তাহা হইতেও পর পুরুষোত্তম অথবা পর অব্যাকৃত হইতে পর অক্ষর ব্রহ্ম। ২।১।২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥৩

'অপ্রাণ অমন'—প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পাছে ভুল হয় যে উহারা বুঝি উপাধি মাত্র, তাহারই নিরাকরণ জন্য শ্রুতি স্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে—এতস্মাৎ [এই জীবন্ত অক্ষর হইতে

জায়তে [জাত হয়] প্রাণঃ [পুরুষোত্তম প্রাণের বিন্দুলিঙ্গ সমান ক্ষুদ্র প্রাণ] মনঃ [সত্য বাস্তব পারমার্থিক মন] সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ [এবং সকল ইন্দ্রিয়; বৃত্তাকীর্ণা এই সব বৃত্তিই তো রাসক্রীড়ার কৃতার্থা ; ভাগবতিতত্ত্ব লাভে ধন্য] খং [আকাশ ; গীতার সব অপরা প্রকৃতি ও পুরুষোত্তমের লীলা ক্ষেত্র রচনার কারণ ; আকাশ যোগাইয়াছে প্রতি বৈচিত্র্যের মাঝে অবকাশ, ছিদ্র, যেখানে বিরাজমান সর্ব্বব্যাপক জীবন] বায়ুঃ [বায়ু করিতেছে যাদন কর্ম্ম ; অন্তরের বায়ুকে বাহিরে, বাহিরের বায়ুকে অন্তরে, প্রত্যেকের জীবনকে প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে বুনিয়া দেওয়া রাসক্রীড়াদনী সংগঠনকর বায়ুর বিশেষ কর্ম্ম] জ্যোতিঃ [অগ্নি ; আগ্নি যোগাইতেছে সকলের সব ভেদ, সব কাম, সব কর্ম্ম হজম করিবার সামর্থ্য ; অগ্নি দিতেছেন অগ্রসর হইবার শক্তি] আপঃ [জল যোগাইতেছে সকলের রস, সকলের মাঝে গলিয়া যাইবার কৌশল, যাহার ফলে শিশু রচনা সম্ভব হইতে পারে] পৃথিবী [ক্ষিতি ; যেখানে আসিয়া সব তত্ত্ব জমাট বাঁধিবে] বিশ্বস্য ধারিণী [বিশ্বের আধারভূতা ; এই পৃথিবীই "প্রথমং ভাবনং স্থানম্"—ভাগবত ; এই পৃথিবীর কোলেই পুরুষোত্তমের ক্রীড়াময় রূপের রাসক্রীড়ার পরম স্থান ; পৃথিবীই ব্রহ্মকে জন্মদান করিয়া, কোলে করিয়া বিশ্বের ধারিণী ; পুরুষোত্তমেই পৃথিবীর জন্ম, পৃথিবীতেই আবার ঘন করিয়া পুরুষোত্তমের জন্ম—দুইয়ের মাঝে দুইয়ের জন্মলীলাস্বাদনরত পুরুষই ধন্য। আকাশ-বায়ু অগ্নি-জল-পৃথিবী আত্মার খোসাও নয়, জিবড়েও নয়, ইহারা অক্ষরের রূপমূর্ত্তি। পূর্ণ, সনাতন, অব্যয়, অক্ষয়, অমর।

এই অক্ষর হইতে প্রাণ, মন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়, খ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী জাত হয়। ২।১।৩

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪

স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বিত মদনমোহন পুরুষোত্তম-রূপের বিশ্বরূপের দিক্ খুলিয়া বলিতেছেন। বিশ্বরূপহীন শুধু স্বরূপের উপলব্ধির বাড়ে 'মদন' ; কেন না বিশ্বরূপকে হজম না করিয়া ইহার অনিত্যত্ব-দুঃখময়ত্ব প্রভৃতি হেয়গুণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যতই না ঘুরে ঘুরে সরিয়া ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিতে চেষ্টা করি না কেন, ইন্দ্রিয় কি ছাড়িয়া দিবে ? এই বিশ্বরূপকে সকল দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি দিয়া, শুধু আত্মতত্ত্বের ভিতর দিয়া, মদন করিয়া অন্তস্বরূপের সহিত সামঞ্জস্য করিলেই না মদন মোহিত হইবে ? ভাবিলে কি হইবে "আমি বিশ্বময়" যতদূর সম্ভব বিশ্বময় ঘুরিয়া, বিশ্বজোড়া কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে বিশ্বরূপ প্রদান করিয়া, আগ্রহ রাখিয়া "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য" তোমাকে মাধুকরী করিতে হইবে, মধু সংগ্রহ করিতে হইবে মধুসূদনের সেবার জন্য। পুরুষোত্তমমূল হইয়া বিশ্বময় সর্ব্বেন্দ্রিয়কে ছড়াইয়া দিলে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মরূপ মদন শিশুর মত ক্রীড়া করিতে করিতে তোমার চরণতলে মূর্চ্ছিত হইবে, ঘন হইবে, ঘুমাইয়া পড়িবে, মদনমোহন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া বাহির হইবে, তখনই সত্য সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার হইবে ; বিশ্বের রস হইতে বঞ্চিত করিয়া কর্ত্তৃত্ব সাধনার তুমি বল বল করিয়া ঠেলাঠেলি করিলেও ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইবে না। বিশ্বরূপের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলে ভাবিতে হইবে, যাহা ভাবিলাম তাহাকে ক্রিয়ার মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্ররূপে সকলের মধ্য দিয়া জমাইয়া তুলিতে হইবে) অগ্নিঃ [অগ্নি ; অর্থাৎ দ্যুলোক "অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নিঃ"—শ্রুতি] সেই পুরুষোত্তম-রূপের; মূর্দ্ধা [মস্তক] চক্ষুষী [চক্ষুদ্বয়] চন্দ্রসূর্য্যৌ [চন্দ্র এবং সূর্য্য] দিশঃ [দিকসমূহ] শ্রোত্রে [কর্ণদ্বয়] বাক্ বিবৃতাঃ চ [এবং উদ্ঘাটিত বাক্য] বেদাঃ [বেদসমূহ] বায়ুঃ [বায়ু] প্রাণঃ [প্রাণ] হৃদয়ম্ [হৃদয়] অস্য [পুরুষোত্তম বিশ্বরূপের] বিশ্বম্ [বিশ্ব ; এই বিশ্ব তাঁহার বলিয়া, সকল বুক নিংড়াইয়া পাওয়া ধন এই বিশ্ব] পদ্ভ্যাং [যাহার পাদদ্বয় হইতে] পৃথিবী [পৃথিবী জাত হয়] এষঃ হি [ইনিই] সর্ব্বভূতান্তরাত্মা [সর্ব্বভূতের অন্তর-বাহিরের আত্মা, অন্তর অর্থ দূরও হয়, সর্ব্বভূতের নিগৃহীত প্রাণের হাহাকার শান্ত করিবার জন্য পুরুষোত্তম আজ সর্ব্বভূতের সর্ব্ববিধ দাবী পূরণের জন্য প্রতি বাষ্টি

শিবকে পরস্পরের সঙ্গে মিলাইয়া সহস্রশীর্ষ রূপ দিয়া দ্যুলোকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া, চক্ষুকে সমষ্টি চক্ষু ঐ চন্দ্র-সূর্য্যের গৌরবে গৌরবমণ্ডিত করিয়া, সমগ্র সৃষ্টিরূপ ফুটাইয়া, প্রতি শ্রোত্রকে সকল দিকে বিশ্বের বাণী সংগ্রহের জন্য প্রেরিত করিয়া, সকল বাক্যকে বিশ্বের উদ্‌ঘাটিত বিজ্ঞান রসাস্বাদনের সমগ্রভাবে উন্মনা করিয়া, প্রতি বায়ু প্রাণকে বায়ুর মতন সকল প্রাণকে বুনিয়া প্রাণসঙ্ঘ তৈয়ার করিবার সাধনায় ক্ষিপ্ত করিয়া, সমগ্র বিশ্বকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিবার হৃদয় বেদনায় আতুর করিয়া, প্রতি পাদক্ষেপকে বিশ্বময় ছুটাইয়া দিয়া সর্ব্বভূতকে অন্তরে বাহিরে পাইয়া তাহার অন্তরাত্মা বানাইয়া তুলিবার জন্য স্বরূপবন বিশ্বরূপ ক্রীড়াকৃত। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি; পুরুষোত্তম সাধর্ম্য লাভ মানুষের জীবনের চরম পরম সৌভাগ্য।]

যাহার মস্তক দ্যুলোক চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, কর্ণ দিক্ সমূহ, প্রকটিত বাক্য বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, হৃদয় ব্যাপার এই বিশ্ব, যাহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ২।১।৪

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াম্
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ৫৫

পুরুষোত্তমকে প্রথম মন্ত্রে সমগ্রভাবে বর্ণনা করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহার স্বরূপের বর্ণনা দিয়া, তৃতীয়-চতুর্থ মন্ত্রে বিশ্বরূপের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত এই মন্ত্রে তাঁহাকে আরও জীবনের নিকট, প্রাকৃত মানুষের জন্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (direct relation) স্থাপন করিবার জন্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নি বিদ্যার পুরুষোত্তমত্বপক্ষ বলিতেছেন—তস্মাৎ [তাহা হইতে] অগ্নিঃ [প্রজাগণের অবস্থাবিশেষ রূপ দ্যুলোকস্থ অগ্নি; ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীতে অগ্নি-দৃষ্টি করিতে হইবে, এই অগ্নিগুলিতে একটীর পর একটী করিয়া হোম করিয়া জীব সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। এই পঞ্চাগ্নিক্রমে যাহারা জাত, তাহারাও যে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমজাত, শ্রুতি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন; জীবজন্মও পুরুষোত্তমের অবাধসিদ্ধ, ইহা উপনিষৎ প্রতিপাদ্য সত্য] সমিধঃ [সমিৎ স্থানীয়] যস্য [যে অগ্নির] সূর্য্যঃ [সূর্য্য] সোমাৎ [চন্দ্র হইতে] পর্জন্যঃ [মেঘ] (তাহা হইতে) পৃথিব্যাম্ [পৃথিবীতে] ওষধয়ঃ [ওষধিসমূহ] (জাত হয়) পুমান্ [পুরুষ] রেতঃ [শুক্র] সিঞ্চতি [সিঞ্চন করে] যোষিতায়াম্ [স্ত্রীতে] (এইরূপে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধক্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিপূর্ণ ভাবে বজায় রাখিয়া) বহ্বীঃ [বহু] প্রজাঃ [জীব সমূহ] সম্প্রসূতাঃ [সমুৎপন্ন হয়] সৃষ্টি চক্রের এই ঊর্দ্ধ-অধঃ ক্রমের মাঝেও তিনি সকলের জন্মের গোড়ায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম কিছুই যে জন্মের আদি হইবার যোগ্য নয়, শুধু কর্ত্তৃত্বতাই যে জন্মের মূল হইতে পুরুষোত্তমকে সরাইয়া দিয়া অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছে, এবং কর্ত্তৃমূল সৃষ্টির স্থলে পুরুষোত্তম-মূল স্থাপন করিলেই যে সৃষ্টি স্রষ্টারই মত সত্য, পারমার্থিক, সনাতন হয়, শ্রুতি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। পুরুষোত্তম-মূল সংসারে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম যোগায় রস; তাহারা সেখানে হেয় নয়, পরম উপাদেয়। পঞ্চাগ্নির মধ্যে যিনি এক পুরুষোত্তম-অগ্নি, সেখানেই সব জন্ম গ্রহণ জন্ম-লীলা রস উদ্‌ঘাটিত।

পরমপুরুষ হইতে দ্যুলোকস্থ অগ্নিজাত হয় যাহার ইন্ধন সূর্য্য (দ্যুলোকসম্ভূত) চন্দ্র হইতে মেঘ, (মেঘ হইতে) পৃথিবীতে ওষধি সকল জাত হয়। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ সেবা করে। এই রূপ পরমপুরুষ হইতে বহু প্রজা সমুৎপন্ন হয়। ২।১।৫

ক্রমশঃ

সমন্বয়ের আদর্শ ও আদর্শ সমন্বয়

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

সমন্বয়ের আদর্শ অতিশয় মান্য; কিন্তু মান্য বলেই তা দুরূহও বটে। পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সমন্বয়, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন, প্রাচীন পৃথিবী ও আধুনিক পৃথিবীর ভাবধারার মধ্যে গ্রন্থিবিন্যাস—এ সব কথা শুনতে খুবই ভালো, কিন্তু বাস্তব জীবনে এই আদর্শকে রূপায়িত করতে গেলে বোঝা যায় কাজটি কত কঠিন। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ের আদর্শের একজন প্রধান উদ্গাতা ছিলেন। আমাদের দেশের অন্যান্য মহাপুরুষ ও পুরাতাত্ত্বিকেরাও নানা ছাঁদে ও নানা ভঙ্গীতে সমন্বয়ের মহিমা কীর্তন করে গেছেন। ভারত ইতিহাসের যেটি মূল তত্ত্ব বলে কথিত এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে আমাদের সর্বপ্রধান জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন—'বিভেদের মধ্যে ঐক্য 'Unity in Diversity'—তারও মূলে নিহিত আছে সমন্বয়ের এই শ্রেষ্ঠের আদর্শ। সব কিছুরই ভালো এবং সব সূত্র থেকেই ভালো গ্রহণ করতে গেলে প্রচুর শক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সব জাতি বা সব মানুষের এই ক্ষমতা থাকে না। আমাদের ভারতীয় সাধক ও ঋষিগণ আমাদের সামনে এই মহৎ অথচ কঠিন আদর্শ ই রেখে গেছেন জীবনাচরণের জন্য।

সমন্বয়ের আদর্শ কঠিন এই জন্য যে, সব কিছু সূত্র থেকে এবং প্রতি বস্তু বা ভাব বা রীতি থেকে শুধুমাত্র ভালোটুকু নিষ্কাশন করে তাকে একটি অখণ্ড রূপ দিতে গেলে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। সমন্বয়-প্রয়াসী যে মন, সে মনের বৈচিত্র্যমুখী না হলে চলে না। স্বভাবতঃই তাকে বিচিত্রের অভিসারী ও নানা রসসন্ধানী হতে হয়। কিছুটা স্থিতিস্থাপকত্ব ও নমনীয়তাও এইরূপ চিত্তবৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নমনীয় মানে এ নয় যে, তা সহজেই অপরের প্রভাবাধীন হয়ে পড়বে। এই নমনীয়তায় বা স্থিতিস্থাপকতায় যা মন্দ বা অগ্রহণীয় তার সঙ্গে যদ্ধা করা বোঝায় না। কথায় কথায় আপস করা এর ধর্ম নয়। এ সমন্বয় আসলে নির্বাচনপন্থী এবং কেবল-মাত্র ভালোটুকুরই কারবারী। 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" এ নীর থেকে শুধু ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করে। আরিস্টটল অথিত 'The Golden Mean বা আমাদের বৌদ্ধশাস্ত্র-কথিত 'মজ্ঝিমনিকায়' বা মধ্যপথ সমন্বয়ের একেবারে গোড়াকার কথা।

সমন্বয়ের আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁদের মন কতকটা একরৈখিকমুখী। 'Single-track mind—এর যোগুণ সুবিধা অসুবিধার তাঁরা অধীন। তাঁদের ধাতটিকে বলা যেতে পারে 'প্রান্তীয়' ধাত। অর্থাৎ সব-কিছু থেকে ভালোটুকু মাত্র গ্রহণ কিংবা নীর থেকে ক্ষীর-টুকু মাত্র আহরণ তাঁদের ধাতে পোষায় না। অত ধৈর্য তাঁদের স্বভাবে নেই। তাঁরা হয় এ প্রান্তে চলেন, নয় তো তার বিপরীত প্রান্তে চলেন। মধ্য পথ ধরে চলা তাঁদের অভ্যাস নয়। কোনো একটি মতাদর্শ বা ভাবাদর্শকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা তাকে পুরোপুরি ভাবেই গ্রহণ করেন, তার অনেকখানি ফেলে কিছুটা নেন না বা কিছুটা ফেলে অনেকখানি গ্রহণ করেন না। বিভিন্ন সূত্র থেকে কেবলমাত্র ভালোটুকু নিয়ে একটি নিটোল বা পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ গড়ে তোলার ধৈর্য তাঁদের নেই। তাঁরা নূতন ও পুরাতন, বর্তমান ও অতীত, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য—এই জাতীয় সমন্বয়ী মিলন চান না; তাঁদের মনের ঝোঁকটাই এ রকম যে, হয় তাঁরা প্রাচীনকে গ্রহণ করেন নয় তাঁরা আধুনিককে গ্রহণ করেন, হয় তাঁরা পাশ্চাত্ত্যকে বরণ করেন নয় তাঁরা প্রাচ্যাদর্শ বরণ করেন—দুইয়ের মিলনে একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার উৎসাহ তাঁদের স্পষ্টতঃই কম বা অনুপস্থিত। অনেক কিছু ভালোর সামঞ্জস্যে একটি অখণ্ড জীবনদৃষ্টি নির্মাণে সমন্বয়ী মনের যে

স্বাভাবিক স্ফূর্তি, সেই স্ফূর্তি থেকে একবগ্গা মন স্পষ্টতঃই বঞ্চিত। এ মন "সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে" কামনা করে না; এ মন ঘরের কাছের কূপের জল পান করেই তৃপ্ত। ঘাটে ঘাটে বিচরণ করে পুণ্যবারি সকলে মঙ্গলঘট ভরে তোলার সময় নেই এ মনের; এ মন বাঁধা ঘাটের জল সকলেই সন্তুষ্ট।

একবর্ত্মাভিমুখী বা সমন্বয়বিমুখ মনের যেমন কতকগুলি অপূর্ণতা আছে তেমন কতকগুলি সুবিধাও আছে। এ মনকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয় না। নানা বিরুদ্ধ বা বিষম প্রবৃত্তির ঘাত-সংঘাতকে সমন্বয়ের মধ্যে মন্থন করে তোলার যে সুকঠিন সাধনা, সেই সাধনার দুঃসহ পরীক্ষার যন্ত্রণা একে ভুগতে হয় না। বিভিন্ন বিরোধী চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের যে আদর্শের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থে প্রচার করেছেন এবং তাঁর প্রবর্তিত অনুশীলন তত্ত্বের যা মূল ভিত্তিস্বরূপ, সে আদর্শ বৈচিত্র্যের অভিমুখে পথনির্দেশ করে এবং বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের উপরই বিশেষ জোর দেয়। এই বিচিত্রমুখের সাধনা যে কী কঠিন তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। দুটি মতাদর্শকে এক সূত্রে গ্রথিত করে ওই মিশ্রণ থেকে একটি অমিশ্র মনোভাব ফুটিয়ে তুলতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়; আর এ তো একাধিক চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ। তা-ও সব চিত্তবৃত্তি সমপ্রকৃতির নয়; বিষম, বিসদৃশ, এমনকি বিপরীত প্রবৃত্তিও আছে। এই সব পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিগুলিকে একটি যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রাণে মেলানো যে কী কঠিন ব্যাপার তা সহজেই অনুমান করা চলে।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রকৃতি এক নয় বরং এই দুইকে বিপরীত গুণসম্পন্ন বলা চলে। কিন্তু দুইয়ের যৌগিক সমন্বয়ে যে জিনিস দাঁড়ায় তা এক অপূর্ব বস্তু—মানুষ ও অন্যান্য সর্ববিধ প্রাণীর জীবনদায়িনী জল। তেমনি, সমন্বয়ের পথ কঠিন হলেও এই পথের শেষে চমৎকার সুফলের আশ্বাস বর্তমান। সমন্বয়ের তপস্যা অতীব কঠোর, কিন্তু তপস্যা সফল হলে অমেয় পূর্ণতা। সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার তৃপ্তিতে তখন মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। জীবনে কিছু সন্তিকারের পাওয়া গেল বলে বোধ হয়—প্রাপ্তির চেতনায় অস্তিত্ব ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে।

এই ঐশ্বর্য-চেতনা থেকে সমন্বয়বিমুখ মন দুর্ভাগ্যভাবেই বঞ্চিত। প্রাচ্যীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁরা প্রবক্তা অথবা অনুগামী তাঁরা একটি আদর্শকে অবলীলাক্রমে এবং অনিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে গিয়ে ওই বিশেষ আদর্শটিকে পুরোপুরিভাবে পান বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক কিছু হারান। কী তাঁরা হারান তা তাঁরা নিজেরাও জানেন না। ধরুন, যে মন পাশ্চাত্ত্য মার্ক্সীয় তত্ত্বকেই জীবনপথে চলার একমাত্র তত্ত্ব বলে গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী স্বীয় জীবনের ছাঁচটিকে গড়ে তুলেছেন, তিনি ওই সুদৃঢ় বিশ্বাসের সূত্রে কিছু পান বটে এবং অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-সংঘাত থেকেও যে তিনি রক্ষা পান সে কথাও ঠিক; কিন্তু তিনি কি ভারতীয়তার বলয়ে কে স্পষ্টই আপনাকে রক্ষিত করেন না? ভারতের নিজস্ব সাধনার ধারার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত আছে সেই সত্যের আস্বাদনজনিত তৃপ্তি বা সন্তোষ তাঁর ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। শ্রেণীবিদ্বেষের অসন্তোষ ও গ্লানিতে তাঁর চিত্ত পরিপূরিত হয়ে ওঠে; প্রেমের অমৃত পথ তাঁর অজানাই থেকে যায় প্রকৃত পক্ষে। অনুরূপ ভাবে বলতে গেলে যে মন শুধু ভারতের সনাতন ঐতিহ্যপুষ্ট হয়েই জীবনপথে চলবার প্রয়াসী এবং ওই ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন মতবাদকে আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন তিনিও অনেক-কিছু সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত থাকেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের মধ্যে যে গতিচাঞ্চল্য, সক্রীয়তা, কর্মিষ্ঠতা এবং বিশেষ করে মার্ক্সীয় তত্ত্বের মধ্যে যে সাম্যের বাণী অন্তর্নিহিত আছে তার সুফল তিনি পান না। ভারতীয় সাধনার ধারার মধ্যে ধ্যানপ্রবণতাকে বড্ড বেশী জোর দেওয়া হয়; অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মধ্যে কর্মবাদের অন্যতমতার। কর্মের আদর্শে সেখানে এতই প্রতিপত্তি ও বাজার দর যে অতিরিক্ত অনুশীলনে—অনুশীলনে তা আর শুধু তত্ত্ববাদ নয় ভোগবাদে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের ভোগবাদের পিঠে প্রাচ্যের ভোগবিমুখতা; আবার প্রাচ্যের নিষ্ক্রিয়ত

ও আনন্দের পিঠে পাশ্চাত্যের জীবনধর্মী প্রাণচাঞ্চল্য। একদিকে দার্শনিক আত্মসমাহিতি; অন্যদিকে কর্মচক্রের নিয়ত-বিঘূর্ণন ও অশান্ত বিক্ষেপ। প্রাচ্যের মানসিকতায় সাম্যের সাধনা ক্ষীণ; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ভাব-মানসে সাম্যতত্ত্ব ওতপ্রোত। আমাদের দেশে জাতিভেদ তথা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ আষ্টেপৃষ্ঠে সমাজকে বেঁধে রেখেছে; পাশ্চাত্যের ভাব-পরিমণ্ডলের ভিতর মানবতন্ত্রের জয়গাথা আকাশে বাতাসে ঊর্মীয়িত। আমাদের গান্ধীবাদের ভিতর অহিংসার অনুপ্রেরণা; মার্ক্সীয় তত্ত্বে হিংসার মন্ত্রণা। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্বে অর্থনৈতিক সাম্য যতদূর প্রবলভাবে সত্য, গান্ধীবাদে তেমন নয়। গান্ধীবাদ অছি-তত্ত্ব (theory of trusteeship) প্রচার করে ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা রফা করতে চেয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের সন্ন্যাসিতন্ত্রের ভিতর বৈরাগ্যের জয়পতাকা সমুড্ডীন; কৃচ্ছ্রসাধন তথা আত্মনিগ্রহকে সে মোটেই ভয় করে না; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ধর্মচর্চার মধ্যে জীবনমুখীনতা প্রবল। আমাদের জীবন আপাতবিচারে ধর্মকেন্দ্রিক, পাশ্চাত্যের জীবন আপাতবিচারে বিজ্ঞানভিত্তিক তথা রাজনীতি কেন্দ্রিক। আমাদের কৃষি, ওদের শিল্পায়ন। আমরা মূলতঃ শান্তরসের সাধক; ওরা আঘাত-সংঘাত বিক্ষোভময় নাটকীয় রসের সাধক। আমরা ভক্তির রসে ভরপুর; পশ্চিমীরা নিছক ভক্তিতে তৃপ্তি পায় না, জ্ঞানে ও কর্মে তাদের সমধিক স্ফূর্তি।

বর্ণিত বিরুদ্ধগুলির কোনোটিই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয় বা নিখুঁত নয়, বলাই বাহুল্য। বরং প্রত্যেকটি বিরুদ্ধেরই কিছু-না-কিছু ত্রুটী আছে। সুতরাং সেই দুটিকল্পীই অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ বলে মান্য হবার যোগ্য যার ভিতর সব কটি বিরুদ্ধের কেবলমাত্র গুণগুলিরই একত্রালীন সমাহার ঘটেছে। ধর্মের ক্ষেত্রে আজ প্রয়োজন ভাবতপথিক রামমোহন রায়—কথিত "মুক্তি-মুক্তির" আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ; রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের কেবলমাত্র বরণীয় দিকগুলির সুষ্ঠু সামঞ্জস্য-বিধান; অর্থাৎ অহিংসাভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ, অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পায়নের একত্র সমাবেশ; জীবন আচরণে ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের সুচারু সামঞ্জস্য।

এইজাতীয় সমন্বয়ই আমাদের কাম্য। এরূপ সমন্বয়ের নীতিতে জীবন দীক্ষিত ও বর্ধিত হলে সত্তার পরিপূর্ণ সার্থকতা সুনিশ্চিত। কি ব্যক্তির স্তরে কি জাতিগত স্তরে এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই কেবল মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব।

হৃষিকেশে

॥ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

উত্তরে গিরি পূর্বে শৈল, সামনে পাহাড় শ্রেণী
মধ্যে তাহার পরস্রোতে বহে গঙ্গা মুক্ত বেণী।
ঋষিকুণ্ডেতে যমুনার জল
তপঃ প্রবাহে করে টলমল
আবক্ষ নীরে অবগাহি সবে, করিতেছে তর্পন।
সলিল পরশে পবিত্র হ'ল, বাসনাসক্ত মন।

তপোবনে ছোট কুটিরে কুটিরে জ্বলে সাধুদের ধুনী।
হয়ত এখানে লুকায়ে আছেন তপঃ সিদ্ধ মুনি।
মায়া অবিদ্যা দ্বেষা হ'ল শেষ
বোধ মন্ত্রের শোনা যায় রেশ
সত্যের জ্যোতি প্রকাশে যেন যে সকলি জ্যোতির্ময়।
অনাহত সুরে গাহে প্রাণ মন, পরম পুরুষ জয়।

ভাগীরথী হেথা রঙ্গিনী মেয়ে, চলেছে উপলে নাচি।
দু'হাতে ছড়ায়ে মুক্তির ধারা সিকি প্রাচীন প্রাচী।
যুগে যুগে কত ধর্ম জোয়ার
এলো, মিলাইয়া গেল বার বার
কোথা প্রচারক, পরিব্রাজক, ধর্মধ্বজী বীর?
হৃষিকেশ আজো তেমনি অটল ধ্যান-নিমগ্ন শির।

শত তাপ-জ্বালা-জর্জর মন আনো ভাগীরথী তীরে।
পুণ্য শীতল সলিলে নাহিয়া তাপ প্রেমাশ্রু নীরে।
এসো রে ব্যর্থ, এসো কৃতার্থ
ভুল ক্ষণতরে বিশ্ব স্বার্থ
হৃদয়-পদ্ম হবে প্রস্ফুট চাহ অন্তরে ফিরে।
এ যে ঋষিভূমি হৃষিকেশ, হেথা আঁখি মেলে ধীরে ধীরে।

পুস্তক পরিচয়

অবিস্মরণীয় কাহিনী :—লেখক জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক : জীবন বিকাশ প্রকাশনী, ১৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৬। পৃঃ ৭২।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অবিস্মরণীয় কাহিনী' বইটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। কিশোরদের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লেখা তাঁর এই বইটি। সাতটি গল্পে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে। অতীতের বিচিত্র কাহিনী ও ঘটনা কালের প্রভাবে আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। মানুষের স্মৃতি সমক্ষে এগুলো আবার নূতন করে তুলে ধরতে না পারলে হয়ত অতীতের এই স্মৃতিগুলি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। লেখক প্রাচীন যুগে নি মনকে টেনে নিয়ে গিয়ে মন্থন করে এনেছেন এ অবিস্মরণীয় কাহিনীগুলি, রূপ দিয়েছেন সহজ ভাষায় সুন্দর করেই। এই পুস্তকটি কিশোরদের নৈতিক শিক্ষা চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে বলে আমাদের মনে হ কেননা সব গল্পগুলি কিশোরদের উপযোগী করেই লেখা এর মধ্যে রয়েছে তাদের আদর্শ গঠনের একটি ইঙ্গিত ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে থাকে অতীতকে ভিত্তি করে। অতী বিলুপ্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ দাঁড়াবে কিসের উপরে? তা আমরা লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সমর্থ জানাচ্ছি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৪২)

ঠাকুর, বিশ্বমানবের চলিবার জন্য যে-পথ আঁকিয়া দিতে তুমি আসিয়াছিলে, সেই পথে তুমিই প্রথম যাত্রী। ওগো আদি অনাদি যাত্রী, আমিও তোমার সঙ্গে তোমারই পথ বহিয়া চলিব। এ পথ প্রজ্ঞা প্রাণের সমন্বিত, সর্ব-পথের সমন্বিত পথ। এখনও এ পথে যাত্রীসমাগম সুরু হয় নাই। এ যে মহা সংযমের পথ, মহা বৈরাগ্যের পথ, ভোগ ত্যাগের পথ, ত্যাগ ত্যাগেরও পথ। তোমার সঙ্গে তোমার পথে আদি পথিক হইবার সার্থকতা আমাকে প্রদান কর। জানি প্রথম যাত্রীদের পদ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইবে, রক্তাক্ত হইবে, হইতেছিও তাই। তবুও এই পথই সহজ পথ, মহাজনদের পথ, সর্বজন নমস্কৃত পথ। ওগো অগ্রগামী শ্রীনিত্যগোপাল, তোমায় নমস্কার। ৬-৩০এ রেণু গোপা ও কুসুম সহ শিয়ালদহ রওনা হয়।… ঈশউপনিষদের প্রথম মন্ত্রই পাঠ হয়—স্বরূপ বিশ্বরূপের সমন্বয় অংশ। এই সময়েই 'সমন্বয়ে'র ব্যাখ্যা হয়। আজিকার পাঠে কুসুম নাই, বেদনা বোধ হইতেছিল। কে আমার এই বেদনা বুঝিবে? আমি বোধ হয় শিশুদের চেয়েও ভাবপ্রবণ। কুসুম গিয়াছে, গোপার মত আমারও মন খারাপ। আমি তো একান্ত করিয়াই চাহিয়াছি, আরও চাহিব। আমি তো কিছুই দিয়া কাহাকেও দেখি নাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সঙ্গে সমস্বার্থ, সম সুখ-দুঃখ হইয়াই থাকিতে চাই।…

৭ই নভেম্বর

ওগো সমগ্র নিত্যগোপাল, তোমার জীবনে জীব-ঈশ্বরের বিরোধ অবিরোধে গড়িয়া উঠিয়াছে। জীব-ঈশ্বর তোমার জীবনে সখ্যবন্ধনে বদ্ধ—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা', কেবল জীব ও কেবল ঈশ্বর তোমার জীবনে সমন্বিত, তুমিই সর্বসমন্বয়মূর্তি। এই বিশ্ব কেবলের মেলা, এখানে প্রতি অণু পরমাণু কেবল, অথচ কি নিবিড় আকর্ষণ, কি একাত্মতা ইহাদের মধ্যে! একত্ব ও পৃথকত্ব স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, কৈবল্য বজায় রাখিয়া তোমার মাঝে সমন্বিত। তুমি একত্বের মহানির্বাণ, পৃথকত্বেরও আবার তুমিই একত্ব-পৃথকত্ব সমন্বিত। একত্ব পৃথকত্ব যখন একান্ত বিরোধে মগ্ন, তখনই না দুই দুইয়ের রিপু? তখন এই দুইয়ের আকর্ষণই না অবিদ্যা? তাই না শঙ্করের কাছে পৃথকত্ব-জ্ঞান অবিদ্যা এবং বুদ্ধের কাছে একত্বজ্ঞানই অবিদ্যা? তুমিই ব্রহ্ম মীমাংসা। তোমার একও নিত্য, পৃথকও নিত্য। কোথায় রিপু, কোথায় অক্ষ সমগ্রের দেশে? এক ও পৃথক যখন একান্ত পৃথক, তখনই না একটা বিকৃত টানের সৃষ্টি হয় এই মিথ্যাজ্ঞানকে ঘুচাইবার জন্য? সমগ্রের দেশে একত্ব পৃথকত্ব তুল্য সত্য, তুল্যভাবে আস্বাদনীয়।…আজ হইতে কুকারে ভাত রান্না হয়।… একটি কেন্দ্র এখানে গড়িয়া উঠুক, সকলে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করুক, শান্তি পাউক, আশ্রয় লাভ করুক—ইহাই তো চাই। ৭॥০টার পর ঈশ-উপনিষদ পাঠ হয়—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'—অংশ। 'ন কাময়েহহম গতিম ঈশ্বরাৎ পরাম্' শ্লোকটি আস্বাদন করা হয়। কি ঋণের বোঝা লইয়াই না মানুষ চলিয়াছে। কার ধন কে ভোগ করিবে? বিশ্বসম্পদ বিশ্বের সেবায় লাগিবে, আমি সেই প্রসাদ পাইব। 'প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি'। যাহা আমি তাহাকে দিব, তাহা আমার হয়—ভোগের কৌশল ইহাই। ভোক্তা-ভোগ-ভোগ্য যেখানে স্বতন্ত্র,

সেখানেই ভোগ সত্যিকার ভোগ। মাখনবাবু আসেন। মণ্ডলের নিকট হইতে একটা ৪৬৲ টাকার চেক দিয়া যান।

৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ তাই আমি আজিও দাঁড়াইয়া আছি, না হইলে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হইতাম, তুমি শুধু সঙ্গেই নাই, তুমি আমাকে স্নেহ পরশ দিয়া রাখিয়াছ, তাই আমি জ্বলিয়া যাই নাই। যে আগুন আমার চারিদিকে সংসার জ্বালাইয়াছে আমি তো পুড়িয়া খাক হই নাই, আজিও তাজা তরুণ আছি। কাহার গুণে? তোমার পরশ যে আমার গায়ে রহিয়াছে তাই আমি জুড়াইয়াছি। আমার সঙ্গে আছ ইহাই আমার ভরসা, তুমি বর্ত্তমান যুগ গড়িবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছ সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। আমিও তোমার সঙ্গে ছুটিব। আমার আবেষ্টন অনুকূল করিয়া দাও। তোমার প্রতিষ্ঠা আমি চাই-ই, সকালে রেণু বাজারে যায়।.. .....। কালও যে প্রকৃতির মতই অনাদি অনন্ত গীতার অনুক্রমণিকা হইতে সেই অংশ পাঠ হয়। কালের প্রতি অংশও অনন্ত। ভাগবতের সাতদিনে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কথার মধ্যে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে। একটি ক্ষণও অনন্ত, তাই ভাগবৎ তৎক্ষণাৎ, সদ্য প্রকৃতি শব্দপ্রয়োগে বদ্ধবান। কলিকালও অনন্ত। "কৃতাদিষুপ্রজারক্ষন্" শ্লোকটি এবং "ন কামহেতুম্" শ্লোকটিও আস্বাদিত হয়। ভগবানকে পাওয়ার পরিণতি বিশ্বকে পাওয়া, গোলক বিশ্বের বুকেই ঘন। এই ঝড়ের দেশেই উপনিষদ্ প্রচার করিলেন শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিবাদে ভগবান ভক্ত লক্ষ্যরূপে ঘন, বিশ্বরূপে ঘন। একটি জীবকে বাদ দিয়াও ভগবান পাইবার, মুক্তি পাইবার কথা ভাগবৎ বলেন নাই। অক্লিষ্ট সাধনায় নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার কথাই গীতায় আছে। এই সংসারের বুকেই ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, এই সংসারের ওপারে নয় ইহাই গীতার শিক্ষা। আজ আর রাত্রিতে পাঠ হয় না। আজিকার পাঠ ভাল লাগিল। নকুলেশ্বরবাবু (চাকুরিয়া) আসেন। দেবুও আসে। দু একটি নতুন মেয়ে আসে। পরে সুধা আসিয়া ঠাকুরের নিকট গান গায়। অপরিচ্ছিন্নের জন্য পরিচ্ছিন্নের কি কান্না!

৯ই নভেম্বর

ওগো গৌরসুন্দর, তোমার জীবনে রাধার জন্য কৃষ্ণের, কৃষ্ণের জন্য রাধার কান্নার সমাধান হইয়াছিল। তুমি ছিলে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু। তুমিই বর্ত্তমান যুগের শ্রীনিতাগোপাল। তোমার জীবনে সমাধান মিলিয়াছে বিশ্বের সর্ববিধ কান্নার। জড়ের জন্য অজড়ের, অজড়ের জন্য জড়ের, নিত্যের জন্য অনিত্যের এবং অনিত্যের জন্য নিত্যের, জীবের জন্য ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের জন্য জীবের, পরিচ্ছিন্নের জন্য অপরিচ্ছিন্নের, অপরিচ্ছিন্নের জন্য পরিচ্ছিন্নের কি কান্না বিশ্বময় চলিতেছে। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। সকল দ্বন্দ্বের সমাধান তুমি। কিন্তু এই কান্নাই কি থামিবে? কান্নাও যে অনন্ত। সুশীল চ্যাটার্জী ম্যাজিসিয়ান আসেন। তাহার বিভূতি দেখানোর কথা হয়। অনেক বিভূতি তিনি দেখাইতে পারেন। আগুন জ্বালানো, জল আনয়ন করিয়া তাহা নেবানো ইত্যাদি কথা বলেন। আমার বিভূতি নাই, চাইও না। আমি মানুষ মাত্র দুনিয়ার সেবক। প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত সাধারণ মানুষের মত আমি চলিয়াছি। রেণু ১১ টায় বাহির হইয়া ব্যাঙ্কে যায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এ গ্রাহকের টাকা ১৩৮৲ নেয়। নিখিলবাবু, নন্দবাবু হিরেণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে। ইউনিভারসিটিতে সুবোধ বাবুর সঙ্গে দেখা করে, সুধাংশু বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তিনি পাঁচ টাকা মাসিক দিবেন। বাসন্তী বাইন্ডিং-এ যায়, ঢাকেশ্বরীতে ২ রিম কাগজের অর্ডার দেয়, তাহাদের চেক্ দেয়, এম্ বি সরকারের ঘরে এই মাসের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্লক আনে, এদ্ সরকার হইতে টাকা আনে নিউ ইণ্ডিয়া পাবলিসিটি হইতে চেক আনে। দাঁতে ডাক্তারের কাছে গিয়া দাঁত ফেলে, তাহার স্ত্রীর সাথে কথা কয়, তাহারা পাঁচ টাকা মাসিক তো দিবেনই যখন যা পারেন দিবেন। নারীদের সঙ্ঘ গড়িবেন ইহা রেণু বলিয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছাও বোধ হয় তাই, তাই মেয়েরা

ছুটিতেছে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র আজ শেষ হয়। কালিপদবাবু ডাক্তারের স্ত্রী ঠাকুরের জন্ত সুচি পায়েস সন্দেশ দিয়া আসেন। আজ শেষ রাত্রিতে ফাউন্টেন-পেনের কালিটা ঢালাইবার কথা মনে হয়, উহার দ্বারা নিত্যব্রত দাঁড়াইতে পারিবে। এখানেরও অর্থাভাব হইতে পারে। একটি স্থায়ী আয় না থাকিলে চলিতে কষ্ট হইবে। এক পয়সার হিসাব করিয়া বড় কাজ হয় না। রেণুর দ্বারা যে ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে সেখানে ধীরে ধীরে কালি ঢালাইলেই চলিবে। মীনুরও কাজ হইবে। নক্ষত্রাণীর জন্ত সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০ই নভেম্বর

ওগো পুরুষোত্তম, তুমি অবহেলিতা, নিন্দিতা, ধিক্কৃতা পদদলিতা নারী-প্রকৃতিকে মাথার স্থান দিয়া গিয়াছ। তাহার চরণরেণু মস্তকের ভূষণ করিয়াছ। আর কে আছে যাহার শরণ লইব তুমি ছাড়া? পুতনাকে তুমি ধাইমার উচিৎ গতি প্রদান করিয়াছ। শ্রীরাধা তোমারি প্রেমে উন্মাদিনী। তোমার নারীপ্রেমের এই মর্যাদা-দানের মাঝে আমি মহানির্বাণ লাভ করিব। তোমার অযাচিত এই করুণার ভার আমি কেমনে বহিব। আমি তোমার অতলস্পর্শী প্রেমের মাঝে নিজিয়া যাইব। বেশ সকালে আমি ও রেণু বেহালার ট্রামে রওনা হই।···। কালি সম্বন্ধে কথা হয়। নিত্যব্রতের সম্বন্ধেও কথা হয়।... উষারিণী ৪।০টার পর বৃন্দসহ ৮০-এ-তে যায়, পরশু আসিবে। রেণু দিয়া আসে। ঈশোপনিষৎ হইতে দ্বিতীয় মন্ত্রটি আজ পাঠ হয় সাড়ে সাতটার পর। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী আসেন। আমরা আজ চারজন। প্রতিভা, রেণু গোপা ও আমি। হরিগোপালবাবু আসিয়া গ্রাহকের চার টাকা দিয়া যান, তখন নিত্যব্রত ছিল! পাঠ শুনিতে আসিবেন। কিছুটা আলোচনা হয়—পাকিস্তান হওয়ার ভুল, বর্ণাশ্রমের steel frame constitution; গৌরাঙ্গ নামক প্রকৃতির সাধনা; মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতা বর্জন, আমার উপনিষদাদির ভাষ্য লেখার প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রেস হইতে ব্যাপার ৫০০ এবং প্রথম ফর্মার প্রুফ দিয়া যায়। ১১ই নভেম্বর

নিত্যগোপাল, স্বামী আমার, যদস্তু হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। হৃদয়ের এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমার বিশ্ব তোমার বিশ্বে একবিশ্বে গড়িয়া উঠুক। ছুটিতে চাই উন্মাদের মত তোমার সর্বনমস্কারের পথে। কিন্তু চতুর্দিকে খাড়া হইয়া আছে পাথরের দেওয়াল। আমায় পথ করিয়া দাও। তোমার পরশ, তোমার আদর আমার জীবনে সফল হউক। তোমার প্রাণখোলা হাসির মাঝে আমি মহানির্বাণ লাভ করিব। আমি তুমিময় হইব, ইহা আমার সারাজীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তুমি আমি—ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত। সাতটার মধ্যে·· নরেন ব্যানার্জী আসে। তাহাকে উদ্বোধন আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা দেওয়া হয়। নরেন গম্ভীরানন্দজীর শিষ্য বিধুদাদার গুরুভ্রাতা। ৮টার পূর্বে সুবোধ মুখার্জি আসে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যে মেয়েদের জীবনের মানকে উঁচু করিয়া তুলিবার জন্ত তাহা তাহাকে বলা হয়। তাহাকে এই দিক দিয়া প্রবন্ধ দিতে বলি। আমাদের আর্থিক অবস্থার কথাও আলোচনা করি। রেণু ৯টায় বাজারে যায়। প্রতিভা রান্না করে। ৩টার পর বড় বৌ ও বিশ্বনাথ আসে।···পাকিস্তানের কথা, নেহরুর দুরদর্শিতার কথা অনেকক্ষণ আলোচনা হয়।···পাঠের মধ্যে হরিগোপালবাবু তাহার এক বন্ধু আনেন। তাহারা পাঠে যোগদান করেন। ঈশোপনিষদের 'অসুর্য্যানামতে লোকাঃ" মন্ত্র রেণু পাঠ করিতেছিল। 'আত্মহা' অংশ পাঠ হইতেছিল। 'নিবৃত্তচক্ষুঃ উপগিয়মনোৎ" শ্লোকটি আস্বাদন করি। আলোচনা ভাল লাগে। 'প্রাণেন দেব মুনয়োঃ' এবং 'ন কামমেহম্' শ্লোক দুইটিও আস্বাদন করি। পাঠের পরেও ইহাদের সঙ্গে আলোচনা করি। শিশিরবাবুকে গ্রাহক হইতে বলি। আমি শুইয়াছি পর প্রেস হইতে প্রুফ দিয়া যায়। রেণু প্রতিভার উপর খাটুনির খুব চাপ পড়িয়াছে। কি করিয়া কাজে আগাইব ঠাকুর, তুমি পথ করিয়া দাও। আমি সারা জীবন ঘাপ্পা-ঘাপি করিয়াই গেলাম।

১২ই নভেম্বর

ওগো রাধারাণী, পরাণ-পুতলী আমার, বর্ত্তমানে ঘর-ছাড়া মেয়েদের গুরু তুমি, ইষ্ট তুমি; ইহাদের সামনে পুরুষোত্তম পথ পুরুষোত্তম জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা কর যাহাতে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ওগো আলো আলো চিন্ময়ী রাধা আমার, আমার বাঁচিবার সাধ তুমি, তোমাকে পাইয়াই তো বাঁচিবার বাসনা জাগিয়াছে, তোমার জীবন-কথা কহিবার জন্ত ব্রজধামে বসিয়া কত রাত্রি ধরিয়া হিন্দি শিখিতাম। তোমার সেবা করিতে পারিলাম কই? তোমার আসন ঘরে ঘরে রচনা করিতে পারিলে মেয়েরা ঘরে বাহিরে ছড়াইত। ঘরের পরিচ্ছিন্ন আবহাওয়ায় যখন ভারতের মেয়েরা, তখন তুমিই পাশ্চাত্য মেয়েদের ভিতর দিয়া ঘর ছাড়ার আদর্শ তাহাদের ভেতর ধরিলে। তাই তাহারা ঘর ছাড়িয়াছে। কিন্তু পুরুষোত্তম তাদের সামনে কই? তোমার পুরুষোত্তম তাহাদের সামনে স্থাপিত কর। তাহারা স্থির হউক। সকলে ইহারা আশ্রম বর্ম্ম করে। রেণু বাজারে যায় একটু বেলায়।··· উমাঙ্গিনী ১০টার পূর্ব্বে এখানে আসে।··· রেণু ১২টার পর বাহির হইয়া প্রথমে প্রেসে যায়। সেখান হইতে অশোকবাবুর আফিস আমহার্ষ্ট রোডে যায়, সেখান হইতে ব্যাঙ্ক হইয়া আশ্রমে ফেরে। ৮টার একটু পূর্ব্বে অসুর্য্যাম্পশ্যাতে লোকাঃ' মন্ত্রটি আগাগোড়া পাঠ করে রেণু। জড়কে আঘাত করিয়া এ-দেশ আত্মঘাতী হইয়াছে, তাই জড় বিজয় বৈকুণ্ঠে গেলেও জড়ের অভিসম্পাত মাটির জগতে নারায়ণ সমেত আসিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র সত্যের এক প্রান্ত মাটির এই জগৎ, অপর প্রান্ত গোলোক—মাঝখানে ভূর্লোক, স্বর্লোক, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য লোক, তাহার পর ক্ষীরোদ সাগর, গর্ভোদক, কারণার্ণব। কারণার্ণবের পরে বৈকুণ্ঠ-গোলক। ভূর্লোক×গোলোক—পুরুষোত্তমলোক। বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখিয়া যে-কোনও একটীকেই একান্ত' (absolute) করিয়া ফেলিয়াছেন। যে-কোনও একটিকে একান্ত করিয়া দেখাই অসুরত্ব। সমগ্র দৃষ্টির অভাবই তমঃ। 'আমি'র নির্বাণ ছাড়া পুরুষোত্তম-আমিকে আমি বলিয়া উপলব্ধি না করিলে কিছুতেই এই সমগ্র দর্শন লাভ হয় না।··· ১৩ই নভেম্বর

ঠাকুর, রিপুবাদ-অধ্যুষিত এই বিশ্বে আমি তোমাকে বুকে লইয়া একাকী চলিয়াছি। এই পথ যে একান্ত নির্জ্জন, কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম। তুমি অহরহ সঙ্গ দাও বলিয়াই আমি চলিতে পারিতেছি। নইলে কবে এলাইয়া পড়িতাম, মুনড়াইয়া যাইতাম, ধূলায় লুটাইতাম। তুমি আমাকে পথে চলিতে শক্তি দিতেছ। বিশ্বে কে কাহার রিপু? চলিবার ছন্দ না জানিবার ফলে আমি নিজেই নিজের রিপু হই, পেটের অন্নও রিপু হয়। যাত্রাজ্ঞান আমাদের নাই, চলিবার ছন্দ লিখি নাই, তাই না সব আমাদের কপাল-দোষে 'রিপু' হইতে পারিল। তোমার শরণাগত হইলে সবই বন্ধু হইত। তোমার তো কেহ রিপু নাই, আমারই বা কেন থাকিবে? তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক।··উপেন ঘর আসে কিছু সন্দেশ লইয়া সন্ধ্যার সময়। মাসিক ১৲ টাকা সে দিবে।··· ঈশোপনিষৎ পাঠ হয়—'অনেজৎ একং' মন্ত্রটী।··

১৪ই নভেম্বর

সত্যরূপিণী শ্রীরাধা আমার, তুমিই পরা প্রকৃতি তুমিই পরাশক্তি। তোমার জীবনে প্রতিটি অংশ পূর্ণ স্বয়ং, স্বয়ংপূর্ণ এই অংশগুলির কায়ব্যূহ তুমি। তোমাকেই তো জীবনে চাই।···মিত্তর মন্মথনসিংহের দিদিকে-এর কাছে যত বেশী মাসের পারে টাকা পাঠাইতে মিত্তর চিঠি দিল। মিত্তর দাদাকেও পত্র দেওয়া হয়।···মিত্তরে অগ্রহায়ণের প্রথমে অর্থাৎ যত শীঘ্র সম্ভব আসিতে বলা হইল।··· পাঠের মধ্যে শিশির সরকার আসে চারু চ্যাটার্জ্জী পুত্র দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জীকে লইয়া। স্থিতি গতি যে একার নয়, অনেকান্ত, তাহা আলোচনা হয়। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইলে 'সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি সঃ যোগী ময়ি বর্ত্ততে' তখন 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' হইলেও স্থিতি টোটে না, যে তখন স্থিত থাকিয়াও 'ঘূর্ণ-ভ্রমতি"। যে dynamic হইতে পারে না, তাহার স্থিতি ব্রাহ্মী স্থিতি নয়।···যা করে ঠাকুর তাহাই হইবে। অন্ধকারের মধ্যে তিনিই এতবা কোলে করিয়া রাখিয়াছেন।

১৫ই নভেম্ব

ঠাকুর তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হওয়ার পর বি

এক নূতনরূপে আমার জীবনে উদ্ভাসিত হইয়াছে, বিশ্ব মানব যত প্রকার সমস্যায় নিষ্পেষিত, আমি সেখানে একটা সমাধান খুঁজিয়া পাই। পথ তোমার আলোকে আলোকিত হয়। মুক্তির একটা আস্বাদন পাই। তুমি আমার জীবনে মুক্তিদান। কিন্তু এই মুক্তিকে তো আমি কার্য্যোপযোগীরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলাম না। সেই দিক দিয়া তুমি আমার সহায় হও। মুক্তিকে যেন সবল বন্ধনের মাঝে আস্বাদন করিতে পারি।·· ৪-১৫এ পাঠ আরম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন—হরিনারায়ণবাবু, দেবু ও তাহার বন্ধু সুরেনবাবু, কালীপদবাবু, ডাক্তার উপেন ঘর, সত্যেন রায়, জীবন বসুনবার ডাক্তার ও তাহার স্ত্রী। মেয়েরাও কিছু ছিলেন। জীবনবাবুর স্ত্রীর ভাল লাগিয়াছে, রেণুকে বলিয়া গেলেন।···পুরুষোত্তম দর্শনে প্রকৃতি, কাল ও কর্ম 'অনন্ত'। কিন্তু প্রচলিত দর্শনে উহারা কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের পর থাকে না; কাজেই এদেশ প্রকৃতির ক্ষেত্রকে 'সঙ্কুচিত' করিয়া চলিয়াছে এবং এই পথে ladder system ও hierarchy-র সৃষ্টি অনিবার্য্য। ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ না করিলে হঠাৎ তোমার সঙ্কোচ করা চলে না। পরিচ্ছিন্নের সঙ্কোচ করিতে করিতে ক্রমশঃ ভূমার দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল সাধনা। কিন্তু পরিচ্ছিন্নের প্রতি বিদ্বেষ রাখিয়া ভূমার দিকে আগাইলেও পরিচ্ছিন্ন যে পিছন হইতে টানাটানি করে, বাধার সৃষ্টি করে এবং অগ্রসর হইতেই দেয় না এবং পরিচ্ছিন্ন ডিঙাইয়া যে ভূমার আরম্ভ করে, সে ভূমাও যে পরিচ্ছিন্নেরই রূপান্তর মাত্র। পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট মন তাহা আত্মতৃপ্তির খেয়ালে ধরিতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ইহা ধরাইয়া দিয়াছেন, তাই কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বুকে, কালের বেগে যুদ্ধের মত জটিল কুটিল কর্ম্মের ভিতর বেদান্তের অদ্বৈতরস বিশ্বকে পান করাইবার সঙ্কল্প লইয়া অবতীর্ণ হন। আজ ইহাই বলা হয়। আমার যাওয়ার পর কালীপদবাবুর ডাক্তারের স্ত্রী কিছু পায়স ও মুগাদি দিয়া যান। কাল সকলের জন্য পায়স রাখিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে শুইয়া থাকি। ভাল লাগিতেছিল না, কাহাকেও তো আমার প্রাণ বুঝাইতে পারিলাম না। ঠাকুরকে তো কেহ রক্ত মাংসের দেহে দেখিল না। প্রার্থনা করিলাম ঠাকুরকে জীবনে আনিয়া ঠাকুরকে পাওয়ার সাধ কিছুটা মিটাইতে, কিন্তু পারিলাম না।

১৬ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি কায়া আমি তোমার ছায়া। কায়ার সার্থকতা, কায়ার কাজ তুমি করিয়া দিয়াছ, ছায়ার কর্ম, ছায়ার সার্থকতা তো আমি দিতে পারিলাম না। তোমার রক্ত-মাংসের দেহ তো আর কেহ দেখিবে না। কেন লোভ হইল জানি না, আমি ছায়া রূপে তোমার দেহ-প্রাণ-মনকে বিশ্বের সামনে প্রকট করিব। আমার দেহে তোমার প্রকাশ দিবে, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ ফুটিয়া উঠিবে, আমার মনে তোমার মন প্রকট হইবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে, আমার ভালবাসায় তোমার ভালবাসা পাইয়া কৃতার্থ হইবে। আমাকে কি তোমার 'ছায়া' করিয়া নিবে না। তোমার জীবন চিরিয়াছি তো শ্রীরাধা আসিয়াছেন। শ্রীরাধাই আমার লাঞ্ছিত জীবনের সান্ত্বনা, শ্রীরাধাই আমার সান্ত্বনা, শ্রীরাধাকে বুকে লইয়াই তো এই দুর্গম পিচ্ছিল পথে চলিয়াছি। আমার প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা তো কাহাকেও বুঝাইতে পারিলাম না। ওগো সখী আমার, তুমি আমার কথা শোন, ব্যথা বোঝ, আমার চোখের জলে তোমার শ্রীচরণ ধৌত করিব, আমার বেদনা দিয়ে তোমার আরতি করিব, কি আর আমার আছে? আমি জীবনভর খুব কাঁদিলাম, কান্নাই আমার সম্বল। প্রতিভা বাজারে যায়। রেণু ১০টার মধ্যেই খাওয়া সারে। ১১টার পর শেখরবাবু আসে গাড়ী নিয়া। রাইটার্স বিল্ডিং-এ বইগুলি ও বিল দিয়া আসে মনোমোহনবাবুর বেয়ারাকে দিয়া, নিখিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে। প্রেস সিণ্ডিকেট, ওয়াণ্টার টম্পসন-এ ফোন করে। সুবোধবাবুর ওখানে যায়। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে ১২৲ টাকা আনে। ইলেকট্রিক বিল দিয়া আসে। আভার কাছে একটা বই রেজিষ্ট্রী করে। দাঁতের ডাক্তারের ওখানে যায়, আবার যায়, দাঁত নিয়া আসে। কমলালয়ে যায়, ২০৲ টাকা আনে। মালিক ও পাবলিসিটি অফিসার-এর

সঙ্গে কথা কয়। গোপার জন্ত কমলাকান্তটার ও একটা ফ্লানেলের ফ্রক আনে। রেণু ফেরে প্রায় ৮টায়। ৭-৪০-এ আমি বাহির হইতে ট্রাম রাস্তার দিকে যাই, বড় রাস্তার নিকট দেখা হয়। ইহাদের বুদ্ধি-বিবেচনার কথা কি আর বলিব? ১১।০টার পর গিয়াছে, ফিরিল রাত্রি ৮টায়। কলিকাতার পথ ঘাট, আর একটী মেয়ে মানুষ। কি দায়িত্ব আমার উপর ইহাদের জন্ত, তাহা কে বুঝিবে? আমি তো প্রাণপণ করিলাম ইহাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, পারিলাম না। আজ আর সন্ধ্যার পরের পাঠ হয় নাই, কালও হয় নাই রবিবার বলিয়া। নিত্যব্রত সন্ধ্যার পর ৩টী কাঁসীর দোয়াত দিয়া যায়, আর লেভেলগুলি ও বাক্সগুলি।…

১৭ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার স্বামী—দেহের স্বামী, প্রাণের স্বামী, মনের স্বামী, বিজ্ঞানের স্বামী, আনন্দের স্বামী, আত্মার স্বামী। তুমি সখারূপে কত কথা আমার কানে কানে বলিয়াছ, আর আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেই প্রাণময়ী কথা তো বিশ্বে শুনাইতে পারি নাই। প্রকাশ সভায় ১৪ হইতে ১৫ হাজার বক্তৃতা দিয়াছি, সভার বাহিরে লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে কত কথাই বলিয়াছি, কিন্তু তোমার কথা তো শুনাইতে পারি নাই। বড় বেদনা রহিল। আমি পথের ধূলির চেয়েও দীনহীন, রিক্ত, নিঃস্ব—তবুও তো তোমাকে সখা সাথী বলিয়া ডাকিতে সাধ হয়। তুমিই আমার লাঞ্ছিত জীবনের সান্ত্বনা, আমার কল্পনার ধন।… সন্ধ্যার পর যখন পাঠ আরম্ভ হয়, তখন জয়া ও রেণু আসে।…পাঠের মধ্যে 'মনঃবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহম্' এটী ব্যাখ্যা করা হয়। "মনের সঙ্গে 'আমি'র আটকাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করে 'বিবেক'—আত্মা তখনই দেহের সঙ্গে একাত্ম হয় যখন দেহের মধ্যে অনন্ত দেহের সমন্বয় হয়।'—দ্রৌপদীর দেহ নয়নরঞ্জনকারী বলিয়াই দ্রৌপদী সতী। যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্রৌপদীর যে দেহ, ভীমের কাছে সে দেহ নয়'।—ইত্যাদি আলোচনা হয়। অনেকগুলি মন্ত্রটী পাঠ হয়। রেণু আসিয়া জয়াকে লইয়া যায়, জয়া গোপার জন্ত একটী জামা ও প্যাণ্ট আনে। আমি সকলেরই সংসারের পথ ও সন্ন্যাসের পথ খোলা রাখিয়াছি। কাহাকেও সংসারের মধ্য হইতে কাড়িয়া আনি নাই, রেণুকে আনি নাই, প্রতিভাকেও আনি নাই, কাহাকেও না। আমার যাবার স্থান নাই, পথই আমার স্থান। কেহ আমাকে নিবে না, আমি যে নিত্য অভিমুক্ত। পুত্র কন্তাদের যদি অগ্রগতি অব্যাহত থাকিত, আমার দেওয়া দুঃখ আশীর্ব্বাদরূপে গৃহীত হইত। কিন্তু আজ তাহা অভিযোগের বিষয় হইয়াছে। সত্যই তো আমার কাছে তাহারা কিছুই খাওয়া পরা পায় নাই। তবে সত্যব্রত বর্ত্তমান দুর্য্যোগের মধ্যে যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কর্ম্মে আগাইয়া যাইতে চায়, তাহা আমার সঙ্গে থাকিবারই ফল, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যাহা হউক আমি একাই চলিব। ঠাকুরকে বুকে করিয়া থাকিব—ইহাই আমার সান্ত্বনা। ১৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, আমার গর্ব্ব করিবার কি আর আছে তুমি ছাড়া? আমার বাঁচিয়া থাকিবার সান্ত্বনা তুমি, সার্থকতা তুমি। তোমার জীবন ও দর্শনের স্পর্শ পাইয়াছি বলিয়াই না আমার বাঁচিবার সাধ। স্বামী আমার, তোমার চরণে লাগিয়া রহিব, তুমি বলিয়া যাইব। আমার মন-বুদ্ধি অহঙ্কারের নির্বাণ তোমাতে হউক। মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহম্—আমি আর ইহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আমার বিশ্বের ও তোমার বিচার করিব না। তোমার বুদ্ধি তোমার বিচার করিতে পারে। ওগো আমার 'আমি' তুমিই আমার পরম আমি: তোমার জীবন হইতে রাধারাণীর প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছি। বিশ্বের পশ্চাতে একটি কান্নার প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, তুমি সেই কান্নার মূরতি; কান্না দিয়া তোমার তনু গড়া। এই কান্না বেদের প্রাণ। বেদনার মূরতি তুমি তাই বেদময়ী। তুমি বেদমাতার গায়ত্রী। ৮টায় অন্নদা প্রসাদ রায় চৌধুরী (কৃষক প্রজা মজদুর) আসেন…আমাদের দর্শন সম্বন্ধে কথা হয়…বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধ্যায় আসেন। তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরমত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে ফেলিয়া না রাখিতে বারবার বলি।… ১৯শে নভেম্বর

ওগো অনন্ত, নিত্য, অনির্বচনীয়, চির অধর, এ বিশ্ব তোমার বাহুতে পরিপূর্ণ; কি এক মদিরা বিশ্বের অণু-পরমাণুতে তুমি ঢালিয়া রাখিয়াছ, যাহা পান করিয়া বিশ্বের জীববৃন্দ মাতালের মত নেশায় বিভোর হইয়া চলিয়াছে, তোমার অনির্বচনীয় লীলা কি এক নেশা আমার জীবনে সৃষ্টি করিয়াছে। এ বিশ্বে প্রতিটি কণা শান্ত অনন্ত। ফুরাইয়া ত কেহ গেলনা, সবই যে নিত্যই নূতন। তুমি অনির্বচনীয়, তোমার শক্তি অনির্বচনীয়, তোমার বিশ্বও অনির্বচনীয়, কে ইহাকে ধরিয়া ফেলিবে? মন বুদ্ধির কাছে চির অধর তুমি, তাই তুমি এত মধুর। অনন্ত না হইলে ত তুমি ফুরাইয়া যাইতে। তোমায় ধরি ধরি ধরি না, পাই পাই পাই না। কি রহস্যময় তুমি! সকালে দেবু পাড়ার একটি মুসলমান ছেলেকে নিয়ে আসে, নাম তাহার বিনয় ঘোষ, কিছু কথা হয় আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে—সন্ধ্যার পর নিত্যব্রত আসে পনেরটা কালি দিয়া যায়...সাড়ে সাতটার পর পাঠ আরম্ভ হয়, Law of causality 'যে রসের অবতরণে অচল, যাহাদের "আমি" প্রবল তাহাদেরই যে কর্মফল কড়ায় গণ্ডায় ভুগিতে হয় ইহা আলোচনা হয়, পরমহংসদেবের উক্তি "আমি অপরাধ নিই না বটে, তবে কর্মফল আছে" এবং নিত্যগোপালের উক্তি "আমি অপরাধ নিই বটে তবে স্নেহ যখন উচ্ছসিত হয় তখন সব ভেসে যায়" এই দুইয়ের পার্থক্য আলোচিত হয়। নিত্যগোপালের দৃষ্টি সমগ্র মানুষের দিকে। অগ্রে কর্মের দিকে দৃষ্টি, তাঁহার পরে—ঠিক যেন মায়ের দৃষ্টি। আর পরমহংসদেবের দৃষ্টি—অগ্রে কর্মের দিকে ঠিক যেন বিচারকের দৃষ্টি। মানুষ শরণাগত হইলে তাহার সঞ্চিত ক্রিয়মান প্রারব্ধ সব গলিয়া যায়—কীয়ন্তে সর্ব কর্মাণি। কর্মাণি পদটি বহুবচনান্ত, কাজেই প্রারব্ধ তাহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। ভগবানের করুণাধারাকে আশ্রয় করিয়া সাধনা করিবার কথা ভাগবত বলিয়াছেন। আগে ভগবান পরে আমার যাহা কিছু, সর্বাগ্রে আমি তাঁর, পরে আর সকলের।...

২০শে নভেম্বর

ঠাকুর আমার সকল দাবি আজ তোমার উপর, বিশ্বে কাহারও উপর দাবি করিবার অধিকার আমার আর নাই, দাবি করিতেই ত চাহিয়াছিলাম, কিন্তু দাবি পূরণ করিতে তো কেহ ছুটিয়া আসিল না, যাহার যাহারও উপর কোন দাবি নাই সে কাজ করিবে কি করিয়া? আমার সকল কাজ কি তবে ফুরাইয়াছে?

শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা লভিব।

তুমিই আমার আশ্রয়, মহানির্বাণ, তুমিই আমার সামনে থাকিও, তোমারি চরণ চাহিয়া তোমাকেই বুকে লইয়া চলিব ইহাই আমার সারা জীবনের লালসা, তুমি আমি, আমি তুমি, তুমিই আমার আমি...৪।৫টার পর মিনু তাহার বিজ্ঞানাগার সহ এখানে আসে মাখনবাবু কিছুক্ষণের জন্য আসেন। রেণু ও প্রতিভা এ পাড়ায় হরিভূষণবাবুর সঙ্গে দেখা করে,...পাঠ হয়, সুধা কিছুক্ষণ ছিল, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও ছিলেন, আজ 'তয়েতি' মন্ত্র পাঠ আরম্ভ হয়। যাহার ভয়ে মৃত্যু ভয় পায় "ভয়াৎ অগ্নিস্তপতি" 'যং ভয়াৎ মৃত্যু বিভেতি' তিনি যশোদার বন্ধনভয়ে ভীত, শ্রীকৃষ্ণ কাঁপেন তাই বিকারী, আবার কাঁপেন না তাই নির্বিকার, তাঁহার জীবনে দুইই সমান মূল্য পাইয়াছে, তিনি যত সমাস স্থিতিগতি সমন্বিত, স্থিতিগতি দুইই আপেক্ষিক। তিনি বড় হইতেও বড় তাই তিনি মূর্তিমতী স্থিতি আবার তিনি ছোট হইতে, ছোট তাই তিনি মূর্তিমতী গতি...

২১শে নভেম্বর

ক্রমশঃ

সদাচারী সমাজ

শ্রীমলিনীকিশোর গুহ

'ধর্মের দেশ ভারত'—এই উক্তি, কম শুনি নাই। এই উক্তিটা মিথ্যা বলা যায় না এই দিক হইতে যে ভারতে ধর্মীয় আচার-প্রথা পদ্ধতি অনুষ্ঠানাদির অবধি নাই। আর অন্ত নাই ধর্ম-মন্দির মঠ ও বিগ্রহাদির। সুতরাং চলতি ভাবে বলিতে গেলে—বলিতে বাধা নাই ভারত ধর্মের দেশ। কিন্তু প্রকৃত ধর্মের কষ্টিপাথরে এই ধর্মের দেশ ভারতেই আজ কিন্তু ধার্মিকের বড় অভাব।

ধর্ম কি, ধর্ম-বিশ্বাস? কিন্তু কাহার ধর্ম-মত খাঁটি, ধর্ম-মত নিভুল ধর্ম-বিশ্বাস উত্তম—তাহা কিন্তু আসলে ধর্ম নয়। ধার্মিকেরও লক্ষণ নয়; ধর্মের ব্যাপারে আসলে যাহা কাম্য তাহাই হইল—আচরণ। What is Religion—? উত্তর :—"Religion is not correct belief but righteous action."

—Dr. Radhakrishnan.

কাহারো ধর্মমত কি, ইহাই ভারতে কখনো গুরুত্ব পায় নাই,—কারণ এ দেশে আচরণ-নিষ্ঠ ধার্মিকের দেখা পাওয়া যাইত। এই ধার্মিক ব্যক্তিগণেরই প্রভাব ছিল জন-জীবনে। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম-মতের অনুষ্ঠানেই বড় হইয়া উঠিতে লাগিল,—ফলে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই যেন 'ধর্ম' বিলুপ্ত হইতে লাগিল,—অন্তরতম অনুভূতি ও উপলব্ধির মৃত্যু ঘটিতে দেখা গেল। ধর্মের-ব্যভিচার এই পথেই দেখা দেয়। যাহা অসার, তাহাই সারবস্তুকে দূরে সরাইয়া দিল। সত্য, সত্য-নিষ্ঠাই ছিল যেখানে ধর্মের প্রাণ, ধার্মিকের একমাত্র পরিচয়, সেখানে আত্মবঞ্চনা ছলনা ভণ্ডামী আসিয়া গেল।

মহাত্মাজী আমাদের বর্তমান সমাজের এই প্রকৃতধর্ম-হীনতার বেদনায় ব্যথিতচিত্তে বলিতেছেন : Ours is a age of hipocracy. Men to whatever religion they may belong care only for the external aspect of religion and give the go-by to all the fundamental principles."

—Mahatma.

—'আমাদের এই বর্তমান যুগ যেন ভণ্ডামীর যুগ। মানুষ, তা তিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, ধর্মের বাহ্যিক, বহিরঙ্গের দিকটার উপরই গুরুত্ব দেন, ধর্মের যাহা মূল সত্য, মূল আদর্শ তাহাই এড়াইয়া চলেন।'

সত্য ও ধর্ম কি, তাহা জানি—কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অসত্য- অধর্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্তি নাই। ইহাই তো প্রমাদ।

এই যে অনাচার ও ভণ্ডামী—এ শুধু ধর্ম-ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রেও সেই একই ভণ্ডামী অনাচার। এমন কি গৃহ পরিবারে পর্যন্ত।

আজ দুর্নীতির কথায় দেশের আকাশ বাতাস ছাইয়া গেল। মানুষের প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে; এই বিশ্বাস হারাণোর মত ক্ষতি অল্পই আছে। দেশে দুর্নীতিই যদি প্রবল, তাহা হইলে ধর্ম-বুদ্ধি প্রবল নয়—ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেশে ধর্মানুষ্ঠান মঠ মন্দির মসজিদের প্রতিষ্ঠা সমারোহ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে ধর্মের বহিরঙ্গেরই প্রাধান্য ঘটিতেছে—প্রকৃত ধর্ম ও ধর্ম-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইতেছে। একদা দাক্ষিণাত্যে বিরাট মন্দির সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্যই, সেই মন্দিরে ঐশ্বর্যের তুলনা নাই! কিন্তু মন্দিরের দেবতা অস্পৃশ্যতার অনাচারের প্রাবল্যে মন্দিরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না—'যত জীব তত শিবের' দেশে অস্পৃশ্যতা-তাণ্ডব শিবের তাণ্ডব। আজো পূজা মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-জনের সমাগম হয়। ধর্মগুরুগণের প্রভাব যদি সত্য, তাহা হইলে দেশে এতো 'দুর্নীতি' কেমন করিয়া সম্ভব হয়?

রাজনীতি ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। সমাজ ব

ব্যক্তিগত জীবন হইতে দুর্নীতি, চারিত্রিক অধোগতি দূর করার আন্তরিকতা অপেক্ষা একে অপরের, এক দল অপর দলের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ আনিবার আগ্রহই অধিক প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই দুর্নীতির ব্যাপারেও দলাদলীর কলহ জমিয়া যায়। সুতরাং—দুর্নীতি-দমন বা সদাচার পালনের ব্যাপারেও যখন কোন নেতৃত্ব এবং দলীয় রাজনীতি নাসিকা প্রবেশ করায়, তখন শ্রেয়ঃ দেখি না। ভরসা পাই না। দোষারোপ করিয়া দোষ মুক্ত হইবার অভ্যাস প্রবল হয় মাত্র।

দুর্নীতি দমন বা সদাচার পালনের প্রশ্নে যাহা ছোট্ট অথচ কাজের কথা বলিয়া মনে হয়,—তাহাই আত্ম-বিচার। আত্মবিচারের দ্বারাই সদাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

ঘটা করিয়া জনকয় মিলিয়া 'দুর্নীতি সংঘ' করা যায় কিন্তু মানুষকে নীতিবান করা সভা-সমিতি মিটিংএর কর্ম নয়। ঐ যে বলে 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' তাহাতে সভা-নিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ তত সদাচারী হইবে।

অমুকে কদাচারী—আমরা সদাচারী,—অমুকে দুর্নীতি-পরায়ণ, আমরা দুর্নীতিবান, এমন প্রচারে ফল ফলে না।

দুর্নীতির নিন্দা সকলেই করেন—সদাচারের গুণগান সকলেই করেন (কোন না কোন দিকে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণকারী যিনি, তিনিও দুর্নীতির নিন্দা করেন)। কিন্তু আত্ম-বিচারের দ্বারা জানিতে হইবে, আমি নিজে সদাচারী, সত্য-নিষ্ঠা কিনা।

ছোট্ট কথা, ছোট্ট কাজ—যাহা আমরা সকলেই করিতে পারি তাহা—'আমি সত্য কথা বলিব, কদাচ মিথ্যা কথা বলিব না।' শুধু সত্য কথা যদি আমরা বলিতে পারি তাহা হইলে সদাচার আসিয়া যাইবে। দুর্নীতি পালাইতে পথ পাইবে না।

ধর্মের দ্বারা সার বস্তু আত্মিক-সত্তা তাহা লাভ করিবার ধ্রুব পথও বুঝি এই ছোট্ট কথাটা শিরোধার্য্য করায় সত্য-সংকল্প 'সত্য কথা বলিব।' —এই যে আচরণ, তাহা কিন্তু নিজেই করিতে পারি। করিতে পারি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, ক্রয়-বিক্রয়ে, হাটে-বাজারে, স্বীয় কর্ম-ক্ষেত্রে, আফিসে। তাহাতে আমার কল্যাণ, আমাদের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ। আমার চরিত্র-ই গোটা সমাজের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইখাটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

কৃষ্ণকে কৃষ্ণির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, কৃষ্টিহীন কৃষ্ণার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। যে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাসহস্রী	৵০
৮।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১।০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	মুণ্ডকোপনিষৎ	
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে	
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ	
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ	
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী	
৮।	অপ্রকাশিত পত্রাবলী	
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ	

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির জন্মকথা	১।০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৵০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৫৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	২৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৪৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৲

পুরুষোত্তম-সৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

Cover Printed by : Narayan Printing Works, 95, Narkeldanga Main Road, Cal-11

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

পুরুষোত্তমানন্দ সংখ্যা, ১৮৮৬ ১৩৭১.
সম্পাদিকা—শ্রীবেলা মিত্র এম. এ. সপ্তদশ বর্ষ ২০/২১ সংখ্যা

আগে ভগবানে অনুরাগ, পরে পূজা। কাহার পূজা করিব ও কে সে আমার, ইহা বুঝাইবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। বুদ্ধিতে হয়তো একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণা ধারণাই থাকিবে যদি না instinct আসিয়া এই ধারণাকে নিজের সপটুকু দিয়া ধারণ না করে। যদি আগে বুদ্ধিতে না যাইয়া জীবন দিয়া পাইতে চাহিতে তবে পরিত্যাগ করিবার ভীতি তোমার হইত না। .....দুনিয়ার কত ঘটনা study করিবে? অনন্ত কালেও পারিবে না। ঘটনার সঙ্গাতে সঙ্গাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও ব্রহ্ম সূত্র—highest connecting link—আবিষ্কৃত হইবে না, analysis ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'Positive Sciences of the Hindoos' গ্রন্থে মনীষী ব্রজেন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, হিন্দু নৈয়ায়িকগণ যুক্তির বদলে দৃষ্টান্তের (example) স্থান দিয়াছেন, কেননা যুক্তির সাধ্য নাই যে analysis ও synthesis মিলায়। একমাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ মিলে। পুরুষোত্তমই দৃষ্টান্ত। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের টানে গোপীগণকে সহজ ও অজস্র (অনায়াসে) ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তই জীবন। জীবনের সঙ্গে ভাবে, ক্রিয়ায় ও দ্রব্যে অদ্বৈত হইয়াই ভক্ত অতি সহজে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। টানের ভিতর ফেলিয়া যশোদাকে জ্ঞান দিলেন। তোমার গোপালের ভাষায় ইহাই 'বর্তমান ভজন'। বর্তমান যুগ বর্তমান ভজনের যুগ ইহাও তাঁহারই নির্দেশ।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট কোঃ লিঃ

সি কি উ রি টি হা উ স

৭৩-বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

প্রোপ্রাইটর্স এণ্ড সেক্রেটারিজ :—

এ হু ড লা ল ও আ এ ড কোঃ লিঃ

ভেল-সম্পত্তি রাখিবার
সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ
স্থান

মানুষের জীবনে বিপদ-আপদ আসবেই— তবুও মানুষ নিশ্চিন্তমনে ও শান্তিতে থাকতে চায় ও চেষ্টা করে। আপনার অলঙ্কারাদি, দলিলপত্রাদি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ আমাদের তত্ত্বে রেখে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকুন। আমাদের তত্ত্বে আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে নিরাপদ অবস্থায় থাকবে। বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদের অফিসে লিখুন অথবা ফোন করুন

ফোন : Bank 5476

ক্ষমা প্রার্থনা

উজ্জ্বলভারত প্রকাশিত হইতে অতিরিক্ত দেরী হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণ নানা কারণের সঙ্গে প্রেসের মেসিন ভাঙ্গা একত্রিত হইয়া এত বিলম্ব ঘটাইল। আমরা এ জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করা যাইতেছে এখন হইতে উজ্জ্বলভারত-প্রকাশ নিয়মিত হইয়া আসিবে। ১৭ই পৌষ, ১৩৭১- ১৮৮৬ সাল।

কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের ধারা বাহিকতায় ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা বাণিজ্যের সাধারণ সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' দিদিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ফাউন্টেন পেনের কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এবং ৩০, ৪০, ১২০, ৩৫০ ও ৭০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও সঞ্চয় করুন ॥

আপনি নিম্নবর্ণিত জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পগুলির সবকটিতে কিংবা যে কোন একটিতে অর্থলগ্নী করতে পারেন। এর থেকে যে টাকা পাবেন তা করমুক্ত।—

★ বারো বছরের জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট—১০০ টাকা ১২ বছরে হয়ে দাঁড়াবে ১৭৫ টাকা।

★ দশ বছরের প্রতিরক্ষা আমানত সার্টিফিকেট—বার্ষিক সুদের হার শতকরা ৪·৫০ টাকা, সুদ প্রতি বছরেই দেওয়া হয়।

★ পনের বছরের অ্যানুইটি সার্টিফিকেট—মূলধনের টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক ৪·২৫% সুদসহ ১৫ বছর ধরে নিয়মিত প্রতি মাসে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা।

★ ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট—বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ।

★ ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী আমানত পরিকল্প—সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক ৩·৩% থেকে ৪·৩%।

★ প্রিমিয়ামযুক্ত প্রাইজ বণ্ড।

আপনার যা কিছু প্রিয় সেগুলি রক্ষার জন্যই আরও সঞ্চয় করুন।

ডাকঘরসমূহ, স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স-বিল্ডিংস, কলিকাতা এবং আঞ্চলিক জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩, এই ঠিকানায় বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

W. B. (P)—Adv. D 7376 /64.

পরিবার পরিকল্পনা

অস্ত্রোপচার (ভ্যাসেক্‌টমি) ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনা খরচে যোগ্য দম্পতিদের ক্ষেত্রে পুরুষদের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা আছে :

১। এম. আর. বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালিগঞ্জ ;

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, আড়িয়াদহ।

এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ যে কোনও কাজের দিন উপরোক্ত হাসপাতালগুলির সহিত যুক্ত পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণকেন্দ্র হইতে জানা যাইবে।

W. B. (P) Ad. D 7717 (83)/64.

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·৫০
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·৩০	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

সাহিত্যের গল্প	১·৫০	বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োজনমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

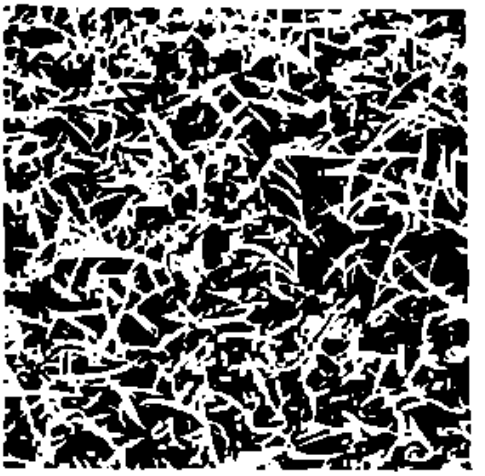

পায়ে হেঁটে পরমায়ু

এখন মিঠে রোদের দিন, উলের পাতলা হাওয়া। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসুন ঘর ছেড়ে, বুক ভরে নিন খোলা হাওয়া। পরিচয় নিন প্রকৃতির। বেড়ানর সুখ এখন পায়ে-হাঁটা পথ ধরে। নীরোগ আনন্দ এই পথে, এই পথে পরমায়ু। পায়ে পরে নিন একজোড়া বাটার জুতো, আরামে ১নম্বর সহচর।

Bata

সূচীপত্র, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, ১৮৮৬

১। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ২৭১
শ্রীচুণীলাল মিত্র

২। আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মসমর্পণ ... ২৭৫
শ্রীবেণু মিত্র

৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ২৭৭
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

৪। ৮২-তম জন্মদিনে ... ২৮৩
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়

৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ২৮৬
শ্রীরাধেশ্যাম মজুমদার

৬। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ... ২৯১
শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী

৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ২৯৭
শ্রীপ্রতিভা রায়

৮। নমঃ নমঃ নমঃ বৈপায়ন ... ২৯৫
শ্রীহরিরঞ্জন কাব্যতীর্থ

৯। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ২৯৬

১০। মুণ্ডকোপনিষৎ (অনুবৃত্ত ভাষ্য) ... ২৯৯

১১। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪২) ২৭৩

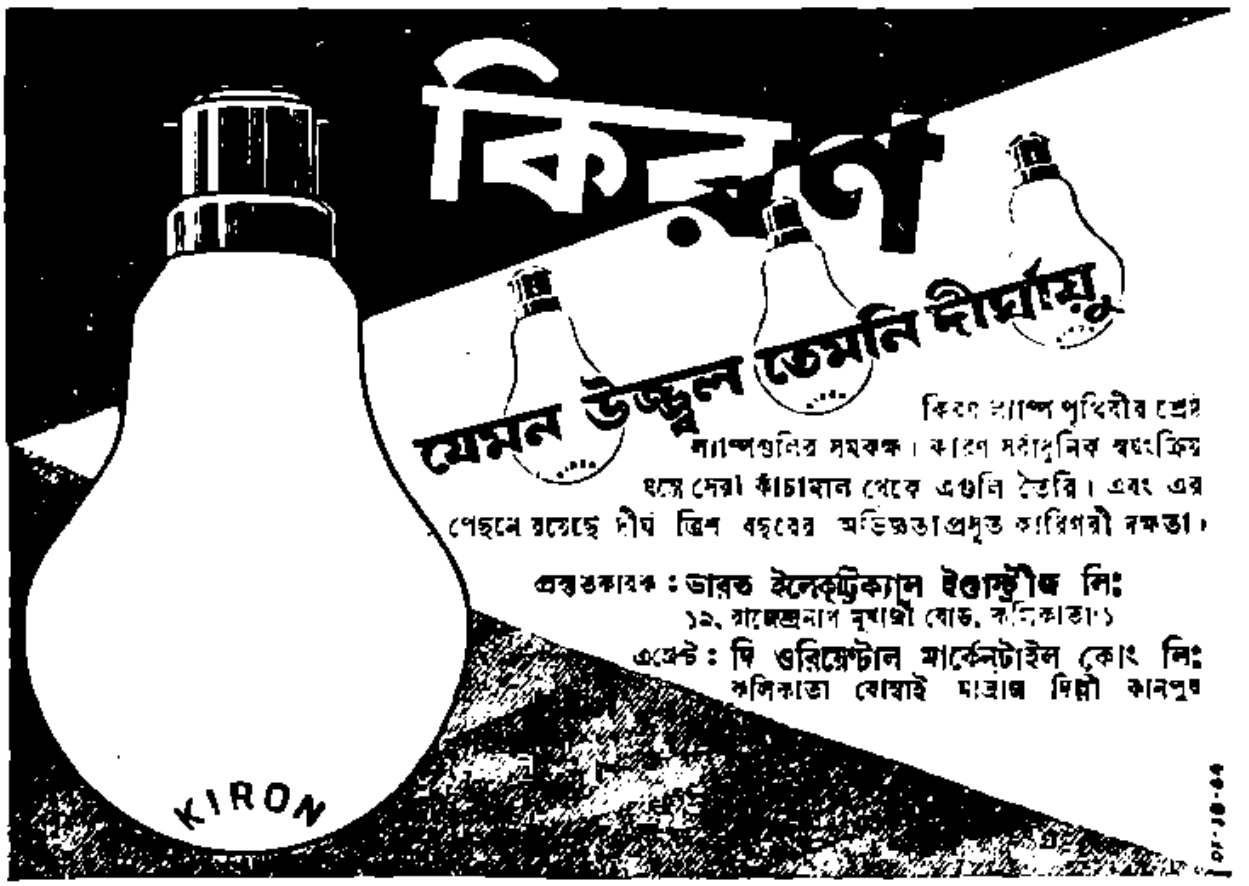

[illegible]

উদ্বোধন

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীচুনীলাল মিত্র এম. এ., বি. টি., সাহিত্যবিনোদ ॥

[৮২-তম জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির ভাষণ]

সমবেত সুধি ও পুরুষোত্তম-ভক্তানুরাগীবৃন্দ,

আপনারা যাঁরা আজ এক মহাত্মার জন্মতিথি স্মরণে এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সকলকেই আমরা স্বাগত জানাই। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে প্রতি যুগই সন্ধিক্ষণ। প্রতি যুগেই আশীর্ব্বাদ ও অভিসম্পাৎ দুইই আছে। তবুও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে আমাদের যুগ বিশেষ অর্থেই সন্ধিক্ষণ। একান্তভাবেই সঙ্কটপূর্ণ। বর্ত্তমানে ব্যক্তি-মানুষ অপর মানুষকে সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে। পরিবারে পরিবারে দ্বেষ হিংসা সংশয়, সমাজে সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। রাষ্ট্র আজ সংগ্রাম-মুখী। বিশ্বরাজনীতি আজ বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত। বিজ্ঞান উন্নতি ও উৎকর্ষের উর্দ্ধশিখরে উন্নীত। ফলে আণবিক বোমা ও মারণাস্ত্র আবিষ্কারে মানব সভ্যতা ও তাহার সহস্র বৎসরের সংস্কৃতি সংহতি আজ মৃতপ্রায়। বিশ্বরাষ্ট্র ও মানব সমাজ আজ সভ্যতার দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ, বিনাশ না পুনর্জাগরণ, প্রশ্নের সম্মুখীন। উহার বিলুপ্তি না পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থান ?

মনে হয় এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে যখন মানুষের ব্যক্তিগত পরিবারগত ও সমাজগত জীবন বিধ্বস্ত, যখন রাজনীতি ও অর্থনীতি বিপন্ন, যখন ধর্মনীতি পরস্পর বিরুদ্ধ ও দার্শনিক মতবাদ পরস্পর প্রতিকূলচারী, যখন মানুষ একান্ত সংশয়াত্মক, যখন দুর্নীতি ও দুঃশাসনে মানুষ সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন, তখনই "সম্ভবামি যুগে যুগে" বার্ত্তা লইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তিনি "মন্নানা অপনি," ও "অসতাং ক্ষিতিভৃজাম্ শাস্তা"। আবার একাধারে 'নৃণাং নরবরঃ।" সকল মত ও পথ, সব ধর্ম-অধর্ম, সত্যাসত্য ন্যায়অন্যায় সকল-নির্ণয়ের মীমাংসার সমন্বয় সাধন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই করেন। তাই ত তিনি স্বয়ং ভগবান। এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের উত্তর সাধক, ধারক ও বাহক শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। তাঁহারই জীবন ও দর্শন গ্রহণ অধুনা সমস্ত জর্জ্জরিত পৃথিবীর একমাত্র সমাধান। সে কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবধূত পুরুষোত্তমানন্দের জীবনবেদ স্বীকার গ্রহণ পালন তেমনি এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।

পুরাণে কথিত আছে মহান জীবনী অধ্যয়নে পা খণ্ডন হয়। আজ এক মহান জীবনী আলোচনা আমরা স্ব স্ব পাপস্খালন করিতেছি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচা করিতেছি।

জৈনধর্ম ও দর্শন ব্যক্তির উন্নতি ছাড়া সমাজের উন্ন কল্পনা করে না। তাই সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান সম্যকচরিত্রই ইহার 'রত্নত্রয়'। জীবন ও চরিত্র ভাল হইলে নিছক আদর্শ ভাল হইলেই চলিবে না। স্বা পুরুষোত্তমানন্দ এই ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, চরিত্র আদর্শের যুগপৎ উন্নতিই কল্পনা ও কামনা করিয়াছেন।

রাষ্ট্র-নায়ক তথা বিশ্বমানবের চারিত্রিক সং (crisis of character) প্রসঙ্গে আচার্য্য সর্ব্বপ

রাঁলাকে বলেন—"If we persist in this attitude of ideological insanity almost all that we love and value will be imperilled," বস্তুতঃ হইতেছেও তাহাই। এই ব্যক্তিগত মতবাদে, নীতিগত স্বাতন্ত্র্যে দেশ পঙ্গু, বিশ্ব ধ্বংসোন্মুখ। কিন্তু শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের নিকট অধ্যাত্মজীবন ও বাস্তবজীবন একই জীবনের দুইটি দৃষ্টিকোণ মাত্র। তিনি অন্তরে সংকীর্ণ ও বাহিরে উদার ছিলেন না। He was not parochial at home and international abroad, দেশভক্তি ও বিশ্বপ্রেম তাঁহাতে একাকার হইয়াছিল। ইটালীয় দার্শনিকের মতবাদ "অধ্যাত্ম জীবন একাধারে ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন," ব্রাউনের মত—"যে জীবন যত ব্যাপক সেই জীবন তত সত্য" ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই পাপ ও মৃত্যু' শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ অপেক্ষা পুরুষোত্তমানন্দ অধিক কেহই বুঝেন নাই। পরন্তু তিনি এ সকলেরও ঊর্ধ্বে তদীয় আচার্য্য ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা, জ্ঞান-অজ্ঞান, সাকার-নিরাকার আকার-নিরাকার, জড়-অজড়, চৈতন্য-অচৈতন্য, দ্বৈত-অদ্বৈত ও সর্ব্ব সমন্বয় স্বীকার করিলেন। তিনিই সমন্বয় দর্শনের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তিনি একাধারে অদ্বিতীয় বাগ্মী, ভক্ত, যোগী ও কর্মবীর।

প্রচলিত শতাব্দীর চিন্তাধারায় পরকাল যথাসর্ব্বস্ব, ধর্ম বার্দ্ধক্যের বিশেষ বয়সে বিশেষ অবস্থায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয় ছিল। কোটী মানবের মতবাদে সন্ন্যাসই একান্ত ও মুখ্য, সংসার নিতান্ত তুচ্ছ গৌণ ও নগণ্য ছিল। স্বামীজি এই সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আজীবন অভিযান করিয়াছেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন সংসার ও সন্ন্যাস তুল্য সত্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য তুল্য মূল্যবান, ইহকাল পরকাল উভয়ই মুখ্য। চাওয়া যেমন সত্য পাওয়া তাহারই মত। কবির ভাষায় :—

এই যে একান্ত করে পাওয়া
এও সত্য যত
এমনি একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু
কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল
এতো বড় প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো,
কাঁটে-কাঁটা পুষ্পসম
এতদিনে হয়ে যেত কালো।

স্বামীজির ব্যাপক চিন্তায়, তাঁর পুরুষোত্তম দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্ম ও মৃত্যু, কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য, সুখ-দুঃখ, ঐশ্বর্য্য-দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গী। একটি অপরটির ভিন্ন দিক মাত্র। উহারা যেন একই মুদ্রার দুইটি পিঠ। দুঃখ দারিদ্র্য ও মৃত্যুকে স্বীকার করিলেই উহাদিগকে জয় করা যায়, উহাদের প্রতি ভীতি অবজ্ঞা ও অবহেলার নয়। শতাধিক জনসভায় সহস্রাধিক শ্রোতাকে তাঁহাকে ইহাই বলিতে শুনিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠে শ্রীঅরবিন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—"Death is not the last word of existence nor is suffering the only fact of life. Death is temporary inertia, suffering, temporary privation. They arise out of our wrongly identifying life with the phases of life. The cure lies not in forsaking them but getting ourselves more and more identified with them."

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্থিতিকেই স্বীকার করিয়াছেন, গতিকে পারমার্থিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে ভগবান বুদ্ধ গতিকে পারমার্থিকতা দান করিয়াছেন। ফলে বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয় স্বীকৃত হয় নাই, অখণ্ড বিশ্বও গড়ে নাই। তাই আমাদের খণ্ডিত সমাজ, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র। পদে পদে দ্বিধা, সংকোচ, ত্রাস। মানুষের

মানুষকে জীতি সংসার, এবং রাষ্ট্রনায়কের অপর রাষ্ট্রনায়কের প্রতি ষেন। অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ কায়মনোবাক্যে এই গতি ও স্থিতি, বুদ্ধ ও শঙ্করের সমন্বয়ের স্বীকৃতির কথাই বলিয়াছেন। তাঁর চিন্তায়, বচনে ও কর্মে শঙ্করামানুজের অদ্বৈত-দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের ঐক্য, head ও heart এর মিতালির কথাই জানাইয়াছেন।

আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে বুদ্ধিকে স্বীকার করিয়াছি, যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছি। ফলে, আমাদের চিন্তায় ও বাক্যে আসিয়াছে বৈষম্য, বাক্যে ও কর্মে আনিয়াছি অসঙ্গতি। তাহারই ফলে জীবনে ব্যর্থতা, বিপর্যয় ও পরাজয় হইতেছে পলে পলে। স্বামীজি জীবনকে অবিচ্ছেদ্যভাবে, সত্যকে সামগ্রিকভাবে দেখিয়াছেন। প্রাণের দ্বারাই ইহা সম্ভব। প্রাণ সকলকেই গ্রহণ করে, স্বীকার করে, মর্যাদা দেয়। মানুষের বৃহত্তর জীবনে যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহাই সামান্য তাহাও স্বয়ংপূর্ণ অমূল্য অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।"

ভাষান্তরে তাঁর বাণী—

"জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
(কারণ) পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।"

আমরা ব্যক্তিজীবনকে বড় করিয়াছি, আপন-স্বার্থকে সীমাহীন ভাবিয়াছি। জনস্বার্থ ও সমষ্টি জীবনকে স্বীকার করি নাই। একান্ত স্বার্থান্ধ হইয়াছি। আমরা জনকল্যাণ চাই নাই, দেশকে ভালবাসি নাই। গোবিন্দ দাসের সুরে নতুন গানে নতুন সুর দিয়া গাহিবার সময় হইয়াছে—

স্বদেশ স্বদেশ কহিস কারে এদেশ মোদের নয়,
এই যমুনা গঙ্গানদী, এ সব মোদের হত যদি,
ধনী-বণিক-শ্রেণী হাতে জীবন কেন বয়,
নিবস্ত্রে অনাহারে মানুষ কৃশ কেন হয়?
—এ দেশ মোদের নয়।

পুরুষোত্তমানন্দের জীবনাদর্শে আমরা যদি জীবনকে রূপায়িত করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হইবে, দেশ উন্নত হইবে জাতি সমৃদ্ধ হবে। জনস্বার্থে লোককল্যাণ অব্যাহত থাকিবে। তখনই দূর নিকট হইবে, পর আপন হইবে, দেশবাসী ভাই ভাই বলে প্রতীয়মান হইবে, দেশধরিত্রী, ধাত্রী ও জননীরূপে পরিগণিত হইবে। প্রাণের স্তরে সবাইকে স্বীকার করিলে একের দুঃখে অপরে বেদনা বোধ করিবে। নদীবক্ষে তুফান উঠিলে তীরভাগ পর্যন্ত তাহার স্পন্দন অনুভূত হইবে। কারণ নদীরই তুফান তুফানের নদী নয়! আমাদের ব্যক্তিসত্তা জাতীয়সত্তার মধ্যে মিলাইয়া দিতে হইবে। স্বামীজির ভাষায় আমাকে লক্ষ সাধারণ গুণিতকের মধ্যেই নিজেকে খুঁজিতে হইবে। তবেই স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব থাকিবে না। নৃত্যাধিক ২৩শত বৎসর পূর্বে কথিত আছে, এথেন্স ডায়োজিনিস (৪১২—৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) প্রকাশ্য দিবালোকে একটি লণ্ঠন বাতি জ্বালাইয়া রাস্তায় রাস্তায় দোকানে বাজারে পরিভ্রমণ করেন, বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। আলোটি নিভাইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। তাঁহার চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন দেখা যায়। কৌতূহলী জনতা তরুণ ও কিশোরেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কিসের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ বলেন যে তিনি একটি খাঁটি মানুষের খোঁজে ছিলেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি একজনও খাঁটি মানুষের সন্ধান পান নাই। কাহিনীটি ঔপন্যাসিক কি সত্য বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। ইহার মর্মকথাই প্রণিধানযোগ্য। বিবেকানন্দ একাধিকবার বেদনায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনিও মুষ্টিমেয় সৎ, দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ, নির্ভীক মানুষ চান তিনি এমনি শতাধিক মানুষ পাইলেই সমগ্র বিশ্বে বিপ্লব আনিতে পারেন। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ এই শ্রেণীর কোটী মানুষের মধ্যে একক বিরল বিরা স্বাধীন নির্ভীক পুরুষ। তাঁহার ন্যায় মানুষের পক্ষে পরিবারে সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন কি বিশ্বেরও চিন্তায় কর্মে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।

বন্ধুগণ, পথ বন্ধুর হয় অন্ধকার হয়, মত বন্ধ হ পথিকের অভাবে, মতবাদীর অবর্তমানে। তাঁহাদের অ

শিষ্য অনুরক্তদের, তাঁহাদের উত্তরসাধকদের অবশ্য করণীয়, অনিবার্য পালনীয় ও অপরিহার্য কর্তব্য সেই পথিক ও প্রবর্তকদের বাণীকে রূপ-দেওয়া, আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা।

ভক্তেরাই ত প্রাণের স্পর্শ পান, পুনর্জীবনের সান্নিধ্য সাহচর্য লাভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী "প্রাণঃ প্রাণং ঘদাতি", যীশু স্বয়ং স্বীকার করলেন "Life begets life"। সমাগত সজ্জনগণ আশ্রমবাসীগণ যাঁহারা আজ পুরুষোত্তমানন্দের জন্মোৎসব বাসরে আসীন তাঁহারা সে বিরাট পুরুষের স্পর্শ পাইয়াছিলেন। বৈশেষিকের ঋষি বলিয়াছেন 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ নতু কার্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ'—কারণের অভাব হইলেই কার্যের অভাব হয়, কিন্তু কার্যের অভাবে কারণের অভাব হয় না। কারণস্বরূপ মহান অবধূতজীবন আমাদের সম্মুখে বর্তমান। তিনি সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়াছেন। আমরাই তাঁহার বাণীকে রূপ দিব, তাঁহার আদর্শকে মূর্তিমান করিব। আমাদের ব্যক্তিজীবনকে, পরিবারকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করিব। সহরে পল্লীতে বাংলার ঘরে ঘরে ও বাংলার বাহিরে স্বামীজি মহারাজের অগণিত শিষ্য ভক্ত অনুরাগী তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করিবেন, পরিবারে সমাজে ও বৃহত্তর রাষ্ট্রে পুরুষোত্তম জীবন গঠনে ব্রতী হইবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও প্রার্থনা। তাঁহারা সমবেত চেষ্টায় স্বামীজির জীবনী প্রণয়নে, স্থায়ী স্মৃতি স্থাপনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে বক্তৃতামালা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক্য প্রদর্শন সত্য ও সার্থক হইবে।

বন্ধুগণ, মহাপণ্ডিত ও জার্মান দার্শনিক ইমাানুয়েল কাণ্টের (১৭২৪—১৮০৪) কথা স্মরণে রাখিয়াও মনীষী Whitehead এর সহিত একমত হইয়া বলা যায় যে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে মহামতি প্লেটোর পর কোনও তেজস্বী দার্শনিকের বলিষ্ঠ মতবাদ সৃষ্ট হয় নাই; পরন্তু সবগুলিই প্লেটোর (৪২৭—৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ) উপরই মন্তব্য, টীকা ও ব্যাখ্যা। একইভাবে আমরাও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে প্রাচ্যখণ্ডে আচার্য শঙ্করাচার্যের পর কোনও সৃজনী প্রতিভার দ্বারা তেমন সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ দর্শন গড়িয়া উঠে নাই। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ এই বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ, তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘজীবনের ধর্ম ও জ্ঞান তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একাধারে তপস্বী ঋষি ও পণ্ডিত সন্ন্যাসী ও আদর্শ সংসারী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সমন্বয়ের আদর্শজীবন রাজর্ষি জনকের জীবন যাপন করেন। ভাব ভাষা ও প্রকাশের অপূর্ব সংমিশ্রণে দীপ্যমান, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতায় ভাস্বর। একাধিক অবধূতের আবির্ভাবেই শাশ্বত ভারতের পরিচয়। আজ তাঁহার স্বর্ণোৎসব সভায় তাঁহার ভাবধারা ও জীবনবেদের বহুল প্রচারই কামনা করি। তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক, আমাদের জীবন ধন্য, মহৎ ও গৌরবান্বিত হউক।

ওঁ নমঃ ভক্তভগবতে শ্রীনিত্যগোপালায় ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ পুরুষোত্তমায়।

আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসমর্পণ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো ভগবতে-নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়।

ওঁ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতম্ সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষম্। বিশ্বপ্রেমময় নরনারায়ণপদেবীম্ বন্দে সমন্বয়গুরুম্ পুরুষোত্তমানন্দম্॥

বন্ধুগণ,

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের দ্বিশতাব্দীতিতম জন্ম উপলক্ষে আজ আমরা সমবেত হয়েছি। এই পবিত্র ক্ষণটিতে তাঁকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি। আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি—আপনারা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের আনন্দ বর্ধন করুন। আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে না পেরে আমি খুব বেদনা বোধ করছি; আমার আজন্ম পীড়িত দেহ বর্তমানে আরও অপটু; তবু শ্রীমৎ স্বামিজীর জন্ম উপলক্ষে তাঁর কথা দুইচারটেও যদি বলতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এই গ্রামে শ্রীমৎ স্বামিজী মাত্র দুই বৎসর দেহেতে ছিলেন। সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও তাঁর হয়ে ওঠে নি—সকলেও তাঁকে জানতে পারেন নি। তবু আপনারা যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আলোচনা শুনেছেন, তাঁরা বুঝেছেন যে তাঁর জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সমস্ত রকম আলোচনার একটা অনবদ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মাত্র দুই বৎসরে গ্রামের একটী রাস্তা তৈরী করবার ব্যবস্থা করে গ্রামের যেটুকু সেবা করবার তিনি সময় পেয়েছিলেন, তা-ও আপনারা সকলে উপলব্ধি করেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালকে লাভ করবার পর থেকে আর ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেন নি। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই প্রায় একশত দশ বৎসর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অপূর্ব জীবন ও সর্ব সমন্বয়ের সামগ্রিক জীবনচেতনা নিয়ে। এ জীবনচেতনা ছিল তাঁর জীবনের ইতিহাসে, আর ছিল তাঁর লেখা বহু রচনাবলীতে। শ্রীনিত্যগোপালের ছিল একটী অদ্ভুত জীবন। তাঁর সর্ব সমন্বয়ের কথা কাউকে তিনি মুখে বলে যান নি—অথচ স্পষ্ট ভাষায় রেখে গিয়েছিলেন জীবনের আচরণে, খাতার পাতায়। আর পরবর্তী কালে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে সেটা প্রকাশ করতে। শ্রীনিত্যগোপালকে আমরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের মধ্য দিয়ে বুঝতে প্রয়াস পাব, নইলে সমুদ্রের মত বিচিত্র বিবিধ রত্নের আকর বিশাল শ্রীনিত্যগোপালকে আমরা ধরতে ছুঁতে পারব না, যেই হারিয়ে ফেলব, এক ঘটনার সঙ্গে আর এক ঘটনাকে মেলাতে পারব না, প্রথমের সঙ্গে শেষের সামঞ্জস্য খুঁজে পাব না। এই শ্রীনিত্যগোপালকে প্রকাশ করাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন ছিল। কী তিনি বলেছেন? অনেক কথাই তিনি বলেছেন—তাঁর কথার মধ্যে আধুনিকতম বিজ্ঞানের আর আধুনিকতম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। এই বিশ্লেষণ দিয়ে হিন্দুর প্রস্থানত্রয় ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্, গীতার তিনি ভাষ্য লিখেছেন। সে সব অনেক কথা এখানে সম্ভব নয়। আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের শান্তি ও আনন্দ আনতে তাঁর দুই একটি কথা একটু ভেবে দেখব।

জীবনের মধ্যে নানা বিপরীতের, নানা বিরুদ্ধতার সমাবেশ। সুস্থ সাধারণের জীবনকে কি করে এই বৈপরীত্য ও বিরুদ্ধতার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে মানবিকতার বিশ্বজনীন রূপ স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের অধিকারী দেখতে পারি,

যেখানে জীবনের অতীত সত্তা রক্ষিত হয়েও জগতের মধ্যে তাকে অক্ষুণ্ণ করে রাখবে—এই দৃষ্টিতে আমরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে ও শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝতে চাইব। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঔৎকর্ষ বৃদ্ধি—তা সে যে দিকেই হোক না কেন—বর্তমান যুগ-সাধনা নয়।

আজকের কথা হচ্ছে ব্যক্তি তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে, অথচ সে সমগ্রের মধ্যে বিধৃত থাকবে। সামগ্রিকতার কথা এসে গেছে বিশ্বে বেশ কিছুদিন হল—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম্ প্রভৃতি অনেক কিছু আমরা দেখছি শুনছি লিখছি। সেইসঙ্গে এসেছে বিশ্বে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি। কিন্তু সত্যিকারের শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়, নিশ্চিন্ততা কোথায়? ভারতবর্ষের তো কিছুই নেই—বিশ্বের মানুষেরই কি আছে? যে শান্তি আনন্দ নিশ্চিন্ততা ভারতবর্ষের মানুষের ছিল তাও গেল, বর্তমান জগতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ যা যতটুকু পেয়েছে, আমরা তা-ও পেলাম না। বর্তমানের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে শান্তি আনন্দের সামঞ্জস্য হয় কি করে—আজকের সমস্যা এইখানে। এই সামঞ্জস্য করে নিতে পারিনি বলে আমরা একেবারেই অমানুষ হয়ে গেলাম। এইখানে পথ দেখাবেন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর সর্ব সমন্বয়ের ছন্দপূর্ণ সামগ্রিক জীবন ও তত্ত্ব দিয়ে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই পথকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ একদিন যে রকম করে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করে নিয়েছিল আজকের দিনে তা অচল হয়েছে। সর্বত্রই তা জীবনের বাস্তবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আচার-সর্বস্ব হয়ে পড়ে সৌন্দর্য হারিয়েছিল। এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজকের দিনে আত্মস্বাতন্ত্র্যের মনোবৃত্তি। সব শুদ্ধ মানুষ আজ বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে, মানুষ হয়ে উঠছে না। শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন দিয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ দেখিয়েছেন বৃহতের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাপনের, আত্মসমর্পণের দীনতা ও শ্রদ্ধাশীলতার সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাবোধ সমন্বিত হয়ে কি করে সামগ্রিক জীবনচেতনা রক্ষিত হয় এবং মানুষের তা হয়ে বেশী মানুষ করে তুলে শান্তি ও আনন্দের অধিকারী করে। আত্মসমর্পণ ও আত্মস্বাতন্ত্র্য এদুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সহজ নয়—কেননা এরা পরস্পরবিরুদ্ধ। কিন্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ যে জীবনে মেলে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই তত্ত্বই প্রস্থাপন করেছেন তাঁর সমস্ত শাস্ত্রব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। কবির ভাষায় এই দুটোকে মেলান "বড় কঠিন সাধনা সে, বড় সহজ সুর"। সহজ এইজন্য যে জীবনের এইটেই ধর্ম, কঠিন এইজন্য যে সহজ মানুষ আর সহজ নেই—নানা রকম ঐকদেশিক চিন্তা ও আচার আচরণের দ্বারা সে বিকৃতিপ্রাপ্ত। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এক দিকে ঔৎকর্ষ ও অপর দিকে শান্তি আনন্দ আনতে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসমর্পণের যুক্ত সাধনার খোঁজ দিয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। বুদ্ধির চাষ করবার জন্য প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, কিন্তু মানুষ তৈরী করতে এই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য কোথায়? শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে তাই বড় প্রয়োজন। কত রকম ভাবধারা আচার আচরণ আমাদের সামনে আজ উপস্থিত, সমাজ-জীবন গেছে বিপর্যস্ত হয়ে, সমস্ত পৃথিবীটাই সকলের সামনে এসে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে—এক দিকে মানুষের বিচরণের পরিধি গেল বেড়ে, অন্যদিকে তার দাঁড়াবার জোর-ই গেল শিথিল হয়ে—সে চাঁদে পৌঁছাতে চাইছে, অথচ মাটির বুকে নিজেকে নিশ্চিন্ত বলে বুঝতে পারছে না—এ হেন পরিবেশে সমস্ত পৃথিবীই যখন আমার আঙিনায় তখন ভারতবর্ষের চিরদিনের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-র সঙ্গে শ্রীনিত্যগোপালের 'আমি বিশ্বনাগরিক'-এর যুক্ততা, ভারতবর্ষের চিরদিনের আত্মসমর্পণের সাধনার সঙ্গে বর্তমানের আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুক্ততায় এক সামগ্রিক সাধনা ছাড়া আজ পথ নেই। আজ ঘরে বাইরে যে বিপর্যয়, মানুষ মানুষ না হওয়ার জন্য সব কিছু থাকা সত্ত্বেও চারদিকে যে শূন্যতা—তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মানুষ হওয়ার কথা যদি আজ কোথাও পাই, তাহলে তাই-ই আজ প্রয়োজন। আমরা যেন এই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য

করতে পারি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বর্ত্তমান আবেষ্টনে মানুষ কি করে মানুষ হতে পারে সেই কথা বলেই জীবন শেষ করেছেন। আজ তাই ওঁর জন্মদিনে ওঁর সমস্ত কথার একটু সারমর্ম এই সাধনা গ্রহণ করার সংকল্প আমরা গ্রহণ করি—আমরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাবোধ নিয়েও আত্মসমর্পণময়ী ভক্তির অধিকারী হই—। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হোন, শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হোন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

ওঁ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগৎ হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ ॥
ওঁ নমো ভগবদ্মূর্ত্তয়ে কৃষ্ণ ভগবতে নিত্যগোপালায়
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তুরীয়-তুরীয়াতীতায়
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়
নিত্যগোপালায় নমঃ নমঃ ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতং
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষং
বিশ্বপ্রেমদৌ নরনারায়ণপ্রসিদ্ধৌ
বন্দে সদগুরু পুরুষোত্তমানন্দং ॥

সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভক্তমণ্ডলী—আপনাদের সকলের সঙ্গে অবধূত মহারাজের ৮২তম জন্ম তিথি উপলক্ষে তাঁর সকল সুন্দর জীবনী আলোচনার সূত্রপাতে আমি আপনাদের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সুন্দর ও তদীয় মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল দেবের শ্রীচরণ কমলে ভক্তি নিবেদন করে তাঁহাদের সকল রস নিংড়ান নন্দনরূপে প্রস্ফুটিত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

প্রথমতঃ বলে রাখি, স্বামিজীর জীবনকে বুঝতে পারা এবং তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করা ও প্রকাশ করতে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োজন তা আমার মোটেই নেই। বিশেষভাবে আপনাদের ন্যায় গুণীজন সমক্ষে উপস্থাপিত করার মত ক'রে কিছু বলা আমার একেবারেই সাধ্যাতীত। স্বামিজী মহারাজ আমার আচার্যদেব। নিজের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তিনি তাঁর সবকিছু উজার ক'রে আমাকে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই অযোগ্য পাত্র যতটুকু নিতে পেরেছে ঠিক ততটুকু যথাসম্ভব আপনাদের কাছে নিবেদন করবার চেষ্টা করব মাত্র। এ কথা আমার বিনয় নয়—ইহা আমার অবস্থার সরল স্বীকৃতি। আমার না আছে ভাষা, না আছে ভাব, না আছে প্রকাশ শক্তি। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। একমাত্র ভরসা ও সাহস এই ছোটর দল, পণ্ডিতের দল কতখানি পেয়ে কৃতার্থ হ'য়েছে, কি পেয়ে কৃতার্থ হ'য়েছে, আমার জীবন-দেবতার কাছ থেকে কোন্ দৃষ্টি, কোন্ বস্তু লাভ ক'রে আমার কাছে "জগৎ" ও "আমি"র কিরূপ আস্বাদন ও অর্থবোধ হ'য়েছে, সেই কথাটি আমার মূর্খের ভাষায় প্রকাশিত হ'লে স্বামিজী মহারাজের জীবন বার্ত্তায় কিছু ইঙ্গিত পাবেন—আমার বলবার জন্য দাঁড়াবার সাহসের পেছনে আমার এই লোভ। আরও লোভ এই জন্যে যে, শ্রীভাগবতের ভাষায় "যাবন্ নিমীলা বা নেত্রে ন অন্যৎ ন পশ্যেদিয়ং" এই কথাটি কতদূর সত্য তা প্রকাশিত হবে। আমরা তো নিমিলিত নেত্রই—

অর্থাৎ অন্ধ। এই অন্ধের দল অনন্তের হাত থেকে ইচ্ছা পাওয়ার অন্ত কতখানি গেল তার প্রমাণও আপনারা পাবেন। স্বামিজী মহারাজের চরণ স্পর্শ পেয়ে, তাঁর অহৈতুক কৃপা পেয়ে আমি ধন্য।

১২৯০ সালের ৬ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার কার্ত্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে পিতা নীলকমলের ঔরসে মাতা মুক্তকেশীর গর্ভে শ্রীনিত্যগোপালের ইচ্ছায় শরৎ কুমারের জন্ম। শিশু শরৎ কুমার ছয় সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন বোবা। তাঁর মুখে কথা ফুটত না। সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল এই শরৎ কুমার তাঁর উত্তর জীবনে অফুরন্ত বাক্যের অধিকারী হবে! বাক্যের কোন্ উৎসের সঙ্গে যুক্ততার ফলে তিনি এত শব্দ-সম্ভার লাভ করেছিলেন, সেই উৎসের কথা স্বামিজী মহারাজের নিজ মুখ থেকে আমরা যা শুনেছি, সেই কথা প্রথমতঃ বলা প্রয়োজন। শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন স্বামিজী মহারাজের ইষ্ট ও গুরু। নিত্যগোপালই কৃষ্ণগোপাল, নিত্যগোপালই গৌর গোপাল—তিনই এক, একই তিন—একই বিভিন্ন সকল সুন্দর রূপ ধারণ ক'রে ধরার, ধরণীর দুঃখ মোচনে অবতীর্ণ হ'য়েছেন এ কথাটি স্বামিজী মহারাজ জেনেছিলেন। কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং অহং ন জানে। কৃষ্ণ-তত্ত্বই গৌর-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্বই নিত্যগোপাল-তত্ত্ব, তিনই এক তত্ত্ব। স্বামিজী মহারাজ নিত্যগোপালের প্রণাম মন্ত্রে "ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে" ব'লে তাঁকে উল্লেখ ক'রেছেন। এই তত্ত্বমূর্ত্তিই হ'চ্ছে তাঁর জীবনের সকল কিছুর উৎস। তিনি ছিলেন নিত্যগোপালময়। তাঁর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নিত্যগোপাল ছাড়া ছিল না। তাঁর সংসার-ধর্ম্ম, তাঁর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, তাঁর রাজনৈতিক জীবন, তাঁর ব্যক্তি-জীবন, তাঁর সমাজ-জীবন সর্ব্ব ক্ষেত্রেই নিত্যগোপাল ছিলেন কেন্দ্র। নিত্যগোপালকে ঘিরেই তাঁর সকল কিছু আবর্ত্তিত হ'য়েছে।

প্রথম জীবনে শরৎকুমার ছিলেন মাতৃভক্ত। শ্রীদুর্গা ছিলেন তাঁর ইষ্ট। তাঁর প্রথম জীবনের সকল কথার সকল লেখায়, সকল আচরণের মধ্যে শ্রীদুর্গা ছিলেন সর্ব্বস্ব। এমন কি যৌবনে বিবাহের প্রস্তাবে একজন দূতকের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও শ্রীদুর্গার সঙ্গে যে তাঁর কি গভীর যুক্ততা তা আমরা জানতে পারি তাঁরই সেই সময়কার লেখা চিঠিপত্র থেকে। সে সকল কথা সবিস্তারে এখানে উল্লেখ করতে গেলে বক্তব্য অনেক দীর্ঘ হ'য়ে যাবে।

ব্রজগোপীগণ যেমন কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে জীবনবল্লভরূপে লাভ ক'রেছিলেন, পুরুষোত্তমানন্দ তেমনি শ্রীদুর্গার আরাধনা ক'রে শ্রীনিত্য-গোপালকে লাভ ক'রেছিলেন। "রাধাকে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আগে"। প্রাণবল্লভকে লাভ ক'রতে হ'লে যোগমায়া রাধাপ্রকৃতি যদি অনুকূলা হন তবেই সম্ভব। পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে আমরা এইটে দেখেছি। রাধারাণীকে তিনি দেখেছিলেন বিশ্বরমণী নারীপ্রকৃতিরূপে, সকল নির্য্যাতিতের, শোষিতের সকল অপমানিতের মুক্তিদাত্রী রূপে। প্রকৃতিকে এই যোগমায়া রূপে তিনি ভজনা ক'রে গেছেন তাঁর সকল কর্ম্মে, সকল বচনে সকল মননে; ভোগ্যা প্রকৃতিকে, ভোগ্য সকল বস্তুকেই তিনি ভজনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন ব'লেই কোন ভোগই তাঁকে দুর্ভোগে ফেলতে পারেনি—পথ কেটে বেরিয়ে গেছেন,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি, শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন, যোগমায়া প্রকৃতি অনুকূলা হ'য়ে পুরুষোত্তম নিত্যগোপালের সঙ্গে তাঁকে যোগযুক্ত ক'রেছেন—তিনি নিত্যগোপালময় হ'য়েছেন।

শ্রীনিত্যগোপালতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব "উদাত্ত চচার" জন্যই পুরুষোত্তমানন্দের জন্ম; ইহাই ছিল তাঁর misson of life। যুগদেবতা শ্রীনিত্যগোপালের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে তিনি জীব জগৎ ও জগন্নাথকে দর্শন ক'রেছেন ব'লেই তাঁর লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অনুবৃত্ত ভাষ্যে, ১১ খানা উপনিষদের ভাষ্যে, গীতাভাষ্যে, ভাগবতপ্রদীপ গ্রন্থে এবং তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, পত্র ও বক্তৃতায় আমরা এই যুগের সকল সমস্যার সমাধানোপযোগী একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির বার্ত্তা পাই। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের পৃথিবী আর আজকের পৃথিবীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পরিণামী প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে হ'য়ে

অবস্থান্তর প্রাপ্ত হ'চ্ছে। এমন কি গত কালের পৃথিবীর রূপের সঙ্গে আজকের পৃথিবীর রূপের মিল নেই। গতকালের দেখা পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে যদি আজকের পৃথিবীকে দেখতে চাই সেখানেই গোল। শতের বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ আর আজকের ভারতবর্ষ কি এক? এমন কি ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টের ভারতবর্ষ আর ১৫ই আগষ্টের ভারতবর্ষের রূপে অনেক প্রভেদ। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'লে আমাদের চিন্তা ও আচরণেও যে পরিবর্ত্তন আনতে হবে এ তো অনস্বীকার্য্য। এই চিন্তা ও আচরণ অবশ্যই ১৫ই আগষ্টের ভারতবর্ষে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানোপযোগী হ'তে হবে তাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সেই চিন্তাধারা ও আচরণ কোথা থেকে উৎসারিত হবে, সে উৎসমুখ কোথায় তা ভারতবর্ষের কাছে তখনও পরিস্ফুট নয়। সেই সময়কার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা উদ্বোধন ভারতে প্রকাশিত অধ্যক্ষ মহারাজের লিখিত "আমাদের কথা" প্রবন্ধে তিনি এই প্রশ্নের অবতারণা ক'রে সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। ১। বৎসর পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন আজকে শুনলেই বুঝতে পারবেন কতখানি ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি থাকলে এই প্রশ্ন করা সম্ভব। তিনি লিখছেন—"ভারতবর্ষ আজ সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ শেষ প্রশ্নের সম্মুখীন। তাহার প্রশ্ন আজ আর বিশেষ কোনও ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া নয়; তাহার প্রশ্ন সর্ব্বতোমুখী। জটিল এই প্রশ্নসমূহের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন্ত সৃষ্টির যাত্রাপথে অচলায়তন ভারতবর্ষের মূলতঃ স্থিতি-প্রধান কৃষ্টির পিছটান তাহার গতিরোধ করিবেই। ভারত আজ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে দো-টানার দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া। ব্রিটিশ আজ আর নাই; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক প্রেরণা সে এতদিন পাইয়াছে, সে রাজনীতি—তাহা আবেদন নিবেদন বা পারস্পরিক সহযোগই হউক, সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অহিংস অসহযোগই হউক—আজ সর্ব্বতোভাবে অচল। সে প্রেরণার কেন্দ্র আজ তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর তো "কুইট ইণ্ডিয়া" বাণী তাহার দেশ-প্রেমের প্রেরণা দান করিবে না। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে ব্রিটিশের রুদ্র পীড়নে যে আত্মশক্তি জাতির বুক চিরিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে শক্তির উৎসকে কোথায় আজ ন্যস্ত করিবে? কোনও নূতন ইঁ-বর্ম্মী (Positive) ব্যাপক ও গভীর দর্শন ও ভাবধারার পথে না লইলে তো পুরাতনকে হজম করিয়া আগাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। কে তাহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন প্রেরণা যোগাইবে? ব্রিটিশ ভারতও নাই আবার দার্শনিক যুগের স্থায়ধর্ম্মী, প্রজ্ঞাবাদী যে ভারত নেতিবাদের যুক্তিতে জগতের ওপারে তাহার ইষ্ট লোকের ধ্যানে ব্যাপৃত ছিল, সে ভারতও নাই। তার প্রবাহে তাহারই অন্তর হইতে উদ্ভূত প্রাণঘন বৌদ্ধ প্রাণ ও বহির্গত প্রাণের ধাক্কায় গতিক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বে যন্ত্রচালিতবৎ সামনের দিকে অনেকখানি সে আগাইয়া আসিয়াছে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রাণস্পন্দনসমূহকে হজম করাইয়া ভারতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত ও পরিপুরিত করিবার জন্য নানক-কবীর তুলসীদাস প্রভৃতি বীরভক্তগণ ও দার্শনিক সমাজ-সংস্কারকগণ, বাংলার গৌরসুন্দর এবং বর্ত্তমান যুগের দয়ানন্দ রামমোহন প্রভৃতি পুরুষসিংহগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সমাজের একটা অংশকে; সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজ-কাঠামোর মেরুদণ্ডস্বরূপ দর্শন ও চিন্তাধারাকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া না নেওয়ায় ফলে তাঁহারা সনাতনকে ধাক্কা দিতে গিয়া নিজেরা বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িলেন। যেই সনাতন সে সনাতনই রহিয়া গেল। ভারতবর্ষ কি আবার পিছে ফিরিয়া অতীতকেই তীব্র সবেগে জাঁকড়াইয়া থাকিবে না অতীতকে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া প্রাণধর্ম্মের উদ্দাম স্রোতে একান্ত বর্ত্তমান জীবনের পথ বাহিয়া চলিবে সে যে বহির্গত প্রাণধর্ম্মীদের আকর্ষণে, অনেকটা দূর আসিয়া পড়িয়াছে। পিছন ফেরার পথ ও সুযোগ কি

তাহার এতটুকুও খোলা আছে? সামনে তাহাকে চলিতেই হইবে—অথচ সামনে পথ চলিবার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান কিছুই তাহার জানা নাই।.....রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যেমন নিরালম্ব, সাহিত্যক্ষেত্রে সে বিষয় ততোধিক ঘনীভূত।..... আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা ত্রিশঙ্কুবৎ অবস্থান করিতেছি। ইহলোক-পরলোক, নর-নারী, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক ও হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সনাতন ভারতের স্বাধু চিন্তাধারা এতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া ইংরেজ এ দেশকে পদদলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর ও বিস্তৃত প্রাণোপাসনাকে কার্য্যাত্মকরূপে সমাজব্যবস্থায় প্রয়োগ করিতে না পারার ফলে সমাজব্যবস্থায় যে ফাঁকি রহিয়াছিল, ফাঁকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই অন্তরাল দিয়া একান্ত প্রাণধর্ম্মী বহিরাগতদের আক্রমণ সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাণধর্ম্মের সব জটিলতা কুটিলতা হইতে মুক্ত একটি নিরেট সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পশ্চাতেই সিঁড়িতন্ত্র (ladder system) নিরঙ্কুশস্বামী পুরুষতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও নিবৃত্তিসর কৃষ্টি আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সে দিন ভারত শুধু নিজেকে গুটাইয়াই আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে, আত্মপ্রসারের কোন সাধনাই সে বরণ করিতে পারে নাই। বহিরাগত ব্রিটিশ শক্তি আজ তাহাকে যখন ইহকাল-সর্ব্বস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, নারীকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছে, নিম্নবর্ণের অন্তরে সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে, শ্রমিক-সঙ্ঘ রচনার মধ্য দিয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, মুসলমানকে ধর্ম্মযুদ্ধের নেশায় উন্মাদ বানাইয়া পাকিস্থান স্থাপনে প্রেরণা জোগাইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষের চক্ষু মেলিয়া বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর মিলিয়াছে। সে অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছে যে, সে তো আর পূর্ব্বের মত ঘর লইয়াই "ঘর" সামলাইতে পারিবে না, তাহাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। আজ কী তাহার আশ্রয় হইবে? ইহকাল না পরকাল? ঘর না বাহির? পর না আপন? সে যদি আজও ইহার সমন্বয় বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তবে পরস্পর-বিরুদ্ধদের রক্তাক্ত সংঘর্ষে তাহার অস্তিত্বই মুছিয়া যাইবে। বাহিরের মধ্যে ঘরকে, ঘরের মধ্যে বাহিরকে গলাইয়া দিয়াই আজ তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ভারতকে বিশ্ব-ভারত হইয়াই উজ্জয়ন্তভারতে গড়িয়া উঠিতে হইবে।"

ভারতবর্ষে আজ যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধদের সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তেমনি, রোগ লক্ষণের তফাৎ হলেও আজ সমগ্র বিশ্বই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিমূঢ়। আজকের বিশ্বে সব চাইতে বেশী উচ্চারিত শব্দ হচ্ছে "শান্তি"। কিন্তু "শান্তি" মানুষের প্রতি বিমুখ। ঘরে বাহিরে আজ মানুষের কোথাও শান্তি নেই: দ্বন্দ্ব (সংঘর্ষ) আজ মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে—স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব, পিতামাতা-সন্তানে দ্বন্দ্ব, ভাই এর সঙ্গে ভাই-এর দ্বন্দ্ব, স্বার্থে পরার্থে দ্বন্দ্ব, সংসারী সন্ন্যাসীতে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব আজ এমন উৎকটরূপ ধারণ ক'রেছে যে যন্ত্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজই বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত। এমন দুর্দ্দিন বুঝি জগতের সামনে আর কোনদিন উপস্থিত হয় নি। এমনি দুর্যোগপূর্ণ দিনে এমন কোন্ কর্ণধার আছেন যিনি মানব সমাজ-তরণীকে শান্তির কূলে ভিড়িয়ে দিতে পারবেন?

দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি? উভয়পদার্থপ্রধানঃ দ্বন্দ্বঃ। যেখানে প্রতিটি পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থই প্রধান থাকে সেখানেই দ্বন্দ্ব-সমাস। দ্বন্দ্ব অর্থ ঝগড়া, দ্বন্দ্ব অর্থ মৈথুন। রাগ-দ্বেষ যুক্ত মন বুদ্ধি ইহার সমাধান দিতে আজ অপারগ। যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্। মন একই কালে একই স্থানে দুইটি বিপরীত পদার্থকে ধারণা করতে পারে না। তাই সে দ্বন্দ্বে সংঘর্ষই দেখে। এই দর্শন থেকে যাত্রা সুরু করার ফলেই মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র রক্তাপ্লুত।

দ্বিতিধর্ম্মী ভারতও জীব জগৎ ও ব্রহ্মের ব্যাখ্যানে পুরুষ প্রকৃতিতে প্রধান অপ্রধান দর্শন ক'রে মূলেই

সংঘের বীজ উপ্ত ক'রেছেন। তাই পুরুষোত্তমানন্দ ব'লেছেন "সমাজ কাঠামোর মেরুদণ্ড স্বরূপ দর্শন ও চিন্তাধারাকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া নিতে হইবে"। সেখানে "ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত, প্রকৃতি অনাদি বটেন অনন্ত নহেন" সেখান থেকেই বৈষম্যের সূত্রপাত। প্রকৃতি পুরুষের ক্ষেত্রে সম-অন্বয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে ঐ মূল হইতে উদ্ভূত সংসার বৃক্ষের সকল অঙ্গই বৈষম্য বিষে জর্জ্জরিত। এই সংঘাত, এই বৈষম্যের হাত থেকে জগৎকে রক্ষা করার জন্য শ্রীনিত্যগোপাল অবতীর্ণ হ'লেন সমন্বয়ের বার্ত্তা নিয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন, "পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।" তিনি আরও ঘোষণা করলেন, "নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। সাকার-আকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।"

সৃষ্টি-রহস্যের মূলে idea আগে না reality আগে, spirit আগে না matter আগে, আত্মা আগে না বস্তু আগে এই নিয়ে বিবাদ সব দেশেই আছে। ভারত আত্মা আগে ধরে নিয়ে যে logic সৃষ্টি ক'রেছে তাতে সে একান্ত স্থিতিধর্ম্মী কৃষ্টি গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য matter আগে ধরে নিয়ে জড়বাদী সভ্যতায় বর্দ্ধিত হ'য়েছে। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর "জড়াজড় সমন্বয়ের" মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিপরীত দর্শন-মধ্যে মিলনসেতু রচনা করলেন। আসলে তো সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন, শ্রুতিরই ভাষায়, "তৎ তু সমন্বয়াৎ"। সৃষ্টির মূলে ব্রহ্ম আছে এ যেমন সত্য এবং ঐ ব্রহ্মে সমন্বয় আছে এও তেমনি সত্য। সেই জন্যই সৃষ্টির আদি কারণ পুরুষোত্তম বস্তুতে সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলতা লাভ করেছে। এই জন্যেই এ তত্ত্বতম তত্ত্ব অবাঙ্-মনোগোচর। শ্রীভগবান নিজ মুখেই নিজেকে সামাসিকস্ত স্বয়ং ব'লে ঘোষিত করেছেন।

শ্রীনিত্যগোপালের এই ব্রহ্ম সমন্বয়ের বীর্য্যবান বাণী অন্তরে ধারণ ক'রে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ যে নূতন ব্যাখ্যানশাস্ত্রের অনুসন্ধান ক'রেছেন তা সত্যই অভিনব। আমাদের দেশের প্রচলিত সকল উপনিষৎ, সকল উপনিষদের সার গীতা-উপনিষৎ, ভাগবৎ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমন্বয়মূলক মন্ত্রে ভরপুর। তাই তিনি সমস্ত উপনিষদের মধ্যে প্রধান ১১ খানা উপনিষদের, ব্রহ্মসূত্রের, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যে এবং তাঁর অন্যান্য সকল রচনার মধ্যে ভাগবৎ উপনিষদাদি গ্রন্থ মন্থন ক'রে যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব্ব-সমন্বয়ের উপদেশের অভ্রান্ততাই প্রতিপাদিত ও স্থাপিত হয়েছে। তাঁর এই সকল মধুর ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি যে অতি উদারের পুরুষোত্তমদর্শন, পুরুষোত্তম কৃষ্টির সন্ধান দিয়েছেন তার জন্য ঋষিপাদবিদ্ধ, তাপ জর্জ্জরিত সকল জগৎবাসী শ্রদ্ধাবনতঃ চিত্তে শ্রীনিত্য-গোপাল-পুরুষোত্তমানন্দকে স্মরণ করবে একথা আমরা আমাদের সকল সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করি।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি—" পুরুষোত্তমের এই লীলাময় জগৎ যখন আনন্দ হ'তে উদ্ভূত তখন সেই আনন্দস্বরূপকে আস্বাদন করার প্রেরণায়ই জীবজগৎ পুরুষোত্তম সংসারে, কর্ম্মজগতে অনুপ্রেরিত হচ্ছে। সর্ব্ব-সমন্বয়ের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তম আমাদের নিকট স্বরূপতঃ স্বতঃসিদ্ধ, সহজসিদ্ধ, নিত্য-সিদ্ধ (fact), তবে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে পাওয়ার সাধনায় (task) জীবজগৎ জ্ঞানে অজ্ঞানে ব্যাপৃত। এই-ই হচ্ছে পুরুষোত্তমলীলা। এই লীলাদ্বন্দ্বের বিরোধিতা জীবের পক্ষে সম্ভবে না। লীলাদ্বন্দ্বের অনুগত হ'য়ে চলাই জীবের স্বধর্ম্ম, সৎধর্ম্ম। এই পুরুষোত্তমলীলাতত্ত্ব না মেনে অহংকারবিমূঢ়াত্মা "নষ্টান্ অচেতসঃ" হবেই। পুরুষোত্তম বিধি লঙ্ঘন করার ফলে বিধি তো বাম হবেই। প্রকৃতির নিয়মানুসারেই এটা হবে। যখনই সমন্বয়-বিজ্ঞানরূপ বাস্তব ধারাকে ছেড়ে অবাস্তব বিজ্ঞানকে অবলম্বন করা হয় সেখানেই সব বিপর্য্যয়। সম-ভাব তাঁর সমস্ত পদার্থের মধ্যেই বিদ্যমান, সমত্বং যোগ উচ্যতে—সম-যোগে তিনি সকল পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রে যখন এই সম

ভাব লক্ষিত হয়—তখনই প্রকৃতিও ক্ষুব্ধা হন। জীবের প্রতি আঘাত আসে যারা আসে পুরুষোত্তমধর্মাভ্যুদয়েই তাকে ধ্বংস করার জন্য, দুঃখ করার জন্য, রোগবিকার থেকে রক্ষা করার জন্য। যার যে রূপ তা থেকে ভিন্নরূপ হওয়ার নামই বিকার। পুরুষোত্তমরূপ হ'তে ভিন্নরূপ হওয়াই হ'চ্ছে বিকার, রোগ। পুরুষোত্তম রূপটি কি? আমরা তাঁর অতি সুন্দর রূপটি অতি অল্প কথায় পাই পুরুষোত্তমানন্দ রচিত শ্রীনিত্যগোপাল-প্রণাম মন্ত্রে। তিনি ভক্ত, তিনি ভগবান। প্রথমতঃ আমরা জীব-ভক্ত। ভক্তের ধর্মাভ্যুদয়ে ভক্ত চান ভগবানকে, ভগবান চান ভক্তকে: ব্যাপ্তিযোগে ভগবানই ভক্ত, ভক্তই ভগবান। শ্রীনিত্যগোপালই একাধারে ভক্ত-ভগবান। এই ভক্ত-ভগবান-রূপ আস্বাদনীয় জাগ্রৎ স্তরে, স্বপ্নের স্তরে, সুষুপ্তি স্তরে, তুরীয় স্তরে, তুরীয়াতীত স্তরে। মানুষ এই পাঁচটি স্তরেই বিদ্যমান। শুধু জাগ্রতের স্তরে কিম্বা স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তির স্তরে মানুষ থাকে না। সব স্তরেই মানুষ যখন ঘোরাফেরা করে তখন সব স্তরেই ভক্ত-ভগবান-রূপ আস্বাদনীয়। মানুষ একটি স্তরের বিষয় যখন তিনি মন তখন কেবল সুষুপ্তির স্তরে তাঁকে আস্বাদন করার অর্থ তাঁকে আংশিক আস্বাদন করা। তাঁকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হ'লে সব স্তরেই আস্বাদন করতে হবে। এই ভাবে ভক্ত-ভগবৎরূপে ব্যক্তি সত্তারই যোগ্যতা জন্মায় পরবর্তী ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তমে যুক্ত হওয়ার। এবং তাইই মানবের পরিপূর্ণ রূপ।

পুরুষোত্তমানন্দের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি—একজন ব্যক্তির ঠিকানা বলতে হ'লে বলতে হয় প্রথমতঃ তার নাম, তারপর পিতার নাম, পাড়ার নাম, গ্রামের নাম, পোষ্টাপিসের, জিলা, দেশ। এইভাবে সে বিশ্বের, বিশ্বাতীতের পর্যন্ত। এতখানি জুড়ে একজন ব্যক্তির অবস্থিতি। শ্রীনিত্যগোপাল বলেছেন—"অল্প অগ্নিও পূর্ণ অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অগ্নি হইতে পারে"। ছোট্ট একটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এতখানি হওয়ার বীজ নিহিত আছে। তিনি যে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"।

কোন্ ছন্দে, কোন্ কৌশলে এ সম্ভব তার দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের লিখিত "আমাদের কথা" প্রবন্ধে, যা থেকে আমি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্নগুলি আপনাদের শুনিয়েছি, সেই প্রবন্ধেই তাঁর লিখিত সমাধানের উপদেশ তাঁরই ভাষা থেকে আপনাদের শুনাচ্ছি। স্বামিজীর কাছে সকল সমস্যা ও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান এক। স্বামিজী লিখছেন, "স্থিতি-গতি, প্রাণ-প্রজ্ঞা, ঘর-বাহির, আপন-পরের, এক কথায় সব পরস্পর-বিরুদ্ধ ও পরস্পর-পরিপূরকদের সন্নিহিত ঘন আস্বাদনই হইতেছেন সার্থক বিশ্বরূপ ও ঐতিহাসিক মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই জড় জগতের বুকে অজড় আদর্শলোকের একটি পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র বিশ্বের দরবারে সর্ব্বপ্রথমে প্রকট করিয়াছেন। তিনিই নিজেকে শ্রীগীতাগ্রন্থে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্টিই পুরুষোত্তম-কৃষ্টি, উজ্জ্বল ভারতের কৃষ্টি। পুরুষোত্তম কৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর্য্য, অনার্য্য, বৌদ্ধ, ইসলাম এবং পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির পরিণতি ঐ কমিউনিজ্‌ম্ কৃষ্টিসমূহের সমন্বয়ের উপাদান; ইহাই ইতিহাসের বিবর্ত্তনের ধারা বহিয়া আজ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বসভ্যতার ভিতর দিয়া আসিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বাস্তবের ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেইভাবেই তাকে ভজনা করি। 'কৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন'। প্রচলিত প্রত্যেকটি-ism দ্বারাই তাঁহার জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যাত হইতে পারে।"

স্বামিজীর কাছে ভাল ভাতের সমস্যা দেশের সমস্যা আর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ছিল একাকার। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাজনীতি করি না, রাষ্ট্রনীতি করি"। আমরা যখন আমাদের অখণ্ডরূপের কথা ভুলে গিয়ে খণ্ডরূপের মধ্যে আমাদের সর্ব্বস্ব দেখি তখনই অপরাপর খণ্ডগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। সে খণ্ড কোন বিষয় হোক, অথবা হোক বা ভাব হোক। অখণ্ড পুরুষোত্তমসত্তা তো সর্ব্ব-

বিষয় এবং তার প্রতিবাদ ও প্রতি বিষয়সকল দীনতা লাভ করে। তিনি সঙ্ঘমূর্ত্তি, গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃত। তাই স্বামিজী সঙ্ঘজীবনে বিশ্বাস ক'রতেন। এই সঙ্ঘ-জীবন কার্য্যাত্মকরূপে আস্বাদন করার জন্য তিনি তাঁর পরিবার ও অন্যান্য পরিবার নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। নরনারায়ণ আশ্রমের প্রথম সভ্য সভ্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী, পুত্রকন্যাগণ। তিনি একটি ব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বব্যাপকতা আছে দেখেছিলেন বলেই যাকেই শিষ্য-রূপে গ্রহণ ক'রেছেন তার পরিবারের সকলকেই নিজের মতনই আপন দেখতেন।

আজ ভারতবর্ষ, তথা ভারতবাসী ও বিশ্ববাসী ঘরে বাইরের সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা পেতে পারে শ্রীনিত্যা-গোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ কথিত ও আচরিত এই পথকে অবলম্বন করলে। আমার নিজ জীবনের অনুভূতি দিয়ে আমি আজ দৃঢ়-নিশ্চয় এই পথই বর্ত্তমানে একমাত্র পথ। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থিত থেকে প্রত্যেকে যদি পুরুষোত্তম-বিধানে বিশ্বজীবন লাভের সাধনায় তাদের সকল দেহমনআত্মা নিয়ে বিশ্বের সকলের সঙ্গে হাতধরাধরি ক'রে এগিয়ে যেতে চায় তবেই, বর্ত্তমানে যে তার সকল গতি রুদ্ধ হ'য়ে যেতে চাইছে, আমার সাধনার সুন্দর আনন্দময় হবে। ভারতবর্ষের সকল প্রশ্নের শেষ সমাধান এই পথেই আসতে পারে। আমার ব্যক্তিজীবনেও আশা নিরাশা নাগ্রাছাড়া হ'য়ে আমাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না যে পরিমাণে আমি এই পুরুষোত্তমতত্ত্বের নিকট শরণাগত হ'তে পারি। শরণাগতির পথে বিনিময় বর্জ্জনে আশ্রয় ক'রে আমাদের ব্যাপক ও গভীর জীবন লাভ করার সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। শ্রীনিত্যগোপাল ও পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন। মহীয় আচার্য্যদেব পরম করুণাময় পুরুষোত্তমানন্দের জন্য আমাদের জীবনে সার্থকরূপ পরিগ্রহ করুক এই প্রার্থনা।

৮২-তম জন্মদিনে

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ, মায়েরা ও বোনেরা—আজ আমরা এখানে যাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণ ক'রে মিলিত হয়েছি তিনি আজ দেহে অনুপস্থিত। তবু একথা আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের আজ ৮২তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ঠিক এমন একটি দিনে তিনি বরিশাল জেলার কাঁকড়দা গ্রামে পিতা নীলকমল ঘোষ, মাতা মুক্তকেশীর কোল আলো করে জন্মেছিলেন। জন্মকাল থেকে ছয় বছর পর্যন্ত তিনি মুখে কথা বলতে পারতেননা। মাতা মুক্তকেশীর মনে বড় ব্যথা এমন সুন্দর ছেলে, অথচ কথা বলতে পারে না! তিনি বোবা রাজার পুত্রে তুরে পুত্রের মুখে কথা এনেছিলেন। স্বামিজীর নিজ মুখে আমরা শুনেছি, তিনি বলতেন আমি ছয় বছর পর্যন্ত বোবা ছিলাম, কিন্তু কথা যখন শোনাম তখন যে খুব কথা বলতাম তা নয়, বড় চুপো ছিলাম। এক স্থানে তিন চার জন লোক একত্রে থাকলে সেখানে আর কথা বলতে পারতাম না—লজ্জা করত সেই চুপো মানুষ আমি শ্রীনিত্যগোপাল দেবের আশীর্ব্বাদে বাংলাদেশের শত শত গ্রামে গিয়েছি এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সংগে মিশেছি ও বক্তৃতা দিয়েছি। স্বামিজী জীবনে শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। তিনি

শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন তত্ত্ব সামনে রেখে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। এই মহান জীবনটিকে বুঝতে গেলে শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন, নতুবা স্বামিজীর জীবন বোঝা সহজ হবেনা।

গীতায় ভগবান বলেছেন :

পৃথিবীতে যখন ধর্ম লোপ পেতে বসে, অধর্ম যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন আমি নিজেকে নিজে যুগোপযোগী করে সৃষ্টি করি। আর সেই সময় আমি সাধুদের রক্ষা করি এবং দুষ্টদের শাস্তি দিই। শ্রীভগবানের একথা আমরা ভারতবাসী বিশেষ ক'রে হিন্দুরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমরা জানি তিনি একবার নৃসিংহ রূপে জগতে এসেছিলেন, একবার রামরূপে জগতে এসেছিলেন, একবার শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে এসেছিলেন। এমনি ভাবে তিনি বিশ্বের বুকে তথা ভারতের বুকে বহুবার এসেছেন এবং তাঁর অলৌকিক জীবন-দর্শন দ্বারা মানুষের চিন্তার উৎকর্ষসাধনও করেছেন। বর্তমান যুগে আমরা শ্রীভগবানের দুই রূপ বা দুই দিকপাল মহাচিন্তানায়ককে দেখতে পাই। প্রথম জন হলেন বিশ্ববরেণ্য ও বিশ্বপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং দ্বিতীয়জন হলেন সমন্বয়াবতার শ্রীনিত্যগোপালদেব : শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সমাধির ভাষায় বলেছিলেন "নিতা, তুইও এসেছিস আমিও এসেছি"। একথার তাৎপর্য আমরা স্বামিজীর মুখে ও তাঁর বিভিন্ন লেখায় পেয়েছি। মূলকথা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপাল এই দুই জনই হলেন এক সমপ্রকৃত। এই সমপ্রকৃতের একদিক শ্রীরামকৃষ্ণদেব, অপর দিক শ্রীনিত্যগোপালদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমন্বয় ধর্মের প্রথম পর্যায় দিয়েছেন, তিনি বহু দেব-দেবীর নামে সমাধিস্থ হয়েছেন, আল্লার নাম নিয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন, খ্রীষ্টের নাম নিয়েও তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অহংকের দিক সমন্বয় করেছেন। আর শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয় করেছেন জড় ও অজড়ের সমন্বয়। তাঁর জীবন-দর্শনে কিছুকে একান্তভাবে বাদ দেওয়ার কথা নেই।

পরমহংসদেবের উক্তিতে আছে "আমি বেছেবেছে নেব; নিতা কি তা নেবে, নিতা যা পাবে তাই নেবে। আমি তাজা গোবরে ঘুঁটে দেব, নিতা পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে" ইত্যাদি। শ্রীনিত্যগোপাল হ'লেন পচাগোবরে ঘুঁটে দেবার দলের লোক। বর্তমান বিশ্বে পচন ধরেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পচন ধরেছে, কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, কি ধর্মনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ পচন শুরু হ'য়েছে। একস্থানে চুপচাপ করে বসে বসে ধর্মকর্ম করার দিন আজ আর নেই। যান্ত্রিক যুগে মানুষ হয়ে হ'য়ে দিনরাত মেশিনের সংগে পাল্লা দিয়ে চলেছে—এর মধ্যে কোন্ ধর্ম নেওয়া চলে? শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন-দর্শন এখানে আলো দেখাতে অদ্বিতীয়। তাঁর জীবন-দর্শনে আমরা দেখতে পাই সন্ন্যাস, সংসার, ধর্ম, রাজনীতি সব একাকার হয়ে গেছে। ট্যাঁকে টাকা আর সমাধিতে তাঁর এতটুকু আটকায় না। যে মানুষ মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হচ্ছেন—সেই মানুষটিই আবার সংসারের ছোটখাট ঘটনার বস্তুর উপরও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন—এ কি অলৌকিক নয়! আমরা এতদিন শুনেছি হয় সংসার করব, নয়তো সন্ন্যাস করব; হয় ভোগী হব, নয়তো যোগী হবো, আমরা পরস্পর বিরুদ্ধ দু'টি ভাবধারাকে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারিনি, কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে সে সব ভাবের সমন্বয় হয়েছে। বিভূতির অন্ত ছিলনা তাঁর জীবনে। শ্রীনিত্যগোপালদেব যখন সমাধিস্থ হ'য়েছেন সেই সময় তাঁর শিষ্যগণ বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি আল্লার নামে সমাধিস্থ হয়েছেন, কৃষ্ণের নামে সমাধিস্থ হ'য়েছেন, গৌরের নামে সমাধিস্থ হয়েছেন, খ্রীষ্টের নামে সমাধিস্থ হয়েছেন—কোনটিতেই তাঁর আটকায় নাই, তাঁর জীবন ছিল এমনই সহজ, নমনধর্মশীল (flexible)। তারপর দিনের পর দিন অনাহারে থাকা, জলের মধ্যে দিনের পর দিন ডুবে থাকা, ইত্যাদি বিভূতি তাঁর জীবনে অভাব সাধারণ ছিল। শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন-তত্ত্বে যতই অবগাহন করা যাবে ততই বিশ্বমানবতা বোধ, বিশ্বের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, স্বভাবতই নেমে আসবে। তাঁর জীবন-দর্শন-তত্ত্ব এতই বিরাট ও ব্যাপক যে জগতের সমস্ত

বিপরীত মতবাদই তাঁর মধ্যে মিলে মিশে থাকতে পারে। আজকের দিনের মানুষের জীবনে যে সমস্যা, এ সমস্যার বাইরের দিক দিয়ে শুধু সমাধান করার চেষ্টা ক'রলে চ'লবেনা। মেসিনের মত হতে গেলেও চলবে না। আজ মানুষকে আরো একটু গভীর ভাবে তলিয়ে চিন্তা করতে হবে ভগবান এই সমস্যার মধ্য দিয়ে কি ইঙ্গিত দিচ্ছেন—তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে হবে। শ্রীনিত্যগোপালদেব আজ থেকে ৭০।৮০ বছর পূর্বেই আজকের এই সমস্যা দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি আমাদের জন্য তাঁর দিব্য জীবনদর্শন-তত্ত্ব রেখে গেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ এই শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন তত্ত্বের সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, আহুতি দিয়েছিলেন। তাঁর নিজমুখে আমরা শুনেছি তিনি বলতেন "শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন পাওয়ার পূর্বে নারী-নরকের দ্বার, অসার এ সংসার মন ছাড়রে একবার, ইত্যাদি বুলিকে আমি অনুসরণ করে চলতাম, মেয়েদের মুখের দিকে চাইতাম না...। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-প্রসাদে আজ আর সংসার অসার মনে হয় না। ওরা বলেন "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে", আমি বলি কবে তৃষিত এ মরু গড়িয়া তুলিব তোমার রসাল নন্দনে। আমি যে বিশ্বকে বৃন্দাবন ধামে গ'ড়ে তুলতে চাই। আকাশের গোলোক বৈকুণ্ঠকে মর্ত্যের পচাগলা ধূলিতে গড়তে চাই। এই পাগল প্রাণ এ ছাড়া তো আর কিছু চায় না। প্রতি ঘরে ঘরে আমি দেখতে চাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শিব দুর্গার রূপ ইত্যাদি।" এই যে স্বামিজীর আকুল প্রাণ, পৃথিবীর মানুষের জন্য কান্না এর মধ্যে র'য়েছে শ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবন-দর্শন তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। স্বামিজীর জীবনে রাজনীতি ধর্মনীতি, সংসার সমাজের কোনও বিপরীত মতবাদ বাদ পড়েনি। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরও স্ত্রী-পুত্রকে সংগে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলন করেছেন, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বিরাট খ্যাতির সংগে দেশসেবা করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামিজীকে যারা সন্ন্যাস অবস্থায় দেখেছেন তাদের অনেকের মুখে শুনতে পাই যে তিনি রাজনীতি ছেড়ে শেষে সন্ন্যাস নিয়েছেন, কিন্তু একথা মোটেই ঠিক নয়; কারণ, শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবনে একান্ত বাদ ছাদ দেওয়া ব'লে কিছু নেই। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরও তিনি রাজনীতি করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের নীতিকে শ্রদ্ধা করেছেন, তবে বর্তমান সময় রাজনীতির মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ ও মোসাহেবী ঢুকেছে; একে তিনি কোনদিন সহ্য করতে পারেন নি। আপনারা যারা তাঁর উদাত্ত বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন দেশের জন্য তিনি কি ভাবে কেঁদেছেন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ইংরেজ তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে বাধ্য করে। জেলে বসে রাজবন্দী অবস্থায় থাকাকালীন তিনি এগারখানা উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর এই ভাষ্যগুলি সবই শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। বর্তমান যুগে তাঁর বইগুলি জনসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনের ছিল কিন্তু সমাজের মানুষ আমরা, এখনো আমাদের মন সর্বতোমুখী হয়ে উঠছে না, onesided মনোবৃত্তি এখনো সমগ্রের কথা চিন্তা করে উঠতে পারছে না; তবে একথা আমি গর্বের সংগে বলতে পারি যে, মানুষ আজ হোক আর দুদিন পরে হোক তাঁর মতবাদ, জীবন-দর্শন একদিন গ্রহণ করবে, এ গ্রহণ করার মধ্যে কোনরূপ চাপ বা ধর্মের অনুশাসন থাকবে না—মানুষ তার স্বাভাবিক ক্ষুধার প্রেরণাই গ্রহণ করবে।

স্বামিজীর দিব্যজীবনের মাঝে বা তাঁর জীবন-দর্শন তত্ত্বের মধ্যে সংসারের সমস্ত বিষয়ের একটা সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাধারা পাওয়া যায়। তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না বৌদ্ধ, না জৈন,—কোনটিই তিনি একান্ত ভাবে ছিলেন না। আমরা সাধারণ মানুষ, জীবিতাবস্থায় তাঁকে চিনতে পারিনি। সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁকে সেইভাবে কথা বলেছি, ব্যবহার করেছি—আজ সে কথা চিন্তা করলে চোখে জল আসে। তিনি

যখন বক্তৃতা দিতেন তখন দেখেছি, মানুষের জন্য কি ভাবে চোখের জল অবিশ্রান্ত ভাবে ঝ'রে পড়েছে—শুনেছি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বাণী। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর বলতেন। আমার বিশ্বাস হয় স্বামী বিবেকানন্দ যেমন পাশ্চাত্যদেশকে ভারতের সাম্যমৈত্রী ও হিন্দু ধর্মের কথা শুনিয়াছিলেন, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ চোখের জলে হয়তো পশ্চিম দেশটি ভাসিয়ে দিতে পারতেন। জানিনা তিনি পশ্চিম দেশে যাননি কেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ আমার গুরু ও ইষ্টদেব। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান পেয়েছি—এটাই আমার জীবনে সবচেয়ে গর্বের বিষয়। তিনি সংগে আছেন এটা ভাবতেও যেন কত আনন্দ লাগে। আজ তাঁর ৮২ তম জন্মদিনে তাঁকে শুধু আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি জানাব আর জানাব সহস্রবার কৃতজ্ঞতা। যে দিব্য জীবন-দর্শন তিনি আমার সামনে ক্রমশঃ উন্মোচন করছেন তা ভাবতে ও চিন্তা করতে যেন ক্লান্তি লাগে না। তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যে আজ নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখছি নূতন সংসারের স্বপ্ন দেখছি, নূতন করে বিশ্বের জীব-জগৎ সব কিছুকেই দেখছি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর জীবন-দর্শন তত্ত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে পারি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যেন বলতে পারি :—

বাহিরের এই ভিক্ষাঝুলি খালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি
অন্তর মোর গোপনে যাক ভরে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীরাধেশ্যাম মজুমদার

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮২-তম জন্ম তিথি উপলক্ষে আজ আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। আজ ছয় বছর হয়ে গেল স্বামিজী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর এই মহাপ্রস্থানে আজ আমাদের মনের মধ্যে এনে দিয়েছে শূন্যতা। আজ অতীতের সেই শোকাচ্ছন্ন দিনটির কথা স্মরণ করে নিজেদের বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে। স্বামীজী ছিলেন তত্ত্বমূর্তি। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব জীবনে আস্বাদন করাই ছিল তাঁর সাধনা। একটা বিরাটের আহ্বান তাঁর প্রাণের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ কৃষ্ণ মেঘের আবরণকে ছিন্ন করে চমকে উঠল বিদ্যুতের সেই ঝলক, শরৎ কুমার শরৎ ঋতুর মত অপরূপ রূপমাধুরী নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন মানুষের প্রাণের দরবারে। ঠাকুর নিত্যগোপালের স্পর্শে তাঁর ভিতর থেকে নূতন জীবনচেতনা নিয়ে বেরিয়ে এল এক নূতন মানুষ। অনন্তত্বের সাধনায় তিনি ছড়িয়ে দিলেন নিজেকে বিশ্বের দরবারে। এই বিরাট বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে সকল বিপরীতের মধ্যে দেখালেন একটা অতি নিকট সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব-মোহমুক্ত জীবনের ইঙ্গিত। বিশ্বের অনন্ত লীলার মধ্যে অবগাহন করে প্রমাণিত করে গেলেন এই বিশ্ব প্রকৃতি কত বিরাট, কত বড় অক্ষয়। যুগ যুগান্তর ধরে এর লীলা চলে আসছে, তবুও এ আর ফুরায়না। তাই বিশ্বকবিও গেয়েছেন—

অকূলের অমৃত বহিয়ে
চঞ্চলতায় নাচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি যে
নেই নেই করে আছে।

এই বিশ্ব যেমন অসীম, এর ইতিহাসও তেমনি ব্যাপক, এর লীলা মাধুরীও অসীম। অনন্ত কালধরে সৃষ্টি রহস্যের সঙ্গে এর একটা অভেদ সম্পর্ক রয়ে গেছে।

আজ থেকে শত বৎসর আগে শ্রীনিত্যগোপাল সব রকম বিপরীতের সমন্বয় করে চিন্তাধারায় এমন একটা বীজ সমাজের তথা বিশ্বের দরবারে রেখে গেছেন যে তাঁর সেই অমৃত বাণী বর্ত্তমান যুগ-সন্ধ্যায় একটা মস্ত বড় অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। তিনি সর্ব সমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়।

এই বিপুল বিশ্বে আজ কি রাজনীতির ক্ষেত্রে কি সমাজ-নীতির ক্ষেত্রে আনতে হবে এক নূতন বিপ্লব। আজ মানুষের মনের অতীতের সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারাকে বিদায় দিয়ে তার আসনে নূতনের ভাবপুষ্ট দার্শনিক চিন্তাকে বসাতে হবে। সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী আজ এই অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সৃষ্টির মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে অতীতে শুভ সু ও কু এর সংমিশ্রিত ঘটনা। ভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একদিন ধরিত্রীকে সিক্ত করে দিয়েছিল, রাবণের দ্বারা সীতা হরণ ও লংকা ধ্বংসের কারণ ঘটিয়েছিল, বৃদ্ধির ক্ষেত্রে টেক্কা দিতে গিয়ে হিরণ্যকশিপুকেও নরসিংহের কাছে গোধূলি বেলায় প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সব রকমের ঘটনা এই বিশ্বের বুকে ঘটছে, তবুও কোথাও এক মুহূর্তের জন্য এর গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

এই বিশ্বে সকল বিপরীতের মধ্যে যদি আমরা এর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ লাভ করতে চাই তবেই সেটা সত্যিকারের পাওয়া হবে। একান্তভাবে একটির উপর বেশী মূল্য দিয়ে অপরটিকে পেতে গেলেই আসবে দ্বন্দ্ব। আজকের দিনে একান্তভাবে কোন বস্তুকে পাওয়া যাবে না। সবকিছু-কেই একটী সংঘের মধ্যে দিয়ে পেতে হবে। কৌলীন্য-বোধ মানুষকে তথা সমাজকে শত শত বৎসর ধরে এমন ভাবে ঘিরে আছে যে মানুষ আজও এই সংস্কারের জালে দ্বিতিশীল হয়ে আছে; এজন্য সে আজও গতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাই আজ মানুষ কর্মের সাথে আদর্শের, সংসারের সাথে সন্ন্যাসের, ধনের সাথে শ্রমের, দেহের সাথে মনের কোথাও সামঞ্জস্য আনতে পারছে না। ধনিক শ্রেণী এতদিন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর টুঁটি চেপে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছিল, আজ তাই সমাজে তার বিপরীত ফল ফলেছে। ফলে চলছে শ্রেণী সংগ্রাম। আজ কিছু সংখ্যক লোক বিভিন্ন মতবাদের বুলি বলে সমাজে সাম্য নীতি প্রচার করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সত্যি কিছু হচ্ছে কি? সমাজ এতদিন একচক্ষু হরিণীর মত যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকেই ছুটেছিল, আসল পথের সন্ধান করেনি। সমাজ এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার কোন উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু আজ থেকে একশত বৎসর আগে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই সমস্যার সমাধানের বীজ বপন করে গেছেন। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপালের সেই অমৃত বাণী অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বের সমাধানের কথা একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর সমাজের কাছে দাঁড় করিয়ে গেছেন। সংসারে বাস করে সবরকম বিপরীতের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে একটা সুন্দর জীবন যাপন করার ইঙ্গিত স্বামিজী মানুষের কাছে রেখে গেছেন। একটি নূতন বিশ্ব রচনা করবেন এই সংকল্প মনে নিয়ে ১৯১৯ সনে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে অজানার আহ্বানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। আগামী কাল কি খাব সে ভাবনাটিও তিনি এক মুহূর্তের জন্য করেন নি। তাঁর বিপ্লবী মন সংসারের ঘটিকা-প্রহর দিনগুলোকে পেছনে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ করে নিল। এই বিশাল নূতন সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়ে হয়ত তিনি কোথায় ভেসে যেতে পারতেন কিন্তু নিত্যগোপাল সেদিন তাঁকে রক্ষা করেছেন। স্বামিজীর যাত্রা-পথের দিশারথের সারথি হয়ে সেদিন নিত্যগোপাল তাঁকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে নিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বামিজীর প্রত্যক্ষ দেবতা। ঠাকুর নিত্যগোপাল স্বামিজীর সংকটের সময় এই আশার বাণী দিয়ে ছিলেন

যে "তত্ত্ব কি টেনে তুলব"। মানুষের সাধনাই ছিল স্বামিজীর জীবনের সাধনা। মানুষ তার জ্ঞানের শক্তি প্রাণের শক্তি বাড়িয়ে সাধনের দিকে এগিয়ে যাক, এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তিনি এই মাটির ধরণীতে নূতন মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে নূতন ধরণের স্পন্দন আনতে চেয়ে ছিলেন। নিত্যগোপালের বাণী আমি বিশ্বনাগরিক "I am a cosmopolitan", এই বিশ্বই আমার মহামঠ —এই সামগ্রিক চিন্তাধারার উপর নূতন ভাবে তিনি তাঁর প্রাণের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ছোটোর মধ্যে স্বীকার করে নিত্যগোপাল বলে গেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ অধিক অগ্নিও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ……।

শ্রীনিত্যগোপাল আজও মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হননি। তবুও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আনাচে কানাচে তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে একটি সাড়া এনে দিয়েছে। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ, অলৌকিক শক্তি, ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করার জন্যে মানুষ একদিন এগিয়ে আসবে। কিন্তু সেদিন এখনও আসেনি, মৃত্যুর হাত থেকে সবে তার যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন একটি দিন আসবে যখন নিত্যগোপাল বিশ্বের মাঝে প্রকাশিত হবেন, বিশ্ববাসী স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের মুখে ব্যাখ্যাত দর্শনের মধ্য দিয়ে নিজ জীবনের সকল প্রকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারবে, মানুষ সব রকম অবস্থা থেকে শান্তিকে উপলব্ধি করতে পারবে। তাই আজ নিজেকে দেবার দিন এসেছে। একটা বড়র মধ্যে নিজের স্থিতি কল্পনা করতে না পারলে কোন দিনই সে দেওয়া সার্থক দেওয়া হবে না। এই দিয়ে দেবার আহ্বান একদিন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণ-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তাঁর পরম সখা অর্জুনকে বলেছিলেন,… ……আমাকে তোমার দেহ মন, প্রাণ, বুদ্ধি, সব দিয়ে দাও। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে দেবার মধ্যে আসে মুক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত বাণী অর্জুনকে মুক্ত দিয়ে হতে প্রণোদিত করেছিল। স্বামিজী তাই বলতেন টাইটেনিকের মত বিরাট জাহাজও জলে ডুবে যায় কিন্তু তলার ঢেলা কখনও ডোবে না। সে বিশাল সমুদ্রে পড়লেও সমুদ্রের অনন্ত গভীরতার সাথে কল কল নিনাদে ভেসে বেড়ায়। সে একটি বিরাটের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। বিরাট ও অনন্তের সাথে সে একটা কুটুম্বিতা পাতিয়ে নেয়। অনন্তত্বের সাধনাই পুরুষোত্তমের সাধনা। আমি পেয়েছি, আমি পাচ্ছি, আমি অনন্তকাল ধরে পেতে পেতেই যাব। কিন্তু একতরফা পেলেই তো সেটা পুরুষোত্তম পাওয়া হয় না, কিছু রেখেও যেতে হয়। নদী যখন কোন ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায় তখন সে ধরণীকে দিয়ে যায় উর্বর পলিমাটি, ভূমিকে ক'রে তোলে সুফলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের মত এক মহাপ্রাণ আজ বিশ্ব থেকে চিরদিনের মত চলে গেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আজ চিরদিনের মত নিভে গেছে। স্বামিজী আজ আর নেই, তাঁর গৌরবর্ণ সৌম্য মূর্তি একদিন সব মানুষের জন্য করেছিল কত প্রতীক্ষা, আমার মানুষ চাই, আমার মানুষ চাই এই বলে সমস্ত জীবন ধরে কত কেঁদেছেন। আজ নর নারায়ণ আশ্রমের বক্ষ থেকে সেই ক্রন্দনের ধ্বনি আর শোনা যায় না। সেই শান্ত, সৌম্য, শিব মূর্তি সকল মানুষের প্রাণকে একদিন প্রলুব্ধ করেছিল, সেই মানুষ আজ আর নেই। তিনি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে নেই বটে কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ভাবে তিনি আমাদের সামনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজমুখে একদিন বলেছিলেন "when I shall be no more my spirit will guide you"। আজ আশ্রমের বুকে তাঁর পবিত্র দেহ শায়িত হয়ে আছে। তাই আজ উচ্চকণ্ঠে তাঁর এই কথাই বলব, নিত্যগোপাল অমর হউন, ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

বিরাশী বছর আগে আজকের এই তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য পুরুষোত্তমানন্দ আসিয়াছিলেন পৃথিবীর এই মাটিতে। তাঁর আসা আজিকার এই সকল তাপনের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে মহামানব আসেন সাধারণ মানুষের মত আত্মসুখ ভোগ করিবার জন্য নয়। পুরুষোত্তমানন্দ আসিয়াছিলেন আত্মসুখ ও বিশ্বসুখ যে কৌশলে একই সঙ্গে ভোগ করা যায় এবং যে কৌশলে বিষয়কে ভোগ করিলে বিষয় বিষ না হইয়া প্রসাদে পরিণত হয়ে সেই কৌশলটী সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য। তাঁহার জীবন-দেবতা ও বিশ্ব-দেবতা শ্রীনিতাগোপাল-আলোকে তিনি ধর্ম-জীবনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলতেন—যে দেবতা মানুষের ঐহিক, পারত্রিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সকল দিকের সুস্থতা বিধান না করেন তেমন দেবতা আমার আরাধ্য নন। এতদিনকার সাধনায় ভগবান শুধু মুক্তিদাতাই ছিলেন। কিন্তু বর্তমান জগতে মুক্তিই গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে অন্নক্লিষ্ট প্রাণের কাছে। শ্রীনিতাগোপাল-প্রদর্শিত পথে পুরুষোত্তমানন্দ আসিয়াছেন এই দুই দিকের সুষ্ঠু সমাধান দিবার জন্য। আজিকার দিনে পুরুষোত্তমানন্দকে বুঝিতে হইলে পূর্বের চিন্তা প্রণালী সম্পূর্ণ বদলাইতে হইবে। পূর্বের সাধনায় মানুষ সংসারের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু স্বামিজীর কাছে শুনিয়াছি যোগমায়া সমাবৃত সাধনাই পূর্ণ সাধনা। তাঁহার দর্শনে রক্তের দাবী—প্রাণের দাবী—সাধনার পথে বিঘ্ন কারক নয়। শুধু চলিবার ছন্দের পার্থক্য। তাঁর চলিবার কৌশল ছিল অভিনব। তিনি প্রচলিত সংসারী বা সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনের উপাসক। তাই সংসারীর সংস্কার ও সন্ন্যাসীর সংস্কার কোনটাতেই তাঁর জীবনের ব্যাখ্যা মিলিবে না। প্রতিটী মানুষকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িবার জন্য সারাটা জীবন তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন। রাজিক কি করিয়া বিপ্লবী-রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারে, কর্মী কি করিয়া জ্ঞানী হইতে পারে, জ্ঞানী কি করিয়া ভক্ত হইতে পারে তাহা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি। একজন ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকে সাধারণ মানুষের এতটুকু বেদনায় মায়ের মত করিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন পায়ে কাঁটা ফুটিলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে অর্থাৎ সমস্ত দেহযন্ত্র পায়ের ব্যথায় ব্যথিত হয়, আমাদের বিশ্বযন্ত্রেও প্রতিটী মানুষের ব্যথায় প্রতিটী মানুষ ব্যথিত হইবে ইহাই মনুষ্য ধর্ম। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কণ্ঠকণ্ঠে সহস্র সহস্র বক্তৃতাদ্বারা কারাবরণ করিতেও তাঁহার এতটুকু কুণ্ঠা ছিল না। তিনি বলিতেন "আমি রাজনীতি করি না—রাধানীতি করি"। সকল প্রকার শোষণ-মুক্ত হইয়া সমাজের মানুষ সুস্থ, পরিবার, সুস্থ সমাজ, সুস্থ রাষ্ট্র গড়িবে ইহাই ছিল তাঁহার স্বাধীন ভারতের, উজ্জ্বল ভারতের ছবি। তিনি বলিতেন যেমন তেমন করিয়া কর্ম করিলেই ত কর্ম হয় না। যে কর্মে আত্ম কল্যাণ, বিশ্ব কল্যাণ, যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয় তাহার কল্যাণ সেই কর্মই কৃষ্ণার্পিত কর্ম। এই প্রকার কর্মই মানুষকে বদ্ধ করিতে পারে না কর্ম করিয়াও নৈষ্কর্ম লাভ করে। এই প্রকার কর্মই পুরুষোত্তমানন্দজী সারা জীবন আচরণ করিয়া গিয়াছেন কোন শুষ্ক-কৌলীন্য বা কর্ম-কৌলীন্যের কোঠা বিচার তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় নাই। তিনি বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যাতা। সমস্ত কর্ম, সমস্ত গুণ দ্বারা যদি পুরুষোত্তম সেব হয় তাহা হইলে কর্মের কোন হেয়ত্ব ও হেয়ত্ব বিচার থাকিতে পারে না। প্রতিটী কর্মই স্বয়ংমর্যাদাসম্পন্ন তিনি বলিতেন ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর পূজা হয় না তখন ঘর ঝাঁট দেওয়া কাজ ছোট এবং ঠাকুর পূজা কাজ উৎকৃষ্ট হইবে কেন? তামস বৃত্তি নিদ্রা

হইলে যেখানে পরের দিন কোন সাত্ত্বিক কর্মই করিতে ইচ্ছা হয় না তখন তামস বৃত্তি ঐ নিদ্রা কম মূল্যবান কিসে? জীবনে অগ্রগতির পথে, পুরুষোত্তম পথে সকল বৃত্তিই সম মর্যাদার যোগ্য। জীবন যে মার্কা মারা লেবেলে চলিতে পারে না তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ বুঝিতেছি। কালের প্রচণ্ড আঘাতে মানুষ আজ সর্বহারা। এই সর্বহারাদের সব পাইবার শাস্ত্র ব্যাখ্যাই পুরুষোত্তমানন্দজী দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভয় বাণীতে শুনিয়াছি যাহার কোন কূল নাই সে-ই ত কৃষ্ণ কূলের অধিকারী। তিনি আসিয়াছেন সকল অকূলে কী ভাবে কূলে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহারই কৌশল শিখাইতে।

আজ তিনি তাঁহার স্থূলদেহে আমাদের সম্মুখে নাই, কিন্তু তাঁহারই কথার পুনরুক্তি করিতেছি—"একদিন আমি ত থাকিব না তখন আমার জীবন থাকিবে তোমাদিগকে ঘিরিয়া"—"When I shall be no more my spirit will remain with you"। তিনি আছেন—আমাদের সকলকে ঘিরিয়া তিনি আছেন। হে প্রভু, তুমি আছ তোমার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে, তুমি আছ তোমার উদ্বোধন ভারতে, তুমি আছ তোমার মধুময় বিশ্বে। তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর, সহস্র সহস্র প্রণাম গ্রহণ কর, আমাদের অনন্ত জীবন ধারায় প্রণাম গ্রহণ কর।

পুরুষোত্তমানন্দের পত্রে তাঁহার কথা স্মরণ করি—

.....ঠাকুর দিতে আসিয়াছেন জীবন, জীবনের পূজার মন্ত্র। দুনিয়ার মানুষ ত ভগবানকে জীবনের বাহিরেই রাখিয়াছিল, ভগবানও বাহির হইতে ভক্তকে দয়া করেন। কিন্তু ভক্ত ভগবান যে জীবনের ক্ষেত্রে দুই থাকিয়াও এক ও অভিন্ন, ভক্তের জীবনের খুঁটীনাটীও যে বিশ্বরূপ ভগবানের প্রেমে ভরপুর থাকে এবং ভগবানের সবখানি সত্তা চৈতন্য আনন্দ ব্যাপিয়া যে ভক্ত বিরাজ করেন এই তত্ত্ব কত দিনে দুনিয়ার মানুষের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে? জীবনে পাইলেই ত তিনি রসময় হন। জীবন দিয়াই ভগবানকে পাইতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মানুষের ধারণা এই যে ভগবানকে পাইতে হইলে জীবন বদলাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। জীবন যেমন তেমনটী থাকিবে—স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা সবই থাকিয়া যাইবে, শুধু নাম জপের সংখ্যা কিংবা ধ্যানের তীব্রতা বাড়াইলেই ভগবানকে পাওয়া যাইবে। অথচ ইহা স্পষ্ট সত্য যে জীবন না বদলাইলে নাম জপও সার্থক হইবে না, ধ্যানও তীব্র হইবে না। জীবন না বদলাইয়া যতই নাম জপ বাড়াইতে চাও বা ধ্যানকে তীব্র করিতে চাও একদিন জপধ্যান আটকাইয়া যাইবে। জপ ধ্যান তখনই সহজ সরল হইবে জীবন যখন সহজ সরল হইবে। জীবন তখনই সহজ সরল হয় যখন পুরুষোত্তম-জীবন-সাগরের সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় নমঃ
ওঁ আজানুলম্বিত ভুজ কনকাবদাতম্
সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষম্।
বিশ্বপ্রিয়ম্বদ নরনারায়ণ প্রিয়ৌম্
বন্দে পরমগুরুম্ পুরুষোত্তমানন্দম্॥

আজ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮২তম জন্মতিথি উপলক্ষে নত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া তাঁহার পুণ্য সমাধি প্রাঙ্গনে আমরা সমবেত হইয়াছি। নর নারায়ণ আশ্রমের দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। বিশ্ব যখন বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির খড়্গাঘাতে

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সেই সময় আসিলেন প্রাণ-পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণের আঠার বিশ্ব-সভ্যতা রচনা করিবার সঙ্কল্প লইয়া। সেই নিত্যগোপাল-প্রাণ-সাগরের একটি মুক্ত প্রবাহ পুরুষোত্তমানন্দ। প্রজ্ঞাচুম্বিত এই প্রাণ প্রবাহ ৭২ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকে চোখের জল ফেলিয়া ঘাসাঘাসি ছুটাছুটি করিয়া পুনরায় প্রাণ-সাগরে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাণ প্রবাহকে প্রাণহীন আমরা শুধু দর্শকের মতই দেখিয়াছি, সেই প্রাণ-প্রবাহে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া ধন্য হইতে সার্থক হইতে পারি নাই। এই বেদনার অর্ঘ্য লইয়া আজ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি, আমাদের আকুতিভরা এই অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করুন।

পুরুষোত্তমানন্দের চলমান মুক্ত জীবনের কথাই একটু বলিব। ১২৯০ সনের ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে বরিশাল জেলার কাঁকরদা গ্রামে পিতা নীলকমল ঘোষ ও মাতা মুক্তকেশীর নয়ন রূপে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদত্ত নাম ছিল শরৎ কুমার ঘোষ, কংগ্রেসের নেতা ও বাগ্মী হিসাবে এই নামেই তিনি বাংলা দেশে বিখ্যাত ছিলেন। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাঁহার জীবন। তিনি সংসারী না সন্ন্যাসী কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, যে হেতু স্ত্রীপুত্রকন্যা তাঁহার সমান জীবনের সহিত যুক্ত ছিল। সংসারীর মত সংসার তিনি কোন দিন করেন নাই, সংসার তিনি ছাড়েন নাই; বিচিত্র জীবন যাপনের পথে তাঁহার প্রাণের আঁঠার আটকা পড়িয়া যে যত দিন তাঁহার পুরুষোত্তম-পথে চলার বেগের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে চলিয়াছে, যে দিন পারে নাই বলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চলার বিরাম ছিল না। তাঁহার জীবন এমন অদ্ভুত ছিল যে কোন সংস্কারেই তিনি কোথাও আটকা পড়েন নাই, তাই এই জনবহুল সংসারে হাজার হাজার লোকের মধ্যে মিশিয়াও একক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আসিয়াছিলেন শ্রীনিত্যগোপালের জড়-অগড়, সংসার-সন্ন্যাস, মায়া-ব্রহ্মের সমন্বয় বার্ত্তা বহন করিয়া, সেজন্যই তাঁহাকে কেহ বুঝিল না, চিনিল না। মানুষের বুদ্ধি প্রাণ-প্রজ্ঞার বেদের ভিত্তিতে গড়া, বিপরীতের সমন্বয় বুঝিবে কি করিয়া।

তিনি জন্মিয়াছিলেন শাক্ত পরিবারে, অথচ কালাচাঁদ বিগ্রহের সেবা ছিল সেই পরিবারে। যে কারণে হউক প্রথম জীবন হইতেই হরিনাম ও দুর্গানাম তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত, কাঁদাইত, একটা কান্নার সুর তাঁহার জীবনে সর্ব্বদাই বাজিত। ১২ বৎসর বয়সে কাঁকরদার পাঠশালার অধ্যয়ন শেষ করিয়া বরিশাল স্বনামধন্য অশ্বিনী দত্তের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন এবং তাঁহার সরলতায় ও হৃদয়বত্তায় জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশ পণ্ডিত প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে শরৎ কুমারের হৃদয়ের সৎ গুণরাশি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিল, তিনি সকলের প্রিয় পাত্র রূপে পরিগণিত হইলেন: ভালভাবে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িতে লাগিলেন কিন্তু তীব্র জগৎ অনুরাগ ও বৈরাগ্য তাঁহাকে আকুলিত করিয়া তুলিল পিতা নীল কমল ঘোষ পুত্রের এই বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসারী করিবার মনস্থ করিলেন শরৎ কুমার এফ, এ পাশ করিলেন বয়স তখন ২০ বৎসর ঢাকা জেলার শ্রীনগর গ্রামের জমিদার কাশীনাথ বসুর পরমা সুন্দরী কন্যা উষাঙ্গিনী দেবীর সহিত বিবাহ স্থির হইল। ১৩১০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে শরৎ কুমারের সহিত উষাঙ্গিনী দেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন বিবাহের রাত্রে শরৎ কুমার উষাঙ্গিনী দেবীকে বলিলেন আমরা দুই জন ভগবানের সেবা করিবার জন্য তাঁহার সেবক সেবিকা রূপে আজ মিলিত হইলাম। এই বলিয়া দুর্গানাম জপ করাইয়া পাশে শোয়াইয়া রাখিলেন, এই হইল তাঁহার সংসারের দ্বারদেশে প্রবেশের প্রথম ছন্দ।

বিবাহের পর বি. এ পড়িতে কলিকাতা যান, সেখানে যাইয়া কতিপয় ভক্তসঙ্গ তাঁহার জুটিল, লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিলেন না, ভগবৎ প্রেমে প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিল, ব্যাপ্ততা প্রেম সে গতি রোধ করিতে পারিলাম না। শরৎ কুমারের এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখিয়া জনৈক ভক্ত তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল যে তখন নবদ্বীপ আমপুলিয়াপাড়া অবধূত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার নিকট শরৎ কুমারকে লইয়া গেলেন

১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ রাধাষ্টমীর দিন নিত্যগোপালের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বয়স তখন ২২ বৎসর। দীক্ষাদান কালে শ্রীনিত্যগোপাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমার ভগবানের কোন্ নাম ভাল লাগে, তিনি বলিয়াছিলেন দুর্গানাম। নিত্যগোপাল দুর্গা মন্ত্রই দিলেন কিন্তু বলিয়া দিলেন এক বৎসর পর মন্ত্র বদলাইয়া দিব।

দীক্ষা লইয়া এক নূতন জীবন লাভ করিয়া শরৎকুমার কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। খুবই কুনো ও লাজুক ছিলেন তিনি। সেই মানুষটি শ্রীনিত্যগোপালের চরণ-স্পর্শে ক্রমে বিপ্লবী হইয়া উঠিলেন, সকল প্রকার অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান সুরু হইল। কলিকাতার বন্ধুগণকে লইয়া ১০৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সত্যব্রত সমিতি করিলেন। উহার আদর্শ হইল—

বিশ্বেষু সত্যানন্দং দৃষ্ট্বা সুখী ভব তবে।
তত্তঃ কিম্
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য সাধিব।

এই বিশ্বের মধ্যে সত্যানন্দের আস্বাদনই তাঁহার আদর্শ ছিল, এই চিন্তাধারায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন। দীক্ষার এক বৎসরের ভিতরই তাঁহার হৃদয়-মথনধন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার হৃদয় মথন করিয়া রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব তাঁহাকে জীবনের ভিতর প্রদান করিলেন। তিনি বলিতেন আমি যে রাধাকৃষ্ণ বলি, ইহা আমি তো বই পড়িয়া পাই নাই, আমার রক্ত মাংস নিংড়াইয়া অনুভূতির ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব আমি জীবনে পাইয়াছি। তাই আমি নির্ভয়ে সহজ ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে পারি ও লিখিতে পারি।

প্রচলিত অর্থাগমতত্ত্ব জীবনে প্রবেশের ব্যাকুলতায় তিনি, এ পরীক্ষা দিলেন, পাশ করিতে পারিলেন না। পরীক্ষার পর হুগলী মঠে নিত্যগোপালের নিকট কিছুদিন ছিলেন,. নিত্যগোপাল বাড়ী যাইতে বলায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, নিত্যগোপাল বলিলেন—শরৎ, তুমি কি জান না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাসী শরৎ কুমার চোখের জল মুছিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তো করিতে হইবেই। পিছনে সংসার রহিয়াছে. কলিকাতা আসিয়া বন্ধুগণের ইচ্ছায় বস্ত্রেমাতরম্ ষ্টোর নামে এক কাটা কাপড়ের দোকান দিলেন। নূতন যুগের নূতন ধর্ম শাস্ত্রের প্রচারক তিনি তাঁহার পক্ষে দোকান চালান কি সম্ভব? তাঁহার পাগল প্রাণ বৃন্দাবন যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। দোকান রহিল আমি বৃন্দাবন চলিলাম বাড়ীতে এই সংবাদ পাঠাইয়া শ্রীনিত্যগোপালের অনুমতি লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন। ছয় মাস বৃন্দাবনে থাকিয়া পাগল প্রাণ লইয়া পাতি পাতি করিয়া বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও পরাণ পুতুলী শ্রীরাধারাণীকে খুঁজিলেন। একদিন স্বপ্নে আদেশ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন তুই বাংলায় যা, এতদিন পর আবার দেখা হইবে। সেই আদেশ পাইয়া বৃন্দাবন হইতে হুগলী মঠে নিত্যগোপালের নিকট আসিলেন। একদিন একটি প্রশ্ন লইয়া নিত্যগোপালের নিকট গেলেন, নিত্যগোপাল প্রশ্ন শুনিলেন না। বলিলেন, শরৎ, তুমি কি জাননা, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। শরৎ কুমারের জীবনের যত সম্পদ সমস্তই নিত্যগোপাল গোপনে তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া দিয়াছেন, মুখে কিছুই বলেন নাই। রবীন্দ্র নাথের সেই গান অন্তর মম গোপনে থাক ভরে, তোমার দানে প্রভু, তোমার দানে। তিনি এই রূপেই নিত্যগোপালের দানে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন আমার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত নিত্যগোপালের আশীর্বাদে তাঁহার চরণে বিকানো। বাবার অসুখ বাড়ী হইতে পত্র আসিল, নিত্যগোপাল বাড়ী যাইতে বলিলেন। শরৎ কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি যদি সংসারে ডুবে যাই। নিত্যগোপাল বলিলেন ভয় কি টেনে তুলবো। এই তিন দিনের তিনটি বাণী তাঁহাকে অভিঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। গুরুবাক্য মন্ত্র মূল মনে করিয়া সারা জীবন সকল ক্ষেত্রে বিপ্লবী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, কাহারো প্রতি কোন প্রকারের শোষণ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

তাঁহার জীবনে দাম্পত্য প্রেম ও ভগবৎ প্রেম পৃথক ছিল না, উষাঙ্গিনী দেবীকে তিনি অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে ভগবৎ মুখীন করিবার জন্যই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। উষাঙ্গিনী দেবীও স্বামীর কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না বরং নিজের জীবনে বহু দুঃখ সহ্য করিয়া হাসি মুখে তাঁহার ভগবৎ পথে অগ্রসর হইবার সহায়তাই করিয়াছেন। শরৎ কুমার সংসারে যাহার প্রতি তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই, তাল সবাইকেই বাসিয়াছেন; কিন্তু সে তাল বাসায় আসক্তি ছিল না বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন। ৮ বৎসর বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছিলেন, সেই সময় বিশ্বকল্যাণ সমিতি গঠন করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দিয়াছেন; সেই সময় হইতেই বক্তা শরৎ ঘোষ রূপে তিনি পরিচিত হইতে লাগিলেন। সেই সমিতির আদর্শ ছিল নোংরা বিষয়ের স্তরে সত্যানন্দকে আস্বাদন করা। ৮ বৎসর শিক্ষকতার পর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে দুর্নীতি দেখা দিল, সত্যসেবী শরৎ কুমার তাহাতে খুবই বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। উষাঙ্গিনী দেবীকে বলিলেন আমি আর ইহার ভিতর কাজ করিতে পারিতেছি না। তিনি স্বামীর মনোকষ্ট দেখিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তখন শরৎ কুমার বলিলেন চাকুরি ছাড়িয়া দিলে যে তোমাদের কষ্ট হইবে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের ঠাকুর যাহা করেন তাহাই হইবে। স্ত্রীর অনুমতী পাইয়া পুত্র কন্যা সহ তাঁহাকে বরিশালের বাসায় রাখিয়া ১৯১৯ ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কলিকাতা গুরু ভ্রাতা নিতাই পালের বাসায় ছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন তুমি নিতাগোপালের জড়াজড় সমবয়ের কিস্তির উপর বেদান্তের ভাষ্য লেখ। শরৎ কুমার বলিলেন, এই দুরূহ কাজ যাহা মহা মহা পণ্ডিতগণ করিয়াছেন, আমি কি তাহা পারিব? নিতাই বাবু বলিলেন তুমি তাহা পারিবে। শরৎকুমার স্বীকৃত হইলেন কিন্তু পাঁচটি প্রাণী যে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তাহাদিগকে তো আমি এক পয়সাও দিয়া আসি নাই। তখন গুরু ভ্রাতাগণ মিলিয়া মাসে ৫০ টাকা দিতে লাগিলেন, তিনি বরিশাল বাসায় এক বৎসর থাকিয়া সেই ভাষ্য রচনা করিলেন। প্রচলিত পথে তো তিনি চলেন নাই তাই ভাষ্য লিখিতে সময় সময় অন্ধকার দেখিতেন, পথ পাইতেন না, তখন কলম ফেলিয়া শ্রীনিতাগোপালের চরণ তলে পড়িয়া থাকিতেন, আলো পাইতেন। এইরূপে বেদান্তের ভাষ্য শেষ করিয়া সেই ভাষ্য লইয়া কলিকাতা গুরু ভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই মনীষী হীরেন দত্তের ইচ্ছায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে একাদিক্রমে চৌদ্দ রবিবার বেদান্তের সেই সামগ্রিক ব্যাখ্যা তিনি করেন। হীরেন দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন—আমরা বেদান্তের নূতন রূপ দেখিলাম, এতদিন যাহা শুনিয়াছি উহা বেদান্তের পোষা আজ বক্তা আমাদিগকে জীবন্ত বেদান্ত শুনাইলেন। সেই সময় কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে তিনি বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় 'বেদান্তের নূতন মূর্ত্তি' বলিয়া একটি লেখা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল—"সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে আমরা আমরা একটি সাধককে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহার নাম শরৎ কুমার ঘোষ। তাঁহার পবিত্র তেজোদীপ্ত সৌম্য মূর্ত্তি। তিনি ভগবান দত্ত প্রেরণায় অন্তর বাহিরে ভরপুর হইয়া সুদূর বরিশালের পল্লীবাস হইতে এই মহানগরীতে এক নূতন আলো লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সে আলো বেদান্তের নূতন মূর্ত্তি। বেদান্ত যে একটা দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ নয়, বেদান্ত যে একটা কঠিন, কঠোর, নিরস, কর্কশ বিষয় নয়, বেদান্ত যে জন কত পণ্ডিতের সঙ্কীর্ণ মতে সীমাবদ্ধ নয় উহা যে মাতৃস্তন্যেরই মত সরল, উহা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই স্বচ্ছ, উহা যে নির্ঝর চন্দ্রালোকের মত ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের সমান উপভোগ্য বিষয়, উহা যে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে, সংসার বিরাগী করিয়া ঘুরে সরাইয়া দেয় না, উহা যে প্রত্যেক পরিবারকে শান্তিময় করিয়া তোলে, অশ্রুজলে ভাসায় না, উহা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, নিত্য প্রয়োজনীয় কথা···। তিনি বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা করিতেছেন

তাহাতে তাঁহাকে আগের ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না" ইত্যাদি।

১৯২০ সনে অসহযোগ আন্দোলন : শরৎ কুমার দেখিলেন তাঁহার নিতাগোপালের নূতন বেশেরও উহাই বাস্তব রূপ। তখন তিনি বিশ্বসেবায় নিজকে সর্বতোভাবে বিলাইয়া দিলেন। সে দিনের শোষক বৃটিশের বিরুদ্ধে যে তাঁহার গর্জন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি দেশের জন্য ১৯২০ তে, ১৯৩০সে ও ১৯৪২সে এই তিনবার জেলে গিয়েছেন, কতবার অনশন করিয়াছেন, বাংলা দেশের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া হাজার হাজার বক্তৃতা প্রদান করিয়া দেশবাসীর আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করিয়াছেন। তিনি বেহাত বাদ দিয়া রাজনীতি করেন নাই, তাঁহার নিতাগোপালের দেওয়া জড় অন্নের সমন্বয়ের দৃষ্টি লইয়া বাস্তবের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবন ব্রত। সেই সময় উজ্জল ভারত নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়া দেশের চিন্তা জগতে এক বিপ্লব আনিবার প্রচেষ্টা করিয়া ছিলেন। যে দিন দেখিলেন কংগ্রেস আর কুম্ভমেলা এক হইল না, কংগ্রেসের ভিতর গলদ দেখা দিল, সে দিন তিনি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া ১৯৩০ সনে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ নাম দিয়া অসহযোগের নীতি চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্মের বিরাম ছিল না। শ্রীনিতাগোপাল বলিয়া গিয়াছেন "এই বিশ্বই আমার মহামঠ"। শরৎ কুমার ছিলেন সেই বিশ্ব মহামঠের একনিষ্ঠ সেবক, তাই তাঁহার কর্মের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। ১৯৩১ সনে হিন্দু-মুসলমান লড়াই বাধা দিলে আবার তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা প্রদান করিয়া হিন্দুর আত্মশক্তি, আত্মসম্মান বোধকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য চোখের জলে, মর্মন করিয়া দেশবাসীকে বাঁচিবার পথ দেখাইতে লাগিলেন। সেই সময় কলিকাতা গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী নাম দিয়া এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আদর্শ সামনে রাখিয়া দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কাজ করিয়া যাইবার পর ১৩৩৪ সনে শরৎ কুমারের পাগল প্রাণ আরো পাগল হইয়া উঠিল, তখন সমাক রূপে শ্রীনিতাগোপালের চরণে নিজকে ন্যস্ত করিবার প্রেরণায় কয়েকজন গুরুভ্রাতার উপস্থিতি ও সম্মতিতে গুরুপীঠ কলিকাতা মহানির্বাণ মঠে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুরুষোত্তমানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন শরৎ কুমারের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন - শরৎবাবু আগে কি কম সন্ন্যাসী ছিলেন, গৈরিক পরিয়া এমন কি বেশী সন্ন্যাসী হইলেন। পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন, সেখানে আড়াই বৎসর ছিলেন। সেই সময় তিনি হিন্দী ভাষা শিখিয়া হিন্দীতে বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ বরদা ঘুরাট প্রভৃতি স্থানে ভাগবৎ ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। আড়াই বৎসর পর মহাপ্রভু স্বপ্নে আবার আদেশ করিলেন তুই বাংলায় যা, বাংলায় কাজ আছে। বৃন্দাবন হইতে বরিশাল ফিরিয়া আসিয়াই ১৯৩০সের লবণ আইন অমান্যে যোগদান করিলেন। বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাস লইয়াও স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়াই বাস করিয়াছেন। পদব্রজে স্ত্রীপুত্র কন্যা ও বন্ধুগণকে লইয়া তিনি লবণ তৈরী করিতে করিতে এবং বক্তৃতা করিতে করিতে ৮০ মাইল যাওয়ার পর বৃটিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া জেলে গমন করেন। ৬ মাস পর জেল হইতে বাহির হইয়া আনন্দমঠ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া আবার কাজ আরম্ভ করেন। সেই সময় বরিশাল টাউন হলে সিনেমা হল স্থাপনের বিরুদ্ধে ৪৫ দিন অনশন করেন। তাঁহার বিপ্লবময় জীবনের ঘটনা আর কতটুকু বলিতে পারিব ? ১৯৩২ এ তিনি রিক্ত হাতে কলিকাতা আসিয়া নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৯৪২ এ আগষ্ট আন্দোলনে ১ বৎসরের জন্য জেলে গেলেন, জেলে বসিয়া ১১ খানা উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্য লিখিলেন। বহু দুর্যোগের ভিতর দিয়া, বহু ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া চলিয়া শেষে তিনি ১৯৫৬তে এই বাগুইআটি গ্রামে আসিয়া ২ বৎসর মাত্র তাঁহার পুরুষোত্তম তত্ত্ব কথা বলিয়া শ্রীনিতাগোপালের চরণতলে চির বিশ্রাম, লাভ করিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও

বিপ্রবময় জীবনের কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, শুধু তাঁহার চলমান জীবনের দুই এক কথা আজকের দিনে স্মরণ করিয়া, বন্ধুগণের সহিত আলোচনা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার প্রয়াস মাত্র।

পুরুষোত্তমানন্দ, তোমার প্রজ্ঞা-চুম্বিত প্রাণধারা আমাদিগকে প্লাবিত করুক, তোমার অশ্রুজল আমাদের সকল মলিনতা ধৌত করুক, তোমার নরনারায়ণ আশ্রমের প্রাণ-সাধনা জয়যুক্ত হউক, এই প্রার্থনা জানাই। আমাদের সমবেত প্রণাম গ্রহণ কর।

নমঃ নমঃ নমঃ দ্বৈপায়ন

।। শ্রীজগদ্বন্ধু কাব্যতীর্থ ।।

নমঃ আচার্য্য তপস্বী তিলক সার্ব্বভৌম হে মহাঋষি ;
তব স্তবগানে আর্য্যাবর্ত্ত ধ্বনিত আজিও অহর্নিশি।
নীলোৎপল আভা জিনি তনুরুচি, শিরে সিঙ্গল জটার ভার,
দীপ্ত লোচন, বিশাল শ্মশ্রু, পরণে দীর্ঘ বাঘের ছাল।
সত্যবতীর স্নেহের দুলাল, বেদনিধি পরাশর সুত—
কেউ বলে তুমি জন্মবিহীন, শ্রীহরি-বাক্য-সম্ভূত।

বেদ প্রবর্ত্তক রূপে আবির্ভাব যুগে যুগে শত মন্বন্তরে ;
কত ভাগবত পরমামৃত শ্রীবদন হ'তে নিয়ত ক্ষরে।
অপান্তরতমা তুমি সারস্বত, বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
জনমমাত্র বেদ বেদান্ত করেছ শাস্ত্র অনুশীলন।
অজ্ঞানতমঃ নাশিয়াছে তব ব্রহ্মসূত্র সৌরকর
সর্ব্ব সম্প্রদায় পূজে আজো তাই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর।

তুমি ত্রিকালজ্ঞ ক্রান্তদ্রষ্টা সর্ব্ববেত্তা হে মহাজ্ঞানী—
সিদ্ধিদাতা গণেশ তোমার লিপিকার লাজে লেখনি আনি।
অজ্ঞানতার কুহেলী আজিকে ছেয়েছে নিখিল জগৎময় ;
ঘুচিতে তমসা হে জগদ্গুরু হোক পুনঃ তব অভ্যুদয়।
বেদসংহিতা ব্রহ্মসূত্র নিধিধ্যাসনে অর্পি মন ;
দাও সেই মতি ওগো মহর্ষি নমঃ নমঃ নমঃ দ্বৈপায়ন।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪১)

…ভাগবত বৈদিক ধর্মের মানব সেবার ব্রত নিল।… নমঃশূদ্রের ক্ষেত্র ভাগবত ধর্মের ক্ষেত্র— এ ক্ষেত্র তো আবাদ করা হয়নি—এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা। সমাজে যারা জাতিকুল-শীল হিসাবে পতিত, তাদের মধ্যে একটা কালচার দেওয়ার কাজই ভাগবত ধর্মের কাজ। ভাগবত সত্ত্বগুণপুরুষ প্রভৃতিদের মধ্যে প্রেম বিতরণ করতে এসেছিল। এইসব নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে থাকলে এত বিচ্ছিন্ন থাকত ও উচ্চবর্ণের এত চাপের মধ্যে থাকত যে এদের কোন উন্নতিই হতো না। এখানে এদের status কত বদলে গেছে। সকলের সঙ্গে সমানভাবে চলবার সুযোগ পেয়েছে—ঐ যে পেয়েছে, ঐটি পেতে দেশ বিভাগ না হলে কত বৎসর যে লাগত তার ঠিক নেই। এখানে এখন এদের এই ক্ষেত্রটাকে কাজে লাগাতে পারলে কল্যাণ হত, এদের শিক্ষা-দীক্ষা না দিলে এরা তো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে।.. কদিন থেকে ভাবছি একটি পাতাও ভগবানের ইচ্ছা না হলে পড়ে না, আর এই এত বড় একটা ঘটনার কোন divine meaning নাই?… হিন্দু সমাজে যারা বর্ণাশ্রমীয় ব্যবস্থায় সামাজিক চাপে নিষ্পেষিত ছিল—এই ঘটনা তাদের বাইরের দিক থেকে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে একই স্তরে এনে দিয়েছে। এর কি কম মূল্য? পূর্ববঙ্গে থাকলে হতো না।…অস্পৃশ্যরা কি কখনও অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে চেয়েছে? ভদ্র-লোকেরা চেয়েছে।…এখন এই যে বাইরের প্রচণ্ড আঘাতে এদের টেনে এনে এক করেছে, এদের একটা কালচার দিতে হবে.. এদের প্রাণ ধরে টান দিতে হবে। মহাপ্রভু এদের গলায় তুলসীর মালা দিয়েছিলেন, এদের বাড়ীতে তুলসী গাছের স্থান হয়েছে, সকাল সন্ধ্যায় এদের 'হরেকৃষ্ণ' নাম দিয়ে গেলেন।… এরা দলাদলিও করতে পারে, গলাগলিও করতে পারে। শচীন বাবু দুর্গাপূজা নিয়ে দুই দলে মিলানর যে ঘটনা বলেছেন সেই শুনে আমার এক গল্প মনে পড়ল।… আমাদের বাড়ীর বাইরের চাকর মণিরামের শ্রাদ্ধ —কি গোলমাল ঘটল বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু তারা খাবে না…। আমার কাছে খবর গেল—আমি গিয়ে সব শুনে গল্প ফাঁদি।… কে কবে কার অপমান করেছিল—এ বিবাদ অনন্ত, আমাকে ওদের উপরের স্তরে নিয়ে গিয়ে টান দিতে হবে। মহাপ্রভুর গল্প বলি…। সুবুদ্ধি রায়ের মুখে কয়োয়ার পানি দিয়েছিল, তার জাত গেছে…বর্ণাশ্রমী বিধানে মৃত্যু ছাড়া তার উপায় নেই… মহাপ্রভু তাকে কোল দিলেন…। এই গল্প এমন প্রাণ মাতানো ভাবে বললাম আর গল্প শেষে প্রাণ ভরে গলাগলি করে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চৈঃস্বরে করে বলতে লাগলাম এইবার খাওয়া আরম্ভ কর… ইত্যাদি— যে, বিবাদের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে রইল—মহাপ্রভুর প্রেমের উত্তপ্ত হাওয়ায় খাওয়া আরম্ভ হয়ে গেল।… এরা rule, কিন্তু একটা soft corner আছে—তারই সুযোগ নিয়ে রামপন্থীদল এদের তাদের কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু সরকার তো কোন লোক পাঠাল না…। এদের প্রাণের সঙ্গে মিশতে পারলে, এদের মানুষ করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ হতো। কে করবে? মহাপ্রভুর প্রাণ তো লাগবে— তার আঁচ নেই কম নেই বেশ নেই…। শিবের প্রাণ

লাগবে যে কুচলীপাড়ায় পড়ে থাকতে পারে। শচীন বাবুরা যদি পারেন মস্ত বড় কাজ করলেন।...দুলু (মনীন্দ্র বুধারী)-র সঙ্গে এ নিয়ে খানিকটা কথা হল।...১৫।৯।৮৬ ...গীতায় ভগবান বলেছেন, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞান আমরা সকলেই চাই, কিন্তু শ্রদ্ধাবান হতে চাই না। এই দীর্ঘ জীবনে এ কথাটা আজ স্পষ্ট বুঝেছি শ্রদ্ধা না থাকলে কাউকে কিছু দেওয়া যাবে না, কেউ কিছু নিতে পারবে না। জ্ঞান আসছে—যেমন সূর্যের আলো আসছে।... যে কাঁচে আঁঠা মাখান থাকে, তাতে ছবি ওঠে, শুধু কাঁচে ওঠে না।... জ্ঞান আসছে, শ্রদ্ধাযুক্ত মনই শুধু তাকে ধরতে পারে।... চক্ষুকর্ণনাসিকা পড়ে থাকে, তার মধ্যে রূপগন্ধশব্দ আসছে; কিন্তু হাতবাক্য বাইরের দিকে প্রসারিত হয়।...সবাই দেখেছে, কেটলির ঢাকনা নড়ে—একজনের মাথায় প্রশ্ন জাগল।...সবাই দেখে ফল মাটিতে পড়ে—একজনের মাথায় প্রশ্ন জাগল।... শ্রদ্ধা তৎপরতা না থাকলে জ্ঞান এসে তার মধ্যে পড়ে না।.. সত্যকে ধারণ করবার মত চিত্তের ভিতরে যে একটা প্রবণতা তাই-ই শ্রদ্ধা।... চিত্তের প্রতিফলিত হওয়ার জন্য যে রস লাগান থাকে (যেমন কাঁচের মধ্যে), তাই চিত্তের প্রবণতা।...৫টা কর্মেন্দ্রিয় ও ৫টা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পার্থক্য...। মানুষকে বুদ্ধিমান করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফল খুব ভাল হয়েছে বলে মনে হয় না।...দীর্ঘকাল শিশু গোলামী করেছে—মনে করেছিলাম দাসের মত মানুষ আসে এটা পছন্দ করি না, তাই তাদের আলোচনা করবার, বুঝে নেবার সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, হৃদয় হারিয়ে ফেলে তারা এ ব্যবস্থার কল্যাণ অনেকেই লাভ করতে পারে নি, শুধু তর্ক করে।...হৃদয় না থাকলে কিছুই হয় না, আমায় হৃদয় দিয়ে না নিলে কেউ পেল না। ...মূর্খ প্রাণবান, বুদ্ধিমান প্রাণহীন।...বানরের গল্প—নির্বোধ শিশু চাই না—বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য চাই জীবনের এই শেষ কয়টি দিন।... প্রসাদ দিতে অনেক সময় ইচ্ছা করে না—প্রসাদও খাচ্ছি, গুরুর কথাও শুনছি না কিংবা গালাগালিও করছি...। নিত্যগোপাল বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রত্যেকটির দোষগুণ বিচার করে দেখিয়েছেন... বুদ্ধি-হৃদয়ই শিবকালী, রাধাকৃষ্ণ—বিচারপূর্ণ বিশ্বাস, বিশ্বাসপূর্ণ বিচার। হৃদয় দিয়ে ভাল বাসব, ভাল বাসতে বাসতে বিচার করব।... তাহলেই ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ।...ভাল না বাসলে সেবা করবে কেমন করে? আমি কি ভাল বাসি না বাসি তা না জানলে সেবা করবে কি রকম করে?... তাঁর বাঞ্ছা-পূরণ করতে একমাত্র রাধাই পারেন...। তন্ময়তা না হলে জ্ঞান লাভ হয় না।... সংসারটাকে সার্থক দেখবার জন্য আজ বেঁচে আছি... কিন্তু শরণাগত হয়ে না এলে কিছুই দেওয়া যাবে না... নৈষা তর্কেন আপনীয় ...

১৮-৯-৮৬।...মানুষকে দুবার পেতে হয়—প্রথমবার পায় নিজের অজ্ঞাতে, বিনা সাধনায়, না চেয়ে। এইটাই সবখানি কথা নয়। দ্বিতীয় বার জেনে শুনে, সাধন করে, চেয়ে পেতে হবে। এই দু রকমের পাওয়া যার জীবনে মেলেনি—তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। কিছুই পায় নি তা হয় না। পেয়েইছে মানুষ; কিন্তু পেয়ে পেয়েই আসছে শুধু যারা, অথচ সাধনা করে না—তারা আলালের ঘরের দুলাল হয়ে পড়ে। ভেবে দেখ মায়ের পেটে যেদিন এলে সেদিন থেকে মা থেকে, পাড়া প্রতিবেশী থেকে কত মানুষের কত স্নেহ শুভেচ্ছায় তুমি আজ পর্য্যন্ত এসেছ...। কিন্তু এই পাওয়াই শেষ নয়—এবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তৈঃ দত্তান্ অপ্রদায়েভ্যঃ যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ—যা পেয়েছ তা ফিরিয়ে দিতে না পারা চুরী...। পিতা মাতার দেহ থেকে...যে যা কিছু দিয়েছেন তা তাদের না দিয়ে (সেই তাঁরাই দেবতা) যদি বল আমার দেহ, তবেই গেলে।...সূর্য চাঁদের আলো পাচ্ছ, বাতাস পাচ্ছ...তুমি কি দিলে?... এই দিতে পারার মনোবৃত্তির নাম শ্রদ্ধা— সব দীক্ষা মন্ত্রের শেষে শ্রদ্ধা শব্দ থাকে।—যা কিছু আমার সব দিলাম। উপনিষদ্ বলছে—মানুষ যখন মরে সমস্ত পথটা দেবতারা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—সে একা যায় না।...মানুষ কখনও একা থাকে না—চাঁদ আছে, সূর্য আছে।...পেতে পেতে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে...আজ সবাই

শেষ মাধব, 'যেই তিল তুলসী দেহ মন সমর্পিণ'।... তপস্যা কর, তিনিও যজ্ঞ করে করে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন, তুমিও কর ...এ রকম কথা আছে যে, যার দীক্ষা হয় নি তার হাতে খেতে নেই—তার মানে সে বড় অহঙ্কারী, বড় গর্বিত, কেবল পেতে জানে, দিতে জানে না।... তিনি দিয়েছেন তিনি নেবেন...। অহঙ্কারীর পক্ষে যম যম, নিরহংকারীর পক্ষে যম ব্রহ্মজ্ঞান দেন—যেমন নচিকেতাকে দিয়েছিলেন। যম মানে সংযম—যে বলে আমার, যম তারটাই নেন, তার পক্ষে তখন সেটা যম কর্তৃক কেড়ে নেওয়াই বটে, কিন্তু যে দিতে জানে, যম তার সংযমনের পথ দেখায়।... বাঁচতে চাইলে মরো, মরতে চাইলে বাঁচো... । যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর। ... যতক্ষণ অহঙ্কার থাকবে, ততক্ষণ তোমার সব কিছু ধূলায়ই লুটাবে। নির্লোভ নিরহংকারীর পক্ষেই ধরার ধূলি ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ ব্রহ্ম-মানুষ।.. সেই তিল তুলসী নিজেকে সমর্পণ কর।...জয় নিত্যগোপাল... ।

১৯।৯।৫৬।... আজ আমাদের এই সান্ধ্য উপাসনার সময় রাধাষ্টমীর দিন যিনি এসেছিলেন, যাদের সঙ্গে একত্র হয়ে বরিশালে আন্দোলনের কাজ করেছি, যিনি এখন ৬ নং ক্যাম্পের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, সেই রমণী বিশ্বাস উপস্থিত আছেন। আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই।...পথে বেরিয়েছিলাম ভগবানকে নিয়ে, যিনি অবতীর্ণ ভগবান, যিনি আকাশে বসে থাকেন না, যিনি... গোধনময় বৃন্দাবন স্থাপন করতে এসেছিলেন—তাঁরই কথা দিয়ে সমাজকে গড়ে তুলবার জন্য পথে বেরিয়েছিলাম।... অনেকেই জানত যে আমি শুধু রাজনীতি করি নাই, আমি রাধানীতি করেছি।... শ্রীরাধা অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন... প্রাণ চিরদিন অন্ধ... বিশ্বের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষগুলি অন্ধ কিন্তু প্রাণবান...কৃষ্ণ ছুটে এসে এই অন্ধেরই পায়ে রাজমুকুট রাখলেন—রাজনীতি করেছিলাম এই গোপন ধর্মকে সকল ক্ষেত্রে রূপ দেবার জন্য। ইংরেজ যদি ছোটকে সম্মান দিত ইংরেজকে যেতে হতো না...সমাজ যদি ছোটকে সম্মান দিত, তাহলে আজকের এই দুর্ঘটনা ঘটত না...। বাজারের মেয়েদের কাছেও স্বরাজের বাণী আমি একদিন পৌঁছেছিলাম... ছোটদের মধ্যেই গড়াগড়ি দিয়েছি সারাজীবন ...আমার গোবিন্দকে আমি দেবালয়ে খুঁজিনি শুধু—বেশ্যালয়েও খুঁজেছি...। রাজনীতি বাদ দিয়ে বেদান্ত হয় না—বেদান্ত বাদ দিয়ে কোন রাজনীতি বলি নি...রাজনৈতিকেরা বেদান্ত নেয় নি...ফলে চরকা চলল না, বিপ্লব এদেশ থেকে পালিয়ে গেছে।... এই দেশ-বিভাগ ভগবদ্-প্রেরিত। .. মুসলমানদের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে, হিন্দুদের শিক্ষা দিচ্ছেন। হিন্দুসমাজের নিম্ন বর্ণ উচ্চবর্ণের মধ্যে যে ভেদ ছিল তা ভেঙে দিয়েছে এই বিভাগ...এখানে নিম্নশ্রেণীর status বেড়েছে ·· পূর্ববঙ্গে থাকতে উচ্চবর্ণীয়েরা নিম্নবর্ণীয়ের লাঠির মর্যাদা দেয় নি...। নিম্নবর্ণকে এই সুযোগের আজ সদ্ ব্যবহার করতে হবে...। উলঙ্গ প্রাণ নিয়ে এই উলঙ্গ মানুষগুলির একটা আন্দোলন করতে হবে...।...আজও সেই পাগল এখানে বসে কাঁদছে, মানুষের সমাজ গড়বার জন্য আজও সে বসে আছে। ধর্ম চাই নাই, অর্থ চাই নাই, কিছু চাই নাই—কেবল মানুষ গড়তে চেয়েছিলাম...। ছোট মানুষদের কোলে তুলে নেবার শাস্ত্র লিখেছি...। রইল সব, সকল শাস্ত্র—ছাপিয়েও যেতে পারলাম না...। গুরুগিরি করি নি·· প্রাণ ছাড়া কিছু আমার নাই...নেতা হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে একাসনে বসেছি··। আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে চোখের জল নিয়ে যাব···হল না বই ছাপা, হল না মানুষ গড়া ·· এখন অপেক্ষা করে আছি শেষ দিনের।···ভাল খাই নি, ভাল পরি নি...বিশ্বের উপবাসক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে একত্ব বোধ করতে কোনদিন ভাল খাই নি···মানুষকে সেবা করতে গিয়ে কোনদিন দুঃখের হাত থেকে রেহাই চাই নি। তাদের সঙ্গে সমান ভাবে চলেছি···দুর্যোগের মধ্য দিয়েই সারা জীবন চলেছি—কোনদিন সুযোগের মুখ দেখি নি···ব্রাহ্মণ থেকে জেলে চাড়াল মুসলমান সব আমার ঘরে বসে খেয়েছে। আশ্রম রইল···বিশ্বের ব্রহ্মবিদ্যা এইখান থেকে প্রচারিত হবে।···।

ক্রমশঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধৃত ভাষ্য সমেত

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥৬

শাস্ত্রে যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানানুষ্ঠান এবং তাহার ফল বিহিত হইয়াছে, সবই যে পুরুষোত্তম-জাত বলিয়া সত্য, সনাতন এবং পুরুষোত্তমকে বুকে লইয়া করিলেই উহারা যে পরিপূর্ণ পুরুষোত্তমলোকরূপ ফল দিতে সক্ষম, এমন কি কর্তৃত্বশূন্য হইয়া করিলেও যে উহাদের পুরুষোত্তম-প্রভাবের প্রভাব কিছু না কিছু ফল দিবেই, একেবারে ব্যর্থ নয়—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—পুরুষোত্তম-ধর্ম্মের স্বল্পও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে—শ্রুতি তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতেছেন—তস্মাৎ [সেই পরম পুরুষ হইতে] ঋচঃ [নিয়তাক্ষরপাদ গায়ত্র্যাদি ছন্দোবদ্ধ ঋক মন্ত্র সমূহ] সাম [পাকযজ্ঞিক এবং সপ্তযজ্ঞিক গীতিবিশিষ্ট সাম মন্ত্রসমূহ] যজুংসি [অনিয়তাক্ষরপাদ বাক্যাত্মক যজুর্মন্ত্র সমূহ] দীক্ষা [মৌঞ্জী ধারণ প্রভৃতি] যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে [অগ্নিহোত্রাদি] ক্রতবঃ [সদুপ, অতএব পশুবধবিশিষ্ট ক্রতুসমূহ] দক্ষিণাঃ চ [এবং একটী গো হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্বার্পণ পর্য্যন্ত দক্ষিণাসমূহ] সংবৎসরঃ চ [এবং যজ্ঞাদ কাল] যজমানঃ চ [এবং যজমান] লোকাঃ [বিদ্বান্ ও অবিদ্বানদের কর্ম্মফলসম্ভূত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মার্গ-দ্বারা প্রাপ্ত লোকসকল] যত্র [যে লোকে] সোমঃ [চন্দ্র] পবতে [লোক সকলকে পবিত্র করেন] যত্র [যেখানে] সূর্য্যঃ [সূর্য্য তাপ দেন]। পুরুষোত্তম-মূল হইলেই মিলিবে পূর্ণফল, পূর্ণলোক, পুরুষোত্তমলোক; পুরুষোত্তম-মূলের স্থানে বিচ্ছিন্ন অহংমূল হইলেও উহারা একেবারে নিষ্ফল নয়, তবে ঘুরিয়া মরিতে হয় দুনিয়া ভরিয়া সব কিছু হইতে তত্ত্ব আহরণ করিবার জন্য; সে কি হয়রাণি! আর পুরুষোত্তম-মূল হইলে এই হয়রাণি আর থাকে না, অথচ লাভ হয় সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বকাম ও পূর্ণ মোক্ষ। বুদ্ধির কুলুপ আর না বুঝিয়া কুলুপ, যেদে শ্রদ্ধা লইয়া যাহা কিছু করুক পুরুষোত্তম-শক্তিতে ভরপুর বেদশাস্ত্র একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিবে না। তবে যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম যদি থাকেন মূল, সমস্ত বৃক্ষের নিংড়ানো ফল পুরুষোত্তম মিলিবে।

সেই পরম পুরুষ হইতে ঋক্ মন্ত্র, সাম মন্ত্র, যজুর্মন্ত্রসমূহ দীক্ষা, যজ্ঞসমূহ, ক্রতুসমূহ, এবং দক্ষিণাসকল, সংবৎসর যজমান জাত হয় এবং সেই সব লোক যাহাকে চন্দ্র পবিত্র করে এবং সূর্য্য তাপ দেয়, তাহাও জাত হয়। ৬।১

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥৭

তস্মাৎ [পুরুষোত্তম হইতে] দেবাঃ বহুধাঃ [কর্ম্মের অঙ্গ গণভেদে বিভিন্ন বহুদেব; সব কর্ম্ম যখন এক পুরুষো কর্ম্মে পরিণত, তখন প্রতি-কর্ম্মের অঙ্গভূত প্রতি দেবত

গলিয়া পুরুষোত্তমাকারই হন্। এইভাবে পুরুষোত্তমই সর্বদেব-সমন্বিত এক দেব; কর্ম কর্তৃতন্ত্র হইলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নানা দেবতাকেন্দ্র। "সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি-গচ্ছতি"] সম্প্রসূতাঃ [সম্যক্‌রূপে প্রসূত হয়] সাধ্যাঃ [সাধ্য নামক দেবতাবিশেষ] মনুষ্যাঃ [কর্মে অধিকারী মানব সকল] পশবঃ [পশু সকল] বয়াংসি [পক্ষিসমূহ] প্রাণাপানৌ [প্রাণ এবং অপান অর্থাৎ জীবন] ব্রীহি যবৌ [হোমার্থ ব্রীহি যব] তপঃ চ [এবং কর্মের সহায়ক কর্তার সংস্কারলক্ষণ] শ্রদ্ধা [যেখানে বুদ্ধির প্রবেশাধিকার নাই, সেই শ্রৎ-এর দেশের, সত্যের দেশের কিছু জানিতে হইলে বা পাইতে হইলে ঐ শ্রৎ-এর সামনে সত্যের সামনে মাথা নোয়াইয়া দিয়া সত্যকে ধারণা করিবার উপযুক্ত ব্যাকুলতাময়ী বৃত্তিই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা সম্বল হইয়াই মানুষ সর্বপুরুষার্থ সাধনে প্রযুক্ত হয়, তখন আসে চিত্তপ্রসাদ এবং আস্তিক্য বুদ্ধি] সত্যং [সমদর্শনই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মতে সত্য; সকলের সব দৃষ্টিকোণ হইতে যাহাকে অবিসম্বাদিত-রূপে মানিয়া লওয়া যায়, তিনিই সমদর্শন সত্য] ব্রহ্মচর্যং [যে ব্রত গ্রহণ করিয়া মানুষ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক মানিয়া লইয়া, তাহার বুকের ভিতরের পুরুষোত্তম ও বিশ্বের ভিতরকার পুরুষোত্তমকে এক বলিয়া বুঝিবার জন্য বিশ্বের শরণাগত হইয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মচর্য, তিনিই মদনকে মোহিত করিতে পারেন; বিশ্বরূপ না হইলে মদনমোহন হওয়া যায় না, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হয় না; শুধু বাহিরের মৈথুন ক্রিয়া বন্ধ করিলেই ব্রহ্মচর্য হয় না। প্রকৃতির শ্রীচরণতলে রহিয়াছে আত্মসমর্পণ-খণ্ডন-কৌশল নিহিত। প্রকৃতিকে পুরুষের সমকক্ষ স্থান দিবার মত শ্রদ্ধা ও সত্য সাহস যাহার নাই, তাহার ব্রহ্মচর্য একদিন প্রকৃতির কোনও রূপের সামান্য একটু চমকের সামনে ধূলায় লুটাইবে। দৃষ্টান্ত পুরাণে বহু রহিয়াছে। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচর্যই অটুট ব্রহ্মচর্য।] বিধিঃ চ [এবং ইতিকর্তব্যতাপূর্ণ বিশ্ববিধান; বিধি তখনই মানুষকে বাঁধে যদি জীবনের রসে উহা রসিত না হয়, মানুষ যদি উহা স্বেচ্ছায় কর্ম-কুশলতার জন্য স্বীকার না করে; পুরুষোত্তমের বিধি চায় সমস্ত বৃত্তির মুক্ত ক্রীড়ন (free play), বিধির জন্য নয়। কর্তৃতন্ত্রঃ তদ্বৈধিঃ—আচার্য শঙ্কর। যেখানে কর্তৃতন্ত্রতা, সেখানের বিধিই কর্তব্যের কঠোরে কথা কয় (speaks with a stern voice of duty); পুরুষোত্তম-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিধির উদ্বেগও কমিয়া থাকে, অথচ বিধির ভিতরকার বাহুল্যের কড়াকড়ি ও ছোট-খাট বিষয়গুলিকে অতিমূল্য দেওয়ার মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। 'চরেৎ অবিধিগোচরঃ'—বিধির আচরণ করিবে কিন্তু বিধির তাড়াহুড়ায় নয়; নিজের সকল সমগ্র দৃষ্টি ও অগ্রগমনকে সামনে রাখিয়া, বিধি যেন জীবনের গতিপথ না আটকাইতে পারে।

তাহা হইতেই পদ্যভেদে বিভিন্ন দেবগণ, সাধ্যসমূহ, মনুষ্যবৃন্দ, পশুবর্গ, পক্ষিগণ, প্রাণ-অপান উপলক্ষিত জীবন, ব্রীহি যব, তপস্যা শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং ইতি কর্তব্যতাময় বিধিও জাত হয়। ২।১।৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকাঃ যেষু চরন্তি প্রাণাঃ
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮

সপ্ত প্রাণাঃ [মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও জিহ্বা] প্রভবন্তি [উদ্ভূত হয়] তস্মাৎ [তাহা হইতে] সপ্তার্চিষঃ [সবিষয় প্রকাশের সাতটি দীপ্তিধারা] সপ্তসমিধঃ [সাতটি সমিধ অর্থাৎ বিষয় যাহার ইন্ধন যোগাইতেছে] সপ্ত হোমাঃ [সাতটি হোম, সপ্ত বিষয়বিজ্ঞানরূপ হোম। 'যদ্যত বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি'—শ্রুতি] সপ্ত ইমে লোকাঃ [এই সপ্ত ইন্দ্রিয়ের অবস্থান ক্ষেত্র] যেষু [যে ক্ষেত্র সকলে] চরন্তি [সঞ্চরণ করে] প্রাণাঃ [ইন্দ্রিয়সমূহ] গুহাশয়া [দেহগুহায় নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত, দেহের গুহ্যতম প্রদেশে প্রাণন ক্রিয়া জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে এমন নিগূঢ় কৌশলে অন্তর বাহিরে চলিতেছে, দেহ হইতে ইহাকে পৃথক করিবার যো নাই; প্রাণ ও দেহ পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্ন] নিহিতাঃ [স্থাপিত, স্থিতিভাবপ্রাপ্ত] সপ্ত সপ্ত [প্রতি

প্রাণীতে সাত সাত করিয়া; এই ইন্দ্রিয় ধারাগুলি এমন সুকৌশলে গোপনে প্রত্যেকের ভিতর দিয়া (current and cross-current) পরস্পরকে কাটিয়া এমন ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে একটীকেও অপরটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যো নাই; সকলেই এখানে 'এক-প্রাণ,' এক গতি, এক উদ্দেশ্য, এক ফলপ্রাপ্তি।

উপনিষদ্ জীবনের সব ব্যাপারকেই হোমে পরিণত করিতেছেন। বাস্তবিকই সবকিছু যখন পুরুষোত্তম-ময়, তখন আত্মযাজী ও কর্ম্মযাজী সকলেই তো যার যা-কিছু সম্বল থাকে সর্ব্বস্ব দিয়া পুরুষোত্তমে হোম করিতেছে, পুরুষোত্তমও নিজকে সকলের ভিতর হোম করিতেছেন। গীতাও ইহাই বলিয়াছেন—"যৎ জুহোষি তৎ কুরুষ মদর্পণম্"। সমস্ত বিষয়-বিজ্ঞান যখন পুরুষোত্তম-হোম, তখনই তো বিষয় হয় প্রসাদ, সেখানেই তো বিদ্যা-অবিদ্যার সঙ্গমস্থান, বিদ্যান্-অবিদ্যানের কোলাকুলি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিষয়ের এবং সর্ব্ববিষয়বিজ্ঞানের পরস্পরের মাঝে এবং সর্ব্বশেষ পুরুষোত্তমের মাঝে এই হোমই শ্রুতিসম্মত। যজ্ঞকে শ্রুতি নিজেই বাহির হইতে ঘরে আসিয়াছেন। এই দেহও তো ব্রহ্মাণ্ডই।

তাহা হইতে মস্তকস্থ সাতটী ইন্দ্রিয়, (তাহাদের) সাতটী কিরণ, সাতটী সমিধ্ অর্থাৎ বিষয়, সাতটী হোম অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান জাত হইল। এই যে সাতটী গোলোক যেখানে প্রতি প্রাণিভেদে সাতটী করিয়া দেহের গোপন প্রদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাও উদ্ভূত হইল। ২।১।৮

অতঃ সমুদ্রাঃ গিরয়শ্চ সর্ব্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ঃ রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে অন্তরাত্মা॥ ৯

(শ্রুতি এতক্ষণ পুরুষোত্তমকে 'তস্মাৎ' 'তস্মাৎ' বলিয়া এই মন্ত্রে তাঁহাকে 'অতঃ'-পদবাচ্য করিতেছেন। আগে ছিলেন যিনি 'তিনি', এখন তিনিই হইয়াছেন 'ইনি'। কত নিকটতম সম্বন্ধ ইহার সঙ্গে। এই নিকটতম পরিপূর্ণতা দুই 'অহং'কে গলাইয়া এক অহং-এ পরিণত করা) অতঃ [ইনি হইতে] সর্ব্বে [সকল] সমুদ্রাঃ [সমুদ্র সকল] গিরয়শ্চ [পর্ব্বতসমূহ] অস্মাৎ [এই পুরুষ হইতে] স্যন্দন্তে [প্রবাহিত হয়] সিন্ধবঃ [নদীসমূহ] সর্ব্বরূপাঃ [বহুরূপ] অতঃ চ [এবং ইনি হইতেই] সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ [সকল ওষধি] রসঃ চ [এবং মধুরাদি রস] (উদ্ভূত হয়) যেন [যে রসের বলে] এষঃ [এই পুরুষোত্তম] ভূতৈঃ [সর্ব্বভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভূতনাথ রূপে] তিষ্ঠতে হি [তিষ্ঠতি; নিশ্চয়ই স্থিতিলাভ করেন, প্রতিষ্ঠিত হন্] অন্তরাত্মা [সকল দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনের অন্তরতম প্রদেশে থাকিয়াও যিনি অন্তরতম অর্থাৎ দূরতম, তিনিই সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা; ইনি স্থূলেরও অন্তরাত্মা, লিঙ্গশরীরেরও অন্তরাত্মা। ইনি সর্ব্বভূতের বাহ্য-অন্তরে স্থিত আত্মা। রসের বলেই পুরুষোত্তম সর্ব্বভূতদ্বারা স্থিত হন্; রসই তাঁহার সঙ্গে ভূতের যোগ সম্ভব করিয়াছে, সফল করিয়াছে।

এই পুরুষ হইতে সমুদয় সমুদ্র ও পর্ব্বত সম্ভূত হয়, ইনি হইতেই বহুরূপ নদীসমূহ প্রবাহিত হয়; ইনি হইতেই সকল ওষধি এবং রস উদ্ভূত হয়; এই রসের বলেই ইনি সর্ব্বভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হন্। ২।১।৯

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরীতীহ সোম্য॥ ১০

পুরুষঃ এব [পুরুষই] ইদম্ [এই] বিশ্বং [বিশ্বের ত্বক্-অস্থিকে হেয় মনে না করিয়া, মড়া কাটা নীতির (postmortem policy) অনুসরণে জীবন্ত জগতের বুকে ছুরি চালাইয়া বিশ্বকে খুনে বক্তাক্ত না করিয়া রস-সাধনায় 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—এইরূপ রস ও ফলে সামান্যাধিকরণ উপলব্ধি করিয়া পুরুষোত্তমময় যে অখণ্ড বিশ্ব সর্ব্ব সাধনার ফলস্বরূপ মিলে] কর্ম্ম [বিশ্বকর্ম্ম

পুরুষই বিশ্বকর্ম ও তাহার মূর্তিমান ফল] তপঃ [বিশ্ব-জ্ঞান; পুরুষই বিশ্ববিজ্ঞান ও তাহার পরিপূর্ণ ফল] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম; বিশ্বও ব্রহ্ম, কর্মও ব্রহ্ম, জ্ঞানও ব্রহ্ম] পরামৃতম্ [পুরুষোত্তমমূল বিশ্ব, কর্ম ও জ্ঞান সবই পর এবং অমৃত] এতৎ [সর্বাত্মক এই পুরুষোত্তম বস্তুকে] যঃ [যিনি] বেদ [জানেন] নিহিতং [স্থিত] গুহায়াং [সব-বিছুর গুহ্যতম প্রদেশে, হৃদয়ে] সঃ [তিনি] অবিদ্যা-গ্রন্থিং [বস্তুতত্ত্ব অবিদ্যার গাঁট] বিকিরোতি [বিকীর্ণ করেন, রস-চঞ্চল জীবন-ধারাকে সর্ব শরীরে প্রবাহিত করিয়া গাঁটগুলিকে আর কখনও বিশেষ কোনও অঙ্গে জমিতে না দিয়া ও শক্ত হইতে না দিয়া চঞ্চলতার মাঝে ছড়াইয়া দেন]। ইহ [এই দেহ; দেহত্যাগ হয় যখন দেহের গ্রন্থিগুলি জমিয়া যায়, বিকীর্ণ হইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। প্রাণচঞ্চল পুরুষোত্তমের পরশ পাইয়া সব রস রসই থাকে, জমে না; coagulate করে না] সৌম্য [হে সৌম্য]

পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম ও জ্ঞান; বিশ্ব, কর্ম ও জ্ঞান ব্রহ্ম, পর ও অমৃত। ইহাকে যিনি গুহানিহিত জানেন, তিনি এই দেহেই অবিদ্যাগ্রন্থি বিকীরণ করেন। ২।১।১০

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় মুণ্ডক
দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১

অক্ষর পুরুষকে কোন্ উপায়ে জানিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন। তাঁহাকে দিয়াই তাঁহাকে জানার আরম্ভ। আবিঃ [প্রকাশ-স্বভাব] সন্নিহিতম্ [অতি নিকটে অবস্থিত বলিয়াই] সম্ (সম্যক্ ভাবে) নিহিত, তিনি জীবের জীবনের সকল স্তরে সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত না-হইয়াই আড়ালে অন্তরালে এমন ভাবে সমগ্রতা নিয়া আবিঃ সন্নিহিত যে, তাঁহাকে সর্ব প্রথমে ধরিতে হয় সহজ জীবনের সহজ স্পর্শ দিয়া; "আমি তো তোমারে চাহি নে জীবনে তুমি অন্তরাগারে চেয়েছ। আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ"—ইহাই আবিঃ সন্নিহিত। জীবের ঘুমের আড়ালে তাহার সমগ্রতাকে সহজ চুম্বনে সিঞ্চিত করিয়া, বিশেষের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আস্বাদন করিবার লালসা জাগ্রত করিয়া পুরুষোত্তম পলাইয়া যান, তখন সেই চুম্বনের আনন্দকে প্রতি ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ীভূত করিয়া আস্বাদন করিবার জন্য জীব পাগল হইয়া দুনিয়ার ছুটিতে থাকে—ইহাই সাধনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম তো 'সাধ্য' নয়। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য বস্তু নয়"—ইহাই "আবিঃ সন্নিহিতম্" এর মর্মার্থ। অগ্রে তিনি "আবিঃ সন্নিহিত," পরে সেই আবিঃ সন্নিধানকে দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান-দ্বারে সর্বেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠা] গুহাচরং নাম [নাম তাঁহার গুহাচর—হৃদয়ের গুহায় গুহায় যিনি বিচরণ করেন; গুহাই গোপন স্থান; গোপন স্থানই তাঁহার বিহার ক্ষেত্র। যিনি সব-চেয়ে আবিঃ সন্নিহিত, তিনিই সবচেয়ে "গোপন"; সাধারণ জীবের কাছে তাঁহার এই গোপন-স্বভাব শুধু তাহার সমগ্র দৃষ্টির অভাবের ফল। অবশ্য সমগ্র দৃষ্টিতেও তিনি চির গোপন; ইহা তাঁহার লীলা রসাস্বাদনের জন্য; গোপনের ঘন হইলেও বিচরণের তো অভাব তাঁহাতে নাই"] (তিনিই) মহৎ-পদম্ [মহৎ এবং পদ; তাঁহারই সবচেয়ে মহত্ত্ব, যিনি অধর হইয়াও ধরা দিতে যান, গোপন হইলেও "আবিঃ সন্নিহিত," তিনিই পদ-সর্বাশ্রয়, সর্বাস্পদ] অত্র [এই অক্ষর বস্তুতে] এতৎ সর্বম্ [এইসব] সমর্পিতম্ [সমর্পণের ভিতর দিয়া প্রবেশিত; স্বরূপে তো সকলেই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সহজভাবেই এই আবিঃ সন্নিহিত পুরুষে সমর্পিত মনোবুদ্ধি হইয়াই আছে; এই নিত্যসিদ্ধ সমর্পণকে বুদ্ধি গোচরে, ইন্দ্রিয়গোচরে আনিবার জন্যই, যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাকেই সাধনার ভিতর আনিবার জন্য শ্রুতি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৪৩)

এই তুমি যাহাকে বরণ কর আগাইয়া আসিয়া অযাচিতভাবে ভিখারী বেশে, শুধু বরণই কর না তাকে তোমার "যা-কিছু"ও প্রদান কর। তুমি ত আমাকে তোমার স্থূলদেহের কিছুটা আকার প্রদান করিয়াছ, নহিলে তোমার প্রতিকৃতি দেখিয়া লোকে কেন মনে করে উহা আমারই প্রতিকৃতি? স্থূলদেহের আকৃতি যদি দয়া করিয়া দিলে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের প্রতিকৃতি কি দিবে না? বরণীয় আমার, তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ, বিশ্ব তোমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। জীব ঈশ্বরের কত কথা কানে কানে প্রাণে প্রাণে, কত ব্যথা উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে। অনন্ত ব্যথার পরিণতি এই বিশ্ব। বিশ্ব ব্যথার সমুদ্র।···সে বলে আমার মাথা নাই মনে কিছু থাকে না, আমি বলি দুই রকমে মনে রাখা যায়, এক বুদ্ধি দিয়া এবং অপর হৃদয় দিয়া...

২৮শে নভেম্বর

"বঁধুয়ারে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি তুই মোর। তোরে বুকে করে আমি পাগলিনী তোর রে। শ্রান্ত হলে নদীতীর তরুতল পাই। তোর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাই। তোরে বুকে করে যাই যথায় তথায়। টলে না পাগল মন কোন ভাবনায়। পথে ঘাটে বলে সবে ঐ পাগলিনী যায়। কেহ হাসে কেহ মোর ধূলা দেয় গায়"। নিত্যগোপাল, তুমি আমার তুমি আমার। আমার গর্ব করিবার তুমি ছাড়া আর কি আছে? আমার গর্ব করিবার তুমি; আমার আত্মমর্য্যাদা তুমি, আমার অহংকার তুমি। তুমিই আমি। উজ্জ্বল ভারত গোঃ অফিসে দিয়া আসে ··৭।০টায় পর পাঠ আরম্ভ হয়। আত্মা সর্বভূতের ব্যাপ্তিকে সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রতে আস্বাদন করিতে হইবে ইহারই ব্যাখ্যা হয়,...অহংকার থাকিলে জড়ের ব্রহ্মরূপ আস্বাদন করা যায় না—'দারু ব্রহ্মই বর্ত্তমান যুগের আস্বাদন। ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপূর্ণ আস্বাদন ঐ দারুব্রহ্ম। বড় যখন ছোট হন তখনই বড় উপাধিমুক্ত। আত্মা ও সর্বভূত একান্তভাবে জীবনের উপাধিমাত্র। সহজ জীবনেই আত্মা ও সর্বভূত উপাধিমুক্ত। 'উপাধিবিধুরঃ স্বাত্মাবিদঃ সহজঃ ব্যাপ্তিঃ।

১৯শে নভেম্বর

সারাজীবন জড়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছি, তুমি সংগে আছ তাই ধরার ধূলিতে মিশিয়া যাই নাই, চতুর্দিকের চাপের মধ্যে নিষ্পেষিত হই নাই। তুমি আমাকে আবরিয়া আছ—"শীতের ওঢ়নি পিয়া গিরিষের বা। বরিষার ছত্র পিয়া বরিষার না"। তাই আমি নিরাপদ আছি, আমি কি তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইব না? তোমাকে কি ধরার ভাষায় create করিতে পারিব না। চাই তোমাকে সৃষ্টি করিতে নিজ জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। তাই আমি সব সহিয়াছি সামনের দিকে চাহিয়া, কাহারও সংগে বিরোধ করি নাই, কাহাকেও দূরে সরাইয়া দিই নাই। সকলকেই যে আমার প্রয়োজন, তাই কাহারও প্রয়োজন আমার নহে; সকলকেই চাই বলিয়া একান্তভাবে কাহাকেও চাই না, সকলের মাঝে তোমাকেই সৃষ্টি করিতে চাই।···সোয়া চারটায় পাঠ আরম্ভ হয়, অষ্টক্রমণিকা হইতে বীতরাগ ভয় ক্রোধ শ্লোক অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ৭।০টার পর সন্তোষ অধিকারী আসে তাহার বন্ধু শান্তশীল দাশসহ। একটা দার্শনিক বিপ্লব সংগঠিত না হইলে সাহিত্যিকদের লেখা প্রাণদর্শনে সমাজের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন আসিবে না।

বর্তমানের সমস্যা—যুবক-যুবতীদের অবাধ মিলনের বিপদ, ধর্ষিতাদের লইয়া প্রশ্ন ইত্যাদির দার্শনিক সমাধান না দিলে সমাজ কি টিকিবে? শান্তশীলবাবুকে আমার ইশ ও কেনোপনিষদ পড়িবার জন্য দেওয়া হয়।...

৩০শে নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইয়াছি, যেদিন আমার পায়ের নীচ হইতে সমস্ত জগৎটা সরিয়া গিয়াছিল, আমি একটা বিরাট অন্ধকারের মাঝে পড়িয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমায় পথে কুড়াইয়া পাওয়া ধন ... কি আর আমার আছে কুড়াইবার তুমি ছাড়া? আজও যে আমি ছুটিয়া চলিতে চাই সে শুধু তোমারই আশীর্বাদ, তোমারই প্রেরণার বল। সারাজীবনের স্মৃতি তোমার দর্শন ও জীবন, তাহা নিয়াই আমার যতকিছু ছুটাছুটি।... পাঠ আরম্ভ হয় ৯৷৷০টায়—যস্তিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানত ঃ...

১লা ডিসেম্বর

ভোর ৪৷৷টায় প্রার্থনা সমাপন করি। আমার জীবনের সকল সমস্যার সহজ সমাধান দিয়াছ, আমাকে সর্বদা আগলাইয়া রাখিয়াছ, আমাকে যেমন পার করিয়াছ তেমন তো তোমার ধামাইকেও (ধর্মদাস রায়) কর নাই। কং বা দয়ালুঃ শরণং ব্রজেম। আমার জীবন-সঙ্গী, আমার সকল জটিল কুটিল সমস্যার সঙ্গী তুমি। তোমাকে বুকে লইয়াই চলিব। আমার যেন অচল বিশ্বাস তোমার উপর থাকে। তুমি ত কিছুর জন্যই আমাকে বেগ পাইতে দাও নাই। এই পাষাণ আবেষ্টনীর মধ্যেও যাহা হউক একরকম আমি উৎরাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমার দর্শন ও জীবনের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না, এজন্য আমার কী বেদনা। ৫-২৫ এ আমি, রেণু, গোপা ও প্রতিভা আশ্রম হইতে বাহির হই,...আমি ঐ ছেলেটির সঙ্গে তখনই দেহালার রওনা হইয়া যাই, ২৷৷০টার পর আশ্রমে ফিরি,...শরীর আর যেন বয় না, হাঁটিতে ক্লান্তি বোধ করি, শরীরটায় বেদনা বোধ করি। পাঠ হয়, তত্র কঃ মোহ কঃ শোকঃ অংশ পাঠ হয়। আসক্তির শোকের, মোহের কেমন করিয়া সার্বজনীন রূপ থাকে, তাহা ব্যাখ্যা করা হয়। বৈষয়িক আসক্তিতেই দুই সতীনের ঝগড়া হয়। কিন্তু বৃন্দাবনের আসক্তিতে ষোল হাজারেও মন কষাকষি হয় নাই। নয়টার পরই শুইয়া পড়ি।

২রা ডিসেম্বর

ঠাকুর, পিতামাতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধুদের ও আশ্রিত আপনজনদের—সুধা প্রতিভা কুসুম সুধাংশু নলিনী রেণু নীলু মিনু রমা মালতী প্রণতি বিরজা প্রভৃতির দায়িত্ব পালনে প্রাণপণ করিয়াছি, কোনও দায়িত্ব ত এড়াইতে চাহি নাই। তাই আজিও সত্যব্রতের খবর পাইয়া এই বয়সে ছুটিয়া যাই, যদিও যাইতে কষ্ট হয়। দায়িত্বের পরিচ্ছিন্নতার অংশ আমার বটে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্নতা অংশের দায়িত্ব ত তোমার। হয় তোমার আমার যৌথ দায়িত্বভার বহিবার সুযোগ দাও, নহিলে সব দায়িত্বভার তুমি বহন কর। আমি বুঝি আর পারি না। দায়িত্ব প্রতিপালনে অর্থ চাই, শারীরিক স্বাস্থ্য চাই আবেষ্টনের সুযোগ চাই। কি আমার আছে? তুমি ছিলে বলিয়াই যেটুকু হয় হইয়াছে। আর যে পারি না। তুমি আমার শরণ...আজিকার উপাসনায় গোপা নাই, রেণু নাই।...প্রতিভাসহ টালীগঞ্জ বাজারে যাই। ফেরার কিছু পরে সত্যব্রত নীহার বাবুর উকিলের ওখান থেকে আসে।...আমি ২৫৲ টাকা দিলাম। তাহার সংগে বেহালা গেলাম।...৩৷৷০টার পর ফিরিয়া আসি। ঠাকুর তোমাকে লইয়া নিশ্চিন্তে যে আমি কাজ করিব, তোমার পথে আগাইয়া যাইব তাহা ত হইল না। আমার না আছে ধন, না আছে জন; অথচ দায়িত্ব ত প্রচলিত সন্ন্যাসীদের মত ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না। সেইখানেই ত আমি বিপন্ন। সংঘ ছাড়া এত দায়িত্ব কি পালন করা সম্ভব? ...পাঠ হয় আজ সপ্তম মন্ত্র পর্যন্ত।...ঠাকুর, তোমার কাজ নিয়া আমি বড় একা, আমাকে মানুষ দাও যাহাদের নিয়া তোমার কাজ করিতে পারি।...

৩রা ডিসেম্বর

হিয়ার পুতলী শ্রীরাধারাণী আমার, তুমি অযাচিত করুণায় আমার জীবনে প্রবেশ করিলে। আমি তোমার জীবন ও দর্শনকে বিরাট বিশ্বের মধ্যে রক্ত মাংসের

মানুষের মধ্যে আস্বাদন করিবার জন্য পাগল হইলাম। কিন্তু তোমার পরশে আমার আবেষ্টন ত পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিল না। তোমার কায়-ব্যূহ যদি আমার জীবনের চারিপাশে না জমিয়া উঠে, কেমন করিয়া আমি আমার ষোল আনা দায়িত্ব প্রতিপালন করিব? তুমি মায়া প্রকৃতিকে যোগমায়া প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিলে, কিন্তু আমার জীবনের বাহ্যিক প্রকৃতি তা জীবন্ত পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিল না। আমি যে আর ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইতে পারিতেছি না। প্রাণবল্লভ রাধারাণী আমার, তুমি আমার হও, আমি তোমাকে বুকে লইয়া তোমার পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠা রচনা করিব। সকালে প্রতিভাকে বলি তোমরা আছ, থাকিও না। আমি সুখে তোমাদিগকে রাখিতে পারি নাই, হয়ত রাখিতে পারিবও না। হয়ত দুর্গতি হইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যাদের মোটামুটি খাবার দিতেও পারি নাই। আজ তাহারা একটু দাঁড়াইতে চলিয়াছিল। যদি আমার সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যুক্ত থাকিত, হয়ত দাঁড়াইয়া যাইত, কিন্তু সে বুদ্ধি তাহাদের নাই। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' তিনিও ত বুদ্ধি দিতে পারিতেন? আমি ত ঠাকুরেরই ছিলাম। ধন নাই, জন নাই। কেমন করিয়া আগাইব? রেণুর উপর চাপ পড়িতেছে, তাহার ত কষ্ট হয়।

তোমরা আমার জন্য নবদ্বীপ বা পাবনায় ভিক্ষা করিয়াছ। আমি ত তাহা ভুলিতে পারি নাই, তিনি সাহায্য না করিলে ঋণ আমি কি করিয়া শোধ করিব? আবার মিনু আসিল। কি আমি করিব? ৬৯ শেষ হইল, পরন্তু ৭০এ পড়িব। কত ঠেলাঠেলি করিয়া চলিব? পাবনা হইতে মাখনের এক চিঠি আসে। আমিই পাসপোর্ট করিয়া দিই নাই, ইহাই আমার উপর অভিযোগ। ..চিঠির মধ্যে বেদনার সুর তো নাইই, আছে দম্ভ, ব্যক্তিত্বের দর্প ও আক্রমণ করিবার মনোবৃত্তি। আমি আকাশধর্মী, আমাকে আঘাত করিয়া কি ফল? আমি দুয়ার খুলিয়া রাখিব, চিঠি পড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লিখিয়াছে। অনেক সহিয়াছি ইহাও সহিব। নিত্যব্রত ১১টায় পর আসিয়াছিল। সে আজ রাত্রিতে ওখানে থাকিবে, সত্যব্রতকে আসিতে বলিয়া ছিলাম, আসে নাই। বিরজা ৪টায় আসে, আরতির পর যায়। রাত্রিটা উদ্বেগে কাটাই ওখানকার খবরের জন্য। কত কষ্টই জীবনে আরও আছে ঠাকুর জানেন। কাজে আগাইয়া যাইবার মত এদের পরিসমাপ্তি কি নাই?

৪ঠা ডিসেম্বর

ঠাকুর, ৬৯ বৎসরের সকল দায়িত্ব-ভার, তাহা বহনে ব্যর্থতা ও সক্ষমতা, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ প্রাণমন, সকল আদর অনাদর লইয়া ৭০ বৎসরের দ্বারদেশে তোমারই শ্রীচরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান। তুমি অনন্ত অসীম অশেষ। কত যুগ ধরিয়া জীবনের খোঁচায় চলিয়াছি অনন্ত অতীত, অনন্ত বর্ত্তমান, অনন্ত ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া। কোন সংস্কার, কোন উপাধি, কোন আসক্তি বাধা দিতে পারে নাই জীবন পথের সে অগ্রগতিকে। ওগো নূতন, আজ আমাকে গ্রহণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠা আর কতদূর? তাহাই ত চাহিয়াছিলাম। তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শ আমার বুকে মাথায় ছিল বলিয়াই না মাথা ফাটিয়া যায় নাই, বুক ভাঙ্গিয়া যায় নাই? ওগো তুমি এস, তুমি এস প্রতিষ্ঠ মূর্ত্তি ধরিয়া। আমি স্থাপন করিয়া ধন্য হই, জুড়াইয়া যাই সত্যব্রত ১০টার পর আসে,...রেণু ৭৷৷-টায় আসে... আনুপূর্ব্বিক সেখানের খবর শুনি।...কুসুমের চিঠি আমাকে আমার অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ করিয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর

কৃষ্ণাপঞ্চমী আমার জন্মতিথি। আমার জন্মসাল রবিবার ১২৯০-এ কৃষ্ণা পঞ্চমীর দিন ছিল। পুনর্বসু নক্ষত্র। ঠাকুর আজ ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। আমার অনন্ত অতীত নিত্য বর্ত্তমান তোমার জীবনে জন্মলাভ করুক। ওগো নর নারায়ণ, তুমি ক্ষরের বুকে অক্ষর, সান্তের মাঝে অনন্ত অনন্ত কালের বরণ গায়ে মাখিয়াই তুমি কালাতীত। ধরা ধূলিতে ক্ষরের দেশেই তোমার অক্ষর রূপকে জমাইয়া তুলিতে চাহিলাম, সংঘরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম চিত্তেন ওগো জড় ব্রহ্ম, আবার তুমি সংঘরূপে প্রকট হও

আজ আমার অতীত সেই সব জনকে স্মরণ করিতেছি যাহাদের স্নেহে করুণায় সেবায় আমি ৭০ বৎসর পদার্পণ করিলাম। আমি তাহাদের, তাহারা আমার। তাহারা ও আমি পুরুষোত্তমের, পুরুষোত্তমও তাহাদের ও আমার। এই দিব্য সংঘ আমার জীবনে গড়িয়া উঠুক, তোমার জনমে আমি নূতন জনম লইব। ঘণ্টায় সিমলাই আসে,...জয়া জোরেই আসে,...রেণু ও জয়া লেক মার্কেটে যায়,...। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলি, "ঠাকুর বলিয়াছেন পরং তুমি যখন যেখানে থাক আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। তোমরা আমার সঙ্গে থাকিও, সংসার অতীব ভীষণ স্থান। আমায় সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে যাইও না। প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যিনি আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি আমাকেও রাখিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে বুকে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করি; তোমরাও আমাকে বুকে রাখিও; তোমরা আমার হও আমি তোমাদের হই। পারস্পরিক এই হওয়ার ভিতর দিয়া সংঘ গড়িয়া উঠুক। সরল হও, অকপট হও। যোগবন্ধঃ পরস্পরং তোমাদের জীবনের মন্ত্র হউক"। ৪টার পর রেণু আমার সম্বন্ধে একটি লেখা পাঠ করে। পাঠের পর আমাকে প্রণাম করে। পাঠের স্থানে আমি ছিলাম না। ৭॥-টায় দৈনিক পাঠ আরম্ভ হয়।...কবির্মনীষী অংশ পাঠ হয়।...

৬ই ডিসেম্বর

ওগো পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল আমার, 'কবি' আমার, 'মনীষী' আমার, ৭০ বৎসর বয়স আরম্ভ করিবার অবসরে আমায় ক্রান্তদর্শী কর, সমগ্রদর্শী কবি কর, আমায় মনীষী কর, অংশদর্শী কর। তোমার দ্বারা "গৃহীতকণ্ঠ" ও "অন্যোন্যবদ্ধবাহু" অংশস্বরূপিনী ব্রজগোপীদের মাঝখানে থাকিয়া তোমার যে রসসংঘ-রচনার লীলা তুমি আস্বাদন করিয়া গিয়াছ, সেই রস পান করিবার সৌভাগ্য আমাকে দাও। বুঝিতে দাও এই বিশ্ব তোমারই হৃদয়, বিশ্বম্ অস্ত হৃদয়ঃ। হৃদয়ের স্বরূপ এই বিশ্বে হৃদয়-বল্লভের প্রতিষ্ঠা হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, তোমার বিশ্ব আমার হউক। আমার হৃদয় তোমার হউক, আমার বিশ্ব তোমার হউক। হৃদয়ের ভাষা হৃদয়দ্বারা বিশ্বকাব্য রচিত, তোমার ভাষা আমাকে বুঝিতে দাও। গোপাকে লইয়া আমি সকালে বেড়াইয়া আসি। গতকল্য ভাগবতের একটি শ্লোক সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়—কুশলানি আশু সিধ্যন্তি নেতরাণি-কৃতানি বৈ। কলিকালে কুশল চিন্তা আশু সিদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে অকুশল চিন্তা আশু সিদ্ধ হয় না। তাহারা কৃত হইলেই তবে সিদ্ধ হয়। কলিযুগের ইহা একটি যোগ্যতা। তোমার অহিত আমি মনে মনে ভাবিলে তাহা ফলিবে না, বিশ্বপ্রকৃতি তাহা শোধরাইয়া লইবেন। কিন্তু তাহাকে কর্মে রূপদান করিতে যাইও না। অকুশল চিন্তা কর্মে রূপায়িত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহা ফলপ্রসূ হয় না। চিন্তায় অকুশলতা থাকিলেও তাহা যেন কর্মে রূপ না পায়। কর্মে অকুশলতা না থাকিলে বিশ্বব্যবস্থার ভিতর অকুশল চিন্তা কুশলতায় গড়িয়া উঠিবে, ইহা কলিকালের বিশেষ যোগ্যতা। কুশল কর্ম অকুশল চিন্তাকে আজ হোক কাল হোক শুধিয়া লইতে পারে। ৪-১৫তে গীতা পাঠ আরম্ভ হয়...গীতায় অনুক্রমণিকা শেষ করি। বর্ধমানের এক ভদ্রলোক আসেন, তাহার বাড়ী বরিশালের কলসকাঠি। নাম হারাধন। তাহাদের আফিসে একটি লাইব্রেরী আছে সেখানে আলোচনা হয়। সেখানে আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ জানায়, বক্তৃতা দিতে হইবে। বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।..

৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি পরসত্য; এই পরসত্যের এককোণ আমি, অপর কোণ বিশ্ব, তৃতীয় কোণ হইতেছ তুমি। এই ত্রিকোণসত্য সকল বিশ্বকে বিধৃত রাখিয়াছে। নরনারায়ণ ও বিশ্ব একই সত্য বন্ধনে বদ্ধ। শ্রীরাধারাণীকে ও নারীজাতিকে একটি পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়া আজীবন পূজা করিয়া আসিয়াছি। যেখানে নারী নিন্দা করিয়া শাস্ত্র লিখিয়াছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি", সেখানে আমি প্রাণ খুলিয়া তাহাদের পূজার জন্য সভার আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু কয়জন সে পূজা গ্রহণ করিতে আসিল? আমার যাযার পূজা সমাপন হইল না।

ব্যথাই রহিয়া গেল। যাহারা অপমানিত তাহারা যদি গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পূজা নিবার জন্য আগাইয়া না আসেন, আমি কি আর করিব? খুব সকালে আমি উষাঙ্গিণী ও গোপা বেড়াইতে বাহির হই, ওয়েলিংটন ব্রীজ পর্য্যন্ত গেলাম। সকালে বহু চিঠি লেখা ও হিসাব-পত্র ঠিক করিয়া বেণু ১২টার পর বাহির হয়।···সপ্তাব্রত আসে···বেণু ফেরে সন্ধ্যার পর।...৭৷৷০টার পর পাঠ হয়। "পরিভূ" ও "স্বয়ম্ভূ" পদদ্বয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। "চিত্রগুপ্ত বড় শক্ত যা করেছি সব লিখেছে", অতীত সব যে আমার জীবনে জমিয়া রহিয়াছে। তাহাকে হজম না করিতে পারিলে তাহার বিষাক্ত উদ্গার যে বর্ত্তমানকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিবে। সেইজন্যই নিজের আবরণ উন্মোচন করিয়া গুরুর সামনে দাঁড়াইতে হয়। গান্ধারীর নিকট দুর্য্যোধনের দাঁড়াইবার প্রসংগ তোলা হয়। পুরুষোত্তম আমির বাহিরে কেহ পরিভূ হইতে পারে না। ঠাকুর যে জীবন ও দর্শন লইয়া আসিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে সফল হইবেই। সেই দূর ভবিষ্যৎ আমার জীবনে বর্ত্তমানবৎ বলিয়াই না আমার এত বেদনা? ভবিষ্যৎকে টানিয়া বর্ত্তমান করিবার জন্যই ত এত প্রাণপণ প্রচেষ্টা।···

৮ই ডিসেম্বর

পুরুষোত্তম, তুমি পরিভূ। অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার জীবনে নিত্য বর্ত্তমান। যিনি পরিভূ তিনি কালের ক্ষেত্রে কালাতীত। যে আদর্শ যে যুগ ভবিষ্যতে আসিতেছে তাহার একটি ছবি কালের ক্ষেত্রে কালাতীত। পরিভূর জীবনে প্রতিফলিত হয় বর্ত্তমানবৎ। যেন আজই তাহা সফল হইবে। অথচ বর্ত্তমানকাল তাহাকে বাধা দেয়। পুরুষোত্তম-জীবনে এই বাধার আর অন্ত নাই। ভবিষ্যৎ যাহার কাছে আজই, তাহার জীবন কী দুর্বিসহ। তাহাকে যে ভবিষ্যৎকে আজিকার দিনে গড়িয়া তুলিবার জন্য পাগলের মত ছুটিতে হয়। এইখানের অবস্থাই "হয় হয় হয় না"। কী দারুণ বাধা, আবার সেই বাধাকে অতিক্রম করিবার জন্য কি দারুণ ব্যথা, কি দারুণ উৎসাহ, কি দারুণ ধৈর্য্য! ঠাকুর, ঠাকুর, বল দাও মন দাও জন দাও। আমার বাধা রাধারূপে রসরূপে গড়িয়া উঠুক। খুব সকালে অন্ধকার থাকিতে আমি উষাঙ্গিণী, মীনু ও গোপা বেড়াইতে বাহির হই।···দুইটার পর রাধু ও হরিদাসী আসে।···৬৷৷০টার পরই আজ পাঠ আরম্ভ হয়। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" মন্ত্রটি পড়া ও ব্যাখ্যা হয়। বিদ্যা ও অবিদ্যা সমন্বিত পথের খবর এযাবৎ লোক-সমাজে প্রচারিত হয় নাই। ক্বচিৎ দু'একটি পথিক এ পথে বিচরণ করেন। বিদ্যার পথ সন্ন্যাসীদের কাছে পরিচিত। অবিদ্যা-পথ বিষয়ীর কাছে পরিচিত। কিন্তু বিদ্যা-অবিদ্যাসমন্বয়ে গড়া ব্রহ্মপথ এখনও সাধারণের ধারণার বাহিরে। এই পথের আদি পথিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বর্ত্তমান যুগে এই পথের প্রচারক। পরমহংসদেব তাঁহারই সহায়তা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারই পূর্ব পর্য্যায়ের সন্ধান দিয়া গিয়া। বিদ্যাপথের পুরুষোত্তম অধর, অবিদ্যাপথেও তিনি অধর। ব্রজেই তবু যতদূর সম্ভব ধরা পড়িয়াছেন। আমার জীবন এই পথের অনুসরণ করিয়া চলিবে। অন্য সব পথ আমার কাছে বিলুপ্ত। একমাত্র ব্রহ্মপথই আমার কাছে উন্মুক্ত যতদূর পারিব এই পথে চলিতে চলিতে মানুষকে ডাকিয়া যাইব।···

৯ই ডিসেম্বর

ওগো পরাণপুতলী রাধারাণী আমার, বিদ্যা অবিদ্যা দুইটি তোমার তনু, বিদ্যাঅবিদ্যার সমন্বয়মূর্ত্তি তুমি, তাই তোমার জীবনে অবিদ্যা ক্ষেত্রে অনাদি অনন্ত কাল ব্রহ্মরসে গড়িয়া উঠিতে পারিল, তুমি উন্মাদিনী বেশে সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া, সকল বন্ধনের রস আহরণ করিয়া দুকূল প্লাবিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ অনন্তের পানে। অবিদ্যার কান্না আজ বিদ্যাভাবে ভাবিত। তুমি আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমার জীবনের পরতে পরতে তোমাকেই ত পাইতে চাই। ওগো মৃণ্ময়ীরূপে চিন্ময়ী আমার, বিদ্যা অবিদ্যা সমন্বিত ব্রজের পথে তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী থাক। বিদ্যাপথের পথিক আছে, অবিদ্যা পথেরও আছে। কিন্তু বিদ্যা অবিদ্যা সমন্বিত ব্রজপথে

এবাবৎ যাত্রী যাতায়াত করে নাই। তাই আমি একা। ওগো একাকিনী, একা আমির সংগে থাকিও।...বেড়াইতে বাহির হই...৭টার পর হারাধন চৌধুরী ও বিনয় ঘর আসে। আগামী শনিবার তাহাদের আফিসের সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া যায়। বিনয়বাবু শনিবার ১২টার পর আসিবে। তাহাদের সংগে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ত্রিবিধারী নামের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যে বর্ত্তমান যুগের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান আর কেহ দিতে পারিবে না, শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব সমস্যা সমাধান-মূর্ত্তি তাহাই আলোচনা হয়। হোয়াইটহেডের It is as true to say ইত্যাদিও বলা হয়। ৭৷৷০ টায় পাঠ হয়, "অন্তদেবতা-হবিষা মর্ত্য" পাঠ হয় এবং বিদ্যাক মন্ত্রের কিছুটা পাঠ হয়। প্রতিভা পালের বহেরটি বাড়ী যায়, আলাপ করে।

১০ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, এই সংসারে আমার গর্ব করিবার কি আছে তোমা ছাড়া, তোমার জীবন ও দর্শন ছাড়া? তুমিই আমার দাহ্যজীবনের ধ্রুবের ধন। তুমি আমার আছ তাই আমি এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছি। কবে আমার জীবনে শান্তি ও ঝঞ্ঝাট এক হইবে? আমার জীবনকে তোমার পথে দাগাইয়া নিয়া চলিবে? আমার যে তোমার দর্শন ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কেমন করিয়া সমস্যার সমস্যায় জর্জ্জরিত এই সমাজ বাঁচিবে? ভাবিলে বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে, সমস্যা ত কাহাকেও ধরাইয়া দিতে পারিতেছি না। বেশ তাহারা চলিয়াছে অথচ সামনে প্রকাণ্ড গহ্বর। কে রক্ষা করিবে তুমি ছাড়া?...১১টার পর রেণু বাহির হইয়া গোলাম মহম্মদ বোম্বে, পোঃ অফিস, ব্যাঙ্ক, হরার স্কুল, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ স্কুলে ব্যাকরণের কথা বলিয়া আসে।...নিজের জীবনের খেয়াল রাখিবার কথা বলি। নিজের কথা নিজে না ভাবিলে কে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পেটের কথা বাহির করিবে? মুখ বুজিয়া সহ্য করিলে সহ্য করা হয় না, ভিতরে অভিযোগ থাকিয়া যায়। শেষে একদিন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৷৷৷ টায় পর পাঠ হয়। বিদ্যাক মন্ত্রের কতক অংশ পাঠ হয়।

১১ই ডিসেম্বর

ওগো অমৃত, অবিদ্যাক্ষেত্র মরণক্ষেত্র এই বিশ্ব মন্থন করিয়া নিংড়াইয়া তুমি অমৃত। যাহা মরণ তাহাই transformed হইয়া হয় অমরণ। যাহারা মরণ এড়াইয়া অমৃত চায় তাহারা মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি। মরণকে পরিপাক করিলেই মরণ হয় অমরণ। তাই শ্রুতি বলেন অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা। তুমি পুরুষোত্তম 'সহস্র-শীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'। আর আমি তোমায় ছাড়িয়া পালাইব না। তোমারি চরণে লাগিয়া রহিব। তুমি ত আমায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছ। উপরে নীল আকাশ, নীচে শ্যামা ধরণী, তাহারই বুকে জগন্নাথ তোমাকে বুকে লইয়া আমি দাঁড়াইয়া। তোমার বিশ্ব আমার, সর্ব ধর্ম আমার ধর্ম, সব সম্প্রদায় আমারই সম্প্রদায়, সকল পাণিতে তোমার পাণি, সর্বতো পাণিপাদম্ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্। তোমার চরণে হাত দিতে গিয়া দেখি তোমার চরণ বিশ্বময় ছুটাছুটি করিতেছে। সারা বিশ্ব যে তোমার চরণ-চিহ্নাঙ্কিত।...৭৷৷০টার পর পাঠ হয়। বিদ্যাক মন্ত্রের অন্তর্গত কর্মণাকর্মঃ শ্লোকটি ও "অস্তিতৈব ক্রিয়েত' 'আলোচনা হয়। কর্মের অর্পণাংশই নৈষ্কর্ম্য। আমাদের সাধনা হইতেছে প্রকৃতির বদল। বিশেষ কোন অঙ্গ অবলম্বনের সাধনায় বিচ্ছিন্নতা কাটে না, বরং আরও তাহা পাকা হয়।...রেণু শ্রীশ দাস, পি. এন. ঘোষ প্রভৃতির সংগে দেখা করে।...

১২ই ডিসেম্বর

শ্রীরাধারাণী আমার, পরাপ্রকৃতি তোমার অবতরণে, তোমার স্পর্শে জৈব প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, transformed হইবে। বর্ত্তমান সমস্ত সাধন পথ যে যাহার সম্পূর্ণতা লইয়া নিজেদের দাবী পেশ করিতেছে, এই সকল দাবী পূরণ হইবে অখণ্ড প্রকৃতি পুরুষোত্তম যোগিনী হইলে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শান্তি-রুদ্র, ভ্রান্তি-অভ্রান্তি পরস্পর বিরোধী সবকিছুর সমাধান তোমার জীবনে। কি যে তুমি আমার, কি করিলে যে তোমার আদর হয় তাহা ত আমি খুঁজিয়া পাই না।...১২৷৷ টায়

পর দিবস ঘর ট্যাক্সী নিয়া আমাকে নিয়া যায়। ১॥ টায় আলোচনা সুরু হয়। "মন্ত্রানাং অশনিঃ" শ্লোক ও গিরিধারীর উপাখ্যান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও দর্শনের আলোচনা করি। ৬০ জন আন্দাজ লোক হইয়াছিল। অফিস কোয়ার্টারে এইরূপ আলোচনা এই প্রথম। জানি না কী অর্থ ইহার। ঝড়ের মত ছুটিতে চাই·· রাত্রে পাঠ হয়।

১৩ই ডিসেম্বর

রাধারাণী আমার, আমার চিরস্মরে পরে কোথে·· আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় তোমাকে পাইয়াছি, সেখানেই তোমাকে রাখিব। ভিখারীর ধন আমার, তোমার চাঁদমুখ আমাকে পাগল করিয়া সংসারমধ্যে তোমার প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য চকল করিয়া তুলিয়াছে। কী আমি করিব? কিছুই ত ধরা ছোঁয়ার মত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ছুটিতে চাই, ছড়াইয়া পড়িতে চাই তোমার বিশ্বরঞ্জন জীবন-দর্শন লইয়া। চতুর্দিকে যে বর্ণাশ্রমের ইস্পাত-কঠিন প্রাচীর। আমাকে · তাহা পরিপাক করিয়া বাহির হইবার মত শক্তি দাও, এগো পরাশক্তি আমার ····৪॥ টায় পর পাঠ আরম্ভ হয়, "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" এই শ্লোকটি আজ আস্বাদিত হয়। জটিল কুটিল আবেষ্টন এড়াইয়া যে উপনিষদ্ একদিন শাস্ত্র আবহাওয়ার মধ্যে আস্বাদিত হইত, সেই বনবাসিনী উপনিষৎকে পুরুষোত্তম এই বড়ের দেশে সমস্যাসঙ্কুল মানব সমাজের মধ্যে আনিবার জন্য একটি রাষ্ট্রঘটিত যুদ্ধক্ষেত্র আনিয়া ফেলিলেন। এইখানে গীতার অপূর্বত্ব। গীতা অপূর্ব উপনিষদ্। ইহার উপক্রম উপসংহার কর্ম। বারবার এই কর্মের উল্লেখ আছে :— মামনুস্মর যুধ্যচ স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করিতে করিতে স্মরণ কর। যেখানের ঝগড়া সেখানেই তাহার মীমাংসা। পড়া শুনা বিশ্বের উৎপত্তি করিয়া সনকাদি ঋষি (চতুঃসন্) ধরার ধাবী বৈকুণ্ঠের দরবারে পেশ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। দ্বারদেশে জয়বিজয় বাধা দিলেন। চতুঃসন্ গর্জিয়া উঠিলেন, অভিসম্পাত দিলেন, জয়বিজয়ের পতন সুরু হইল। নারায়ণও সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে জয়বিজয়ের সম্মুখীন হইলেন। ধরার বুকেই হইল ধরার সকল সমস্যার সমাধান. বৈকুণ্ঠ গোলোকে ধরার সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। নিরাপদ পরিসরে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা কিছুতেই সমাধানের পথে আগাইবে না। তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশে সমস্যা আরও জটিল হইবে। আজিকার আলোচনায় ডাক্তারবাবু বেশ সত্যেন কর ছিলেন, আলোচনা বেশ জমিয়া ছিল। পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম, তুমি কি এই জটিলতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না? কেন তবে আমাকে উন্মাদ করিলে? আমি কি করিব? আমি যে তোমাকে লইয়া বিব্রত।

১৭ই ডিসেম্বর

"চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে" কেন, কোন প্রয়োজনে? রাধা ছিলেন জটিলা কুটিলা পরিবেষ্টিত, ক্লীব রায়ানের ঘরের বউ, একটি steelframe constitution এর মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তাহার প্রাণ চায় পুরুষোত্তমকে তিনি একাধারে ক্লীবের ঘরের বউ, অপরদিকে পুরুষোত্তম মহিষী, পুরুষোত্তমের আদরিণী। ঘরে বাহিরে তাঁহার এই আনাগোনার সমন্বয় বুঝিবা তখন হয় নাই। ঘরকে বাহির করা এবং বাহিরকে ঘর করা সেই যুগে সম্ভব হয় নাই, আজ পাঁচহাজার বৎসর পরে শ্রীরাধারাণী আমার নিত্যগোপাল সাজে সাজিয়া ঘর বাহির সমন্বয়ের দর্শন দিয়া গেলেন, জটিল কুটিল কঠিন আবেষ্টনকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার শাস্ত্র ও জীবন দিয়া গেলেন। পুরুষোত্তম আমার বরণীয়, ভজনীয়। আর কাহার শরণ লইব? তিনি পুরুষোত্তম। কে এমন মর্যাদা প্রকৃতিকে দিয়েছেন? তিনি আমার বধূ আমার স্বামী। আর কাহারও আমি না পুরুষ ত আর দেখি না, সবই ত ক্লীব রায়ানের ঘরের তিনিই আমার হৃদয়বল্লভ, তাঁহার ঘর ছাড়া আর কাহা ঘর করিব। কে আমার আদর করিবে ..সামঞ্জস্য কংগ্রেস দুর্নীতি শেষ করি। বেলু ৯-১৫তে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কে যায়, পরে কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসারের ওখানে,···সহজ পড়া ও উজ্জ্বল ভারত লাইব্রেরীগুলোতে চালান যায় কিনা তাহার আলোচনা করে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় শেষ সপ্তাহে যাইতে বলিলেন। নারকেলডাঙ্গার সুরকার

বিদ্যালয়ে যায়, ব্যাকরণের কথা বলে, তাহারা আমাদের একসেট বই নিবার কথা বলে, ...। ভীষ্ম তাহার দ্রৌপদী সম্বন্ধে দায়িত্ব প্রতিপালন করিলেন না, আর অর্জুন সে ভীষ্মের জন্য কাঁদিবেন ভগবান তাহা বরদাস্ত করেন নাই, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

১৫ই ডিসেম্বর

ওগো রাধারাণী আমার, মৈত্রেয়ী, প্রতি গুণের বুকে তিনটী মুক্তির আস্বাদন আনার, তোমাকে জীবনে পাইলে সকল গুণের উপাধি চরণে কাটিয়া যায়, প্রতি গুণ পুরুষোত্তমগুণে গড়িয়া ওঠে, তখন বিশ্বের সর্বত্র অবারিত দ্বার। তাই ত পুরুষোত্তম নিজমুখে কুরুক্ষেত্রের বুকে অর্জুনকে নৈষ্কর্ম্য হওয়ার কথা শুনাইয়াছেন। মানুষ যখন প্রতিগুণে গুণী হইয়াই নির্গুণ, তখন গুণ ও আর বন্ধনের কাজ করে না, গুণ হয় তখন অলংকার, লীলার পুষ্টিদাতা। নির্মমোহো হইতে না পারিলে কর্মক্ষেত্রে কিরূপে মুক্তির আস্বাদন সম্ভব হইবে? সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ যাহার পরিপাক হইয়াছে তিনিই লীলায় নিমিত্তদানের অধিকারী। রাধারাণী, আমার বুকের ধন, বুকে এস। সকালে আমি উন্মাদিনী, বেণু ও গোপী বেড়াইতে স্থির হই। বড় রাস্তার কাছে রাধাগোবিন্দ নাথের সঙ্গে দেখা; আমি আগাইয়া পরিচয় দেই, আলিঙ্গন করি, কথা বলি, মোটামুটি রাধা-গোবিন্দের কথা আলোচিত হয়। তাহার পর childrens' পার্কে যাই। ১০টার পর যাইয়া প্রথম কুমারেশে যায়, সেখানে বান্ধবের সংগে দেখা করে, পরে মেট্রোপলিটন, টাটা প্রভৃতি স্থানে যায়, পরে প্রেসে যায়, ফেরে পাঁচটায়। বাসবিহারীতে ফোন করে,...সন্ধ্যার পর উপেন ঘর এসে,...। -এর কোন চিঠি আসিল না, কেন যে এ শাস্তি আমাকে দিতেছে বুঝি না। আমি ত সকলের সব অতীতকে সার্থক করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। কিন্তু সকল অতীতের সার্থক করা ত প্রাণ উপাদনা ছাড়া সম্ভব নয়। মনের স্তরে অতীত বর্তমান পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, প্রাণের স্তরেই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমন্বয় সম্ভবপর। আমিই অবিমুক্ত, আমি সকলের সব সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিবার কথা বলি বলিয়াই ত সকলে যে-যার খেয়ালমত অতীতকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়। অথচ সকলেই কিন্তু উচ্চ জীবন চায়: ৭।০টার পাঠ হয়, উপাধি সম্বন্ধে আলোচনার পর কিছুটা পাঠ হয়,.....

১৬ই ডিসেম্বর

রাধারাণী, সহজ জীবনঘন তুমি, তুমি সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত। অথচ সর্বোপাধিযুক্ত। তোমার জীবনে নারী জীবনের সকল সমস্যার সমাধান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান কালের ধর্ষিতা মেয়েদের কে বুকে তুলিয়া লইবে? সীতার আদর্শ বর্তমান নারী জীবনের সকল ব্যথা দূর করিতে পারে না। তাই সীতার পর রাধারাণী তোমার অবতরণের প্রয়োজন ছিল। তুমি না আসিলে বর্তমান যুগে নারী-জীবনকে উপহার দিবার মত কিছু ছিল না। তোমার পাদস্পর্শে বর্তমান যুগ ধন্য...বিনয়ের ভাই পুলিনকৃষ্ণ দাস আসে ৩টার পর।...

১৭ই ডিসেম্বর

ওগো রাধারাণী, পুরুষোত্তমের অনির্বচনীয় প্রেমশক্তি, তুমি বেদান্তের বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদীদের মায়াশক্তি। তুমি বিশ্বের কার্যকারণ শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া উন্মাদিনী বেশে পুরুষোত্তম-সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছ। কার্য যে কারণেরও কারণ হয় এবং কারণও যে সকল কার্যের কার্য হয় তোমার জীবনের স্পর্শে বিশ্ব তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছে। কার্যকারণের অবকাশে তুমি দাঁড়াইয়া; তাই বিশ্বের সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব অনেক কিছু ঘটনার সম্ভব হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

তুমাকে তুমির মধ্যে উপলব্ধির উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অর্থহীন, তুমিহীন তুমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের ভাগ্য মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার ইঙ্গিতও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (১ম অধ্যায় পর্যন্ত)	৩৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিতাগোপাল তাহার ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	।০
৭।	গীতাতত্ত্বসার	৵০
৮।	উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৸০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	১৸০
১১।	প্রশ্নোপনিষৎ	১।০

: পাণ্ডুলিপি :

১।	মুণ্ডকোপনিষৎ
২।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
৩।	তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৭।	স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৮।	অপ্রকাশিত পত্রাবলী
৯।	বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির বন্ধুকথা	।০
২	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্যা নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	৵০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৸০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম	৵
৪।	রবীন্দ্র-ছন্দ	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি. পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

সুঠাম সুন্দর দেহ

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রতি সংখ্যা ৪৪ পয়সা বার্ষিক পাঁচ টাকা

(Cover Printed by ... Nageswar Printing Works, 25, Nayabhaban North Road, Cal-11

ওঁ নমঃ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

পৌষ সংখ্যা, ১৮৮৬ ১৩৭১ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ, সপ্তদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুয়রিটি' লিকিং ওয়ার্ন, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, বাকিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

যোশাম

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে

এক্স ৩০, ৬০, ১২০, ২৪০ ও ৫০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

PRO/SW - 17

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·২১

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৭০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·৩০	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

সাহিত্যের গল্প	১·৫০	বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সাধারণতন্ত্র-দিবস ১৯৬৫

১৫ বছর আগে এই শুভ দিনে ভারতীয় সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। সেই থেকে পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভৃতিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সার্বক চেষ্টা চ'লছে। সেই সঙ্গে চ'লছে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি; সমাজ ব্যবস্থায় আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যম এবং জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি, যানবাহন ও পথের উন্নয়ন। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আমাদের রাষ্ট্রের মূল আদর্শ।

এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য সাধারণতন্ত্র দিবসে নূতন করে আমাদের সংকল্প গ্রহণ ক'রতে হবে। আসুন, আমরা আজ সকলে এই পবিত্র দিনে কৃষিতে এবং কল-কারখানা ও খনিতে অধিক উৎপাদনের সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের অধিকতর সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং আমাদের সর্ববিধ কল্যাণে ব্রতী হই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২২) ... ২৮১

২। মানবিক না পাশবিক ... ২৮৪
শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২-৫৩) ২৮৬

৪। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি ... ২৯৩
অরুণবরণ চক্রবর্তী

৫। মুণ্ডকোপনিষৎ (অনুবাদ ভাষ্য) ... ২৬৯

বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনের পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ এই পৌষ মাসে শেষ হইল। এ বৎসরটা আমাদের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া গেল। সকলের সহযোগিতায় আমরা এ অবস্থাতেও চলিতে পারিব ভরসা রাখি। গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের অধিকতর সহযোগিতা আহ্বান করিতেছি যাহাতে আগামী মাঘ সংখ্যা হইতে আমরা নূতন উদ্যমে কাজ করিতে পারি। গ্রাহকগণকে অনুরোধ তাঁহারা যেন অষ্টাদশ বর্ষের চাঁদাটা—পাঁচ টাকা—খুব শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

সম্পাদিকা, উদ্বোধন

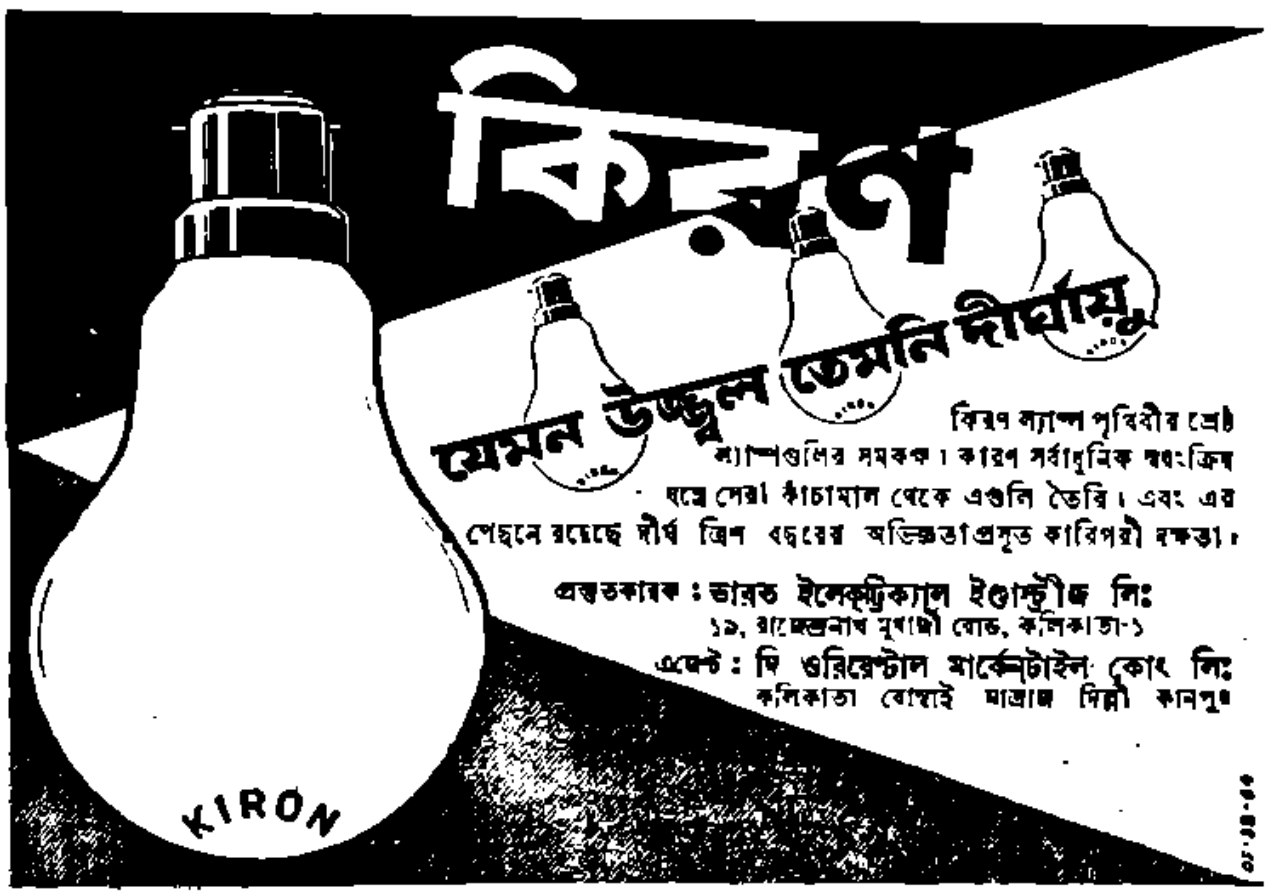

এখন ফসল কাটা হয়ে গেল
সঞ্চয়ের কথা ভাবুন

শস্য ঘরোয়ার ঘরে ঘরে এখন নতুন ফসলের সমারোহ। ফসলের এই প্রাচুর্য এনে দেবে আর্থিক স্বচ্ছলতা। আর্থিক স্বচ্ছলতার চিন্তা নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রই সকলের কথা ভাবেন, ভাবুন সবচিন্তাই তো সমান ভালো হয় না। তাই নিজের ও নিজের পরিবারের মঙ্গলের কথা ভেবে খানিক বেশি ভাবুন ও নিজের খরচ কমিয়ে কিছুটা বেশি সঞ্চয়ের সুযোগ করুন। আর সেই সঞ্চয় সর্বাধিক নিরাপত্তার সঙ্গে লাভজনক ভাবে লগ্নী করার সুযোগ উপস্থিত হল জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা। এই সঞ্চিত টাকায় শুধু আপনার পারিবারিক মঙ্গলই হবে না, হবে সমগ্র দেশের মঙ্গল। আপনার অঞ্চলের পথঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, কৃষি উন্নয়ন প্রভৃতি দেশ-গঠনের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হবে এই টাকা।

জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় লগ্নী করুন

- ১২-বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৮½%
- ১০-বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা রিপোর্টিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪½%
- ১৪-বছর মেয়াদী অ্যাডাটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৮·২৫% (চক্রবৃদ্ধি হারে)
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট : সুদের হার ৫% (মাত্র ২৲ টাকায় অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী রিপোর্টিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩% থেকে ৪·৩%

(এই সব লগ্নী করুন)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

সঞ্চিতমন সাকার কর্তৃক প্রচারিত

আপনার সঞ্চয় জাতির শক্তি

উদ্বোধন

পৌষ, ১৮৮৬ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪২)

২০. ১. ৫৬। ওঁ...। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে বলেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যস্থানটা কোথায় তা বের করে দিতে হবে। গোপাল ভাঁড় বললেন, এতো প্রচুর খরচ সাপেক্ষ.. দু মাস সময় লাগবে অন্বিপ করতে···। গোপাল ভাঁড় ঘরে বসে খেয়ে দেয়ে দু'মাস কাটিয়ে দু মাস পরে নিজের উঠানে একটা খুঁটি গেড়ে বললেন, মহারাজ এইটেই মধ্যস্থান—কেন্দ্র। কি রকম করে হল?

পুরাণে একটা গল্প আছে—গণেশ বড়, না কার্তিক বড়?···দ্রুতগামী কার্তিক তার ময়ূরে চড়ে বিশ্ব ঘুরতে বের হল...গণেশ তার বাহন ইঁদুরে চড়ে মাকে ঘুরে এসে বসে কার্তিকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল...। গণেশের বক্তব্য কি?

পুরুষোত্তম-তত্ত্বে centre everywhere, circumference no where। পরিধির যে কোন স্থান থেকেই কেন্দ্র সমান দূরে—equal and direct relation···। যাসে তিনি কেন্দ্রে, তিনি পরিধিতে... তদ্দূরে তদ্বস্তিকে...কামুক দূরত্ব ঘুচিয়ে তার ভোগ্যবস্তুকে নিকট করতে চায়···যিনি দূরকে দূর রাখিয়া নিকটকে নিকট রাখিয়া দুইকে সমান মূল্যে রাখেন, তিনিই পুরুষোত্তম।···শরৎচন্দ্র বললেন, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়। কামুক দূরে রাখতে আঁৎকে ওঠে।···পুরুষোত্তমে কাদের কেহ নাই। কেউ অতীতকে পছন্দ করে, বর্তমানকে চায় না, কেউ অতীতকে গাল দেয়, ভবিষ্যৎ বোঝে না, বর্তমান নিয়েই থাকে—এরা সবাই কালাহত। পুরুষোত্তম সর্বত্র at home।···বাইরে এবং ঘরে উভয়ত্রই যিনি সমান খুশীতে বিচরণ করেন, তিনিই মুক্ত।·· কাকে কেন্দ্র করব? কোন একটাই একমাত্র কেন্দ্র হবার যোগ্য নয়—বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র···। নিত্যগোপাল বলেছেন, আমরা কার্ক—কৃষ্ণ হতে কার্ক। কৃষ্ণ নির্গুণ। বৈষ্ণব যে বিষ্ণু শব্দ থেকে, সেই বিষ্ণু তো সগুণী। কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ...। এত দিন man was the centre of creation ছিল—কৃষ্ণ আসার পর প্রত্যেকটিই centre হবার যোগ্য··· উদ্ধব শুষ্কশুল্লতা হতে চাইছেন···। পৃথিবীতে গাছপালা নেই, তুমি আছ কল্পনা করতে পার?···রক্ত আছে হাট নেই কিংবা হাট আছে রক্ত নেই—কোনটাই হয় না।··· পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—কর্তা ভাবনা করবে চাকরের, চাকর ভাবনা করবে কর্তার...। যো বনস্পতিষু, যো অপ্সু, যো দেবাগ্নৌ···তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। তিনি তো বনস্পতিতেও আছেন।·· যৎ কিঞ্চিৎ বাক্যেতে এই-ই তিনি বুঝিয়েছেন—যৎ শব্দ দ্বারা নিখিই কিছু বলেন নি। ···তিনি স্বধর্ম রক্ষা করে গেছেন।···ব্রাহ্মণ দিয়ে সমাজ রক্ষা হয়নি, ক্ষত্রিয়কে দরকার হয়েছে। "কোনটাই কেলার নয়···তোমার অন্ন পচা মাছের জল না হতে পারে, কিন্তু তা গাছের অন্ন "কৌলীন্য কোথায়?···কালী প্রেসে প্রুফ আনতে গেছে, সে যদি মনে করে আমার আরতি দেখ

হল না, তবে সে ভুল করবে···সেবার সেবা করতে এসেছ—এ কাজও তাঁর, ও কাজও তাঁর।—কালী যেন আবার এও মনে না করে যে প্রেম আনাই বড় কাজ আরতির চেয়ে—তাদেরও সে ভুল করবে।···দেশকালপাত্র বিবেচনায় লক্ষ রেখে চলবে—দুজই এখানকার একমাত্র কথা। তাই এ বড় কঠিন কথা।···পেট ভরে খেয়েও পুরুষোত্তম-দর্শনে তৃপ্তি হতে পারে, আবার ৬০ হাজার বৎসর না খেয়েও তৃপ্তি হয় না।···গুরুর বুকের তাপে যে থাকে, তার জীবন থেকে ব্রহ্ম-বস্তু বের হয়। পুরুষোত্তম স্বর্গ থেকে স্বর্গ থেকে বঞ্চনা হতে বলেছেন।···অল্পাধিক পরিমাণে সব গুণই সবের মধ্যে আছে, যার মধ্যে যেটা মুখ্য সেইটে নিয়ে বঞ্চনা হতে হবে।···পুরুষোত্তম-দর্শনে সকলেই সকলের বেদ্য···ইহাই রাম—ইহাই সমাজতন্ত্র। প্রত্যেকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হয়। প্রত্যেককে এগিয়ে দিতে সুযোগ দেওয়ার নাম সুস্থ সমাজ···independent and at the same time interdependent—এই হচ্ছে সুস্থতার চিহ্ন।

২২. ৩. ৫৬। ···এই সংসার প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতভাবের উপরে আর সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতভাবের উপরে। সংসারী সংসারী এই জন্য যে তারা যে কোন সম্পর্কেই দুজনে দুজনকে পৃথক না দেখে কাজ করতে পারে না। কিন্তু সন্ন্যাসে এই দ্বৈতভাব নেই। উপনিষদ্ সহ নৌ ভুনক্তু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ—আমাদের দু জনকে—গুরু শিষ্য কিংবা আমি ও বিশ্ব এই দুই জনকে—রক্ষা কর—একলা রক্ষা পাওয়ার কথা কোন সত্যিকারের সন্ন্যাসী ভাবতে পারে না। সংসারে সব উল্টো—সেখানকার কথা আমাকে রক্ষা কর, সেখানে ভগবানের কাছে নিজের জন্য প্রার্থনা—আমায় ধন দাও, জন দাও, আমায় রক্ষা কর; সংসারী লোকে বলে না চাইলে মায়েও দুধ দেয় না—অথচ সন্ন্যাসে সব ভাব উল্টো। সংসারী মনে করে না চাইলে পাওয়ার উপায় নেই—কিন্তু এ তো একেবারে জীব ধর্ম—একেবারে বিড়ালী শিশুনীর মত—তার কিছুতেই বিশ্বাস নেই যে তাকে খেতে দেওয়াই হবে।···কিন্তু সন্ন্যাস অর্থ অপরকে দুজন না ভাবা—দুজন ভাবলেই তখন আমাদের বুদ্ধি আসে··· পাশ্চাত্যের রাজনীতি এই বুদ্ধির ফল—এ অভ্যাস আজ সর্বত্র এসে গেছে—এই বানিয়া বুদ্ধি আজ পিতাপুত্রে স্বামীস্ত্রীতে সর্বত্র।··· চাই চাই করলে পুরুষোত্তম-কৈশলেই সমস্ত পাওয়া থেকে মানুষ আপনি বঞ্চিত হয়ে যায়।··· কর্মেই অধিকার—সেবা করে যাও। চাওয়া মানেই ভোগ করবার ইচ্ছা···। আমার কাছে কেউ কোনদিন চেয়ে পায় নি···। এও যেমন সত্য কথা তেমনি এও সত্য যে পুরুষোত্তম কোন কণ্ট্রাক্টে হাতখৎ লেখেন নি···একদিন নিজেই করেছেন, আজ করবেন না কেন?—না করব না। তুমি কর, আমিও করব—এও আমি···দ্বৈতবুদ্ধি ছাড়। আত্মসুন্দরের আত্মপরিচয়ে তিনি বলেছেন যে, ভজনা করলে ভজনা করা—এ বানিয়া বুদ্ধিই তাঁর একমাত্র কথা নয়—সে দলেরও তিনি নন। পিতামাতা যা করুণাবশে ভজনা না করলেও ভজনা করেন—পুরুষোত্তম বলছেন আমি spoilt child তৈরী করি না।···বলতে গেলে শুতে চাওয়ার মনোবৃত্তি যেন আমাদের না হয়···। সেবার জন্য এখানে এসেছ—আমি স্পষ্টভাবে বলি সেবার জন্য এসেছ তোমরা—চাওয়ার মনোবৃত্তি ছেড়ে দাও···। আমি কারো কোন গোত্র জিজ্ঞাসা করি নি, কারো অতীতের চরিত্র জিজ্ঞাসা করি নি···। এতদিন আমি দিয়েছি—এইবার তোমরা এগোবে, তবে আমি এগোব। দ্বৈতভাব ছাড়—এক হও—সেবাবুদ্ধি রাখ।···এই কথা বললে তিনি রাগ করবেন—এ ভয় কেন? তাঁর রাগ সইতে পার না? তাঁকে এক মনে করলেই পারবে।···ভগবান কেবল তোমার মনোরঞ্জন করবেন, আর তুমি করবে না? এ হবে না। ···মায়ের সঙ্গে অদ্বৈতাত্মবৃত্তির জন্য মিষ্টি শত মার খেয়েও মাকে চায়···। পৃথকবুদ্ধি রেখো না—অদ্বৈতাত্মবৃত্তিতেই ধরার ধূলি ব্রহ্ম-ধূলি হতে পারে।

২৩. ৩. ৫৬। ···ভাগবতের একটি শ্লোকে কলি-যুগের বিশেষ যোগ্যতা—'কুশলানি অস্য নিখিলস্য নেতরাণি কৃতানি'—কুশল চিন্তা আশু নিখিলার্থ করে—অকুশল চিন্তা কার্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করে না। কারণ কলিযুগে সব রকম বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করায় অকুশল চিন্তা

আসতে পারে—কিন্তু জটিল জীবন—সে চিন্তা প্রকাশ করো না—দীর্ঘকাল অপেক্ষা কর। কথা চিন্তা করা ও তা বাক্যে প্রকাশ করার মধ্যে গীতার কুশলযোগকে আনতে হবে—খেতে ইচ্ছে হওয়া ও খাওয়ার মধ্যে, অর্জুনের বাণ তোলা ও নিক্ষেপ করার মধ্যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। ধনু কি ভাবে ছাড়ব, কেন ছাড়ব, কার উপর ছাড়ব—এ সবের মীমাংসা দরকার।...অপেক্ষা কর, দেখ। মৌন শিক্ষা, বাক্ সংযম—এগুলি প্রয়োজন।...তাতল আর মাতল—এ রকমে কাজ হয় না—ইন্দ্রিয়-বেগ সংযত করতে হয়। কেন? কথা সংযত করব ভাল কথা বলবার জন্য ...কলি-যুগে তিনটা তাপ—তার মধ্যের এই বাক্যাবেগের দ্বারা সংসারকে সংসার ছারখার হয়ে গেছে।...কথা বন্ধ করে কাজ করে যাও।...লোক হয়েছে—সংযম কর—সময় নাও। —কথা অপ্রকাশ থাকে না, সে প্রকাশ পাবেই—।

২৬. ৯. ৮৬।...উপনিষদ্ বললেন, তিনি মনসঃ মনঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ—অর্থ কি? আমি যাকে আমার মন বলি সেখানে আমার প্রকৃত মন নেই—আমার মনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পরকীয়...। নিতাগোপাল বলেছেন, মন যদি তোমার হত তাহলে মন তোমার কথা শুনত। পুরুষোত্তম-মনই তোমার আসল মন। প্রাণ বুদ্ধি মন নিজের আত্মা স্ত্রীপুত্র ধনাদি যার সম্পর্কে প্রিয় সেই যে তিনি তাঁর সম্পর্কের জন্য এগুলি আমার ভাল লাগে। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক মুখ্য, সংসারের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গৌণ।...তাঁর মনের ছবি আমার মন, তাঁর মনকে পাই, তবে তো আমার মন পাব?...নির্যোগক্ষেম আত্মবান —এই দেহ যখন তাঁকে দেই, তখনই দেহ আমার।... তোমার মতে চলে তোমার জয়া ভুবি ভুমি করবে।... নাড়ুগোপালের মত তিনি হাত পেতে বসে আছেন— তাঁকে হাত নিজেকে—হবিসে লাগি রহ রে ভাই।... নিজের মনবুদ্ধির উপর বিশ্বাস করো না—শরণাগত হও। নিজের মনের উপর যারা খুব জোর দেয়, নিজের মনের জালে তারা জড়িয়ে পড়ে—মনঃ এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষ কারণম্।...সাধনার জগতে প্রবেশ করতে হলে মনবুদ্ধি বলি দিতে হবে।...আকাশের ভগবানের সঙ্গে মনের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না—বাস্তব ভগবানের সঙ্গে, সৎ গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর—তোমার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না।...মন বলি দিতে হবে—মন্মনা হও, মতি বুদ্ধিং নিবেশয়, ব্রজগোপীদের সম্পর্কে বলছেন, তারা তন্মনস্কাঃ তদালাপাঃ। মনকে ট্রেনিং দেওয়া যায়...মনে উঠার সঙ্গে কার্যাকারিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান রেখে বিচার করতে বস, গুরুর সঙ্গে বসে বিচার কর...। লোহাটা চুম্বক হয়—চুম্বকের সঙ্গে লেগে যায়—চুম্বকের মধ্যে অণুগুলি যে রকম ভাবে সাজান, লোহার মধ্যে অণুগুলি সেই ভাবে সেজে ওঠে তখনই লোহা চুম্বক হয়।...কৃষ্ণ কি ভাবে জীবনের পরমাণুগুলি সাজিয়েছেন? জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য তাঁর দেহ-বিন্যাস কি রকম—এই তো দেখার জিনিস।...তা না হলে জীবন আসে আর যায়—যোচন বলে সেই পাখী এল আর গেল।...সংসারের বুদ্ধ আর সন্ন্যাসের বুদ্ধ এক নয়। ...নিজের বুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রেখে তো কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না।... আঙুলের কি দেহের কাছ থেকে রক্ত চাইতে হয়? দেহ নিজের তাগিদেই আঙুলকে রক্ত দেবে—চেয়ো না— আঙুল নিজের ঘরে বসেই পায়। চাওয়া অর্থ পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি।...সব বিশ্বময় অন্ন বস্ত্র চলাচলি করছে। লক্ষ্মী তোমার নয়—সার্বজনীন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলো না।... ভক্ত নিত্য অভিযুক্ত—ever accused—সাবিত্রী অভিযুক্ত হয়ে—সেটা স্বীকার করে নিয়ে জীবনের ঘটনা দ্বারা মানুষকে দিয়ে স্বীকার করিয়েছে যে সে দেবের কি নয়—গলাবাজি করে কি নিজের পরিচয় হয়? ভগবানকে নিয়ে বেরিয়েছে যে, সংসার তার অভিযোগ করবে না? সংসার যার খুব আদর করল, সাধন পথে সে বড় অগ্রসর হতে পারে নি। নিতাগোপাল, আমার মন তুমি লও, আমার বুদ্ধি তুমি লও—তোমার মনই সত্যিকারের মন— তোমার সঙ্গে বনতে বনতে বনে যাই।...জীবন, সারাহ্নে এই প্রার্থনা আমি যেন আমার নিজের মন দিয়ে চলতে গিয়ে নিজের গলায় ছুরি না দেই...।

ক্রমশঃ

মানবিক না পাশবিক

।। শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ।।

কে যে প্রথম কবে পশুকে অধম বা ইতর বলে বর্ণনা করেছিল ইতিহাস তার হিসেব রাখে নি। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার এই মতবাদের দ্বারা মানুষকে জাতিহিসেবে উন্নততর ব'লে প্রমাণ করতে পারে নি। "মানুষ আজ পশুর সমান হ'য়ে গেছে"—এ'ধরণের উক্তি শুনতে আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু মানুষ যদি সত্যিই পশুর স্তরে উঠ্‌তে পারতো তাহ'লে হয়ত পৃথিবী থেকে অনেক নৃশংস অপরাধ, অনেক ভয়ঙ্কর অন্যায়ের সমাপ্তি ঘট্‌তো।

পশুজগতে সাধারণভাবে দেখা যায় হিংসাপ্রবৃত্তির প্রাবল্য। অর্থাৎ নিরামিষভোজী ছাড়া অন্যেরা প্রাণী-হত্যার দ্বারাই প্রাণধারণ করে। কিন্তু এ'সত্য মানুষেরও সত্য। প্রাণধারণের জন্য প্রাণীহত্যা হিংসার পরিচয় নয়। মানুষের প্রত্যহের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে পরিমাণে পশু-পক্ষী হত্যা করা হয় তার তুলনা নেই। কিন্তু কেবলমাত্র পশুজগৎ সম্বন্ধে যে সত্য গ্রহণীয়, তা হ'লো এই যে পশুজগতে অকারণ হত্যা নেই। নরখাদক বাঘও তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যায় মাতে না। উন্মত্ত পশুর কথা স্বতন্ত্র, উন্মত্ত মানুষও কি না করে? কিন্তু মানুষ যে-অতিরিক্ত বুদ্ধির অধিকারী—সেই বুদ্ধির সহায়তায় সে সুপরিকল্পিত হত্যায়, অহেতুক গণহত্যায় অকারণ মেতে ওঠে—তার প্রমাণ ত' ভূরিভূরি। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে অজস্র যুদ্ধবিগ্রহে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ড করা হ'য়েছে—তা'র কি নৈতিক প্রয়োজন খুঁজে পাওয়া যায়? হিরোসিমায় আমেরিকার বোমা যে ভাবে শিশু বৃদ্ধ ও নারী হত্যায় মানুষকে কলঙ্কিত করেছে, কিম্বা হাঙ্গেরীতে রাশিয়া যে হত্যা-লীলা চালিয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার ভূমিকার বেশী মূল্য আছে কি? জার্মানীতে হিটলার-অনুচর আইখম্যানের ভয়াবহ নির্মমতার ঘটনাবলী আজ কারও অজানা নয়; তেমনি আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে বর্বরতার যে অভিযান বার বার চালিয়ে গেছে—তার ফলে মানুষকে আজ বিশ্বাস করবার, শ্রদ্ধা করবার শেষ ইচ্ছাটুকুও মুছে গেছে। মানুষ মহৎ, মানুষ স্বার্থ-ত্যাগী ও মানবপ্রেমী এ কথা যেমন সত্য, মানুষ ক্রূর নির্দয় ও বর্বর এ'কথাও তেমনি সত্য।

বিবর্তনবাদ বলে মানুষের পূর্বপুরুষ পশু ছিল। হাজার হাজার বছরের সাধনায় জ্ঞান আর বিজ্ঞানের প্রগতিতে মানুষ নিজেকে উন্নীত করেছে, আজ সভ্যজগৎকে তার বিচার-বুদ্ধি ও মানবিক বোধের প্রেরণায় সে চালিত করছে।

মানবতার এই অগ্রগতিতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। তবে বিখ্যাত দার্শনিক সোপেনহয়েরের সংজ্ঞাটি আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। সোপেন-হয়ের মতে মানুষ হ'চ্ছে—অন্ধ পশুশক্তির স্কন্ধে আরূঢ় পঙ্গু বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ মানুষের ভেতরে রয়েছে সেই পশু (beast) যাকে জয় করবার জন্যেই তার যুগান্তব্যাপী সাধনা, তার শিক্ষা ও দর্শনের নব নব বিকাশ। ভদ্রতা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ, করুণা—এগুলি শুধু বর্ণপ্রলেপ। ভেতরে সে আজও; আদিম ও অন্ধ। আজও, সভ্যতার এই চরম বিকাশের যুগেও মাঝে মাঝে সেই আদিম বর্বরতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আশা করি উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

মহান নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কার মানুষকে পাহাড় ভেঙে পথ তৈরী করবার, শহর বানাবার ক্ষমতা দিল। কিন্তু মানুষের বর্বরতা তার

চেয়ে অনেক বড়। তাই ডিনামাইটের মহাশক্তিকে সে ধ্বংসের কাজেই লাগালো। মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন শিউরে উঠে ছিলেন, যখন দেখলেন তাঁর আবিষ্কৃত অণুশক্তি আণবিক বোমাতে রূপান্তরিত। পুরো একটা দেশকে কি ভাবে পলকে বিধ্বস্ত করা যায়, জনশক্তিকে কেমন করে নির্মমভাবে বিনষ্ট করা যায় এই কৌশলের উদ্ভাবনাতেই মানুষের সাধনা সচেষ্ট। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ বা টলষ্টয় ইতিহাসের অলঙ্কার মাত্র। আসল সত্য রাজনীতিক অহমিকা বোধ।

যে কথা বলছিলাম—মানুষ পশুর সঙ্গে তুলনীয় কিনা। বিখ্যাত শিকারী জিম্ করবেট সারা জীবনের আরণ্যক অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে, পশু জগতে অকারণ হত্যার প্রবণতা নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা পুরোমাত্রায় আছে। আফ্রিকার সিংহকুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত শিকারী হাণ্টার যেখিয়াছিলেন যে ক্ষুধার্ত না হ'লে সিংহ হিংস্র হয়না। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে এ কথা খাটেনা। মানুষ শুধু মাত্র আনন্দের জন্য হিংস্র হ'য়ে ওঠে। 'হিংসায় উন্মাদ' কথাটা মানুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। একটা মাছকে বঁড়শীতে গেঁথে পুকুরময় ঘুরিয়ে মারা, একটা মুরগীর গলনলী কেটে তার ছট্‌ফটানি দেখে আনন্দ পাওয়া—এগুলি মানুষেই সম্ভব। হত্যায় নিষ্ঠুরতার প্রয়োগ বা চরম যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া মানুষেরই আবিষ্কার। একটি বাঘ খাবার আঘাতে তার শিকারকে হত্যা করে, হাতী পায়ের তলায় দলিত ক'রে হত্যা করে। আর মানুষ?

কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে তালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো, বিচার ক'রে সজ্ঞানে আগুনে পুড়িয়ে মারা, জীবন্ত দেহ থেকে চোখ উপড়ে নেওয়া—এ'গুলি মানুষী নৃশংসতার পরিচয়। এই ত মাত্র কয়েক বছর আগেই ঘটেছিল সেই ঘটনা—আইখম্যানের হুকুমে দলে দলে নরনারীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মারা হ'য়েছে। মারা হ'য়েছে এমন মানুষকে যারা নিরীহ অসহায় ও অশক্ত।

রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে এলেও সামাজিক জীবনে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম আছে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। বরং সামাজিক জীবনে শিখণ্ডির মত যে ধর্ম ও নীতির ঢাকে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে চায় কিছুদিন আগেও এ'দেশেই সতীদাহের মত জঘন্য প্রথা চলন ছিল। বিধবার প্রতি অবথা অত্যাচারের প্রতিবাদেই বিদ্যাসাগরের জন্ম আমরা দেখেছি। কিন্তু সামাজিক পীড়নে অসহায় নারীর লাঞ্ছনা কি এখনই কিছু কমেছে পূর্বপাকিস্তানে নারীদেহ নিয়ে বীভৎস ব্যাপক বর্বরতা প্রসার আমরা দেখেছি, তা'কি এই যুগেরই ঘটনা নয়?

মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এ'কথা যারা মানে না তারা বলে যে সব মানুষই সমান। তারাও বলে যে মানুষে অধিকার রক্ষা না করলে সভ্যতা কথাটি অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। স্বাভাবিক জীবনে শান্তি ও জীবন যাপনে অধিকার সকলেরই কাম্য। কিন্তু কুংসিৎ লোভের বশবর্তী হ'য়ে ওষুধের মধ্যে জল মিশিয়ে, তেলের মধ্যে বিষাক্ত ভেজাল দিয়ে, চাল গুম ক'রে রেখে অনাহারে মানুষকে মৃত্যুর মুখে যারা ঠেলে দেয় তারাও মানুষ। কোন পশু আজ পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা, নির্বিচার হত্যা বা হত্যার আনন্দে হত্যার কৌশলে মানুষের সমপর্যায়ে যেতে পারেনি।

প্রচলিত ধারণাকে তাই বদলে দেওয়ার সময় এসেছে মানুষ পশুজগতের চেয়ে বেশী এগিয়ে আছে সত্যি। কিন্তু সেই অগ্রগতি মূলতঃ আদিম বর্বরতার সূক্ষ্ম বিকাশ কৌশলে। তাই মানুষ পশুর স্তরে পৌঁছেছে এ'কথা না বলে মানুষ পশুর জীবনস্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছবার জন্য সাধনা করছে—এ' কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৪৩)

তুমিই আমার জীবনবল্লভা। তুমি আমার জীবনের মাঝে আসিয়াছ, আমাকে অঙ্গীকার কর, সবটুকু আত্মসাৎ কর, পুরুষোত্তম-জীবন দান কর। আমি উষাজিনী ও গোপা Childrens পার্কে যাই ও আসি। ৮।। টায় সব পুলিনকক্ষ আসে, ব্যাপার লেগে, accounts লেখে। ১১টার পর যায়, আবার আসে ২ টায়, যায় প্রায় ৫টায়, কিছুটা proof দেখে···সন্ধ্যার পর আরতি হয়···। আরতির অর্থ হইতেছে জীবনের ক্ষিতিতত্ত্ব, অপতত্ত্ব, মরুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব দ্বারা পুরুষোত্তমের পরিচর্যা করা। আমার জীবনের প্রতি স্তরের সঙ্গে তাঁহার রমণ আস্বাদন করা। আ—রম্+ক্তি প্রত্যয় করিয়া আরতি। রম্ ধাতুর অর্থ রমণ বা ক্রীড়া। আ—রতি—আরতি।···ঠাকুর আমার জীবন্ত। তাঁহাকে যে প্রাণ খুলিয়া আদর করিবে, সেবা করিবে সে ধন্য হইবে। পাঠ হয়। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আসেন। সম্বৃতি অসম্বৃতি অধ্যায় পাঠ হইতেছে। আরতি হওয়ার পরে বিদায় আসে, প্রায় ১ ঘণ্টা থাকে। কখন সে আসিয়া আমার সঙ্গে যুক্ত হইল তাহার যাগযজ্ঞ মূলা বুঝিবার কথা বলি। মানুষের পা রহিয়াছে মাটির সঙ্গে যুক্ত, মাথা রহিয়াছে আকাশে; আকাশ পৃথিবীর সমন্বয়ই মানুষ চায়। মানুষ একান্ত পৃথিবীরও নয়, একান্ত আকাশেরও নয়। মাটির স্পর্শ ছাড়িয়া আকাশে ঠিক দিলে আছাড় খাইতেই হইবে। আকাশে পৃথিবী সমন্বয় করিয়া মানুষ চলিয়াছে। ১টায় শুইয়া পড়ি।

১৮ই ডিসেম্বর

শ্রীনিতাগোপাল সখা আমার, জড় অজড় দুই সোনার রূপ পাখা সমন্বিত তুমি-আমি এই সংসার বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আছি। তোমার পাখা অজড়প্রধান জড়, আমার পাখা জড়প্রধান অজড়। দুজন আকাশের বুক চিরিয়া চলিয়াছি বুকে বুক মিলাইয়া। তোমার হৃদয় আমার, আমার হৃদয় তোমার। আমার শরীরের এক অর্ধ তুমি, অপর অর্ধ আমি। যৎ-করোষি, যৎ অশ্নাসি, যজ্জুহোসি, দদাসিযৎ, আমার সব পা ফেলার এক অর্ধ তুমি, অপর অর্ধ আমি। তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে এই বিশ্ব যে টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। তুমি এক বিশ্ব গড়িতে আসিয়াছ, তোমার ইচ্ছা আমার জীবন অবলম্বনে পূর্ণ হউক।·····কোনদিন কিছুর জন্য আগাইয়া না আসার ফলে দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা কিছুই নাই। দায়িত্ব যাহার নাই চারিদিকের ব্যাপারে খেয়াল রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।···সবকিছু ঠাকুরের মাঝে সমর্পণ কর, না পারার বৈকল্যও তাঁহার পায়ে সমর্পণ কর। পারি না, পারি না বলিও না। ··সন্ধ্যার পূর্বে ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন, তিনি এখানের দর্শন ঠিক ঠিক বোঝেন না; অনেক কথা হয়। কাঞ্চন দ্বারা বিশ্বের অনেক উপকার হইয়াছে, কামিনী বিদ্যাংবমনিবর্গতি ইহা ধীরেনবাবু বলেন। কাঞ্চন অপেক্ষা কামিনী অনর্থ বেশী সৃষ্টি করে ইহাই তাঁহার মত। সমস্যা ত কামিনী কাঞ্চন নিয়া নয়, সমস্যা হইল dynamism-এর কী স্থান staticএর মধ্যে থাকিবে; বর্ণাশ্রমের পাশাপাশি সহজীয়-মতবাদ রহিয়াছে, অস্বীকার করিলেও তাহা আছে। কোন সামঞ্জস্য কি নাই?

১৯শে ডিসেম্বর

ওগো সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল, সন্ধির দেবতা আমার, যেদিন হইতে তোমার এই পথ আমার কাছে

প্রকাশিত হইয়াছে সেই দিন হইতে আমার কাছে একান্ত আলোর পথ, একান্ত আঁধারের পথ, একান্ত সন্ন্যাসের পথ, একান্ত সংসারের পথ মুছিয়া গিয়াছে। আমি আজি কাহারও নই, অথচ দুইই আমার। দুই না থাকিলে সন্ধি হইবে কাহাদের সংগে। কিন্তু দুই ত সন্ধিকে না মানিয়া মনোকল্পিত বিগ্রহের পথ বাছিয়া লইয়াছে। আমি আজ একা একান্ত একা। তুমি সংগে আছ বলিয়াই না আমি আজও আছি। তুমি সংগে না থাকিলে কোথায় চূর্ণবিচূর্ণ হইতাম? কতদিন আর আমাকে এমন রিক্ত অবস্থায় রাখিবে? তোমার সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিবার অনুকূল আবেষ্টন সৃষ্টি করিবার সুযোগ করিয়া দাও, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।.....বেণু ১টার প্রেসে যায়, সেখান হইতে ফিরে ৫টায়। আজ মনে বাজিতেছিল দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নারীরা কি কল্যাণ করিয়াছে" এই উক্তি। সৃষ্টির এক অর্ধেক ওই নারীর এই সমালোচনা এই বিশ্বের ভিতরে বসিয়া করা কি ধৃষ্টতা? "মাত্রাস্বস্রাদুহিত্রাবা নাবিবিক্তাসনভবেৎ" শ্লোক যিনি লিখিয়া থাকুন তিনি সামাজিক একজন মানুষকে কি চক্ষে দেখিতেছেন ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এ কোন্ সমাজের চিত্র? যে সমাজে মা আকর্ষণ করে পুত্রকে, বোন কামের পথে আকর্ষণ করে ভাইকে, মেয়ে আকর্ষণ করে পিতাকে? তাহা হইলে সে সমাজ ত পশুসমাজ। কোথায় থাকে culture, সাধারণ মানুষের ব্যবহার! এই চিত্র লইয়া কি কোন ভদ্রমনোবৃত্তি মানুষের নাড়ানাড়ি করিবার অধিকার আছে? আর ইহাই কি বাস্তব চিত্র? সেই জন্যই ত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রয়োজন হইয়াছিল। মনে হইতেছিল শ্রীরামচন্দ্র যে অপমান সীতাদেবীকে লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর করিলেন, সীতা কেন তাঁহার সংগে গেলেন, কেন লজ্জায় অশোক কাননে রহিলেন না! রাবণ সীতার কেউ নন, কিন্তু এতবড় অপমান যিনি করিলেন সেই শ্রীরামই বা সীতার কি? পাতাল প্রবেশ তাঁহাকে করিতেই হইল, শ্রীরাম কিছুতেই তাঁহাকে ধরাপৃষ্ঠে থাকিতে দেন নাই। এই জগৎ হইতে না তাঁড়াইয়া শ্রীরাম ছাড়িলেন না। পুলিনকৃষ্ণ দুইবেলাই আসে রাত্রিতে পাঠ হয়। পুলিন থাকিলে যে সময় বাঁচিবে তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার কথা পাঠের সময় আলোচনা হয়।

২০শে ডিসেম্বর

রাধারাণী আমার, অপমানিতা প্রকৃতির অবহেলিত নিন্দিতা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা দান করিতে আসিয়াছ বিশ্বের এক অর্ধেক নারী, কাজেই নরনারীর আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক তেমন দুর্লঙ্ঘ্য। এই আকর্ষণ না থাকিলে সৃষ্টির সৃষ্টিই হয় না, এই আকর্ষণের শুদ্ধ শোভন ব্যবহার করিতে পারিলেই না সৃষ্টি শুদ্ধ শোভন হইত। নর নারী নিন্দায় মুখর হয় কোন্ সাহসে? নারীনিন্দা করিয়া নারীকে মুছিয়া ফেলিতে গিয়া নর কি বিশ্ব প্রকৃতিকে এবং নিজেকেই নিন্দা করিতেছে না, মুছিয়া ফেলিতেছে না? "মাত্রাস্বস্রাদুহিত্রাবা না বিবিক্তাসনভবেৎ" শ্লোক দ্বারা যে অপমান সামাজিক মানুষকে—পুত্র ভ্রাতা ও পিতাকে করা হইয়াছে, মেয়েরা কী ইহার পরে শ্রীরাধাকে বুকে লইয়া আত্মমর্যাদা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হইবে না? যতদিন জাতিকুলশীলের বর্ত্তমান শাস্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে, নারী বিদ্বেষের উপর উহাদের মর্যাদা দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততদিন জাতিকুলশীল ছাড়িয়া বিশ্বময়ী হওয়া ছাড়া নারীদের পক্ষে গত্যন্তর আছে কি রাধারাণী, তোমার বিগ্রহের একরূপ মেয়েদের দাও আগো তুমি, কেন আমার জীবনে আসিয়াছিলে? রাধারেণুর হরিগোপালবাবু এখানে উকি দেন, তিনি বলেন সমস্যাপীড়িত আমাদের মাথা ঠিক নাই। আমি বলি সব লোকের মাথা ঠিক না থাকার মধ্যে দু একজনের মাথাও ঠিক না থাকিলে চরম বিপদ আসিয়া পড়িবে তোমাদের মত একদলের মাথা ঠিক রাখিবার জন্যই আসিতে বলি। বিরাট জাতের মধ্যে যাহার দৃষ্টি একটি সুনিশ্চিত গঠনের মধ্যে থাকে তাহার মাথাই ঠিক আছে। শ্রীকৃষ্ণের ছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের ছিল না। ৪-২০তে পাঠ আরম্ভ হয়। আজিকার পাঠে তারাবাবু, পুলিনকৃষ্ণ, অমূল্য রায়, সন্তোষ কর এবং

পরে জনরঞ্জনবাবু, কিতীশ চক্রবর্ত্তী ও সেবানন্দ যোগ দেয়। আলোচনা হয় "খণ্ডকর্ম্ম সেনযোকরণ"র মধ্যে এবং "নিরীক্ষা" (critical study)-র বিষয়ে। বেশ ভাল লাগিল। পাঠের শেষে জনরঞ্জনবাবু ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার দর্শনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা বলেন। মহেন্দ্র সরকার ঠিক এই কথাই কোন এক অন্নোৎসবে সন্ন্যাসী মহারাজদের প্রতি বলিয়াছিলেন—আমি ছাড়া কেহ নাকি ইহা পারিবে না। শুনিয়া গৌরব-বোধ করি, ভয়ও হয়। উজ্জলভারতের ১২ মাসে ১২টি প্রবন্ধ বাহির হইবে। ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা জনরঞ্জনবাবু স্বীকার করেন। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে হইবে। জাগো নিত্যগোপাল, মহা সমাধি নিদ্রা হইতে। আজ যে বিশ্বের বড় প্রয়োজন তোমাকে দিয়া। এক ঘণ্টা প্রায় তাহাদের সঙ্গে কথা হয়।

২১শে ডিসেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমি আসিয়াছিলে ৯৮ বৎসর পূর্বে, ২০৮ সালে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলে। তোমার আসাকে আমরা পড়িয়া তুলিব একটি বিশ্বজনীন আসাতে। কিন্তু তাহা পারিলাম কই? শত বার্ষিকী আসিবে ইবে আর এক বৎসর পর। কিছুই তো করা হয় নাই। নে উঠিয়াছিল এই এক বছরের মধ্যে তোমার জীবন-দর্শন লিখিব, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্যাসঙ্কুল বর্ত্তমান বিশ্ব-াবেষ্টিত হইতেছে, যাহার জীবন ও দর্শনই এই সব টিলতম সমস্যার সমাধানে সক্ষম হইবে। কাল গীতা াঠের পর তোমার আশ্রিত জনরঞ্জন রায় ও কিতীশ চক্রবর্তী তোমার শতবার্ষিকীতে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে হার প্রেরণা দিয়া গেলেন। তাঁহারা উজ্জল ভারতের ২টি সংখ্যায় তোমার 'দর্শন' বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত রিবার নির্দেশ দিলেন। তাঁহাদের মতে আমিই নাকি ার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। শ্রীজীব গোস্বামী যেমন াপ্রভুর মতবাদকে দার্শনিকভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, োমাকেও নাকি সেই ভার নিতে হইবে। ঠাকুর, আমায় দ দাও, শক্তি দাও। আমি জীবন মরণে তোমার। ৪৫-৯টার পর বাহির হইয়া প্রেস, আশুবাবু, মণিবাবু ও পূর্ণিমা মজুমদারের ওখানে যাই।.....এতগুলো দায়িত্ব পালন কেহ করিতে পারে না, তাই সর্ব্বধর্ম পরিত্যজ্য বাক্যের উপকারিতা রহিয়াছে। সে যদি তাহার পারিবারিক জীবন হইতে 'মুক্ত' না হয়, সে তাহার পারিবারিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। 'অনন্যঃ চিন্তয়ন্তঃ মাম্' বাক্য যথাযথ জীবনে পালিত হইলে ভগবানও যোগক্ষেম বহন করিতেন। কাহারও সামনের পথ কি রুদ্ধ? অসম্ভব। পথ আছে, কিন্তু তাহার জন্য মানসিক প্রস্তুতি চাই।...দায়িত্ব এড়াইতে চাহিলেই দায়িত্ব যায় না। পাঠ হয়। 'সম্ভূতিবিনাশক' মন্ত্রটি পাঠ হয়। স্থিতিগতি সমন্বয়ই মন্ত্রটির উদ্দেশ্য।—

২২শে ডিসেম্বর

বিশ্বপ্রাণমন্থন ধন শ্রীনিত্যগোপাল আমার, তুমি বিশ্ব-প্রাণতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া (অধিষ্ঠায়) এই ধরার বুকে আসিয়াছিলে এই বিশ্বপ্রাণকে মথিত করিয়া, মথিত হইয়া নূতন করা সৃষ্টির পরিকল্পনা লইয়া। তাই তুমি অপরিচিত, উপেক্ষিত। কেহ তোমাকে চিনিল না জানিল না। প্রাণ যে নিত্য-অভিযুক্ত। বুদ্ধির দেশে প্রাণ চিরনিন্দিত, চির অবজ্ঞাত, অথচ প্রাণই ইন্দ্রিয় সমূহের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তোমাকে হৃদয়ে লইয়া বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য আমার প্রাণ যে পাগল ঠাকুর। এই পাগলামি লইয়া আমি বড় বিব্রত। তুমি আমার জীবনে আসিয়া-ছিলে। আজ বিশ্বের 'প্রাণাত্যয়' উপস্থিত, তাই 'সর্ব্বাত্মসমন্বয়' ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই সর্ব্বাত্মই সর্ব ধর্ম সমন্বয়। আজ তুমি সর্ব সম্প্রদায়ের সব তত্ত্বরূপী অন্ন সমন্বিত করিয়া যুগধর্ম স্থাপিত করিয়া গেলে।...১টায় সময় পুনরায় বাদন্তীতে গিয়া রেণু চ্যাক্সীতে করিয়া উজ্জল-ভারত লইয়া আসে। তখনই প্রতিভা ও মীনু কাজে লাগে, পরে পুলিন আসিয়া কাজে যোগ দেয়...আজ আর পাঠ হয় না। রাত্রিতেই উজ্জলভারত ঠিক করা হয়।

২৩শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সব—আমার গর্ব তুমি, আমার মান প্রতিষ্ঠা তুমি। তুমি আমাকে যে অধিকার দিয়াছ—বেদান্ত লিখিবার অধিকার—তাহার চরম সার্থক ত

কি তুমি দিবে না? তোমার বিশ্বে তোমার বিশ্ব সংগঠনের মূল রহস্য, তোমার বিশ্বকে তোমার সেই মূল রহস্যের চাঁচে গড়িয়া তুলিবার যে লালসা আমার প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছ তাহা কি সার্থক হইবে না? আমায় সুযোগ করিয়া দাও। কেন আমাকে এই অধিকার দিলে? এত কষ্টের লেখাগুলি কি পোকায় কাটিবে? তুমি কি প্রকাশ করিবে না?...আজ উজ্জয়নীরাত হইতে 'ত্রিপুরাদের উদ্ভব' ও 'মেঘে ঢাকা গিরিধর' প্রবন্ধ দুইটি পাঠ ও ব্যাখ্যাত হয়।...

২৬শে ডিসেম্বর

ওগো যীশু নিত্যগোপাল, আজ তোমার জন্মদিন। তুমি মেরীমাতার গর্ভে উদিত হইয়াছিলে। যিনি যুগে যুগে গো-পাল আজ তিনি মেষ-পাল, হারানো মেষ (lost sheep) খুঁজিতে আসিয়াছেন যীশুরূপে। সংসারের সকল ক্রুশ তোমাকে বিদ্ধ করিয়াছে। তুমি সংসারকে ক্রুশ হইতে মুক্তি দিয়া গেলে। ক্রুশের যে তোমারই আজ, বিশ্ব আজ ক্রুশ-মুক্ত। তুমি তাই পরিত্রাতা, তোমার রক্ত মাংস নিজের জীবনে আস্বাদন করিয়াই মানুষ হইবে মুক্ত। তুমি মূর্তিমান প্রেম। Tit for tat নীতি তোমার আবির্ভাবে গলিয়া গেল। তুমি সমগ্র সৃষ্টির প্রচারক। কবে বিশ্ব তোমাকে চিনিবে, আপনার করিয়া তোমাকে বরণ করিবে?...বৈকালে কবিরবাবু ও তাঁহার অফিসের একটি যুবক আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে ৪টা পর্যন্ত কথা হয়। আমাদের পত্রিকা যে সমাজপতি, চিন্তানায়কদের শিক্ষার জন্য, জনসাধারণের জন্য দিবার সময় যে আজও আসে নাই, চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে একটা বিপ্লব না আনিতে পারিলে যে ধর্ষিতার সমস্যা, নরনারীর অবাধ মিলনের ফলে ব্রহ্মচর্যের দুরবস্থা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অসম্ভব এইসব আলোচনা হয়। রেণু প্রথম বর্ষের 'যে ফেরেনি' প্রবন্ধ পড়িয়া শোনায়...কবিরবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করি। তিনি মাঝে মাঝে খবর নেন। প্রাণ আছে তাই খবর নেন।...সম্বৃতি ও অসম্বৃতির সহভাবের কথা আজ আলোচনা হয়।

২৭শে ডিসেম্বর

ওগো, কার্যকারণ বিধির শক্ত শৃঙ্খলা গলাইয়া দিয়া তুমি সেখানে তোমার অনন্ত সম্ভাবনাময়ী সহজ জীবন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিলে, সংসার লীলাক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিল। রাধারাণী হইতেছেন এই শৃঙ্খলার দিশা আস্বাদন—মুক্ত বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার ভিতর rigidity নাই, আছে সহজ অদ্বৈত জীবনের ঘন আস্বাদন। আকাশ নিরাকারের ঘন প্রকাশ। শৃঙ্খলা ছাড়া, ছন্দ ছাড়া আকার হয় না। তাই প্রথমে অসম্বৃতি বা বিনাশ (Indeterminism) পরে সম্বৃতি ও সংগঠন। পুরুষোত্তম-জীবনে রহিয়াছে অনিশ্চিত নিশ্চিতের সমন্বয়, বিনাশ-সম্বৃতির সমন্বয়। তোমার জন্ম হউক বিশ্বলীলায়। ৫টার পর ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও চৈতন্য আসে, জনরঞ্জনবাবা ঠাকুরের শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে প্রচার পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমার অনুমোদনের জন্য তাহা নিয়া আসে। সুবিধা হয় নাই, রাখিয়া দিলাম। রেণুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া লিখিয়া রাখিব। রবিবার বৈকালে আসিতে বলিয়া দিলাম। মাখনবাবু আসেন।...৮টায় পাঠ আরম্ভ হয়। 'ত্রিপুরাদের পাত্রেন, মন্ত্র আরম্ভ করা হয়। দুয়ারে ধূপ রাখিয়া, নিকটকে নিকটে পাইয়া যিনি ভগবানকে পান, তিনিই পোষণমূর্তি পুরুষোত্তমের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। একান্ত যোগ বা একান্ত মায়ার পক্ষে পুরুষোত্তমের মূল ত্রিপুরাদের দ্বারা আবৃত। যোগ ও মায়ার সংঘর্ষেই পোষণ জন্মিয়া ওঠে। একান্ত যোগের পথও শোষণের পথ, একান্ত মায়ার পথও শোষণের পথ। ৯টায় পর শুইয়া পড়ি।

২৮শে ডিসেম্বর

ঠাকুর আমার, তোমার জীবনে কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কল্পনার মূর্তি শ্রীরাধা অথচ বাস্তব জীবন তাঁহার। কল্পনাময়ী বলিয়া জাতির যৌবন, কুলের সংস্কার, শীলের ধর্ম তাঁহাতে মুছিয়া গিয়াছে। রাধারাণী আমার সর্বত্যাগিনী। সর্বকে পক্ষ করিয়া ঝাঁকড়াইয়া ধরার ফলে যে বাস্তব গড়িয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জন্মিয়া উঠিয়াছে কার্যকারণবিধি (Law of causality)। রাধা-রাণী সেই বিধি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কল্পনার টানে পথে বাহির

হইলেন। আমাকেও ত তুমি পথে দাঁড় করাইলে। আমার লোকোত্তর-কল্পনা মাটিতে বাস্তব হউক। বাস্তবের প্রাণ কল্পনা, কল্পনার মূর্তি বাস্তব। মনঃ কল্পন-ক্ষমা শক্তি তাই তোমাতেই সার্থক। তুমি ধরার বুকে কল্পলোক গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ, তোমার জয় হোক। ঠাকুর যে দর্শন এই বিশ্বে আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেই দর্শন অনুযায়ী জীবন যাপন করিলে Law of Excluded Middle-এর কোনও এক প্রান্তে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে কি? তাই আজ আমি জাতিছাড়া, কুলছাড়া, সীমছাড়া। আমি এই বিশ্ব-প্রান্তরে একা, নিতান্তই একা। আমার কথা কেহ বোঝে না, আমিও তাহাদের কথা ঠিক বুঝি না। অথচ ইহাদের মধ্যেই বাঁচিতে হইতেছে। কি বেদনা আমার! আজ আনন্দবাজারে কটক সাহিত্য সম্মেলনে দর্শন-শাখার সভাপতির ভাষণ পড়িয়া ভারতীয় দর্শনের ত্রুটিগুলি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন পূরণ করিয়াছে এবং তাহা অরবিন্দ দর্শনে রূপায়িত হইয়াছে ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু "consciousness"কে কেন্দ্র করিয়া রওনা হওয়ার ফলে তিনি জড়কে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করুন না কেন, জড় শেষ পর্যন্ত স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আচার্য শংকরের দর্শন হইতে ইহা অনেকখানি অগ্রসর হইলেও প্রকারান্তরে শাংকর দর্শনই রহিয়া গিয়াছে। জড় static এই hypothesis তাঁহার দর্শনে স্বীকৃত হওয়ার ফলে ladder system অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে, সত্ত্ব গুণ যাহার সর্বোচ্চ ধাপ, তমোগুণ সর্বনিম্ন ধাপ। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দর্শন ত এই হিসাবে পরিপূর্ণ। 'আত্মজ্ঞান যদি সত্য, তবে যুগপৎ অনাত্ম জ্ঞানও সত্য'—নিত্যধর্মপত্রিকা ১৩২১ চৈত্র সংখ্যা (দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯। ইহা পাঠ হয়।...

২৭শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার নিকটতম, দূরতম। তুমি জগন্নাথ, তাই তুমি কত দূরে। তুমি আমার প্রাণনাথ, তাই কত নিকটে। তোমার জীবন ও দর্শন আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার মাথার উপর কি যে দায়িত্ব চাপিয়াছে তাহা কি বলিব? তোমার ব্যাপকতম সমন্বয় আজ পত্রে পুষ্পে শোভা পাইতেছে, কিন্তু তুমি তো সমন্বয়-ফলও; অরবিন্দ দর্শনও তোমার সবখানি কথা বলিতে পারে নাই। তাহাও ত ক্রম-বাদের উপর স্থাপিত, বেদ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, উঠানামার উপর ঝাঁড় করানো। মন হইতে উহার যাত্রা আরম্ভ। উঠানামা যে যুগপৎ, প্রাণ যে যুগপৎ ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতিতে উঠানামা করিতে পারে তোমার দর্শনে ইহা সুস্পষ্ট। আত্মজ্ঞান যে মুহূর্তে যতখানি সত্য, অনাত্মজ্ঞানও সেই মুহূর্তে ততখানিই সত্য। দায়িত্ব যদি দিলে তাহা পূরণ করিবার সুযোগও তুমিই করিয়া দাও। আমাকে নিশ্চিন্তে তোমার সেবা করিতে দাও। ৪-৪৫তে পাঠ আরম্ভ হয়, উপস্থিত ছিলেন যতীন চট্টোপাধ্যায়, হরিগোপালবাবু, হরিনারায়ণ ও তাহাদের পিতা, চৈতন্য, দেবু, কালিপদবাবু, পুলিন ও সত্যেন কর। Life impulse ও death impulse-এর সমন্বয়, 'সংঘ রূপায়ণ' ও 'বিষাদন্' বিষয়ে আলোচনা হয়, আজ চাই warrior vedantist সৃষ্টি করা;...

২৮শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, 'সেই তিল তুলসী দেহ মন সমর্পিনু দয়াজানি না ছোড়ব মোহ'। আমি চলিতে চাই 'between Scylla and Charybdis'—এই দুইদিকের টান সামলাইয়া মাঝখান দিয়া চলিবার সাধনা যে বর্তমান যুগে কি গুরুতর তাহা আমি বুঝিতেছি। কে আমাকে বর্তমানের এই steelframe আবেষ্টনের মধ্য দিয়া আগাইয়া নিয়া চলিবে, শরণ, তুমি ছাড়া? আমি সর্বসংস্কারমুক্ত অবধূত জীবন লাভ করিবার জন্য এই বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বেশ্বর তোমার সঙ্গে উপাধিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ প্রযত্নশীল, জীবনের সকল প্রবৃত্তি সকল নিবৃত্তি সুস্থ থাকিয়া তোমাতে সমর্পিত হউক। আমি কোন কিছুতেই আটকাইয়া যাইব না। আমি সহজ জীবন লইয়া শুধু আগাইয়া যাইব, বন্ধনমুক্তি কাম অকাম এক করিয়া। ৬টার পর যতীন চট্টোপাধ্যায় দুই জন শিখ ভদ্রলোক ও এক জন মহিলাকে লইয়া আসেন। গুরু-গোবিন্দ সিং-এর জন্ম উপলক্ষে একটি সঙ্গত আহ্বান

করিবেন। পাঞ্জাবীদের সংগে মিলিত হইয়া তাহারা গুরুজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চায়, আমাকে যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। রবিবার বৈঠক হইবে ঠিক হইল, আমি পাঁচটায় পাঠ শেষ করিয়া যাইব। গুরু ত ভারতবর্ষের প্রতিটি মানবের গুরু, আমি প্রাণের অর্ঘ্য দান করিব। তিনি ছিলেন warrior vedantist। Practical Vedanta incarnate is Guru Govind Singh....। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া অমিতা মিত্র এখানে দেখা করিতে আসে। দুঘণ্টা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ উজ্জ্বলভাবে দেওয়া হয়।...

২৯শে ডিসেম্বর।

রাধারাণী, আমার জীবনের সকল বৃত্তি দিয়া তোমাকে বুকে চাপিয়া ধরিব। তুমি সর্ব বৃত্তিময়ী, সর্ব বৃত্তিবিহীনা; প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তোমাতে সমন্বিতা। কেন তুমি আমার জীবনে অযাচিতভাবে আসিলে? আমি যে তোমার পরশ দিয়া এই যান্ত্রিকী প্রকৃতিকে জীবন্তা পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না! সারাজীবন মেয়েদের ভাবিলাম, কই কেহ ত তেমন করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিল না তোমার জীবনে জীবনলাভ করিতে? তোমার পাগলিনী রূপ কি মাটির দেশে কাহারও জীবনে দেখিব না? শুধুই পুরুষোত্তম, শুধুই পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম বিনা, "আন কথা না কহিবে আন কথা না শুনিবে।"....প্রায় ১ ঘণ্টা থাকি। প্রসংগ ওঠে মেয়েদের লইয়া...শ্রীরাধার কথা বলি, শুচি অশুচির প্রশ্ন ওঠে।..

৩০শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার শরণ: একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়, শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়। তোমার রাতুল চরণকমল একদিন আমার মাথায় বুকে দিয়াছিলে, সেই পরশ বহন করিয়া চলিয়াছি, ইহাই আমার পরম সম্বল, নিরাশার আশা। তোমার পাদপদ্ম সর্বসংস্কারবর্জিত, সর্বতোভাবে। যতদিন থাকিব তোমার শ্রীচরণ বহন করিয়া চলিব। একূলে ওকূলে কেহ আমার নাই, কাহার সংগে আটকাইয়া যাইব? একূল ওকূলের মাঝখান দিয়াই ত ব্রহ্মপথ প্রসারিত দুইকূলের সমন্বয় করিয়া। তোমার চরণই শীতল, জুড়াইবার স্থান।..... আমি যথাসাধ্য প্রত্যেকের ক্ষুদ্র সেন্টিমেন্টকেও আদর করি...কেহ কি আমার প্রাণের অবস্থা বোঝে? ঠাকুর তুমি আমার থাকিও। ৭।০টার পর পাঠ হয়...। যতীন চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যায় আসেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের একটি জীবনী দিয়া যান।...

৩১শে ডিসেম্বর

১৮৮৯

ওঁ পুরুষোত্তম

ঠাকুর, "পূষন্ একর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজঃ তত্তে কল্যাণতমং রূপং তত্তেপশ্যামি যোঽসাব সৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"। ওগো আমার অহম্ অস্মি, তুমি আমি এক, অদ্বৈত: তুমি আমি একই প্রাণসূত্রে সমপ্রাণ, পাশাপাশি বসিয়া সবানন্দুকে আলিঙ্গন করিয়া আছি। তুমি আমি শুধু মুখোমুখীই নহি। দেশের ধারণা লইয়াই তোমার descent ও আমার ascent কল্পনা করা হইয়াছে। Ascent করিতে গিয়া ত প্রকৃতির পরস্পরবিরুদ্ধতাকে অস্বীকার করিতেই হয়, অথচ তুমি আছ পুরুষপ্রকৃতির সমন্বয় মূর্তি। প্রকৃতির বুক চিরিয়া ঊর্ধ্বগামী হইলে কি তোমার অবতরণকে আমি ধারণ করিতে পারিব? Cousciousness-এর ঊর্ধ্বগতি কি করিয়া ধারণ করিবে চৈতন্য-অচৈতন্য, cousciousness ও unconsciousness সমন্বয়মূর্তি তোমাকে? শরণাগতি দেশকাল আশ্রয় করিয়া হয় না। উহা দেশাতীত, কালাতীত; অথচ সর্বদেশ সমন্বিত, সর্বকাল সমন্বিত। তুমি আমি সম, ইহাই শরণাগতির পরিপূর্ণ আস্বাদন। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। আমি ত জ্ঞাতসারে কাহারও সেন্টিমেন্টের অনাদর করি নাই, আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার যতদূর পারিয়াছি ক্ষুদ্রতম সেন্টিমেন্টেরও মূল্য দিয়াছি। বেড়াইয়া আসিয়াই দেখি মাখনবাবু আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আসেন।... এই পাঁচ বছরে এদেশের মত জটিলতম আবেষ্টনের মধ্যে ইহার চেয়ে

যেন অগ্রগমন সম্ভব নয়, ইহা তাঁহারও মত। বায়ুৎ-নীদং মন্ত্রটির আলোচনা আরম্ভ হয়। অধ্যাত্ম প্রাণ যখন আধিদৈবিক প্রাণের সংগে সমন্বিত, তখন তাহা অমৃত। তস্মাত্তে এই শরীরও অমৃত হয়।··

১লা জানুয়ারী

প্রজ্ঞাঘন প্রাণচক্ষু প্রাণেশ নিত্যগোপাল আমার, কি দুর্গম পথ বহিয়াই না চলিয়াছি! প্রাণের সকল বেদনাকে, সকল ব্যথাকে সকল বুকধড়ফড়ানিকে প্রজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হইবে। তুমি ছিলে সখা, তুমি আছ সখা, আমার জীর্ণ জীবন-রথের সারথি। তাই এ পথে চলিতে পারিতেছি। কেমন করিয়া অতি ক্ষুদ্র প্রাণস্পন্দনকেও ব্রহ্মমূল্যে আস্বাদন করা যায় তাহাতো কিছু কিছু জীবনে আস্বাদন করিয়াছি। কৃষ্ণ-বিরহের মাঝে বুঝি বিশ্বের সব বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই গোরার খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিদ্ নাই চোখে। সংসারের লোক বেদনার কি মূল্য জানে? 'দুচারদণ্ড বারাকাটি' ইহাই ত তাহাদের বেদনা আস্বাদনের দৌড়। বেদনা যদি ব্রহ্মভাবিত না হয় সে বেদনা দুদিনেই জুড়াইয়া যায়। বেদনাও তোমারই স্তবে অনন্ত। তুমিই বেদনামূর্ত্তি বেদমূর্ত্তি।·····চন্দ্রকান্ত ইনষ্টিটিউশন হইতে তারাপদ দাস এখানে পৌঁছায় ১টায়। আমি ও রেণু ১-১৫এ রওনা হই, ২-১৫য় পর পৌঁছি; ৩টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে ঋষি চট্টোপাধ্যায় স্তোত্র পাঠ করে, পরে বন্দে মাতরম্ গীত হয়। আমাকে সভাপতি করা হয়। প্রথমে শৈলেশ সেন (৺তরণীকান্ত সেনের পুত্র) কিছু বলে। বেশ বলিয়াছে। এই দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে যে প্রাণ লইয়া নগেন্দ্রনাথ স্কুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। Lost in the city যাহারা হইতে পারে, তাহাদের মধ্য হইতে কিছুকে অন্ততঃ নগেন্দ্রনাথ প্রাণের মধ্যে রাখিতে পারিতেছে, তাহা ভবিষ্যতের পথে কল্যাণকর। অধ্যাপক গোপাল ভট্টাচার্য্য (নগেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী) নগেন্দ্রনাথের প্রাণের সুখ্যাতি ও সেবাব্রতের বর্ণনা করে। ··,আমি বলি ১৫ মিনিটের বেশী নয়। চাওক ও তাহার মায়ের উক্তি বলি। সহনাববতু···তেজস্বিনাবধীতমস্তু। শিক্ষক ছাত্র এক সমগ্র বস্তু। হৃদয়ের নিভৃতে তাহারা দুই এক। শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-প্রজ্ঞা সমাধিপূর্বকমিতরেষাম্। ·· শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। একদিন সন্দিপনী মুনির পাঠশালায় কৃষ্ণ ছাত্র ছিলেন। প্রাণসাধনা লইয়া থাকিলে একদিন নগেন্দ্রনাথের স্কুলেও কৃষ্ণ আসিবেন, তখন তাহাকে স্বীকার করিতে স্কুল বোর্ড বাধ্য হইবে। মায়ের দুধের টাটানির মত শিক্ষার টাটানি লইয়া যেন নগেন্দ্র ছাত্রদের বুকে রাখেন।·····।

২রা জানুয়ারী

জগন্নাথ নিত্যগোপাল আমার, আমি তোমার ঘর করিব। তোমার বিশ্ব আমার ঘর হউক, তোমার জন আমার জন হউক। আমি গোত্রান্তরিত হইব, তোমার মাঝে মহানির্বাণ লাভ করিব। বিচ্ছিন্ন 'আমি'র ঘর করিয়া আমার না আছে সুখ, না আছে স্বস্তি। তোমারই চরণতলে পড়িয়া রহিব, ওগো আমার আমি, তোমার যাকিছু সব আমার হউক, আমি তুমি বনিয়া যাই। তোমার মন আমার মন হউক, তোমার বুদ্ধি আমার বুদ্ধি হউক, তোমার অহংকার আমার অহংকার হউক, তুমি আমি একাত্ম হই।·····উজ্জয়ন্তীভারতের গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন বাড়ানো উচিত, বিজ্ঞাপনের বাজার যেরূপ মন্দা, তাহাতে গ্রাহকের উপর জোর দেওয়া উচিত। পুলিনকে তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলি। আমি যে সুযোগ তাহাকে দিয়াছি যদি সে দৃঢ় সংকল্প হইয়া তাহার সুযোগ না নেয় তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মনের ওপর জোর করিতে হয়। রোগের আলোচনা রোগ বাড়ায়। কতখানি অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতে হয়। আজকাল শুইয়া না থাকিলেই মনে করিতে হইবে সুস্থ। ৭।০টার পর পাঠ হয়। বায়ুরনিলং মন্ত্র আজ শেষ হয়। অগ্নে নয় সুপথা শুধু পাঠ করিয়া রাখা হয়। প্রতিভা সকালে শুক্ল গোবিন্দসিং পুস্তকের অনেকটা পাঠ করিয়া শুনায়। তেগবাহাদুরের মৃত্যু কি বেদনাদায়ক।

৩রা জানুয়ারী

ঠাকুর, সখা আমার, তুমি আমি দুই সাথী সোনার-

বরণ পাখা ছড়াইয়া হৃদয়াকাশে কোন্ অজানা দেশের আবিষ্কারের জন্ত কিংবা গড়িয়া তুলিবার জন্ত উড়িয়া চলিয়াছি। তুমি অপরিচ্ছিন্ন, আমি পরিচ্ছিন্ন। এই মহা-মিলনের ভিতর দিয়া সেই অজানা দেশ গড়িয়া উঠুক। প্রলয় পয়োধি জলে এখনো সেই দেশ নিমগ্ন। তুমিই মীন, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ। আমি তোমার শরণ লইলাম।··· সকালে সুধীর সরকার রেণুর সংগে দেখা করিতে আসেন। ...ঠিক সোয়া চারটায় পাঠ আরম্ভ হয়, ৪-৪৫ পাঠ বন্ধ করি। আজ পাঠ আরম্ভ হওয়ার কিছু পরে অমিতা মিত্র আসে। সভায় ছিলেন শুধু এজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, যতীনবাবু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, আমি ও যীরেন ভদ্র ও সর্বশেষে সভাপতি বসেন। 'মন্নানাম্ অশনিঃ' শ্লোক বলিয়া গুরু গোবিন্দের জীবনেও যে water tight compartment ছিল না, তিনি যে বেদান্ত ঝড়ের মধ্যে আনিয়াছিলেন, 'মানুষের ধর্ম্ম চ' ইহাই যে তাহার জীবনের মর্ম ছিল, ইহা অল্প সময়ের মধ্যে বলি। শিক্ষণের বেশ সজ্জন সকলেরই বেশ সেবা প্রবৃত্তি আছে। দুই তিনজন যোগ করিবেন বলিয়াও বলেন। যতীনবাবুর ইষ্টগুরু গোবিন্দসিং ···ইহা তিনি বেশ অনুরাগের সঙ্গে প্রকাশ করেন গুরু গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন পাটনায়। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা এক প্রদেশ ছিল। যতীনবাবু বলেন গুরু গোবিন্দ Bengalee of Bengalees।···

৪ঠা জানুয়ারি

ক্রমশ

সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি

॥ শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী ॥

প্রেতের কংকালের মত পথের ধারে দাঁড়িয়ে
যে ছিল একদিন পথিকের বিভীষিকা ;
বাতাসের শির শিরানিতে যার মৌন কান্না
মরণাভিসারের সকরুণ গান হয়ে বাজ তো ;
চৈত্রদিনের বৈকালী আকাশের রক্ত-বলয়ের দিকে তাকিয়ে,
মরে-বেঁচে থাকার গ্লানি থেকে উদ্ধারের আশায়
প্রলয়কে যে আহ্বান জানাতো অস্থি-হাড় দুলিয়ে দুলিয়ে ;—

তাখো, তাখো, চেয়ে তাখো,
আবার তার নয়নাভিরাম রূপ তাখো !
কোন্ যাদুকরের যাদুদণ্ডের মায়াস্পর্শে
সবুজের সমারোহ আবার তার সর্ব-অঙ্গে !
প্রাণবহ্নির রক্ত-শিখা উঁকছে পড়ছে থরে থরে !
নিজেকে পূর্ণ করে নিজেকে সে বিলিয়ে দিচ্ছে আবার !

কিন্তু মৃত্যুকে সে সত্যিই চায়নি।
কারণ সে জানতো, মৃত্যু মুক্তি নয়।
নতুন করে বাঁচার জন্তে সে তাই ছটফট করতো
সব সময়
আর, তুমি আমি ভাবতাম, মৃত্যু কামনায় সে অধীর !
আমরা তাকে ভুল বুঝেছি সে কিন্তু মহাজ্ঞানী !

নব জীবনের সাধনায় সে প্রতীক্ষা করেছে
অসীম ধৈর্যের সঙ্গে।
ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতেও সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে
জন্ম-দাত্রী মাকে তার।
বাঁচার মত বাঁচার মন্ত্র সে জপেছে অহর্নিশি।
তার এই প্রতীক্ষার সাধনা সফল হবেই—
এ বিশ্বাস তার ছিল।
আর, ছিল বলেই—
আজ আবার সে নয়নাভিরাম !
প্রাণবহ্নির রক্ত শিখায় আবার সে দেদীপ্যমান !
নিজেকে পূর্ণ করে নিজেকে সে বিলোয় আবার !

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বতঃসিদ্ধ পাওয়াকেই সাধনায় পাওয়া সম্ভব ; অসিদ্ধের সাধনা বিড়ম্বনাময়, মিথ্যা]। (কি কি সমন্বিত হইয়া আছে ?) এবং [যাহা চলিতেছে সচল পক্ষী প্রভৃতি] প্রাণৎ [প্রাণাপানাদিনাম্ পক্ষ-মক্ষ্ণ] নিমিষৎ চ [নিমেষবান্ এবং চ পদের দ্বারা নিমেষরহিত] এতৎ যৎ [এই যিনি সর্ব্বাস্পদ ইহাকে] জানথ [সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখ, শোন, আস্বাদন কর, আলিঙ্গন কর, প্রতি অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া এক হইয়া যাও] (হে শিষ্যাঃ) সদসৎ [সৎ-অসৎ সমন্বিত ; যিনি "আছেন" বা "নাই" কোনও উপাধিতে বা আটকাইয়া গিয়াও সৎ-স্বরূপে ভাব-স্বরূপে "আছেন" এবং অসৎ-রূপে, রস-রূপে 'নাই'] বরেণ্যাং [যিনি জীবের জীবনে স্বয়ংমূল্য দিবার জন্য 'নাই', একেবারে জীবনের মাঝে নিজকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতেছেন, আবার লীলার ভিতরে পৃথকভূত হইয়াই যিনি সকলের বেদনাকে পূরণ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিষয়রূপে, আস্বাদনরূপে, আস্বাদকরূপে "আছেন", তিনিই জীবনের বরেণ্য, জীবের "বর"] পরং [পঞ্চাত্তের সব খণ্ড তত্ত্বকে পূর্ণ করিয়াই যিনি পঞ্চত্তের অগ্রে, অতীতরূপে বিরাজমান, তিনিই পর] প্রজানাং [জনসমূহের] বিজ্ঞানাৎ [খণ্ড বিজ্ঞান হইতে] যৎ [যিনি] বরিষ্ঠং [বরতম]।

তিনি স্বপ্রকাশরূপে সন্নিহিত, গুহাচর তাঁহার নাম, তিনি মহৎপর ; ইহাতেই সচল বিহঙ্গযাদি, প্রাণধারী জন্তুাদি, নিমেষবান ও নির্নিমেষ এই যাহা কিছু সব সমন্বিত হইয়াই আছে, এমন যিনি তাঁহাকে জান, যিনি সৎ-অসৎ সমন্বিত, বরেণ্য, জন-সমূহের খণ্ড বিজ্ঞান হইতে

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং
সোম্য বিদ্ধি ॥ ২

যৎ [যিনি] অর্চ্চিমৎ [দীপ্তিমান্, সকলের দীপ্তি যে মূল হইতে] যৎ [যিনি] অণুভ্যঃ [সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ হইতেও ; কর্ত্তৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের শেষ সীমায় প্রাপ্ত যে সূক্ষ্মতম অব্যাকৃত, তাহা হইতেও] অণু [সূক্ষ্ম] চ [এবং স্থূল হইতেও স্থূল] যস্মিন্ [যাহাতে] লোকাঃ [ভূতাদি লোকসমূহ] নিহিতাঃ [অবস্থিত] লোকিনঃ চ [এবং লোক নিবাসিগণ] তৎ [তিনিই] এতৎ [এই সর্ব্বরূপ] অক্ষরং ব্রহ্ম [অক্ষর ব্রহ্ম] সঃ [তিনি] প্রাণঃ [ব্যষ্টি-সমষ্টি সমন্বিত প্রাণঘন] তৎ উ [তিনিই আবার] বাঙ্ মনঃ [সর্ব্বেন্দ্রিয়ের খোদা বজায় না ছাড়াইয়াই চৈতন্য ও আধার সমন্বিত অখণ্ড বাগিন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়] তৎ এতৎ [সেই এই ব্রহ্মই] সত্যং [সত্য] তৎ [তিনি] অমৃতম্ [অমৃত, সকল মরণকে অমরণের সঙ্গে সমন্বয় করিয়াই তিনি অমৃত] বেদ্ধব্যম্ [বিদ্ধ করিবার যোগ্য ; তাড়িতধ্য শব্দের, তাড়াইয়া নিবার যোগ্য] সৌম্য [হে সৌম্য] বিদ্ধি [বিদ্ধ কর, সেই অমরকে, আদিঃ সন্নিহিত থাকিয়া পালাইয়া পালাইয়া ফিরিতেছেন, ধরিতে ধরিতে সিটলাইয়া যাইতেছেন যিনি তাঁহাকে তোমার শানিত সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করাও যেন তিনি সর্ব্বাঙ্গবিদ্ধ হইয়া ধরা দেন]।

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি অণু হইতেও অণু, স্থূল হইতে স্থূল, যাহাতে লোকসকল এবং লোকনিবাসিগণ অবস্থিত তিনিই সর্ব্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনিই আবার বাক্ ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্য, তিনি অমৃত। হে সৌম্য, তাঁহাকেই বেধ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বেধ কর। ২.২।২

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি। ৩

মৃগয়ার সাজে সাধককে সাজাইয়া শ্রুতি অক্ষর ব্রহ্ম-মৃগ ধরিবার গূঢ় কৌশল শিখাইতেছেন—ধনুঃ [শরাসন] গৃহীত্বা [গ্রহণ করিয়া] ঔপনিষদম্ [উপনিষদের অন্তরেই যাহা অছে, উপনিষৎশাস্ত্র প্রণব] মহাস্ত্রং [মহৎ এবং অস্ত্র ; ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবার এমন যোগ্য অস্ত্র আর নাই] শরং [বাণ] (কিরূপ বাণ ?) উপাসা নিশিতম্ [উপাসনা অর্থাৎ বিদ্ধ করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুলতাপূর্ণ ধ্যান দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত] সন্ধয়ীত [সন্ধান করিবে] আয়ম্য [ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া ; সকল দিক হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিনিচয়কে গুটাইয়া আনিয়া, লক্ষ্য বস্তুতে আকৃষ্ট করিয়া, এক করিয়া] তদ্ভাবগতেন [সেই অর্থাৎ লক্ষ্য অক্ষর বস্তুতে ভাব অর্থাৎ রতির ভাব পাইয়া লয় হইয়াছে যে সর্ব্বার্থ চিত্ত] চেতসা [চিত্তদ্বারা] লক্ষ্যং [উক্ত লক্ষণযুক্তম্। যিনি বেধনের পূর্ব্বে থাকেন 'লক্ষ্য', তিনিই বেধনের পর ত্বম্ ত্বাচ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়গম্য। লক্ষ্য করিবার জন্য চাই নিপুণ ইন্দ্রিয় বৃত্তি। লক্ষ্য যাহার স্থির, তাহারই বেধন-আকাঙ্ক্ষা হয় ফলবতী] তৎ এব অক্ষরম্ [অক্ষর সেই ব্রহ্ম-মৃগকে] সোম্য [হে সৌম্য] বিদ্ধি [বিদ্ধ কর, বাণে বাণে জর্জ্জরিত কর]।

উহাতে নিরন্তর ব্যাকুল ধ্যানদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ সন্ধান করিবে, ধনু আকর্ণ পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রেমে লয় চিত্তদ্বারা লক্ষ্য সেই অক্ষরকেই বিদ্ধ কর। ২।২।৩

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। ৪

উপমাটী পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—প্রণবঃ [প্রণব] ধনুঃ [লক্ষ্যবেধ বিষয়ে ওঙ্কারই ধনু ; যেমন লক্ষ্যে শর প্রবেশ বিষয়ে ধনুই কারণ, সেই প্রকার অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মশরের প্রবেশে প্রণবই কারণ। প্রণব অভ্যাসে সব সংস্কৃত হয়, বেধনের সব প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়, ব্রহ্ম-প্রবেশ অব্যবহিত হয়।] শরঃ [ধনুর শর] হি আত্মা [জীবাত্মাই] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম] তল্লক্ষ্যম্ [উক্ত শরের লক্ষ্য] উচ্যতে [কথিত হন্] অপ্রমত্তেন [প্রমাদ-বর্জ্জিত পুরুষদ্বারা ; যাহার জীবনে Error o. omission (বাদ দিবার মত ভ্রমের সম্ভাবনা) নাই. যিনি জীবাত্মা-পরমাত্মার অসহ দৃষ্টিশূন্য, যিনি আত্মা-অনাত্মার ভেদ-অভেদ রূপ অবগত আছেন, যিনি লক্ষ ব্রহ্ম-মৃগকে দারা দুনিয়ার ভেদ-উপায়ের সকল বস্তুর বৃক্ষের মধ্যে গুহায় গুহায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যাহার জীবনে সব জটিল-কুটিল কণ্টকময় পথে বিচরণ ভ্রমর হইয়াছে কাঁটার খোঁচার ভিতর যিনি পুরুষোত্তমের খোঁচা অনুভব করেন, তিনিই অপ্রমত্ত, মাতালের মত টলিবার তাহার কাছে আর এদিক-ওদিক নাই, সবদিকই যার পুরুষোত্তম দিক তিনিই অপ্রমত্ত, তাহা দ্বারাই] বেদ্ধব্যম্ [বেধনের যোগ্য] শরবৎ [শরের মত] তন্ময়ঃ ভবেৎ [তন্ময় হইবে ; শর যেমন লক্ষ্যের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া মর্ম্মগত হয় জীবাত্মাও সেই পুরুষোত্তমকে বিদ্ধ করিয়া ভেদ-অভেদ ভাবে পুরুষোত্তমময়ই হইয়া যান্, পুরুষোত্তমতাদাত্ম্যই লাভ করেন, এবং তাদাত্ম্য প্রাপ্ত ভক্তের কাছে শরবিদ্ধ যেমন মৃগয়াকারীর আয়ত্তাধীন হয়, লক্ষ্য ব্রহ্ম সেই রূপই আত্ম সমর্পণ করেন, ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়গম্য হন্। ব্রহ্মে জীবনের পরতে পরতে আদর করিয়া ব্রহ্মময় হন]।

ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম উক্ত শরের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন্। প্রমাদহীন হইয়া বিদ্ধ করিতে হইবে। ২।২।৪

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। ৫

দুর্লক্ষ্য ব্রহ্মকে কোথায় কোথায় লক্ষ্য করিয়া খুঁজিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—যস্মিন্ [যে অক্ষর পুরুষোত্তমে] দ্যৌঃ [দ্যুলোক] পৃথিবী [পৃথিবী] অন্তরিক্ষং চ [এবং অন্তরিক্ষ] ওতম্ [মাখামাখি] মনঃ [অন্তঃকরণ] সহ প্রাণৈঃ চ সর্বৈঃ [এবং সর্ব্ব প্রাণের সহিত] তম্ এব এবং [সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বাশ্রয় একেরই, যিনি প্রতি-একেরই অংশ এক করিয়া বাঁচাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন] জানথ [জান] আত্মানম্ [আত্মাকে (তাঁহাকে জানিয়া)] অন্যাঃ বাচঃ [যথা-কাটাকাটির মধ্য দিয়াযাহা সর্ব্বত্র পরস্পর বিদ্যমান অনন্ত ব্যবধানযুক্ত যত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষোত্তম-বাক্য বর্জিত সেই সব "অন্য বাক্য"; "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ"—অবিপশ্চিতের মন এক্য ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ঠুলায় বঞ্চিত হইয়া অব্যবসায়ের ফলে যখন পুষ্পিত বাক্যের জাল বুনিয়া বুনিয়া যে সব পরস্পর বিদ্যমান বহুশাখাপূর্ণ অনন্ত কর্ম্ম-সম্প্রদায় বা জ্ঞান-সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে সবই অন্যাবাক্-এর ক্ষেত্র] বিমুঞ্চথ [ত্যাগ কর] অমৃতস্য [অমৃতের; সব বিশিষ্ট বাক্যের, সব বিশিষ্ট মতবাদের পরস্পরের বিবাদ মিটাইয়া সমন্বয় স্থাপন করিয়া যিনি সকলকে মরণের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছেন, তিনিই অমৃত, তাঁহার] এষঃ [এই পুরুষোত্তমই] সেতুঃ [পুল, bridge; এপার-ওপারের মিলন-ব্যবস্থা, এপার-ওপারে স্থিত বাক্যে, বাক্ প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তসমূহকে অবরুদ্ধ বর্ষে রক্ষিত করিয়া এবং করিতেছেন যিনি ধারণ করিতেছেন তিনিই বিধরণ, সেতু। এক রক্ত করিয়া যখন সব রক্তকণার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সারা দেহখানি ঘুরিয়া আসে, তখনই সে থাকে পবিত্র, শুদ্ধ এবং তখনই তাহার যোগ্যতা লাভ হয় জীবনের গতি লক্ষ্য করিবার। দুনিয়াময় ছড়ানো বিরাট পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হইবে, বিদ্ধ করিতে হইবে।

যাহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সহিত মন মাখামাখি রহিয়াছে, সেই এক আত্মাকেই অবগত হও এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, এই পুরুষোত্তমজ্ঞানই এপার-ওপারের মিলন সেতু, আখ্যান-প্রদানের সংযোগ সেতু। ২।২।৫

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ৬

অরা ইব [চক্রশলাকার মত] রথনাভৌ [রথচক্রের নাভিতে] (যেরূপ সমর্পিত তদ্রূপ) সংহতাঃ [সন্নিবিষ্ট; পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া] যত্র [যে হৃদয়ে] নাড্যঃ [জীবনবহা সর্ব্বতোব্যাপ্ত নাড়ীসমূহ] [সেই হৃদয়ে] সঃ এষঃ [সেই এই আত্মা-পুরুষোত্তম যখন] অন্তঃ [হৃদয় মধ্যে] চরতে [চরতি; সঞ্চরণ করেন] বহুধা [বহুরূপে] জায়মানঃ [হৃদয়বৃত্তির ভিতরে মনোলোভা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া—কখনও গুরুরূপে, কখনও স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী প্রিয়তমা রূপে, নন্দনরূপে, সখারূপে, কখনও বা শত্রুরূপে; হৃদয়ের ক্ষেত্রেই তিনিসর্ব্বরূপ বহুত্ব-মূর্ত্তিরূপে জাত হইয়া] ওম্ ইতি [ওম্-রূপেই] এবং [যথোক্ত উপায় অবলম্বনে অর্থাৎ অকারদ্বারা সমগ্র জাগ্রৎ স্থানকে, উকারদ্বারা সমগ্র স্বপ্নস্থানকে, ম-কারদ্বারা সমগ্র সুষুপ্তিস্থানকে এবং চতুর্থ অমাত্রাদ্বারা অব্যবহার্য্য] আত্মানং [আত্মাকে] ধ্যায়থ [ধ্যান কর;

অযাবহার্য প্রপাকোপশমের জন্য মন্থন কর] স্বস্তি [মঙ্গল হউক] বঃ [তোমাদের] পারায় [ভবময় সংসারে সংশয় পারের জন্য, 'পরায়'-এই পাঠান্তরও আছে] তমসঃ [অজ্ঞান অন্ধকারের] পরস্তাৎ [অতীত]।

চক্রশলাকা যেমন, রথচক্রের নাভিতে অবস্থিত, সেইরূপ দেহ-ব্যাপিনী নাড়ীসমূহ হৃদয়ে সংহত আছে; সেই হৃদয় মধ্যে উক্ত পুরুষ-রতন হৃদয়ের বৃত্তিতে বহুরূপে জাত হইয়া বিচরণ করেন। এই আত্মাকে 'ওম্' বলিয়া যথোক্ত উপায়ে ধ্যান কর; অজ্ঞানান্ধকারের অতীত পারের যাত্রাপথে তোমাদের স্বস্তি হউক। ২।৬

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে
হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭

যঃ [যিনি] সর্ব্বজ্ঞঃ [সামান্য রূপে সব জানেন] সর্ব্ববিৎ [বিশেষরূপে সব জানেন] যস্য [যাহার] এষঃ [এই] মহিমা [বিভূতি] ভুবি [ভুবনে; এই সারা ভুবন যিনি নিজ ঐশ্বর্য্যের মহিমায় শাসন করিতেছেন এবং হৃদয়ের মাধুর্য্য-রসদ্বারা পোষণ করিতেছেন, তাঁহার এই শাসন-পোষণই মহিমার রস বা রসঘন মহিমা, 'মহিমা রসেন চ'—ছান্দোগ্যশ্রুতি] দিব্যে [দ্যোতনাময় ও ক্রীড়াময়] ব্রহ্মপুরে [ব্রহ্মের নিত্যাভিব্যক্তি স্থান হৃদয় পুণ্ডরীকম্] ব্যোম্নি হি [হৃদয়াকাশেই; আকাশের প্রয়োজন অবকাশদান—হৃদয়াকাশই সকলের সব-কিছু বাসনা কামনার পুরুষোত্তমে বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ দিয়াছে; কর্ত্তৃতত্ত্ব সাধনা যদি বিধিমার্গের শক্ত কাঠামোতে সব-কিছুর অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করুক না কেন, হৃদয়-আকাশ ছিন্ন রাখিয়া দিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া হৃদয়ের ঠাকুর অহরহ যাতায়াত করিতেছেন যেমন হিরণ্যকশিপুর পাওয়া অমর বরের ফাঁক দিয়াই নরহরিদেব প্রহ্লাদের সামনে প্রকটিত হইয়াছিলেন] এষঃ আত্মা [এই আত্মা] প্রতিষ্ঠিতঃ [প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত] মনোময়ঃ [হৃদয়-দেবতা মনের দাবী পূরণ করিয়া মনের অন্তরের অবকাশটুকু সব সময় করিয়া নিজেই সকলের মনোমত রূপে, বাসনা প্রচুর রূপে ঘন হইয়া বিরাজিত] প্রাণশরীরনেতা [প্রা এবং শরীরের নেতা; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শরীরকে নিয়ন্ত্রণে কার্য্যিত করিবার নেতৃত্ব, পরিচালকত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন] প্রতিষ্ঠিতঃ [প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত] অন্নে [অন্ন রস-রক্তাদির মধ্য দিয়া শরীর সৃষ্টি করে, সেই অন্ন রক্তের সর্ব্বশেষ অবতরণ স্থান, বিশ্রাম স্থান, প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র হৃদয়ং [হৃদয়কে] সন্নিধায় [সন্নিধিতে পাইয়া, সম্পূ সন্নিধান রূপ পাইয়া; হৃদয় যাহার সম্যক্ 'নিধান', তি পচা-গলা বিকারময় বিশ্রী অন্নের ক্ষেত্রেই স্ব-প্রতিষ্ঠা যাহা শ্রীক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল] তৎ [তাঁহাকে বিজ্ঞানেন [সর্ব্ববিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রাপ্ত পুরুষোত্তম-বিজ্ঞা দ্বারা] পরিপশ্যন্তি [পরি অর্থাৎ সব দৃষ্টি কোণে দাঁড়াই পূর্ণভাবে সমগ্রভাবে দেখেন] ধীরাঃ [সমগ্রের ক্ষে সমগ্রকে অঙ্গীকার করিয়া সমগ্রকে লইয়া অভিযান করিব যোগ্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষেরা] আনন্দরূপম্ [আনন্দ যাহার রূপ; "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। হ্যেষ হ্যেবানন্দয়াতি।" [রসরূপই আনন্দ-রূপ অমৃতম্ [রস-রূপই অমৃত] যৎ বিভাতি [যাহা সব বিশেষত্বে পরিপূর্ণ আভায় আত্মাযুক্ত করিয়া সহজ ভা সমগ্রভাবে, প্রত্যক্ষ প্রকাশ পাইতেছেন।]

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, এই ভুবনে যাহার মহিমা, দি ব্রহ্মপুরে, হৃদয় আকাশে এই আত্মা প্রতিষ্ঠিত। ই মনোময়, প্রাণ ও শরীরের নেতা, হৃদয়কে সন্নিধিতে পাই অন্নে প্রতিষ্ঠিত, ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিজ্ঞান-দ্বা পরিদর্শন করেন, যিনি অমৃত আনন্দরূপেই বিভা হইতেছেন। ২।২।৭

ক্রম

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপনিষদের পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অপ্রত্যক্ষ, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত :

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ১।০
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮৲
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৬৲

২। ঈশোপনিষৎ ২৲
৩। কেনোপনিষৎ ১৲
৪। কঠোপনিষৎ ৩৲
৫। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে ১৷৷০
৬। স্বরূপের পূর্ণরূপ ৷০
৭। গীতাবল্লরী ৵০
৮। উদ্ধবসংবাদ (পুস্তিকা) ৷৷০
৯। ঐতরেয়োপনিষৎ ১৷০
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
১০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২৷০
১১। প্রশ্নোপনিষৎ ১৷০

: পাণ্ডুলিপি :

১। গুরুগীতা
২। মহাত্মাগীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে

পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা

৩। তৈত্তিরিয়োপনিষৎ
৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৭। স্বামীজি লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৮। অপ্রকাশিত পত্রাবলী
৯। বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ভ্রমকথা ১৷০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা স্বধার কথা ৵০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল ৪৵০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩৲
৪। রবীন্দ্র-কাব্য ৪৲
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪৲

নবজাগরণ আশ্রম

কোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৪৪ পয়সা বার্ষিক পাঁচ টাকা

Cover Printed by : Narayan Printing Works, 95, Narkeldanga North Road. Cal-11